রবীন্দ্র-স্মারকগ্রন্থ

প্রবন্ধ-সংকলন

বি শ্ব ভা র তী
কলিকাতা

প্রকাশকের নিবেদন

রবীন্দ্রজন্মের একশো পঁচিশতম বার্ষিকী পালন উদ্দেশ্যে ইংরেজি ও বাংলা স্মারকগ্রন্থ প্রকাশের যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় সেই অনুযায়ী ইংরেজি গ্রন্থটি ১৯৮৯ সালে প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা গ্রন্থটি মুদ্রণে নানা অভাবিতপূর্ব বাধার সৃষ্টি হওয়ায় প্রকাশে বিলম্ব ঘটল। এই বিলম্বের জন্য বর্তমান গ্রন্থের পাঠকগোষ্ঠীর নিকট আমরা মার্জনাপ্রার্থী।

গ্রন্থমুদ্রণে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের অর্থানুকূল্য কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি।

বর্তমান গ্রন্থের জন্য যাঁরা রচনা পাঠিয়ে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের সহায়তাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অতীব পরিতাপের বিষয়, প্রবন্ধকারদিগের মধ্যে বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য, দেবীপদ ভট্টাচার্য এবং জীবেন্দ্র সিংহ রায় ইতিমধ্যে প্রয়াত হয়েছেন। তাঁদের জীবিতকালে গ্রন্থটি প্রকাশ করা গেল না, এজন্য ঐকান্তিক দুঃখ ও বেদনা জ্ঞাপন করি।

সূচীপত্র

রবীন্দ্র-স্মারকগ্রন্থ

স্টিফেন ফিলিপ্‌স ও রবীন্দ্রনাথ

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

সাহিত্যিকের মৃত্যু হয়— সাহিত্যও অমর হয় না। রাষ্ট্রে-রাষ্ট্রে জাতীয় গ্রন্থাগারে কালাতিক্রম করে যাঁদের সু-সজ্জিত দেখা যায়, তাঁদের অনেকেই আজ আধুনিক পাঠকদের কাছে অপরিচিত।[১] তবে যে-কয়টি সাহিত্যকণাকে কালের কষ্টিপাথরে পরখ করে খাঁটি সোনা বলে জহুরী-পাঠকরা গ্রহণ করেছেন— তাঁরা কালজয়ী স্রষ্টা। কিন্তু অমরতা লাভের গৌরব কজন দাবি করতে পারেন ? কাব্যের রস, গদ্যের তত্ত্ব, অভিনয়ের আঙ্গিক কালবদলের হাওয়ায় নূতন মানুষদের তৃপ্ত করে না। রস ও রুচির মৃত্যু হয়, তত্ত্বেরও সমাধি হয়। সাহিত্য কলা দর্শন বিজ্ঞানের দীর্ঘ পথে ছড়িয়ে আছে রসের পঙ্ক, ভাবের কঙ্কালরাশি। কত কবি-মনীষীকে অবজ্ঞাভরে বিস্মৃতির অন্ধকারে ঠেলে দিয়েছে দিঙ্‌নাগাচার্যর দল। আবার অন্য যুগে মুষ্টিমেয় রসিকের দল তাদের পুনর্বাসন করেছেন।

এই শ্রেণীর এক বিস্মৃত ব্রিটিশ কবি স্টিফেন ফিলিপ্‌সকে স্মরণ করছি কেন, এ-প্রশ্ন বাঙালি সাহিত্যিকদের মনে জাগতে পারে। স্টিফেন ফিলিপ্‌সকে স্মরণ করছি, তার কারণ—রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা ঠাকুর এই তরুণ কবির একখানা কাব্যনাট্য বাংলা ছন্দে রূপান্তর করেন। এত ইংরেজ কবির এত কাব্য থাকতে স্টিফেন ফিলিপ্‌সের 'মারপেসা' কাব্যনাট্য অনুবাদ করতে গেলেন কেন এবং কেনই-বা ভ্রাতুষ্পুত্রীর প্রচেষ্টাকে সফলতা দানের জন্য খুল্লতাত পুনরায় ছন্দে গাঁথলেন ? এ-প্রশ্নের উত্তর পাবার জন্য আমরা স্টিফেন ফিলিপ্‌সের এবং তাঁর পরিবৃত্তির চিত্র রূপ-রেখায় অঙ্কন করতে প্রয়াসী হয়েছি, ক্রমে তাঁর কাব্য-প্রসঙ্গে ফিরে আসব।

অক্সফোর্ডের নিকটবর্তী এক গ্রামে স্টিফেন ফিলিপ্‌সের জন্ম হয় ১৮৬৪ সালের ২৮ জুলাই। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের থেকে বয়সে তিন বৎসরের কনিষ্ঠ এবং ইন্দিরা দেবীর থেকে তিনি নয় বৎসরের জ্যেষ্ঠ। ফিলিপ্‌স অক্সফোর্ডের ছাত্র ; ছাব্বিশ বৎসর বয়সে ১৮৯০ সালে আরো তিনজন ছাত্রের সঙ্গে একত্রে Primavera বা প্রথম কবিতাগুচ্ছ নাম দিয়ে একখানা কাব্যখণ্ড প্রকাশ করেন। এ-প্রসঙ্গে কবিচতুষ্টয়ের অন্যতম লেখক লরেন্স বিনিয়ন তাঁর সহাধ্যায়ী কবি-বন্ধু মনোমোহন ঘোষের Songs of Love and Death কাব্যের প্রবেশিকা-ভূমিকায় যা লেখেন, তার থেকে কিয়দংশ উদ্‌ধৃত করলেই সমকালীন ঘটনার সংবাদ পাওয়া যাবে। তিনি লিখেছেন—"In the Summer term of 1890 Mr. Blackwell published a little volume bound in brown paper which Selwyn Imago had made an exquisite design. It was called Primavera, and was the joint production of Stephen Phillips,

১ দ্রষ্টব্য : Francis M. Crawford নামে জনৈক আমেরিকান ঔপন্যাসিকের জীবনী। তার জীবনীকার লিখেছেন—"Americans liked his stories well enough to purchase each of his 44 volumes by the tens of thousands and to support three collected editions of his novels during his life time." Yet the 1969 Edition of the Encyclopaedia-Britannica does not even mention Crawford in its section on the 19th Century American novel. Few writers have been so decisively consigned to oblivion—*SPAN*, December 1970, p. 12.

Monomohan Ghosh, Arthur Cripps of Trinity and myself. It was received with indulgence often accorded to such youthful effort, and was soon in the Second edition."[২]

রবীন্দ্র-জীবনকথা যাঁরা সামান্যতম অবগত, তাঁরা জানেন যে কবি যৌবনে দ্বিতীয়বার বিলাত যান মাসেক কালের জন্য (সেপ্টেম্বর ১৮৯০)। আমাদের মনে হয় সেই সময়ে তরুণ বাঙালি কবি অক্সফোর্ডের উদীয়মান কবি-চতুষ্টয়ের সদ্য-প্রকাশিত Primavera কাব্যখণ্ড সংগ্রহ করেন— ইংরেজি ভাষায় একজন বাঙালি কবি-ভ্রাতা কী লিখেছেন, তাও হয়তো জানবার কৌতূহল হয়েছিল। খুবই কষ্টকল্পনা হবে না, যদি বলি রবীন্দ্রনাথ বিলাত থেকে ১৮৯০ সালেই উক্ত Primavera কবিতা সঞ্চয়টি কিনেছিলেন, এবং দেশে ফিরে ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবীকে উপহার দিয়েছিলেন ; এবং পরে কোনো সময়ে Marpessa বাংলায় রূপান্তর করবার কথা বলেছিলেন। যাই হোক এ প্রশ্নে আবার যথাসময়ে ফিরে আসতে হবে।

প্রাইমাভেরা কবি-চতুষ্টয়ের কবি-খ্যাতি আজ বিস্মৃতির অতলে নিমজ্জিত, কেবল লরেন্স বিনিয়ন (১৮৬৯-১৯৪২) আর্ট-ক্রিটিকরূপে আমাদের কাছে আজও পরিচিত। তবুও তাঁর *Lyric Poems* (1894)থেকে বর্তমান ইংরেজি কবিতা-সঞ্চয়নে কয়েকটি কবিতা স্থান পেয়েছে। বিনিয়ন পরে ব্রিটিশ মুজিয়মের Keeper of Prints and Drawings পদে নিযুক্ত হন এবং কালে চীনা আর্ট সম্বন্ধে পাণ্ডিত্য-খ্যাতি অর্জন করেন। পরযুগে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হন। কিন্তু সে আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক।

প্রাইমাভেরার অন্যতম কবি Arthur Cripps (1869)। ইনি ইংরেজিভাষাতে কবিতা, উপন্যাস ছোটোগল্প অনেককিছুই লেখেন। কিন্তু ব্রিটেনের দ্বীপ সীমানায় তাঁকে ধরে রাখা যায় নি। তিনি দক্ষিণ রোডেশিয়ার মাশোনাল্যানডে **মিশনারি** হয়ে বাস করতে যান। ১৯১৪ সালে সি· এফ· অ্যানড্রুজ ভারতীয় শ্রমিকদের সত্যাগ্রহ আন্দোলন সরজমিনে দেখতে যান, তখন সেখানে যে-সব লোকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে ক্রিপস তাঁদের অন্যতম। এই কবি সম্বন্ধে স্থানীয় কোনো বিশিষ্ট ভদ্রলোক অ্যানড্রুজকে লিখে জানান, "আপনি জেনে রাখুন যে এই আফ্রিকাতে এখনো এমন দু-একজন আছেন, যাঁরা ঈশ্বরের নামে শয়তানের কাছে মাথা পাতেন নি। এই মুষ্টিমেয়দের মধ্যে একজন সাধু আছেন, যাঁর সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ হলে আমি খুশি হব। তাঁর একটি কাব্যগ্রন্থ পাঠালাম।"[৩]

এই সাধু খ্রীস্টান কবি অক্সফোর্ডের প্রাইমাভেরার অন্যতম লেখক আর্থার ক্রিপ্‌স। ক্রিপ্‌সের জীবন রোডেশিয়ায় কাটে ; তাই তাঁর রচনা-উৎস ছিল ম্যাশোনাল্যানডের পরিবেশ—"mostly derived from his missionary labours and are uniformly graceful and scholarly"। অ্যানড্রুজ যে কাব্যখণ্ড পান সেটি বোধহয় *Pilgrimage of Grace* (1912)। অ্যানড্রুজ লিখেছেন যে এই কাব্যগ্রন্থের মাধ্যমে ক্রিপসের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় ও ক্রমে এই পরিচয় নিবিড় বন্ধুত্বে পরিণত হয়।

প্রাইমাভেরার অপর কবি মনোমোহন ঘোষ—শ্রীঅরবিন্দের অগ্রজ। এদেশে তাঁর খ্যাতি ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক রূপেই। তাঁর কবিতাও যে এককালে ইংরেজ-সাহিত্যিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল এবং ইংরেজি কবিতা-সঞ্চয়নে স্থান পেয়েছিল—এ-সব তথ্য আজ বিস্মৃত। কবি হিসেবে তাঁর জীবন ব্যর্থই হয়েছিল বলতে হবে—এর কারণ তাঁর বন্ধু লরেন্স বিনিয়ন সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। বিনিয়ন বলেন, মনোমোহনের জীবন দোটানায় পড়ে ব্যর্থ হয়। বাল্যকাল ও যৌবন ইংলন্ডে কাটে- সম্পূর্ণ ইংরেজি ভাবাপন্ন হয়ে যান পরিবেশের প্রভাবে। তার পর যে-দেশে ফিরলেন সে-দেশের

২ Manomohan Ghose, "Introductory Memoir": *Song of Love and Death*... 1926, pp. 11-12
৩ 'ঋণাঞ্জলি', 'প্রবাসী', ভাদ্র ১৩৭৭ পৃ ৪৫১।

ভাষা তাঁর অপরিচিত, তথাকার সংস্কৃতির সঙ্গে যোগ নেই। এদেশে ফিরে বিলেতের সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এ-সব কারণে সাহিত্যে তাঁর সৃজনীশক্তি বিকশিত হবার সুযোগ হারাল।

প্রাইমাভেরার স্টিফেন ফিলিপ্‌সও আজ বিস্মৃত। সেই বিস্মৃত কবির একটি কাব্যই হবে আমাদের আলোচ্য বিষয়। এবং সেই আলোচনায় প্রবৃত্ত হবার প্রেরণা কোথায় তা আমরা পূর্বেই বলেছি।

প্রাইমাভেরা প্রকাশের পর স্টিফেন ফিলিপ্‌সের কবিখ্যাতি একদিন ইংলন্ডে ছড়িয়ে পড়ে—বিশেষ করে Marpessa-র জন্য। এই কাব্যনাট্যখানা ব্রিটিশ প্রকাশক ও সমালোচকদের সুনজরে পড়ে গেল। ১৮৯৭ সালে জন্ লেন্ নামে বিশিষ্ট প্রকাশক ফিলিপসের *Poems* সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত করে মুদ্রণ করলেন। ১৮৯৮-এর মুদ্রণে দেখেছি তা তৃতীয় সংস্করণ। আমাদের ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে ১৯০৪ সালে মুদ্রিত পঞ্চদশ সংস্করণ আছে। এর পর আর দেখতে পাই নে এ কবিকে। সমকালীন ব্রিটিশ পত্র-পত্রিকা এই তরুণ কবিকে উচ্ছ্বসিত ভাষায় অভিনন্দিত করেছিলেন—সাহিত্য পত্রিকা Literature তার সাক্ষ্য বহন করছে। ঐ পত্রিকা লিখলেন—'এ ধরনের বই বহুকাল বের হয় নি'— No man in our generation and few in any generation, have written better than this." *Globe* নামকরা পত্রিকা, তাঁরা লিখলেন, "Marpessa has an almost Shakespearian tenderness and beauty." বলা বাহুল্য এ-সব সমালোচকদের অতিশয়োক্তি।

ফিলিপ্‌সের কবি-খ্যাতির জন্য The Academy-র স্বত্বাধিকারী কবিকে প্রথম দফায় ১৫০ গিনি দান করেন এবং ১৮৯৭ সালে পুনরায় ৫০ গিনি দেন—A second gift of Fifty Guineas, to the writer of the two books, which should be adjudged worthy to be 'Crowned' as the most important contribution to the literature of 1897." ইংরেজি জীবনীকোষ লেখক বলছেন "The popularity and sale of his [S. Philips] work was extraordinarily large."—কিন্তু আজ আর তাঁকে ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্রেরা জানে না।

সৌভাগ্যক্রমে ভারতের দুজন সাহিত্যিক ফিলিপ্‌স সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন—তাঁকে যোগ্য মান দিয়েছেন। একজন আইরিশ কবি জেম্‌স কাজিন্‌স, অপরজন শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ। জেম্‌স কাজিন্‌স তাঁর *New ways in English Literature* (Ganesh, Madras, 1917) গ্রন্থে এই বিস্মৃত কবি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এই প্রবন্ধে কাজিনস তাঁর যৌবনে পড়া Marpessa থেকে কয়েক পঙ্‌ক্তি উদ্‌ধৃত করে বলেছেন, "memory retained from the first appearance of the book"— অর্থাৎ ১৮৯০ সাল থেকে।

শ্রীঅরবিন্দ কাজিন্‌সের সমালোচনা পড়ে উৎসাহিত হয়ে স্টিফেন ফিলিপ্‌সের Marpessa সম্বন্ধে The Future Poetry নামে প্রবন্ধধারা *Arya* পত্রিকায় প্রকাশ করেন; পরে তা গ্রন্থভুক্ত হয়। অরবিন্দের জ্যেষ্ঠ সহোদর মনোমোহন ঘোষ অক্সফোর্ডে ফিলিপ্‌সের বন্ধু ছিলেন— এ স্মৃতিও অরবিন্দকে হয়তো Marpessa সম্বন্ধে আলোচনায় উদ্‌বোধিত করেছিল। কিন্তু প্রকৃত আকর্ষণের কারণ ফিলিপ্‌সের কাব্যের metrical stress, rhythm। ইংরেজি কবিতার ছান্দসিক রূপ কী ছিল ও ভাবীকালে কবিতার ধারা কী রূপ গ্রহণ করবে, তা প্রবন্ধগুলিতে বিস্তারিত করেছেন। ফিলিপ্‌সের blank verse— তাঁর মতে— is of a very original mould,...built on this principle."(p. 231-32)। অরবিন্দের মত Marpessa-র সমসাময়িক সমালোচকরাও পোষণ করতেন। *Daily Chronicle* এর সমালোচক লিখেছিলেন ফিলিপ্‌সের "blank verse is finer than his work in rhyme." আমরা অরবিন্দ-উদ্‌ধৃত Blank-verse এর নমুনা কয়েক পঙ্‌ক্তির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ-কৃত অমিত্রাক্ষর ছন্দের অনুবাদ উদ্‌ধৃত করছি:

"For thy life has been
this history of a flower in the air,
Liable but to breezes and to time

As rich and purposeless, as in the rose
The simple doom is beautiful."

"তোমার জীবনটুকু
শূন্যপানে বিকশিত ফুলের কাহিনী,
বায়ু আর কালের খেলেনা, গোলাপের
মত তুমি নিরর্থক শোভার ঈশ্বরী ;
কেবলি সুন্দর হবে এই ভাগ্য তব··· ।"

অরবিন্দ-উদ্‌ধৃত ফিলিপ্‌সের blank verse ও রবীন্দ্রনাথের নমুনা মাত্র দেখিয়ে আমরা, এখন Marpessa কাব্যনাট্য আলোচনাতে প্রবৃত্ত হব ।

গ্রীক পৌরাণিক কাহিনী-মতে মারপেসা মানবী—ইভেনুস-এর কন্যা। ইডাস-ও মানবসন্তান, কিন্তু সাগরদেব-আশ্রিত । তাই মারপেসাকে দেবতা-প্রদত্ত রথে তুলে ইডাস পলায়ন করেন । ইভেনুস তাদের পশ্চাতে ধাবিত হলেন, কিন্তু ধরতে না পেরে মনঃকষ্টে নদীতে আত্মবিসর্জন করেন—সেই থেকে সেই নদীর নাম হল 'ইভেনুস' । এদিকে আপোলোদেব মারপেসাকে প্রেয়সীরূপে পাবার জন্য পাগল। দুই প্রেমিক— নর ও দেবের যুদ্ধ শুরু হল। মহাদেব জিউস্ তাদের ছাড়িয়ে দিয়ে বললেন যে মারপেসা যাকে বরণ করবে সেই তার হবে স্বামী । মারপেসা ইডাসকে বরণ করল । দেবতার প্রেম সম্বন্ধে মানবীর আশঙ্কা, সে যখন জরাগ্রস্ত হবে তখন আপোলো তাকে পরিত্যাগ করবেই— দেবতারা তো অমর, অজর । এ-ই হল গ্রীককাহিনী ।

এই গ্রীক পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে স্টিফেন্ ফিলিপ্‌স Marpessa নামক কাব্যনাট্য রচনা করেন । কবি মুখবন্ধে লেখেন—"Marpessa, being given by Zeus her choice between the God Apollo and Idas a mortal, chose Ideas." (*Poems*, p. 8)

বাঙালি কবির হাতে এসে মারপেসার ভারতীয় নামকরণ হয় মঞ্জুলা ও ইডাস হয় সুরদাস । "সুরদাসের প্রার্থনা" মানসী কাব্যের কবিতা—১২৯৫ সালের ২২-২৩ জ্যৈষ্ঠ রচিত হয় ; অর্থাৎ ১৮৮৮ সালের মে মাসে । আমাদের মনে হয় এই সুরদাসকে স্মরণ করেই কবি-ভ্রাতুষ্পুত্রী ইডাসের নামান্তর করেন 'সুরদাস' । Primavera ১৮৯০ সালের শেষের দিকে রবীন্দ্রনাথ বিলেত থেকে এনে অষ্টাদশী ইন্দিরা দেবীকে দিয়েছিলেন—তা ইতিপূর্বে বলেছি, কিন্তু তিনি কাব্যটি কখন অনুবাদ করেন—সে-তারিখ জানা যায় নি । ইন্দিরাদেবী-কৃত অনুবাদের পাণ্ডুলিপিতে অনেক কাটাকুটি । মনের মতো না হওয়াতে অবশেষে খুল্লতাতের হাতে সমর্পণ করলেন । খুল্লতাত তার রূপান্তর করেন । যে পাণ্ডুলিপিখানা পাওয়া গেছে, তাতে রচনা-শেষে লেখা আছে 'শান্তিনিকেতন ১লা বৈশাখ ১৩১২ ।' ১৩১২ সালে রবীন্দ্রনাথ 'ভাণ্ডার' পত্রিকার সম্পাদন-ভার গ্রহণ করেন (১৯০৫) । কিন্তু পাণ্ডুলিপি আরো পাঁচ বৎসর চাপা থাকে । এর ছাপা রূপ দেখা গেল 'প্রবাসী' মাসিকে ১৩১৭ সালের ফাল্গুন মাসে অর্থাৎ ১৯১০ সালের মার্চ মাসে । কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, পত্রিকাতে অনুবাদকের নাম নেই— কেন, তা জানি নে। ফিলিপ্‌সের মূল কবিতা প্রকাশের বিশ বৎসর পরে, তার বাংলা রূপান্তর পাওয়া গেল ছাপার হরফে । এই পাণ্ডুলিপি ও কাব্য সম্বন্ধে বহু তথ্য দিয়ে পুলিনবিহারী সেন তাঁর স্বাভাবিক নিষ্ঠার সঙ্গে মূল-অনুবাদ কবিতার পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপি প্রকাশ করে পাঠাদির আলোচনা করেছেন ।[৪]

'মঞ্জুলা' মারপেসার অনুবাদ । এমন সার্থক অনুবাদ কমই চোখে পড়ে । ভূমিকায় কবি লেখেন—"মঞ্জুলা নাম্নী নারী

৪ দ্র 'দেশ', সাহিত্য সংখ্যা ১৩৭৩ ।

দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট হইতে বর পাইয়াছিলেন যে সূর্যদেব ও সুরদাস, দেবতা ও নর, এই উভয়ের মধ্যে একতমাকে সে পতিরূপে গ্রহণ করিতে পারিবে। অতঃপর উভয়পক্ষের নিবেদন শুনিয়া মঞ্জুলা সুরদাসকেই বরণ করিল।"

সূর্যদেব মঞ্জুলাকে ভাবীকালের রঙিন ছবি দেখিয়ে তাঁকেই বরমাল্য দানের প্রার্থনা জানালেন। এমন-কি সূর্যদেব মানব-সংসারের বীভৎস-করুণ-কাহিনী বিস্তারিত করতেও কম প্রয়াসী হন নি। তাঁর কথা :

"ফুটিয়াছে
নববসন্তের কোলে এই ত সেদিন—
তুমিও বরিবে দুঃখ, প্রতিদণ্ড পল
তোমারে গ্রাসিবে, ছিন্ন করে নিয়ে যাবে
অন্তিম সন্ধ্যায় ? হায় হেরিতেছি আমি
এখনই চলেছ সেই তামসীর পানে।"

তার পর মঞ্জুলাকে স্বর্গ-সুখে প্রলুব্ধ করে সূর্যদেব বলেন :

"কিন্তু যদি মোর সাথে কর তুমি বাস
ভূলোকের ঊর্ধ্বে রবে পরম পুলকে
সচল সজীব শান্তি মাঝে,—সেইখানে
শ্রম-মাত্রে উথলে আনন্দ পারাবার,
বিশ্রামেতে বহে প্রাণে হরষ হিল্লোল।
কি আশে রমণী যাচে মানবের প্রেম,
আছে কি তাহার ?"

ইতিপূর্বেই বলেছিলেন—'একদিন প্রেমেরে করিবে ব্যঙ্গ পরিহাসে'।

ফিলিপ্সের মূল পাঠ :

"But if thou wilt live with me, then shalt thou bide
In more felicity above the world
In peace alive and moving,, where to stir
In ecstacy, and thrilling is repose
What is the love of men that women seek it."

সূর্যদেব মর-মানবের জীবনের অভাবাত্মক দিকটা অতিরঞ্জিত করে মঞ্জুলাকে বলছেন :

"লাবণ্য রাগিণী আর প্রাণবায়ু মিলি
একটি সংগীতরূপে রচিল তোমাকে
সে কি ঘূর্ণ-বালুকায় যাবে ছড়াইয়া ?···
তবে যদি মোর সাথে কর তুমি বাস
চুম্বনে ঢালিয়া দিব দীপ্ত-অমরতা
অধরে তোমার ; লয়ে ঊর্ধ্বলোকে,—
আলোকে আনন্দে বিশ্ব করিয়া আপ্লুত
যে হর্ষ উপজে তাহা দুজনে ভুঞ্জিব।"

"And all that tint and melody and breath,
Which is their lovely unison are thou,

To be dispersed upon the whirling sands!
But if thou wilt live with me, then will I kiss
Warm immortality into thy lips.
And will carry thee above the world,
To share my ecstacy of flinging beams,
And scattering without intermission joy."

ফিলিপ্‌স যেখানে আপোলোর Babylon, Nineveh. বলিয়েছেন, সেখানে ভারতীয় কবি বলেছেন বারাণসী উজ্জয়িনী। সূর্যদেব সান্ত্বনার সুরে মঞ্জুলাকে বলছেন :

"না হয়, রমণী তুমি দিবে তোমা তরে
কমনীয় কর্মভার।"

"Since thou art a woman thou shalt have
More tender Tasks."

এইরূপে চলে সূর্যদেবের যুক্তি—মঞ্জুলার মন আকর্ষণের জন্য। এই-সব শুনে সুরদাস বলে :

"এহেন বিচার শুনি আর
কি কহিব, কি দেখাব ক্ষীণ প্রলোভন ?—
ওই দেহ বিশ্বের মাধুরী দিয়ে ভরা,
ফাগুনের লাবণ্যে উজ্জ্বল, মাধবীর
মদপাত্র মলয় সমীরে হিল্লোলিত,
জীবনের নিশাপ্রান্তে তরুণ অরুণ,
শুধু ওই দেহ তার নহে মোর প্রেম।
... তবে কেন ভালবাসি ?
অনন্ত তোমার পরে আছে পক্ষ মেলি।

ইডাস বলেন :

"After such argument what can I plead
Or what pale promise make?
I love thee then
Not only for the body packed with sweet
Of all the world, that cup of brimming June,
That jar of violet wine set in the might of life,
Nor far this only do I love thee"

মঞ্জুলা দেব ও-নরের উক্তি শুনে বহু বিচারের পর বরমাল্য দিলেন মানবের কণ্ঠে। মঞ্জুলা মানব-কন্যা, সে ধরণীকেই ভালোবাসে ; তাই স্পষ্ট করেই বলল :

"ব্যথাহীন অমৃতের কথা— অশ্রুহীন
অনন্ত জীবন ; সকল যন্ত্রণা হতে
আমারে বাঁচাতে চাও, পাছে একদিন
দিব্যকান্ত এই মুখ আঁধারে হারায়।
কিন্তু দেব, আমি যে মানবী, মানবের
দুঃখে মোর আছে প্রয়োজন।...
এমন সুন্দর করে রচিয়াছি মোরা
এ পৃথিবী।... জন্ম মোর
এ বেদনা সহিবার তরে, মানবের
কন্যা আমি, মানবের দুঃখ তাপ কিছু
ছাড়িতে উৎসুক নহি, ঘৃণা হয় মনে
করিতে আনন্দ ভোগ তার পরিহরি।"

অতঃপর মঞ্জুলা স্পষ্ট করেই সুরদাসকে বরণ করার কারণস্বরূপ বলছে :

"সুরদাস দিবে মোরে সাধের সন্তান—
তারা নহে দেবশিশু, যারা মানবীকে
অবজ্ঞা করিত— তারা কচি বাছনিরা
আঁকুবাঁকু তনু, মন ভুল ভ্রান্তিময়।
রাত্রে তার পার্শ্বে শোব, দুঃস্বপ্নে ডরিলে
ভরসা পাইব তার কর পরশনে।"

ফিলিপ্‌স মারপেসার কণ্ঠে যে-সুর উদ্গীত করেছেন, তা পৃথিবী-প্রশস্তি তুল্য।

"But if I live with Idas, then we two
On the low earth shall prosper hand in hand
In odours of the open field, and live
In peaceful noises of the farm, and watch
The pastoral fields burned by the setting Sun.
And he shall give passionate children, not
Some-radiant god that will despise me quite,
But clambering limbs and little hearts that err."

"তারপরে যথাকালে আসিলেও জরা
বৃদ্ধ হব একসাথে, লাবণ্য আমার
ম্লান হলে, ক্ষীণ জ্যোতি হলে মোর আঁখি,

ক্ষতিবোধ নাহি হবে তার...
শেষে একে একে
বর্ষগুলি আমাদের দিবে নম্র করি
ধরাপানে, নতমুখে দেখে দেখে যাব
আমাদের ধূলিময় চরম শয়ন
তবু বসি রব মোরা পুণ্য হাসি লয়ে।"

মঞ্জুলা সূর্যদেবকে প্রত্যাখ্যান করে সুরদাসের সঙ্গে পৃথিবীতেই বাস করতে গেল—

"সুরদাস উল্লসিয়া
ধরিল তাহারে, তারপর বিরাজিল
নিস্তব্ধতা,—রোষভরে আরক্ত তপন
করিলেন অন্তর্ধান। তখন দুজনে—
সুরদাস নতমুখ, উন্মুখী মঞ্জুলা
গেলা চলি সায়াহ্নে শ্যামল ছায়ায়।

কাব্যনাট্য এইখানে শেষ হল—মানবকন্যা মা-বসুন্ধরার কোলে মানবগৃহে ফিরে এল—স্বর্গ হতে বিদায় নিল।
মঞ্জুলা কাব্যনাট্য পড়তে পড়তে রবীন্দ্রনাথের "স্বর্গ হইতে বিদায়" কবিতাটির কথা মনে পড়ে। এ-যেন Marpessa-র ভাবেরই প্রতিধ্বনি— ধরিত্রী বর্ণনা। এ-কবিতাটি রচিত হয় শাহাজাদপুরের পথে "উর্বশী" কবিতা রচনার কয়দিন পর—১৮৯৫ সালের ১০ ডিসেম্বর—প্রাইমাভেরা প্রকাশের পাঁচ বৎসর পরে ; ছিন্নপত্রের শেষ পত্রের প্রায় সমসাময়িক।
"স্বর্গ হইতে বিদায়" কবিতাটিতে নায়ক পৃথিবীর মানুষ—দীর্ঘকাল স্বর্গে বাস করে মর্ত্যে ফিরে আসতে চাইছে ; যেমন পৃথিবীর নারী মঞ্জুলা স্বর্গের সকল ভাবী সুখ সম্ভোগের প্রলোভন প্রত্যাখ্যান করে মর্ত্যবাসীর সঙ্গে সুখে দুঃখে বিজড়িত হয়ে বাস করতে চেয়েছিল। কবিতাটিতে স্বর্গক্লান্ত মানুষ বলছে :

"থাকো স্বর্গ হাস্যমুখে, করো সুধাপান,
দেবগণ, স্বর্গ তোমাদেরি সুখস্থান—
মোরা পরবাসী। মর্ত্যভূমি স্বর্গ নহে,
সে যে মাতৃভূমি— তাই তার চক্ষে বহে
অশ্রুজলধারা।... স্বর্গে তব বহুক অমৃত
মর্ত্যে থাক্ সুখেদুঃখে অনন্ত মিশ্রিত
প্রেমধারা— অশ্রুজলে চির শ্যাম করি
ভূতলের স্বর্গখণ্ডগুলি।..."

পাঠকদের পুনরায় এই কবিতাটি পাঠ করবার অনুরোধ জানিয়ে প্রবন্ধ শেষ করছি।

'কালি ও কলম', বৈশাখ ১৩৭৮

রবীন্দ্রনাথের ছন্দ-ভাবনা

প্রবোধচন্দ্র সেন

এক

অবতারণা

"কেউ কেউ বলছেন, এখন কবিতার যে আওয়াজটা শোনা যাচ্ছে সে নাভিশ্বাসের আওয়াজ ; ওর সময় হয়ে এল। যদি তা সত্য হয় তবে সেটা কবিতার দোষে নয়, সময়ের দোষে। মানুষের প্রাণটা চিরদিনই ছন্দে-বাঁধা, কিন্তু তার কালটা কলের তাড়ায় সম্প্রতি ছন্দ-ভাঙা।"— রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি[১] (১৯৩১ ডিসেম্বর) স্মরণ করার উপযোগিতা এখনও আছে। কেননা, 'আধুনিক' অভিধায় আখ্যাত কবিতার গতিপ্রবণতা অনেককেই ভাবিয়ে তুলেছে। তাঁদের মতে কলের তাড়ায়ই হক বা নকলের তাড়ায়ই হক বা অন্য যে-কোনো কারণেই হক আধুনিক কবিতা ছন্দছাড়া, আর ছন্দছাড়া মানেই তো ছন্নছাড়া। তার পরিণতি শুভ হতেই পারে না। এ প্রসঙ্গেই রবীন্দ্রনাথের আর-একটি উক্তি[২] এই— "প্রাণপদার্থ তো বাষ্পবিদ্যুতের ভূতে-তাড়া-করা লোহার এনজিন নয়। তার একটি আপন ছন্দ আছে। সে ছন্দে দুই-এক মাত্রা টান সয়, তার বেশি নয়।" তার বেশি টান পড়লেই বিপদ্। গানের তালের মতো কবিতার ছন্দও তখনই মর্ম স্পর্শ করে 'যখন সে কানের সজীব ছন্দ মেনে চলে'। এর থেকেই বোঝা যায়, 'আধুনিক'.কবিতার প্রতি রবীন্দ্রনাথের মন যে প্রসন্ন ছিল না তার একটা বড় কারণ হল তার ছন্দ-ভাঙার প্রবৃত্তি। আরও নানা প্রসঙ্গেই তাঁর এই মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন—

মন উড়ুউড়ু, চোখ ঢুলু ঢুলু,
 ম্লান মুখখানি কাঁদুনিক—
আলুথালু ভাষা, ভাব এলোমেলো,
 ছন্দটা নিরবাঁধুনিক।
পাঠেকরা বলে, 'এ তো নয় সোজা,
বুঝি কি বুঝি নে যায় না সে বোঝা।
কবি বলে, 'তার কারণ আমার
 কবিতার ছাঁদ আধুনিক।'

—খাপছাড়া-২০, 'মন উড়ুউড়ু'

এই কয়েকটি পঙ্‌ক্তিতে আধুনিক কবিতার সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অপ্রসন্নতার সংক্ষিপ্ত অথচ সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। আর, বোধ করি এ বিষয়ে তাঁর সবগুলি অভিযোগও এখানেই সংকলিত হয়েছে। এই সবগুলি অভিযোগের মধ্যে আধুনিক কবিতার 'নিরবাঁধুনিকতা'ই অর্থাৎ বন্ধনহীনতাই (অনেকের মতে তা 'ছন্দোমুক্তি'রই লক্ষণ) যে সর্বপ্রধান তাতেও সন্দেহ নেই। এই প্রবন্ধের গোড়াতেই যে-দুটি উক্তি উদ্‌ধৃত করেছি তাতেই বোঝা যায়, রবীন্দ্রনাথের মতে আধুনিক কবিতা যে প্রাণের তথা 'কানের সজীব ছন্দ' লঙ্ঘন করে চলছে, এটাই তার ভাবী পরিণতির সবচেয়ে বড় দুর্লক্ষণ।

১ 'আত্মপরিচয়' গ্রন্থ, পঞ্চম প্রবন্ধ ('প্রতিভাষণ')।

২ তদেব

আধুনিক কবিতার ছন্দোদৈন্যের প্রতি রবীন্দ্রনাথের এই যে নির্মমতা, তাকে নেহাত অগতিশীলতা তথা অন-আধুনিকতার লক্ষণ বলে উপেক্ষা করা অযৌক্তিক। রবীন্দ্রনাথের এই মনোভাব আসলে তাঁর সারাজীবনের পরীক্ষা-নিরীক্ষাজাত অভিজ্ঞতারই ফল। ছন্দ ভাঙা-গড়া নিয়ে তাঁর পরীক্ষণের কাজ শুরু হয় তাঁর ছেলেবেলাতেই। পয়ার-ত্রিপদীর কলাকৌশল শেখার পরেই শুরু হয় তাঁর ছন্দ-পরীক্ষণের পালা। এ বিষয়ে তাঁর নিজের উক্তি[১] এই—

> "আট-অক্ষর ছয়-অক্ষর দশ-অক্ষরের চৌকো-চৌকো কতরকম শব্দভাগ নিয়ে চলল ঘরের কোণে আমার ছন্দ-ভাঙাগড়ার খেলা। ক্রমে প্রকাশ পেল দশজনের সামনে।... শুরু হল আমার ভাঙা ছন্দে টুকরো কাব্যের পালা, উঞ্ছবৃত্তির মতো। এই রীতিভঙ্গের ঝোঁকটা ছিল সেই একঘরে ছেলের মজ্জাগত।"

এই রীতিভঙ্গের পরিণতি সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেছেন[২]—"আমার ছন্দগুলি লাগামছেঁড়া,... ভাষার ও ভাবের অপরিণতি পদে-পদে। তখনকার সাহিত্যিকেরা মুখের কথায় বা লেখায় প্রায়ই আমাকে প্রশ্রয় দেন নি।... তাঁদের লেখায় শাসন ছিল, অসৌজন্য ছিল না। তাই প্রশ্রয়ের অভাব সত্ত্বেও বিরুদ্ধরীতির মধ্য দিয়েও আপন লেখা আপন মতে গড়ে তুলেছিলেম।" দেখা যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথের প্রথম বয়সের রচনায় ছন্দ-ভাঙার সঙ্গে গড়াও ছিল। অর্থাৎ প্রচলিত রীতি ও রূপের ছন্দ ভেঙে নূতন রীতি ও রূপের ছন্দ গড়াই ছিল তাঁর লক্ষ্য। তা বলে প্রচলিত ছন্দকে যে তিনি বর্জন করলেন, তা কিন্তু নয়। প্রচলিত ছন্দকেও তিনি কাজে লাগালেন, হয়তো ক্ষেত্রবিশেষে কিছু মেজে-ঘষে নিয়ে। এ প্রসঙ্গে তাঁর আর-একটি উক্তি[৩] (১৯৩১) স্মরণযোগ্য।— "আমি আজন্মকাল বিদ্রোহী— বালক-বয়সেও স্পর্ধার সঙ্গে বাঁধা ছন্দের শাসন অস্বীকার করেই কবিলীলা সুরু করেছি। বাঁধনে ধরা দিতে আপত্তি করি নে, যদি ধরা না-দেবারও স্বাধীনতা থাকে। ঘরে বাস করতে হয় বলেই যদি বাগানে বেরোলেই লোকে চার দিক্ থেকে তেড়ে আসে তা হলে সেটা তো হল জেলখানা। বস্তুত কাব্যে দেয়াল-ছাঁদা ঘরও কবির, নির্দেয়াল বাগানও তার।" ছন্দ রচনায় রবীন্দ্রনাথ চিরকালই এই ঘরে-বাস ও বাগানে বিচরণের নীতি মেনে-চলার পক্ষপাতী ছিলেন। প্রয়োজনমতো তিনি নূতন ঘরও তৈরি করে নিয়েছেন।

যে আজন্মবিদ্রোহী কবি ছন্দ-ভাঙাগড়ার খেলা নিয়ে কবিলীলা শুরু ও শেষ করেছেন তাঁকে স্বভাবতঃই ছন্দের আকৃতি-প্রকৃতি নিয়ে সারাজীবনই অনেক ভাবনাচিন্তা করতে হয়েছিল। সুখের বিষয় ছন্দ নিয়ে তাঁর এই ভাবনাচিন্তার লিখিত নিদর্শনেরও অভাব নেই। তাঁর ছন্দচিন্তার প্রথম নিদর্শন পাওয়া যায় ১৮৮২ সালের জানুআরি মাসে 'ভারতী' পত্রিকায় (১২৮৮ মাঘ) প্রকাশিত গিরিশ ঘোষের 'রাবণবধ' ও 'অভিমন্যুবধ' নাটকের 'নূতন ধরনের অমিত্রাক্ষর ছন্দে'র সমালোচনা উপলক্ষে। তার আগেই তাঁর লাগাম-ছেঁড়া ছন্দে রচিত টুকরো কবিতা (পরে 'সন্ধ্যাসংগীত' গ্রন্থে সংকলিত) প্রকাশের পালা শুরু হয়েছে। তখন তাঁর বয়স প্রায় একুশ। আর, তাঁর ছন্দচিন্তার শেষ নিদর্শন প্রকাশিত হয় ১৯৪০ সালের ডিসেম্বর মাসে সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায় (১৩৪৭ পৌষ ১০), আলোচনার বিষয় গদ্য ছন্দের স্বরূপ। রবীন্দ্রনাথ একাধারে ছন্দ-বিপ্লবের মহানায়ক এবং ছন্দ সংরচনের মহাশিল্পী। এ হেন বিপ্লবসাধক মহাশিল্পীর প্রায় ষাট বছরের (১৮৮২ জানুআরি-১৯৪০ ডিসেম্বর) অবিশ্রান্ত ছন্দচিন্তার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় দেওয়া সহজসাধ্য নয়। তাই এ ক্ষেত্রে আমাকে তাঁর ছন্দভাবনার কয়েকটিমাত্র বিশেষ দিকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েই নিরস্ত হতে হবে।

নিজের ছন্দচিন্তা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের একটি স্মরণীয় উক্তি[৪] এই— "ছন্দের তত্ত্ব সম্বন্ধে আমি যা বলি সেটা আমার অশিক্ষিত বলা, সুতরাং তাতে দোষ স্পর্শ করতে পারে। কিন্তু ছন্দের রস সম্বন্ধে আমি যদি কিছু আলোচনা করি, সংকোচ

১ 'আত্মপরিচয়' গ্রন্থ, পঞ্চম প্রবন্ধ ('প্রতিভাষণ')।

২ তদেব

৩ 'ছন্দ' গ্রন্থ (তৃতীয় সং, ১৯৭৬), অনুষঙ্গ-১, 'ছবি ও গান' কাব্যের মুক্তবৃত্ত ছন্দ (দ্বিতীয় পর্যায়), পৃ ২৪৮। এই প্রবন্ধে ছন্দ-বিষয়ে কবির প্রায় সব মন্তব্যই 'ছন্দ' গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ থেকে গৃহীত।

৪ 'ছন্দ' (১৯৭৬), 'ছন্দের মাত্রা' প্রবন্ধ (দ্বিতীয় পর্যায়), পৃ ১৩৮।

করব না। কেননা ছন্দসৃষ্টিতে অশিক্ষিতপটুত্বের মূল্য উপেক্ষা করবার নয়।" তাঁর এ-জাতীয় আর-একটি উক্তি[১] এই— "ছন্দের বিষয়টা জানবার বিষয় বটে। কিন্তু ছন্দ ব্যবহার কালে কারো বেশি কিছু আবশ্যক হয়, সেটা কাউকে বুঝিয়ে দেওয়া যায় না। এর বেলাও খাটে 'ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন'।" এই দুই উক্তিকে এক সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে দুটি স্বতন্ত্র বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এক, ছন্দের তত্ত্ব বা নিয়ম-কানুন জানবার প্রয়োজনীয়তা আছে আর সে জানা শিক্ষাসাপেক্ষ। শিক্ষার অভাবে ছন্দের জ্ঞানে দোষ বা ত্রুটি থেকে যাবার আশঙ্কা আছে। রবীন্দ্রনাথ নিজে মনে করতেন যথাযোগ্য শিক্ষার অভাবে নিয়ম-বিচার তথা বিশ্লেষণ সম্পর্কে তাঁর মতামতে ভ্রান্তি থাকা অসম্ভব নয়। দুই, ছন্দসৃষ্টিতে বা ছন্দব্যবহারে ছন্দজ্ঞান ছাড়াও 'আরো বেশি কিছু' থাকা আবশ্যক— সেটা 'অশিক্ষিতপটুত্ব' অর্থাৎ সহজাত প্রতিভা, এ ক্ষেত্রে ছন্দের ধ্বনিরস-সৃষ্টির প্রতিভা। এই প্রতিভা শুধু মেধা বা বুদ্ধি তথা প্রচুর শিক্ষার দ্বারা (বহুনা শ্রুতেন) লভ্য নয়। এই প্রতিভা কিভাবে কাজ করে তা কাউকে বুঝিয়ে দেওয়া যায় না। কিন্তু কবির সহজাত শ্রুতিপ্রতিভা যে ছন্দের রস সৃষ্টি করে তা অনির্বচনীয়, অর্থাৎ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের যোগ্য বিষয় নয়। এই ছন্দরস সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বহু মূল্যবান উক্তি বিকীর্ণ হয়ে আছে তাঁর বিভিন্ন রচনায়। এই ছন্দরসের আলোচনায় নিজের অধিকার সম্বন্ধে তাঁর মনে কোনো সংকোচবোধ ছিল না।

এই প্রবন্ধে আমরা শুধু ছন্দের রীতিনীতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মতামতের কিছু পরিচয় দিতে চেষ্টিত হব। এ কাজে প্রবৃত্ত হবার পূর্বে তাঁর ছন্দশিক্ষার কিছু পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন।

দুই

রবীন্দ্রনাথের ছন্দশিক্ষা

রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন ছন্দ-বিষয়ে যথোচিত শিক্ষা লাভ তাঁর হয় নি। বস্তুতঃ সংস্কৃত, বাংলা বা ইংরেজি ছন্দশাস্ত্রের আলোচনায় তিনি কখনও গভীরভাবে নিবিষ্ট হয়েছেন বলে মনে হয় না। তিনি কতকগুলি সংস্কৃত ছন্দের নাম ও লক্ষণ অর্থাৎ গঠনপ্রণালীর কথা জানতেন। তাঁর গদ্য-পদ্য নানা রচনাতেই অনুষ্টুপ্, ত্রিষ্টুভ্, ভুজঙ্গপ্রয়াত, মালিনী, মন্দাক্রান্তা, শিখরিণী, শার্দূলবিক্রীড়িত প্রভৃতি কতকগুলি বর্ণবৃত্তবর্গীয় ছন্দ-নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। মাত্রাবৃত্তবর্গীয় ছন্দের মধ্যে একমাত্র 'আর্যা' ছন্দের নাম ছাড়া অন্য কোনো নাম আপাততঃ মনে পড়ছে না। মনে হয় এগুলির গঠনপ্রণালীও তাঁর অজানা ছিল না। তিনি কতকগুলি বর্ণবৃত্ত ছন্দের বাংলা প্রতিরূপও রচনা করেছিলেন অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথের আদর্শে। ভারতচন্দ্রের কৃপায় তূণক-তোটকের লক্ষণও তাঁর অজানা ছিল না। রসিকতার ছলে সংস্কৃত পদ্ধতিতে অনুষ্টুপ্ ও তোটক ছন্দ প্রয়োগের দু-একটি নিদর্শনও পাওয়া যায় তাঁর কোনো-কোনো রচনায়। শেষ বয়সের একটি প্রবন্ধে ('ছন্দের মাত্রা'-দ্বিতীয় পর্যায়। ১৯৩৪। বাং ১৩৪১ জ্যৈষ্ঠ) সংস্কৃত ও প্রাকৃত ছন্দশাস্ত্রের উল্লেখ এবং প্রাকৃত গগনাঙ্গ, ঝুল্লণা এবং দণ্ডকল ছন্দের সংজ্ঞাসূত্রের উদ্‌ধৃতিও দেখা যায়। কিন্তু কোথাও অক্ষরবৃত্ত (নামান্তরে 'বর্ণবৃত্ত') ও মাত্রাবৃত্ত (নামান্তরে 'জাতি'), সংস্কৃত ও প্রাকৃত ছন্দের এই দুটি প্রধান শ্রেণীবিভাগের নামোল্লেখও দেখা যায় না। এই দুই শ্রেণীর ছন্দের রচনারীতির পার্থক্য অবশ্যই তাঁর জানা ছিল। জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' কাব্যের সঙ্গে যাঁর আবাল্য ঘনিষ্ঠ পরিচয়, তাঁর পক্ষে এটা অজানা থাকতেই পারে না। কিন্তু সংস্কৃত ও প্রাকৃত ছন্দশাস্ত্রে এই দুই রীতির পার্থক্য কিভাবে দেখানো হয়, তা তাঁর জানা ছিল না বলে মনে করার কারণ আছে। বেশি বয়সে (১৯১৮) ভুবনমোহন রায়চৌধুরীর লেখা 'ছন্দকুসুম' (১৮৬৪। বাং ১২৭০ ফাল্গুন) নামের বাংলায়-লেখা সংস্কৃত ছন্দ-শিক্ষার বইটির পরিচয় তিনি পেয়েছিলেন। আরও বেশি বয়সে (১৯৩৪) 'প্রাকৃত-পৈঙ্গল' গ্রন্থ ব্যবহারের প্রয়োজনও তাঁর হয়েছিল। কিন্তু সংস্কৃত বা প্রাকৃত, কোনো ছন্দশাস্ত্রই

১ 'ছন্দ' (১৯৭৬), অনুষঙ্গ-৩, 'ছন্দের মাত্রা-গণনায় স্থিতিস্থাপকতা-বিচার', পৃ ২৫০।

তিনি কখনও যথারীতি অধিগত করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন বলে মনে হয় না।

ক্যাম্‌ব্রিজের অধ্যাপক জে· ডি· এন্ডারসন (১৮৫২-১৯২০) সাহেবকে লেখা একটি পত্রপ্রবন্ধে তিনি কয়েকটি ইংরেজি ছন্দের বিশ্লেষণ করেছিলেন বাংলা ছন্দের কাঠামোর সঙ্গে মিলিয়ে। চিঠিটি 'সবুজ-পত্রে' প্রকাশিতও হয়েছিল (১৩২১ শ্রাবণ। ইং ১৯১৪)। এই বিশ্লেষণ সম্পর্কে প্রবল আপত্তি জানিয়েছিলেন অধ্যাপক এন্ডারসন। কবি-ছান্দসিক সত্যেন্দ্রনাথও ইংরেজি ছন্দের এ-রকম বিশ্লেষণ বিধিসম্মত নয় বলেই জানিয়েছিলেন। ফলে রবীন্দ্রনাথ ওই পত্রপ্রবন্ধটিকে তাঁর 'ছন্দ' গ্রন্থে (১৯৩৬) সংকলন না করাই সমীচীন মনে করেছিলেন। বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথ তাঁর ইংরেজি ছন্দশাস্ত্রের জ্ঞান সম্পর্কে নিজেই সন্দিহান ছিলেন বলে মনে হয়।

রবীন্দ্রনাথের ছাত্রজীবনের প্রথম পর্বে বাংলা ছন্দশাস্ত্র গড়ে ওঠে নি। গড়ে ওঠার সময় হয় নি তখন পর্যন্ত। তখন ছন্দ শেখার উপযোগী দুটি বই ছিল সুপ্রচলিত— লালমোহন বিদ্যানিধি -প্রণীত 'কাব্যনির্ণয়' আর মধুসূদন বাচস্পতি-প্রণীত 'ছন্দোমালা'। 'কাব্যনির্ণয়' বইটির প্রথম সংস্করণে (১৮৬২) ছন্দ-বিষয়ে কোনো অধ্যায় ছিল না। বইটি নর্মাল স্কুলের পাঠ্যপুস্তক রূপে নির্বাচিত হওয়াতে অচিরেই এটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় (১৮৬৪)। এই সংস্করণে বেশ বড় একটি ছন্দ-পরিচ্ছেদ যোগ করা হয়। এই বইটি দীর্ঘকাল পাঠ্যপুস্তক রূপে সুপ্রচলিত ছিল। রবীন্দ্রনাথকেও হয়তো নর্মাল স্কুলের ছাত্র হিসাবে এ বই পড়তে হয়েছিল। কিন্তু তাঁর ছন্দচিন্তায় এ বইটির প্রত্যক্ষ প্রভাবের কোনো লক্ষণ দেখা যায় না, পরোক্ষ প্রভাব থাকতে পারে।

মধুসূদন বাচস্পতি ছিলেন নর্মাল স্কুলেরই শিক্ষক। তাঁকে 'কাব্যনির্ণয়' পড়াতে হত কিনা জানি না। তবে অনুমান করা যায়, এ বইএর ছন্দ-পরিচ্ছেদটি তাঁর মনোমত ছিল না। তার ফলে রচিত হয় তাঁর 'ছন্দোমালা' বইটি। প্রকাশ কাল ১৮৬৮ মে (বাংলা ১২৭৫ বৈশাখ ৩১)। সম্ভবতঃ এ বইটিও নর্মাল স্কুলের পাঠ্যপুস্তক রূপে স্বীকৃত হয়েছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিক্ষক বাচস্পতি মহাশয়ের কাছে এ বইএর পাঠ নিয়েছিলেন কিনা জানা যায় নি। তবে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, তাঁর মনে 'কাব্যনির্ণয়'-এর চেয়ে 'ছন্দোমালা'র প্রভাব হয়েছিল গভীরতর। তার অন্যতম প্রধান কারণ 'কাব্যনির্ণয়'-এর ছন্দসূত্রগুলি রচিত হয়েছিল নীরস গদ্যে, আর 'ছন্দোমালা'র সূত্রগুলি ছিল ছন্দোময়। শুধু তাই নয়, প্রত্যেক ছন্দের লক্ষণগুলিও বর্ণিত হয়েছিল সেই ছন্দেই। যেমন, পয়ারের লক্ষণসূত্র রচিত ছিল পয়ারেই, ত্রিপদীর সূত্র ত্রিপদীতে। ফলে সেসব সূত্র শিক্ষার্থীর কানে, জ্ঞানে ও স্মৃতিতে গাঁথা হয়ে থাকত অনায়াসেই।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন এই গ্রন্থের প্রণেতা মধুসূদন বাচস্পতির প্রিয় ছাত্র। বিশেষ কৃতিত্বের জন্য একবার তিনি তাঁর গুরুর কাছ থেকে একখণ্ড 'ছন্দোমালা' বই পুরস্কার পেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের এই পুরস্কার- প্রাপ্তির গুরুত্ব কম নয়। তাই তিনি তাঁর পরিণত বয়সেও এ-কথা মনে রেখেছিলেন। তাঁর 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে ('বাড়ির আবহাওয়া' পরিচ্ছেদ) আছে এই পুরস্কার-প্রাপ্তির সানন্দ উল্লেখ। স্বভাবতঃই অনুমান করা যায়, এই ছোট বইটি রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলাতেই তাঁর ছন্দচিন্তাকে নানাভাবে উদ্রিক্ত করেছিল। কিন্তু কোনো স্থায়ী বা গভীর প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল বলে মনে হয় না। একমাত্র পয়ার-রচনায় যতি-স্থাপন বিষয়ে গ্রন্থকার মধুসূদন বাচস্পতির অভিমত রবীন্দ্রনাথকে পয়ারের আদর্শ সম্পর্কে একটা সুনির্দিষ্ট ধারণা করতে কিছু সহায়তা করেছিল বলে মনে হয়। আর হয়তো লঘু ও দীর্ঘ-ভেদে ত্রিপদী ও চৌপদী প্রভৃতি তৎকালপ্রচলিত কতকগুলি ছন্দোরূপ চিনে নিতেও সহায়তা করেছিল এই ছোট বইটি। এর চেয়ে গভীরতর কোনো স্থায়ী প্রভাবের পরিচয় আমি পাই নি। তবে এই বইটির প্রত্যক্ষ প্রভাবের চেয়ে তার পরোক্ষ প্রভাবের চেয়ে তার পরোক্ষ প্রভাবের গুরুত্বই বেশি। কারণ এই বইটি যে বালক কবির স্বাধীন ছন্দচিন্তাকে নানাভাবে জাগিয়ে তুলে তাঁকে বিভিন্ন প্রকার ছন্দোরূপ সৃষ্টির প্রবর্তনা জুগিয়েছিল তা নিঃসন্দেহে অনুমান করার কিছু হেতু আছে।

আসলে রবীন্দ্রনাথের ছন্দরচনা তথা ছন্দচিন্তার মূলে ছিল গীতছন্দ ও গীতশাস্ত্রের প্রভাব, সংস্কৃত বা বাংলা ছন্দশাস্ত্রের নয়। রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষভাবে ছন্দ-আলোচনায় প্রবৃত্ত হন অধ্যাপক জে. ডি. এন্ডারসনের ছন্দ-জিজ্ঞাসার প্রেরণায় (১৯১৪)। এই উপলক্ষে তিনি দুটি পত্রাকার প্রবন্ধ রচনা করেন। তাতে দেখা যায়, বাংলা ছন্দের আলোচনায়

প্রায় অনিবার্যভাবেই তিনি গানের তালের প্রসঙ্গ তুলেছেন। কেননা, তিনি জানতেন[১]— "কাব্যে ছন্দের যে কাজ, গানে তালের সেই কাজ।" অন্যত্র বলেছেন[২]— "কবিতায় যেটা ছন্দ, সংগীতে সেইটেই লয়।" লক্ষ করবার বিষয়, তিনি অনেক সময়েই 'তাল' ও 'লয়' শব্দ অভিন্নার্থে ব্যবহার করতেন। তাঁর মতে এসব স্থলে এই দুই-এরই অর্থ ধ্বনিস্পন্দ Rhythm। যা হক, এন্ডারসন সাহেবকে বাংলা ছন্দের দুটি প্রধান রূপের পার্থক্য বোঝাতে গিয়ে তিনি লিখলেন[৩]—

> "আমাদের দেশের সংগীতের তাল যদি আপনার জানা থাকে তবে এক-কথায় বলিলেই বুঝিবেন, চৌপদীতে কাওয়ালির লয়ে ঝোঁক দিতে হয় এবং আমি যে ছন্দটা লক্ষ্য করিয়া লিখিতেছিলাম তাহার তাল একতালা। কাওয়ালি দুইবর্গ মাত্রার তাল এবং একতালা তিনবর্গ মাত্রার।"

এখানেও 'লয়' ও 'তাল' অভিন্নার্থক। যা হক, পরবর্তী কালেও ছন্দের আলোচনা-প্রসঙ্গে তিনি বারবার একতালা, কাওয়ালি, ঝাঁপতাল, দাদরা, ধামার প্রভৃতি তালের উল্লেখ করেছেন। বস্তুতঃ তাঁর ছন্দচিন্তা যে অনেকাংশেই তাঁর সংগীতচিন্তার দ্বারা, মুখ্যত সংগীতের তালবোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত তাতে সন্দেহ নেই। যথাস্থানে বিভিন্ন প্রসঙ্গে তা দেখাতে চেষ্টা করব। পক্ষান্তরে রবীন্দ্রনাথের সংগীতচিন্তা ও তালসৃষ্টি কিছু পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে তাঁর ছন্দচিন্তা তথা ছন্দসৃষ্টির দ্বারা। সে আলোচনা তাঁর সংগীতভাবনার এলাকাভুক্ত, আমাদের পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক।

তিন

বাংলা ছন্দের রীতিভেদ

এবার বাংলা ছন্দের কয়েকটি প্রধান প্রসঙ্গ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি ও ভাবনাগত বিশিষ্টতার কিছু পরিচয় দিতে চেষ্টিত হব।

আমরা সবাই জানি বাংলা ছন্দ রচনার তিন রীতি। অন্ততঃ ১৯২২-২৩ সাল থেকে বাংলা ছন্দের এই তিন রীতি স্বীকৃত হয়ে আসছে সর্বসম্মত রূপে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় রবীন্দ্রচিন্তায় এই তিন রীতির স্বাতন্ত্র্য কখনও সুস্পষ্ট রূপে ধরা পড়ে নি। ১৯১৪ থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত তাঁর রচিত প্রবন্ধে বা চিঠিপত্রে কোথাও এই তিন রীতি স্বীকৃতি পায় নি। অথচ তাঁর রচনাতেই বাংলা ছন্দ তিন রীতির তিন ধারায় প্রবাহিত হয়েছে প্রবলরূপে। তাঁর রচনা থেকেই এই তিন ছন্দোরীতি সংশয়াতীত রূপে ধরা পড়েছে বাংলার ছান্দসিকদের কানে এবং জ্ঞানে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নিজে যখনই বিভিন্ন রীতির ছন্দের পরিচয় দিয়েছেন তখনই শুধু দুই রীতির ছন্দের কথা বলেছেন। এক স্থানে[৪] প্রসঙ্গক্রমে তিনি স্পষ্ট করেই বলেছেন—

> "আমরা বাংলায় সংস্কৃতে [মানে সাধু বাংলায়] ও প্রাকৃতে [মানে চলতি বাংলায়] দুই ভিন্ন নিয়মেই চলি, তার অন্যথা করা অসম্ভব। তাই বাংলা কাব্যে এই দুই ভাষার ধারায় ছন্দের রীতি দুই ভিন্ন পথ নিয়ে থাকে।"

অন্যত্র[৫] বলেছেন— "শাস্ত্রাচার ও লোকাচারের ভেদে একই ভাষায় দুই রকমের প্রথা [অর্থাৎ রীতি] চলচে।" বস্তুতঃ তাঁর মতে এইজন্যেই বাংলা কাব্যে এই দুই ভাষারীতি অনুসারে ছন্দোরীতিও স্বভাবতই দুই ভিন্ন পথ নিয়েছে। অর্থাৎ সাধু ও চলতি, বাংলাভাষার এই দুই রীতিভেদে বাংলা ছন্দেও স্বভাবতঃই দুই রীতি দেখা দিয়েছে— সাধু [সংস্কৃত] ছন্দোরীতি ও চলতি [প্রাকৃত] ছন্দোরীতি। কিন্তু সাধু বাংলাতেই যে দুই ছন্দোরীতি দেখা দিয়েছে মুখ্যতঃ তাঁরই প্রচেষ্টায়, তা ধরা পড়ে

১-২ এই দুটি মন্তব্যই গৃহীত হয়েছে 'ছন্দ গ্রন্থের 'সংগীত ও ছন্দ' প্রবন্ধ (পৃ ৪২ এবং ৪৪) থেকে।

৩ 'ছন্দ' (১৯৭৬), 'বাংলা ছন্দ' দ্বিতীয় পর্যায়, পৃ ৩৪।

৪ 'ছন্দ' গ্রন্থ (১৯৭৬), 'ছন্দের হসন্ত-হলন্ত' দ্বিতীয় পর্যায়, পৃ ১১৭।

৫ 'ছন্দ' গ্রন্থ (১৯৭৬), অনুষঙ্গ-৩, 'ছন্দের মাত্রা-গণনায় স্থিতিস্থাপকতা-বিচার' পৃ ২৪৯।

নি তাঁর সচেতন মনে। সংস্কৃত তথা প্রাচীন প্রাকৃত ভাষায় প্রচলিত অক্ষরবৃত্ত (বা বর্ণবৃত্ত) ও মাত্রাবৃত্ত (বা জাতি), এই দুই ছন্দোরীতির ছন্দশাস্ত্রসম্মত প্যার্থক্য যদি তাঁর জানা থাকত, তাহলে বাংলার সাধু ছন্দোরীতির দুই ধারার স্বাতন্ত্র্য ও তাঁর কাছে স্বতঃস্বীকৃতি লাভ করত বলেই আমার বিশ্বাস। 'বৃত্তম্ অক্ষরসংখ্যাতং জাতির্মাত্রাকৃতা ভবেৎ'— এই ছন্দঃসূত্রটি কখনও তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে নি বলেই মনে হয়। তাই সাধু বাংলা ছন্দের দুই ধারাও তাঁর বিবেচনায় অভিন্ন বলেই গণ্য হয়েছে। তার বিশেষ কারণ কি, যথাস্থানে তা দেখাতে চেষ্টিত হব।

এ প্রসঙ্গে একটা মজার কথা বলা দরকার। তিনি নিজে বাংলা ছন্দের দুই রীতি বই তিন রীতির সন্ধান পান নি। অথচ অন্য সকলের কাছেই বাংলা ছন্দের তিন রীতি স্বতঃস্বীকার্য বলেই গণ্য। তা দেখে তাঁর মনে হল হবেও বা বাংলা ছন্দের তিন রীতিই স্বীকার্য। তাই তিনি একটি রীতি খুঁজে বার করলেন। ফলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত (১৯৩৩) এক প্রবন্ধে তিনি লিখলেন[১]—

> "বাংলা ছন্দের তিনটি শাখা। একটি আছে পুঁথিগত কৃত্রিম ভাষাকে অবলম্বন করে, সেই ভাষা বাংলার স্বাভাবিক ধ্বনিরূপকে স্বীকার করে নি। আর-একটি আছে সচল বাংলার ভাষাকে নিয়ে, এই ভাষা বাংলার হসন্ত শব্দের ধ্বনিকে আপন বলে গ্রহণ করেছে। আর-একটি শাখার উদ্‌গম হয়েছে সংস্কৃত ছন্দকে বাংলায় ভেঙে নিয়ে।"

প্রথম দুটি শাখা তো পূর্বোক্ত সাধু ও চলতি, বাংলা ভাষার দুই রীতি-জাত দুই ছন্দোরীতিরই পুনরুল্লেখ মাত্র। তৃতীয় শাখাটির আশ্রয় সাধু বাংলা, না চলতি বাংলা— এ বিষয়ে তিনি নীরব। উক্ত তৃতীয় শাখার দৃষ্টান্ত হিসাবে তিনি মালিনী, শিখরিণী ও মন্দাক্রান্তা প্রভৃতি বড়-বড় সংস্কৃত ছন্দভাঙা বাংলা ছন্দের উল্লেখ করেছেন। শিখরিণী ছন্দের দুটি দৃষ্টান্ত— একটি অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথের রচিত, অন্যটি নিজের রচিত— আর, মন্দাক্রান্ত ছন্দের একটি স্বরচিত দৃষ্টান্তও উদ্‌ধৃত করেছেন। এই তিন দৃষ্টান্তেরই অবলম্বন সাধু বাংলা এবং তাদের ছন্দও রবীন্দ্রকথিত সাধু ছন্দের অন্তর্গত। তাই এসব ছন্দকে বাংলা ছন্দের তৃতীয় শাখা বলে মেনে নেওয়া যায় না।

আসল কথা, 'মানসী' কাব্য রচনার কালে (১৮৮৭-৯০) তিনি যে নূতন ছন্দোরীতির প্রবর্তন করেন, তার স্বাতন্ত্র্য তাঁর নিজের কাছেই কখনও স্বীকৃতি পায় নি। এই রীতিকে তিনি পূর্বাগত সাধু ছন্দেরই প্রকারভেদ বা রূপান্তর বলে মনে করতেন। তার প্রধান কারণ দুটি— (এক) সংস্কৃত প্রাচীন প্রাকৃত ছন্দের রীতিভেদ বিষয়ে তাঁর অসচেতনতা আর (দুই) সাধু ছন্দের মাত্রাগণনায় তাঁর অবলম্বিত ভ্রান্ত পদ্ধতি। সংস্কৃত ও প্রাকৃত ছন্দের রীতিভেদের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। এখানে রবীন্দ্র-স্বীকৃত মাত্রাগণনার কিছু পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন।

চার

বাংলা ছন্দের মাত্রাগণনা

বাংলা ছন্দের মাত্রাগণনা করা হয় তিন স্বতন্ত্র রীতিতে। মাত্রাগণনার এই তিন রীতিই বাংলা ছন্দের তিন রীতি বলে স্বীকৃত। তদনুসারে সমস্ত বাংলা ছন্দকেই তিন স্বতন্ত্র শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। রবীন্দ্রনাথ মাত্রাগণনার রীতিভেদে ছন্দের শ্রেণীবিভাগ করতেন না, করতেন ভাষারীতি-ভেদে। অধিকন্তু ছন্দের মাত্রাগণনাও করতেন পূর্বাগত ভ্রান্ত পদ্ধতিতে। তার ফলে তাঁকে বারবারই নানা সমস্যায় পড়তে হয়েছে। একে-একে তার একটু পরিচয় দিচ্ছি।

১ 'ছন্দ' (১৯৭৬), 'ছন্দের প্রকৃতি', পৃ ১৭২।

১। পূর্বতন সাধুরীতির ছন্দে

প্রথমেই ধরা যাক পূর্বাগত 'সাধু' ছন্দের কথা। এক স্থানে[১] তিনি বলেছেন (১৮৯২)— "আমাদের ছন্দে অক্ষর গনিয়া মাত্রা নিরূপিত হইয়াছে।" পরবর্তী কালেও (১৯১৪) তিনি অনুরূপ উক্তি[২] করেছেন— "যখন আমাদের সাধুসাহিত্য-প্রচলিত ছন্দগুলি পড়িয়া দেখি, তখন দেখিতে পাই তাহাতে প্রত্যেক অক্ষরটি একমাত্রা বলিয়া গণ্য হইয়াছে। যেমন— 'মহাভারতের কথা অমৃত সমান।' ইহাতে চোদ্দটি অক্ষরে চোদ্দ মাত্রা।" এই সময়েই আর-এক স্থানে[৩] তিনি দেখালেন—

শয্যা কই বস্ত্র কই, কী আছে কৌপীন বই

এই দৃষ্টান্তের প্রত্যেক অক্ষরে এক মাত্রা গণনীয়। এই হিসাবে এখানে আছে আট+আট, মোট ষোল মাত্রা। এই হিসাব সম্পর্কে কবি-ছান্দসিক সত্যেন্দ্রনাথ এক বিতর্ক উত্থাপন করলেন— আমাদের উচ্চারণে 'কই' শব্দেরই অক্ষর তো পুরো এক মাত্রার মূল্য পায় না। তাঁর এ সূক্ষ্ম বিচারবোধ খুবই প্রশংসনীয় সন্দেহ নেই। এই বিতর্কের উত্তরে এক চিঠিতে[৪] রবীন্দ্রনাথ জানালেন, আমাদের উচ্চারণে এখানে— "ক-এর অ-টাকে দীর্ঘ করে ই-এর হ্রস্বতা পূরণ করা হয়।" তিনি আরও বললেন যে, এই নীতি ব্যঞ্জনবর্ণের সম্বন্ধেও খাটে। যেমন— 'কোথা জল, কোথা স্থল' এই দৃষ্টান্তের— "জ যত বড়, ল্ তত বড় নয়। সেইজন্যে জ-টাকে দেড়মাত্রা করতে হয়েছে।" অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের মতে বাংলায় জল্ শব্দের জ দেড় মাত্রা, ল্ আধ মাত্রা। ছন্দের বিশ্লেষণে আধ মাত্রার কথা রবীন্দ্রনাথ অন্যত্রও বলেছেন। 'কই' এবং 'জল' শব্দের ই এবং ল ধ্বনির এ-রকম 'হ্রস্বতাপূরণ'-কে (অর্থাৎ খণ্ডতা পূরণ-কে) তিনি অন্যত্র বলেছেন 'ধ্বনিচুরি'। এ বিষয়ে তিনি আরও বলেছেন যে, অবস্থাবিশেষে এটুকু চুরিতে কানে 'পীড়া বোধ হয় না'।[৫] এ-প্রসঙ্গে বলা উচিত যে, ছন্দবিচারে আধ মাত্রার হিসাবটা অযৌক্তিক। কেননা, স্বর বা ব্যঞ্জন, কোনো খণ্ডবর্ণই (ই্ উ, ও ; ত্, ন্, ল্) স্বতন্ত্রভাবে উচ্চারিত হয় না, তাই তার মাত্রার হিসাব করাও সম্ভব নয়। 'জল্' সিলেব্‌ল্‌টা বাগ্‌যন্ত্রের এক প্রয়াসেই উচ্চারিত হয়। তখন সমগ্রভাবে এই সিলেব্‌লটাকেই দীর্ঘ অর্থাৎ দ্বিমাত্রক বলে গণ্য করা সমীচীন।

রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র[৬] বলেছেন— "বাংলায় হসন্ত শব্দের পূর্ববর্তী স্বর দীর্ঘ হয়। যেমন জল, চাঁদ। এ দুটি শব্দের উচ্চারণে জ-এর অ এবং চাঁ-এর আ আমরা দীর্ঘ করে টেনে পরবর্তী হসন্তের ক্ষতিপূরণ করে থাকি।" এই উক্তির সত্যতা অবশ্য-স্বীকার্য। কেবল 'হসন্ত শব্দের' না বলে শব্দান্ত্য 'রুদ্ধদলের' closed syllable-এর বললেই অধিকতর সংগত হত। দ্বিতীয়তঃ, এসব স্থলে দীর্ঘ উচ্চারণের দ্বারা পরবর্তী স্বরলোপেরই ক্ষতিপূরণ হয়, হসন্তের নয়। তাছাড়া, জল বা চাঁদ, এই দুটি দলের স্বরবর্ণ দীর্ঘ বা দ্বিমাত্রক হয়, না বলে সমগ্র দলটাই দ্বিমাত্রক হয় বলা সংগত। কারণ আমাদের উচ্চারণে খণ্ড ল্ বা খণ্ড দ্ তো ওই দুই মাত্রার বাইরে থাকে না। ল্ বা দ্ নিয়েই দুই মাত্রা উচ্চারিত হয় একই প্রয়াসে। ইংরেজিতেও সমগ্র সিলেব্‌ল্-কেই short বা long বলে গণ্য করা হয়, শুধু তার স্বরটাকে নয়।

রবীন্দ্রনাথের এই বিশ্লেষণ থেকেও বোঝা যায়, জল বা চাঁদ শব্দের দুই অক্ষরে দুই মাত্রা গণনা অযৌক্তিক। রবীন্দ্রনাথ

১ 'ছন্দ' গ্রন্থ (১৯৭৬), 'বাংলা শব্দ ও ছন্দ' প্রবন্ধ, পৃ ৭।
২ 'ছন্দ' গ্রন্থ (১৯৭৬), 'বাংলা ছন্দ' প্রথম পর্যায়, পৃ ২৭।
৩ 'ছন্দ' গ্রন্থ (১৯৭৬), 'বাংলা ছন্দ' দ্বিতীয় পর্যায়, পৃ ৩৯-৪০।
৪ 'ছন্দ' গ্রন্থ (১৯৭৬), অনুষঙ্গ-২, 'সাধু ছন্দে হসন্ত শব্দের মাত্রানিরূপণ', পৃ ২৪৮-৪৯।
৫ 'ছন্দ' গ্রন্থ (১৯৭৬), 'ছন্দের হসন্ত-হলন্ত' প্রবন্ধ, প্রথম পর্যায় : প্রথম অনুচ্ছেদ (পৃ ৯৩) এবং তৃতীয় পর্যায়, তৃতীয় বিভাগ (পৃ ১১৯)
৬ 'ছন্দ' গ্রন্থ (১৯৭৬), 'ছন্দের হসন্ত-হলন্ত', প্রথম পর্যায়, পৃ ৯৪।

এক স্থানে[১] স্পষ্ট করেই বলেছেন, 'অক্ষরবৃত্ত' বা 'অক্ষরমাত্রিক' নাম ব্যবহার করলে ছন্দের বিচারে কানের আধিপত্যকে অস্বীকার করা হয়। অন্যত্র[২] বলেছেন— "আক্ষরিক ছন্দ বলে কোনো অদ্ভুত পদার্থ বাংলায় কিংবা অন্য কোনো ভাষাতেই নেই। অক্ষর ধ্বনির চিহ্নমাত্র।" এরই ব্যাখ্যা[৩] পাওয়া যায় তাঁর আর একটা উক্তিতে— "বাংলা ভাষায় স্বরবর্ণের ধ্বনিমাত্রা বিকল্পে দীর্ঘ ও হ্রস্ব হয়ে থাকে।... ব্যবহারের প্রয়োজনে একটা সীমার মধ্যে তাদের সংকোচন-প্রসারণ চলে।... এইজন্যেই অক্ষরের সংখ্যা গণনা করে ছন্দের ধ্বনিমাত্রা গণনা বাংলায় চলে না।" এই প্রসঙ্গে তাঁর অনুরূপ আরও একটি উক্তি[৪] স্মরণীয়— "মাত্রাগণনার বাঁধা নিয়ম বাংলা ছন্দ-বিচারে চলে না, তার স্থিতিস্থাপকতা [ধ্বনির সংকোচন-প্রসারণ] বিচার করতে হয়।" পূর্বাগত সাধু ছন্দের প্রসঙ্গে এর চেয়ে স্পষ্টতর ও সত্যতর উক্তি আর কি হতে পারে?

রবীন্দ্রনাথ দৃষ্টান্তযোগেও এই উক্তির সার্থকতা প্রতিপন্ন করেছেন। যেমন, 'মহাভারতের কথা' ইত্যাদি দুই পঙ্‌ক্তির ছন্দ-বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে[৫] তিনি বলেন, চলতি বাংলার নিয়মে এই দুই পঙ্‌ক্তির প্রথমাংশের প্রত্যাশিত উচ্চারণরূপ যথাক্রমে 'মহাভারতের্কথা' এবং কাশীরাম্ দাস্কহে'। কিন্তু সাধু ছন্দের রচনায়— "বাঙালি বরাবর সহজেই পড়ে এসেছে 'মহাভারতে-র কথা', অর্থাৎ 'তে'র একারকে দীর্ঘ করে আপসে মীমাংসা করে দিয়েছে [অর্থাৎ ছন্দের মাত্রাসমতা রক্ষা করেছে]। তার পরে 'পুণ্যবান্' কথাটার 'পুণ্য'র মাত্রা কমিয়ে দিতে সংকোচ করে নি।" অথচ 'বান্' কথাটাকে টান দিয়ে দুই মাত্রায় পরিণত করেছে। রবীন্দ্রস্বীকৃত নীতিসূত্র অনুসারে এই দুই পঙ্‌ক্তির ছন্দোগত উচ্চারণরূপ এই—

মহাভারতে-র কথা। অমৃত সমা-ন্,
কাশীরা-ম্ দা-স্ কহে। শুনে পুণ্যবা-ন্।

অর্থাৎ 'তে-র্' প্রভৃতি পাঁচটি শব্দান্ত্য রুদ্ধদলের উচ্চারণ দীর্ঘ অর্থাৎ দুইমাত্রা-পরিমিত। অথচ 'পুণ্' এই শব্দাদ্য রুদ্ধদলটির উচ্চারণ হ্রস্ব, মানে একমাত্রা-পরিমিত। ম হা ভা র প্রভৃতির সব মুক্তদলই হ্রস্ব ও একমাত্রা-পরিমিত। এই হিসাবে প্রতি পঙ্‌ক্তিতেই পাওয়া যাবে চোদ্দ (আট+ছয়) মাত্রা। এই বিশ্লেষণ সর্বতোভাবেই এই ছন্দের চিরাভ্যস্ত উচ্চারণসম্মত। পক্ষান্তরে অক্ষরমাত্রার হিসাব বাঙালির অভ্যস্ত উচ্চারণসম্মত নয়, তাই যুক্তি-সংগতও নয়।

বস্তুতঃ শুধু অক্ষরসংখ্যার বিচারে অনেক সময় এ-জাতীয় ছন্দের ধ্বনিমাত্রা-নিরূপণ সম্ভবই হয় না। যেমন—

১। মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া উৎকট
হঠাৎ ফুকারি উঠে, হিং টিং ছট্।

২। সংক্ষেপে বলিতে গেল; হিং টিং ছট্।

এখানে অক্ষরসংখ্যা গণনা করে 'উৎকট' ও 'হঠাৎ' শব্দের মাত্রানিরূপণ করতে গেলেই সংকটে পড়তে হবে। খণ্ড ৎ-টাই ঘটাবে বিভ্রাট। আবার সং এবং হিং ও টিং-এর মাত্রা নিরূপণ করতে গেলে যে সমস্যা দেখা দেবে, শুধু অক্ষরসংখ্যা গণনার দ্বারা তার মীমাংসাও সম্ভব নয়। এখানে বিপদে পড়তে হবে অনুস্বারকে নিয়ে।

আসলে যে ছন্দোরীতিটি 'অক্ষরবৃত্ত' নামে পরিচিত হয়েছে, তাতে রুদ্ধদলের সংকোচন-প্রসারণ দু-ই চলে একসঙ্গে। আর রুদ্ধদলের এই সংকোচন-প্রসারণ বিচার করেই তার ধ্বনিমাত্রা নিরূপণ করতে হয়। এই হিসাবে কোথাও সমস্যায় পড়তে হয় না। তাই এই রীতির ছন্দকে আমি বলি 'মিশ্রবৃত্ত' বা 'মিশ্রপ্রকৃতির' ছন্দ। রবীন্দ্রনাথ এ-জাতীয় ছন্দের কোনো পারিভাষিক নাম দেন নি। শুধু তার ভাষারীতি অনুসারে তাকে বলেছেন সংস্কৃত বাংলার ছন্দ বা সাধু বাংলার ছন্দ, সংক্ষেপে 'সাধু ছন্দ'।

১ বর্তমান লেখকের 'ছন্দপরিক্রমা' গ্রন্থ (১৯৭৭), 'ছন্দের গঠন' প্রবন্ধ, পৃ ১৭৯।
২-৩ 'ছন্দ' গ্রন্থ (১৯৭৬), 'ছন্দের হসন্ত-হলন্ত' দ্বিতীয় পর্যায়, পৃ ১০১ এবং ১০২।
৪ 'ছন্দ' গ্রন্থ (১৯৭৬), অনুবন্ধ-৩, 'ছন্দের মাত্রা-গণনায় স্থিতিস্থাপকতা-বিচার', পৃ ২৪৯।
৫ 'ছন্দ' গ্রন্থ (১৯৭৬), অনুবন্ধ-২, 'বিবিধ ছন্দপ্রসঙ্গ'-১, পৃ ৮১-৮২।

২। নবতন সাধুরীতির ছন্দে

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'মানসী' কাব্য রচনা কালে (১৮৮৭-৯০) আধুনিক বাংলা সাহিত্যে যে নূতন ছন্দোরীতি প্রবর্তন করেন, এবার দেখা যাক তিনি নিজে তার বিশ্লেষণ করতেন কিভাবে। 'মানসী' কাব্যের ভূমিকাতেই (প্রথম সং, ১৮৯০) তিনি এই নূতন ছন্দোরীতির কিছু পরিচয় দিয়েছেন। এ-প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন[১]—

"এই গ্রন্থের অনেকগুলি কবিতায় যুক্তাক্ষরকে দুই অক্ষর স্বরূপ গণ্য করা হইয়াছে।... আমার বিশ্বাস যুক্তাক্ষরকে দুই অক্ষর স্বরূপ গণনা করাই স্বাভাবিক এবং তাহাতে ছন্দের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে।... শব্দের আরম্ভ-অক্ষর যুক্ত হইলেও তাহাকে যুক্তাক্ষর স্বরূপে গণনা করা যায় নাই।

এই নূতন রীতির দৃষ্টান্ত হিসাবে তিনি বলেছেন—

"নিম্নে যমুনা বহে স্বচ্ছ শীতল ;
ঊর্ধ্বে পাষাণ-তট, শ্যাম শিলাতল।

নিম্নে, স্বচ্ছ এবং ঊর্ধ্বে, এই কয়েকটি শব্দে তিন মাত্রা গণনা না করিলে পয়ার ছন্দ থাকে না!"

এ-প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেছেন যে, এসব স্থলে সংস্কৃত ছন্দের নিয়মানুসারেই শব্দের অনাদ্য যুক্তাক্ষরকে দুই অক্ষর হিসাবে গণনা করা হয়েছে। আসলে কিন্তু সংস্কৃত ছন্দের নিয়মে যুক্তাক্ষরের পূর্ববর্তী অক্ষরকেই দীর্ঘ (অর্থাৎ দ্বিমাত্রক) বলে গণ্য করা হয়, যুক্তাক্ষরকে নয়। এইজন্যই 'শব্দের আরম্ভ-অক্ষর' যুক্ত হলেও দ্বিমাত্রক হয় না। মানতেই হবে, মাত্রাগণনার রবীন্দ্র-কথিত এই নিয়মটা ভ্রান্তিপ্রসূত, কেননা তা উচ্চারণসম্মত নয়। যেমন, 'নিম্‌নে' শব্দের তিন অক্ষরে তিন মাত্রা ধরলে খণ্ড ম-কেও এক মাত্রার মূল্য দিতে হয়। যে ধ্বনি স্বতন্ত্রভাবে উচ্চারিতই হয় না, তাকে মাত্রামূল্য দেওয়া অযৌক্তিক। সংস্কৃত নিয়মে 'নিম্নে' শব্দের নি-টাই দ্বিমাত্রিক, 'ম্নে' একমাত্রক। এই নিয়ম অপেক্ষাকৃত ভাল। আরও ভাল হয় যদি বলা যায়— 'নিম্‌নে' শব্দের 'নিম্' এই রুদ্ধদলটাই দ্বিমাত্রক, আর 'নে' একমাত্রক। কারণ শব্দের এই বিভাগই তার স্বাভাবিক উচ্চারণসম্মত। সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্রকাররা শব্দের উচ্চারণগত দলবিভাগের কথা ভাবেন নি, লিপিগত অক্ষরবিভাগের কথাই ভেবেছেন। তাই তাঁদের বলতে হয়েছে অনুস্বার-বিসর্গযুক্ত বর্ণও দ্বিমাত্রক। তাঁদের মতে 'সঙ্গত' ও 'সম্মত' শব্দের স দ্বিমাত্রক, কারণ এটি যুক্তবর্ণের পূর্ববর্তী, কিন্তু 'সংযত' শব্দের সং দ্বিমাত্রক, কারণ এটি অনুস্বারযুক্ত। 'রুদ্ধদল দ্বিমাত্রাক হয়' বললে এক নিয়মেই কাজ চলে, সংস্কৃতের মতো দুই নিয়ম করতে হয় না। মনে হয় রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে সংস্কৃত নিয়মটা সম্বন্ধেও সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন না। সেজন্য তাঁকে উক্ত দুর্বল নিয়মটার আশ্রয় নিতে হয়েছিল। তাঁর অনুমিত নিয়মে খণ্ডবর্ণেরও মাত্রা আছে বলে মানতে হয়। তাহলে অস্ত্র, রন্ধ্র, সম্প্রদান প্রভৃতি শব্দের যুক্তাক্ষরে তিন মাত্রা গণনা করতে হয়! তাঁর নিয়মে হিংসা দুঃখ প্রভৃতি অনুস্বার-বিসর্গযুক্ত শব্দের মাত্রাগণনা করা যাবে কিভাবে তাও বলা হয় নি। আর, শব্দের আদ্য যুক্তাক্ষর দ্বিমাত্রক না হবার কারণ কি, তাও তিনি ভেবে দেখেন নি। একটু ভাবলেই তিনি বুঝতে পারতেন, যে-যুক্তাক্ষর আমাদের উচ্চারণে বিশ্লিষ্ট হয়ে রুদ্ধদল উৎপাদনের সহায়তা করে না, সে-যুক্তাক্ষর একমাত্রকই থাকে। যেমন, 'ব্রতী' শব্দের ব্র ও 'তন্ত্র' (তন্‌ত্র) শব্দের ত্র ভেঙে দুভাগ হয় না। তাই একমাত্রক। লক্ষণীয় ব্র আছে শব্দের আরম্ভে, আর ত্র আছে অন্তে। আসলে আমাদের উচ্চারণে যুক্তাক্ষর ভেঙে যাবার ফলে যে রুদ্ধদলের সৃষ্টি হয়, সে রুদ্ধদলটাই হয় দ্বিমাত্রক। সে ক্ষেত্রে আমাদের উচ্চারণে আর যুক্তাক্ষর থাকেই না। যেমন, 'ব্রতী' শব্দের ব্র আমাদের মুখে যুক্তাক্ষর, অর্থাৎ মুক্তদল রূপেই উচ্চারিত হয়, তাই তার মাত্রামূল্যও একের বেশি হয় না। কিন্তু 'তীব্র' শব্দের ব্র আমাদের উচ্চারণে বিশ্লিষ্ট হয়ে যায়, ফলে যুক্তাক্ষরত্বের মর্যাদাও হারায়। আর ব্র ভেঙে যাবার ফলে 'তীব্র' শব্দের উচ্চারণরূপ হয় 'তীব্‌র'। তার প্রথমাংশে দেখা দিল একটা রুদ্ধদল, 'তীব্'— আর সেটাই পায় দুই মাত্রার মূল্য।

১ 'ছন্দ' গ্রন্থ (১৯৭৬), 'বাংলা ছন্দে যুক্তাক্ষর', পৃ ৬ এবং 'ছন্দের প্রকৃতি', পৃ ১৬২।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিনির্ভর বিশ্লেষণে 'তীব্র' শব্দের তী একমাত্রা, আর ব্র দুই মাত্রা। এখানেই তাঁর অনুমিত নিয়মের দুর্বলতা। তার মূল কারণ হল তাঁর আবাল্য-অর্জিত অক্ষরের সংস্কার। পরবর্তী কালে তিনি এই অক্ষর-সংস্কারের দুর্বলতা বুঝতে পেরেছিলেন। কিন্তু সে সংস্কার তিনি পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। এইজন্যই দেখি পরিণত বয়সেও (১৯৩৩) তিনি বলছেন[১]— "চন্দনচর্চিত শব্দটা অক্ষরগণনায় আট মাত্রা, অন্তত সংস্কৃত ছন্দে তার এই ওজনই পাকা।" বলা বাহুল্য, সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্র অনুসারে 'চন্দনচর্চিত' শব্দে 'অক্ষর' আছে ছয়টি, আর 'কলামাত্রা'(mora), অর্থাৎ উচ্চারিত ধ্বনির আদর্শমান (কলা) আছে আটটি। চ.ন্দ.ন.চ.র্চি.ত— এই ছয় অক্ষর, তার মধ্যে প্রথম ও চতুর্থ অক্ষরে (দুই চ) দুই+দুই চার কলামাত্রা, আর বাকি চার অক্ষরে চার কলামাত্রা, মোট আট কলামাত্রা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বিশ্লেষণে চ.ন্.দ.ন.চ.র্.চি.ত— এই আট অক্ষরে আট মাত্রা। এই বিশ্লেষণের দুর্বলতা কোথায় তা একটু আগেই দেখানো হয়েছে। আসলে চ-ন্.দ.ন.চ-র্.চি.ত. এই হল ওই শব্দটার উচ্চারণরূপ। চ-ন্ ও চ-র্, এই দুই দীর্ঘ রুদ্ধদলে চার কলামাত্রা আর বাকি চার মুক্তদলে (দ ন চি ত) চার কলামাত্রা, মোট আট কলামাত্রা।

দেখা গেল, পূর্বাগত সাধু ছন্দের বিশ্লেষণে রবীন্দ্রনাথ আবাল্যপোষিত সংস্কারবশে অক্ষরগণনার হিসাবেই অভ্যস্ত ছিলেন। আর, 'মানসী' রচনার যুগে তিনি যে নূতন ছন্দোরীতির প্রবর্তন করেন তাও শুধু যুক্তাক্ষর গণনায় ঈষৎ হেরফের ঘটানোরই ফল। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস, এই নূতন ছন্দোরীতিটি পূর্বতন সাধুরীতিরই অতি সামান্য রূপান্তর মাত্র, দুই রীতিই তাঁর মতে অক্ষরমাত্রক। ফলে তাঁর প্রবর্তিত নূতন ছন্দোরীতির স্বাতন্ত্র্য তাঁরই স্বীকৃতি পায় নি। তাঁর দৃষ্টিতে এই দুই রীতি অভিন্ন। তার বিশেষ কারণ এই যে, এই দুই রীতিরই আশ্রয় সাধু ভাষা। তাই রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত বাংলা ভাষার সাধু ও চলতি এই দুই রীতি-ভেদে ছন্দেরও দুই রীতির কথাই বলেছেন। 'মানসী' কাব্য রচনার যুগে তাঁর প্রবর্তিত নূতন রীতির প্রকৃতিগত স্বাতন্ত্র্য স্বীকৃতি পেয়েছে পরবর্তী কালে, ছান্দসিকদের কাছে।

এখানে আর-একটি কথাও বলা দরকার। 'মানসী' কাব্যের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রবর্তিত নূতন ছন্দের অক্ষরমাত্রা-গণনার যে পদ্ধতির কথা বলেছেন, উত্তর কালের কবিরাও দীর্ঘকাল সেই পদ্ধতিই মেনে চলেছেন, হয়তো এখনও চলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল থেকে নীরেন্দ্রনাথ পর্যন্ত অনেক কবির ছন্দ-বিশ্লেষণেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। কবি করুণানিধানের সঙ্গে আলোচনাকালে তাঁর উক্তরূপ অক্ষরমাত্রা গণনার কথা শুনে প্রথম বিস্মিত হয়েছিলাম। এ-রকম গণনার ত্রুটি কোথায়, তাঁকে তা বোঝাতে পারি নি। বহু কাল পরে, নীরেন্দ্রনাথের ছন্দগ্রন্থেও এই বিশ্লেষণ দেখে আরও বিস্মিত হয়েছিলাম। জানি না এখনকার কবিরা সকলেই ওই বিশ্লেষণপ্রণালী মেনে চলেন কিনা। মাত্রাগণনার এ-রকম ত্রুটিতে ছন্দ-রচনায় বিন্দুমাত্র ত্রুটি ঘটে না, তবে বিচারবুদ্ধির দুর্বলতা অবশ্যই প্রকাশ পায়। আর প্রকাশ পায় ছান্দসিকদের বিচারবিশ্লেষণের চরম ব্যর্থতা।

এখানে এই বিষয়টা একটু বুঝিয়ে বলা দরকার। দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর 'ত্রিবেণী' কাব্যের ভূমিকায় (১৯১২) বাংলা ছন্দকে তথা এই কাব্যের ছন্দকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন।— "(১) মিতাক্ষর, অর্থাৎ যাহার ছন্দোবন্ধ অক্ষরের সংখ্যার উপরে নির্ভর করিতেছে। যুক্তাক্ষর, ঐকার ও ঔকার ছন্দোবিশেষে দুই অক্ষর বলিয়া গণিত হইয়াছে। বৈষ্ণব কবিদিগের পদাবলিতে ইহার বিশেষ প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। মদ্‌রচিত 'মন্দ্র' কাব্যের সমস্ত কবিতা এই [মিতাক্ষর] শ্রেণীর। (২) মাত্রিক, অর্থাৎ যে কবিতার ছন্দ মাত্রা(syllable)দ্বারা পরিমিত হয়। মদ্‌রচিত 'আলেখ্য' কাব্যের সমস্ত কবিতাই এই শ্রেণীর।" —দেখা যাচ্ছে দ্বিজেন্দ্রলালও রবীন্দ্রনাথের মতোই বাংলা ছন্দকে দুই প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করতেন। তবে রবীন্দ্রনাথ ছন্দের শ্রেণীবিভাগ করেছেন ভাষার রীতিভেদ অনুসারে, আর দ্বিজেন্দ্রলাল করেছেন ছন্দের মাত্রাগণনার রীতিভেদ অনুসারে। তাই রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন সংস্কৃত বা সাধু (বাংলার) ছন্দ, তাকে দ্বিজেন্দ্রলাল বলেছেন 'মিতাক্ষর' ছন্দ, আর রবীন্দ্রনাথ যাকে বলতেন প্রাকৃত বা চলতি (বাংলার) ছন্দ, তাকে দ্বিজেন্দ্রলাল বলতেন 'মাত্রিক' (syllabic)

১ 'ছন্দ' গ্রন্থ (১৯৭৬), 'ছন্দের প্রকৃতি', পৃ ১৬০।

ছন্দ। স্বীকার করতে হবে, ছন্দের শ্রেণীবিভাগ নিরূপণে দ্বিজেন্দ্রলালের অবলম্বিত নীতিটাই অধিকতর যুক্তিসংগত। আর-একটা লক্ষণীয় বিষয় এই যে, যে 'ছন্দোবিশেষে' যুক্তাক্ষর দুই অক্ষর বলে গণিত হয়, দ্বিজেন্দ্রলালও, রবীন্দ্রনাথের মতো, সেগুলির স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করেন নি। তাঁর মতেও সেগুলি 'মিতাক্ষর' (অর্থাৎ রবীন্দ্রকথিত 'সাধু') ছন্দের প্রকারভেদ মাত্র। তবে রবীন্দ্রনাথের উক্তিতে ঐকার-ঔকারের দ্ব্যক্ষরতার উল্লেখ নেই, দ্বিজেন্দ্রলালের উক্তিতে আছে। আবার রবীন্দ্রনাথ দ্ব্যক্ষরতার ব্যতিক্রম হিসাবে শব্দের আদ্য যুক্তাক্ষরের কথা বলেছেন, দ্বিজেন্দ্রলাল বলেন নি। প্রসঙ্গক্রমে এখানে বলে রাখা দরকার যে, রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল উভয়েই ইংরেজি syllable কে বাংলায় বলতেন 'মাত্রা'।

কবি সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর 'ছন্দসরস্বতী' প্রবন্ধে[১] (১৯১৮) 'মানসী' কাব্যে প্রবর্তিত নূতন ছন্দোরীতির স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করেছেন। এ রীতিকে তিনি পূর্বাগত 'সাধু' বা 'মিতাক্ষর' রীতির রূপভেদ মাত্র বলে মনে করেন নি। পূর্বাগত অক্ষরগোনা রীতিকে তিনি বলতেন 'আদ্য' পদ্ধতি, আর 'মানসী' কাব্যের নূতন রীতিকে বলতেন 'হৃদ্য' পদ্ধতি। কিন্তু এই নূতন রীতির মাত্রাগণনায় তিনি রবীন্দ্র-দ্বিজেন্দ্রের পদাঙ্ক অনুসরণই করেছেন। এ বিষয়ে তাঁর ছন্দচিন্তার গভীরতা বা স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ পায় নি। এ বিষয়ে তাঁর উক্তি ('ছন্দসরস্বতী', দ্বিতীয় প্রকাশ) এই— "শব্দের গোড়ায় ভিন্ন অন্য সকল জায়গার যুক্ত-অক্ষর প্রকৃতপক্ষে যে এক জোড়া অক্ষর, এই কথাটা মনে রাখলে এই নতুন ছন্দের বিশেষত্ব বুঝতে কষ্ট হবে না। আর এটাও স্মরণ রাখতে হবে যে, ঐ-কার আর ঔ-কার হচ্ছে এক-জোড়া ভিন্ন জাতের স্বরবর্ণে তৈরি।" সহজেই বোঝা যাচ্ছে, সত্যেন্দ্রনাথ এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের অনুবর্তী। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এই তিন কবির একজনও এই নূতন রীতিতে অনুস্বার-বিসর্গ প্রয়োগের কথা ভেবে দেখলেন না। অথচ ছন্দ-রচনায় এঁরা সবাই অনুস্বার-বিসর্গ প্রয়োগ করেছেন অব্যর্থ নৈপুণ্যের সঙ্গে।

আরও বিস্ময়ের বিষয়, সত্যেন্দ্রনাথের 'ছন্দসরস্বতী' প্রবন্ধ প্রকাশের (১৯১৮) পরে ছয় দশকের অধিক কালে বাংলা ছন্দচিন্তা অনেক এগিয়ে গেছে, অথচ আধুনিক কালের অগ্রণী কবি-ছান্দসিক নীরেন্দ্রনাথের ছন্দচিন্তা দীর্ঘকাল, অন্ততঃ এই একটি বিষয়ে, সত্যেন্দ্রনাথের স্তরেই স্থির হয়ে ছিল। তিনি তাঁর 'কবিতার ক্লাস' গ্রন্থে (১৯৭০) 'মাত্রাবৃত্ত' রীতির প্রসঙ্গে বলেছিলেন— "মাত্রাবৃত্তের বেলায়··· প্রতিটি [অযুক্ত] অক্ষর তো এক মাত্রার মূল্য পায়ই, যুক্তাক্ষর পায় দু-মাত্রার মূল্য।·· শব্দের আদিতে যুক্তাক্ষর থাকলে তার মাত্রাগত মূল্য বাড়ে না, সে তখন··· সাধারণ [অযুক্ত] অক্ষরের তুল্যমূল্য।" ঔকার-ঐকার সম্বন্ধে তিনি কিছু বলেন নি। মাত্রাবৃত্ত রীতিতে অনুস্বার-বিসর্গ প্রয়োগে তিনি সিদ্ধহস্ত। অথচ ছন্দ-ব্যাখ্যায় তিনিও এ বিষয়ে নীরব। সুখের বিষয়, তিনি তাঁর গ্রন্থের চতুর্থ সংস্করণে (১৯৭৩) আধুনিক ছন্দচিন্তার কিছু আভাস দিয়েছেন। এই সংস্করণে গ্রন্থের শেষ দিকে 'সব ছন্দই কি সিলেবিক' নামে একটি অতি ছোট অধ্যায়ে (পৃ ৯৪-৯৬) আধুনিকতম ছন্দচিন্তার সংক্ষিপ্ততম পরিচয় পাওয়া যায়। এই অধ্যায়ে বলা হয়েছে— "মাত্রাবৃত্তে মুক্ত-সিলেব্‌ল্ এক-মাত্রার মূল্য পেলেও রুদ্ধ-সিলেব্‌ল্ পায় দুই-মাত্রার।" কিন্তু দৃষ্টান্ত দিয়ে এই ছন্দসূত্রের ব্যাখ্যা করা হয় নি। পক্ষান্তরে গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে আছে পূর্বাগত 'যুক্তাক্ষর-ভাঙা' পদ্ধতির সুবিস্তৃত ব্যাখ্যা ও দৃষ্টান্ত। গ্রন্থের শেষাংশে আধুনিকতম সরল ও যুক্তিসংগত ছন্দসূত্রের উল্লেখমাত্র করা হল, অথচ মূল গ্রন্থে পূর্বাগত ভ্রান্ত ব্যাখ্যা পরিত্যক্ত বা পরিবর্তিত তো হলই না, পরবর্তী পঞ্চম এবং ষষ্ঠ সংস্করণেও এই দ্বৈতাচার বহাল রাখা হল, এটা খুবই দুঃখের বিষয়। কেননা, তাতে জিজ্ঞাসু পাঠকদের বিভ্রান্ত হবার পথটাকেই প্রশস্ত রাখা হল। যা হক, এ-প্রসঙ্গে আর-একটা লক্ষণীয় বিষয় এই যে, নীরেন্দ্রনাথ এই ছন্দোরীতিকে পূর্বগামী কবিদের অনুসরণে 'সাধু', 'মিতাক্ষর' বা 'হৃদ্য' নামে আখ্যাত করেন নি। তিনি মেনে নিয়েছেন ছান্দসিকের দেওয়া পূর্বতন (এবং পরে পরিত্যক্ত) 'মাত্রাবৃত্ত' নামটি।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে বলে রাখা কর্তব্য যে, কবি শঙ্খ ঘোষ কিন্তু ছান্দসিকের আধুনিকতম বিশ্লেষণকেই যুক্তিসংগত বলে

১ দীর্ঘকাল পরে অধ্যাপক অলোক রায়ের সম্পাদনায় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত (১৯৬৮। বাং ১৩৭৪ ফাল্গুন)

মেনে নিয়েছেন। তার কিছু প্রমাণ আছে নীরেন্দ্রনাথের 'কবিতার ক্লাস' গ্রন্থে সংকলিত তাঁর চিঠিতেও। তবে তিনি এখনও ছান্দসিকের দেওয়া পুরোনো নামগুলিই (অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত) ব্যবহার করে থাকেন।

৩। প্রাকৃত রীতির ছন্দে

প্রাকৃত (অর্থাৎ লৌকিক বা চলতি) রীতির ছন্দের রবীন্দ্রস্বীকৃত বিশ্লেষণপ্রণালী কি, এবার তাই দেখানো যাক। প্রথমেই বলা দরকার যে, সাহিত্যক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবকাল পর্যন্ত বাংলা লোকছন্দ বিশ্লেষণের কোনো প্রথাগত নীতি স্বীকৃত ছিল না। বোধ করি তিনিই এ ছন্দের বিশ্লেষণে ও স্বরূপনির্ণয়ে প্রথম প্রবৃত্ত হন (১৮৮৩)। তখন তাঁর বয়স মাত্র বাইশ বছর। 'ভারতী' পত্রিকায় এক প্রবন্ধে (১২৯০ শ্রাবণ) তিনি জানালেন, রামপ্রসাদের ছন্দই বাংলা ভাষার 'স্বাভাবিক' ছন্দ।[১] স্মরণীয় বিষয় এই যে, এই ছন্দের বিশ্লেষণেও তিনি অক্ষরগণনার নীতিই মেনে নিলেন, শুধু অক্ষরগণনার পদ্ধতি বদলালেন। দৃষ্টান্ত হিসাবে উদ্‌ধৃত করলেন রামপ্রসাদের এই দুই ছত্র—

মন্ বেচারির কি দোষ আছে,
তারে যেমন্ নাচাও তেম্‌নি নাচে।

এ সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য এই—"দ্বিতীয় ছত্রের 'তারে' নামক অতিরিক্ত শব্দটি [অতিপর্ব] ছাড়িয়া দিলে দুই ছত্রে এগারোটি করিয়া অক্ষর থাকে।" তার পরে বললেন— "বাস্তবিক ধরিতে গেলে রামপ্রসাদের ছন্দেও আটটির অধিক অক্ষর নাই।

মম্বেচারি র্কি দোষাছে,
যেমন্নাচা তেম্নি নাচে।

দ্বিতীয়, ছত্র হইতে 'নাচাও' শব্দের 'ও' অক্ষর ছাড়িয়া দিয়াছি, তাহার কারণ এই ওটি হসন্ত 'ও' [খণ্ডস্বর], পরবর্তী তে-র সহিত ইহা যুক্ত।"— প্রত্যেকটি খণ্ডবর্ণকে পরবর্তী বর্ণের সঙ্গে যুক্ত বলে গণ্য করার ফলে আটটি অক্ষর পাওয়া গেল, রবীন্দ্রনাথের মতে সেটাই হল ও-ছন্দের মাত্রাসংখ্যার আসল হিসাব। অর্থাৎ এখানেও তিনি অক্ষরমাত্রাকেই এই ছন্দের মূল-উপাদান বলে গণ্য করলেন। এটাও তাঁর অক্ষর-সংস্কারেরই ফল। আসলে এই ঘুরপথে না গিয়ে সোজাসুজি এই দুই ছত্রের দলগুলি (সিলেব্‌ল্‌গুলি) গুনে গেলেই আট মাত্রা পাওয়া যাবে। তাই এই ছন্দকে অক্ষরমাত্রক না বলে দলমাত্রক syllabic বলে মেনে নিলেই এই সমস্যার সরলতম মীমাংসা হয়।

পরবর্তীকালে (১৯৩১) রবীন্দ্রনাথ এ-জাতীয় ছন্দকে সোজাসুজি দলবৃত্ত অর্থাৎ সিলেবিক বলতেও দ্বিধা করেন নি। যেমন তাঁর মতে[২]—

"এই যে এল· সেই আমারি স্বপ্নে-দেখা রূপ,
কই দেউলে দেউটি দিলি, কই জ্বালালি ধূপ।
যায় যদি রে যাক না ফিরে, চাই নে তারে রাখি,
সব গেলেও হায় রে তবু স্বপ্ন রবে বাকি।

এখানে এই, সেই, কই, যায়, হায় প্রভৃতি শব্দ এক সিলেব্‌ল্-এর বেশি মান দাবি করলে না। বাঙালি পাঠক সেটাকে

১ 'ছন্দ' গ্রন্থ (১৯৭৬), 'বাংলাভাষার স্বাভাবিক ছন্দ', পৃ ৬-৭।

২ 'ছন্দ' গ্রন্থ (১৯৭৬), 'ছন্দের হসন্ত-হলন্ত' প্রথম পর্যায়, পৃ ৯৬

অন্যান্য না মনে করে সহজ ভাবেই মেনে নিলে।" এই দৃষ্টান্তে এই, সেই প্রভৃতি সব রুদ্ধদলই এক সিলেব্‌ল্‌-মাত্রা (দলমাত্রা) বলে গণ্য হয়েছে। তেমনি[১]

"দুইজনে জুই তুলতে যখন গেলেম বনের ধারে,
সন্ধ্যা-আলোর মেঘের ঝালর ঢাকল অন্ধকারে।
কুঞ্জে গোপন গন্ধ বাজায় নিরুদ্দেশের বাঁশি,
দোঁহার নয়ন খুঁজে বেড়ায় দোঁহার মুখের হাসি।

এখানে যুগ্মধ্বনিগুলো [রুদ্ধদলগুলো] এক সিলেব্‌ল্‌-এর চাকার গাড়িতে গাড়িতে অনায়াসে ধেয়ে চলেছে।" আর, মুক্তদলগুলি তো স্বভাবতঃই এক সিলেব্‌ল্‌। এই হিসাবে এর প্রত্যেক পঙ্‌ক্তিতেই পাওয়া যাবে চোদ্দটি সিলেব্‌ল্‌-মাত্রা (দলমাত্রা)। সুতরাং, এ রীতির ছন্দ যে সিলেবিক বা দলবৃত্ত তা অনায়াসেই বোঝা যায়। খণ্ডবর্ণকে পরবর্তী বর্ণের সঙ্গে যুক্ত বলে ধরে নিয়ে পরোক্ষে অক্ষরমাত্রার হিসাব আমদানি করা অনাবশ্যক। কেননা, এই হিসাব আমাদের স্বাভাবিক উচ্চারণসম্মত নয়। তাতে অকারণ জটিলতা বাড়ানো হয়।

আরও পরবর্তী কালে (১৯৩৮) তিনি বলেছেন[২]—'চলতি ভাষার কাব্য, যাকে বলে ছড়া, তাতে বাংলার হসন্তসংঘাতের স্বাভাবিক ধ্বনিকে স্বীকার করেছে। সেটা পয়ার হলেও অক্ষরগোনা পয়ার হবে না, সে হবে মাত্রাগোনা পয়ার।" আগেই বলেছি, রবীন্দ্রনাথ ইংরেজি 'সিলেব্‌ল্‌' শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হিসাবে 'মাত্রা' শব্দই ব্যবহার করতেন। দ্বিজেন্দ্রলাল-প্রমুখ আরও কেউ-কেউ সিলেব্‌ল্‌ অর্থে 'মাত্রা' শব্দ ব্যবহার করতেন।[৩] এখানে 'মাত্রাগোনা পয়ার' মানে সিলেব্‌ল্‌-গোনা (সিলেবিক) পয়ার। মজার কথা এই যে, চলতি বাংলা ছন্দের এই সিলেবিক প্রকৃতি মেনে নেওয়া সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত অক্ষর-সংখ্যার সংস্কার কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। চলতি ভাষার পয়ারকে সোজাসুজি 'মাত্রাগোনা' পয়ার বলার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই তিনি তার অক্ষরমাত্রার হিসাব দিয়েছেন।—

"এ-পার গঙ্গা ও-পার গঙ্গা মধ্যিখানে চর,
তারি মধ্যে বসে আছেন শিবু সদাগর।

এটা পয়ার, কিন্তু চোদ্দ অক্ষরের সীমানা পেরিয়ে গেছে। তবু উচ্চারণ মিলিয়ে বানান করলে চোদ্দ অক্ষরের বেশি হবে না।

এপার্গঙ্গা ওপার্গঙ্গা মধ্যিখানে চর,
তারি মধ্যে বসে আছেন্‌শিবু সদাগর।"

ওই একই প্রবন্ধে তিনি অনুরূপ আর-একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন।—

অচিন ডাকে নদীর বাঁকে ডাক যে শোনা যায়।

বাউল গানের এই ছত্রটি সম্বন্ধে তিনি বলেন—"যদি উচ্চারণ মেনে বানান করা যেত তা হলে বাউলের গানের চেহারা হত।

অচিণ্ডাকে নদীর্বাঁকে ডাক্‌যে শোনা যায়।"

অর্থাৎ এই মাত্রাগোনা (সিলেবিক) পয়ারই অক্ষরগোনা পয়ারের রূপ নিত।

রবীন্দ্রনাথ এক স্থানে[৪] লিখেছেন—"বাংলা চলতি ভাষার ধ্বনি হসন্তের সংঘাতধ্বনি, এইজন্য ধ্বনি হিসাবে সংস্কৃতের

১ 'ছন্দ' গ্রন্থ (১৯৭৬), 'ছন্দের হসন্ত হলন্ত' প্রথম পর্যায়, পৃ ৯৭।
২ 'ছন্দ' গ্রন্থ (১৯৭৬), 'বাংলা প্রাকৃত ছন্দ', তৃতীয় পর্যায়, পৃ ১৮৭।
৩ দ্রষ্টব্য বর্তমান লেখকের 'আধুনিক বাংলা ছন্দসাহিত্য' গ্রন্থ (১৯৮০), পৃ ৯-১১।
৪ 'ছন্দ' গ্রন্থ (১৯৭৬), 'বাংলা ছন্দ', দ্বিতীয় পর্যায়, পৃ ৩৯।

চেয়ে ইংরেজির সঙ্গে তাহার মিল বেশি। তাই এই চলতি ভাষার ছন্দে মাত্রাবিভাগ বিচিত্র। বাংলা-প্রাকৃতের একটা চৌপদী [পঙ্‌ক্তি] নীচে লিখিলাম—

কই পালঙ্ক, কইরে কম্বল,
কপ্‌নি-টুক্‌রো রইল সম্বল,
এক্‌লা পাগ্‌লা ফিরবে জঙ্গল,
মিট্‌বে সংকট, ঘুচবে ধন্দ।"

তার পরে এর সিলেব্‌ল্ ভাগ করে দেখালেন, এর প্রতি পদেই আছে আট মাত্রা। অর্থাৎ এখানে প্রত্যেকটি দল (সিলেব্‌ল্) একমাত্রা বলে স্বীকৃত। এই বিশ্লেষণ থেকেও বোঝা যায়, বাংলাপ্রাকৃত ছন্দ স্বরূপতঃ দলমাত্রক বা দলবৃত্ত (সিলেবিক)। তার পরে ইংরেজি ছন্দের দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখালেন তাতেও এক-একটি সিলেব্‌ল্ই একমাত্রা হিসাবে গণনীয়।

প্রাকৃত-বাংলা ছন্দের প্রকৃতি প্রসঙ্গে এক প্রবন্ধে তিনি 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর-টুপুর' ইত্যাদি ছড়াটির সম্বন্ধে বলেন[১]—"এই ছড়া সাধু বাংলার ছন্দে বাঁধলে পালিস-করা আবলুস কাঠের মতো পিছল হয়ে ওঠে।

বারি ঝরে ঝরঝর নদিয়ায় বান,
শিবু ঠাকুরের বিয়ে তিন মেয়ে দান।...

এতে যুক্তবর্ণের সংযোগ হলেও ছন্দের উল্লাস তাতে বাড়ে না। যথা—

মন্দমন্দ বৃষ্টি পড়ে নবদ্বীপে বান,
শিবুঠাকুরের বিয়া তিন কন্যা দান।...

এইসব যুক্তবর্ণের যোগে এ ছন্দ বন্ধুর হয়ে উঠেছে বটে, কিন্তু তরঙ্গিত হয় নি।"

এই দুই রূপান্তর থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর-টুপুর' ইত্যাদি ছড়াটি এখানে প্রাকৃত (দলবৃত্ত) রীতির পয়ার বলেই স্বীকৃত হয়েছে। ফলে এই ছড়ার প্রত্যেকটি দল (সিলেব্‌ল্) এক মাত্রা হিসাবে গণনীয়।

কিন্তু অন্যত্র[২] তিনি এই ছড়াটির ছন্দ-বিশ্লেষণ করেছেন অন্যভাবে। যেমন—

বৃষ্টি। পড়ে-। টাপুর। টুপুর। নদেয়। এলো-। বা-ন,
শিবঠা। কুরের। বিয়ে-। হবে-। তিন্‌ক। ন্‌নে-। দা-ন।

এ সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য এই—"এটা তিন মাত্রার ছন্দ।... এর প্রত্যেক পা-ফেলার লয় হচ্ছে তিনের।" এই বিশ্লেষণের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে তিনি বলেন—"দেখা যাচ্ছে, তিন গণনায় যেখানে-যেখানে ফাঁক, পার্শ্ববর্তী স্বরবর্ণগুলি সহজেই ধ্বনি প্রসারিত করে সেই পোড়ো জায়গা দখল করে নিয়েছে। এত সহজে যে, হাজার হাজার ছেলেমেয়ে এই ছড়া আউড়েছে, তবু, ছন্দের কোনো গর্তে তাদের কারো কণ্ঠ স্খলিত হয় নি।" এ তো গেল ছড়ার কথা।

এ ছন্দের কবিতা সম্পর্কেও তিনি ঠিক এই কথাই বলেছেন।[৩]—"স্বরবর্ণে টান দিয়ে মিড় দেবার জন্যেই প্রাকৃত-বাংলা ছন্দে কবিরা বিনা দ্বিধায় ফাঁক রেখে দেন। সেই ফাঁকগুলো ছন্দেরই অঙ্গ, সেসব জায়গায় ধ্বনির রেশ কিছু কাজ করবার অবকাশ পায়।" তাঁর 'ছন্দ' গ্রন্থের আরও নানা স্থানে তিনি প্রাকৃত-বাংলা ছন্দকে বলেছেন 'তিন মাত্রার ছন্দ'। রবীন্দ্রনাথের এই বিশ্লেষণকে রাজশেখর, সুধীন্দ্রনাথ প্রমুখ কেউ-কেউ চূড়ান্ত বলে মেনে নিয়েছেন। তাঁরা লক্ষ করেন নি বা জানতেন না

১ 'ছন্দ' গ্রন্থ (১৯৭৬), 'ছন্দের অর্থ' প্রথম পর্যায়, পৃ ৬৮।
২ 'ছন্দ' গ্রন্থ (১৯৭৬), 'ছন্দের হসন্ত-হলন্ত' দ্বিতীয় পর্যায়, পৃ ১০২-০৩।
৩ 'ছন্দ' গ্রন্থ (১৯৭৬), 'ছন্দের হসন্ত-হলন্ত' দ্বিতীয় পর্যায়, পৃ ১০৩।

যে, রবীন্দ্রনাথ এ ছন্দের অন্যরকম বিশ্লেষণও করেছেন। যেমন, 'যারা আমার সাঁঝ-সকালের গানের দীপে' ইত্যাদি সুপরিচিত কবিতাটি সম্বন্ধে তিনি বলেছেন[১] (১৯১৭)—"এই জাতের সাধু ছন্দে আঠার অক্ষরের আসন থাকে। কিন্তু এটাতে কোনো-কোনো লাইনে পঁচিশ পর্যন্ত উঠেছে।" অর্থাৎ এ ছন্দটা আঠার অক্ষর-মাত্রার সাধু ছন্দের প্রাকৃত (লৌকিক) প্রতিরূপ। তাই এটাতে অক্ষর-মাত্রার হিসাব চলবে না। একটু মন দিলেই দেখা যাবে, এটাতেও প্রতি পঙ্‌ক্তিতে আছে আঠার মাত্রা, কিন্তু সে মাত্রা অক্ষরমাত্রা নয়, সিলেবল-মাত্রা (দলমাত্রা)। দীর্ঘকাল পরে (১৯৩৪) প্রাকৃতবাংলা ছন্দের শক্তি ও গাম্ভীর্য প্রসঙ্গে তিনি এক প্রবন্ধে[২] বলেন—"এই প্রাকৃত-বাংলাতেই 'মেঘনাদবধ' কাব্য লিখলে যে বাঙালিকে লজ্জা দেওয়া হত সে কথা স্বীকার করব না।" এর পরে তিনি ওই কাব্যের প্রথম কয়েক লাইনের প্রাকৃত বাংলা রূপ কেমন হতে পারত, তার দৃষ্টান্ত রচনা করেন। ওই দৃষ্টান্তের শেষাংশটুকু এই—

"কও মা সরস্বতী,
অমৃতময় বাক্য তোমার, সেনাধ্যক্ষ-পদে
কোন্ বীরকে বরণ করে পাঠিয়ে দিলেন রণে
রঘুকুলের পরম শত্রু, রক্ষকুলের নিধি।।"

এ সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেন—"এতে গাম্ভীর্যের ত্রুটি ঘটেছে। এ কথা মানব না।" এখানে আমাদের বিচার্য বিষয়, এর মাত্রাবিন্যাস। স্পষ্টতঃই এ ছন্দের প্রতি পূর্ণ পঙ্‌ক্তিতে চোদ্দ মাত্রার সীমা মেনে চলা হয়েছে, আর সে মাত্রা সাধু পয়ারের অক্ষরমাত্রা নয়, সে মাত্রা প্রাকৃত পয়ারে সিলেব্‌ল-মাত্রা (দলমাত্রা)। আশা করি কোনো পাঠকই এই অংশটুকু ছড়ার ছন্দের মতো টেনে-টেনে মাত্রার ফাঁক পূরণ করে তিন মাত্রার লয়ে আবৃত্তি করতে সাহসী হবেন না।

রবীন্দ্রনাথের ছন্দ-ভাবনা সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বলা বাকি রইল। কিন্তু নির্দিষ্ট সময় তথা শ্রোতাদের ধৈর্যের সীমা লঙ্ঘনের ভয়ে (যদি ইতিমধ্যেই সে সীমা লঙ্ঘিত না হয়ে থাকে) এখানেই নিরস্ত হওয়া গেল।

পরিশেষ

উপসংহারে বলা উচিত, আমি মনে করি রবীন্দ্রনাথই বাংলা ছন্দের অদ্বিতীয় রূপকার, তিনিই আমাদের সকলের ছন্দোগুরু। যে দেশে হাজার বছরেও এমন একজন অলোকসামান্য ছন্দশিল্পী কবির আবির্ভাব হয় সে দেশের গৌরবময় সৌভাগ্য ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকে। আমি যে এমন একজন মহা-ছন্দশিল্পীর ছন্দ-ভাবনার দুর্বলতা ও ত্রুটিগুলির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করতে সাহসী হলাম, সে শুধু ছন্দোবিজ্ঞানের মর্যাদা রক্ষার প্রয়োজনে। আমি জানি রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তির প্রতি শ্রদ্ধাবান্। তাঁর জীবিতকালেও এই মনোবৃত্তি নিয়েই তাঁর ছন্দ-চিন্তার প্রতিকূল অথচ সশ্রদ্ধ সমালোচনা করেছি, কিন্তু তাতে তাঁর সস্নেহ আনুকূল্য থেকে বঞ্চিত হই নি। আশা করি এখনও এই নিরপেক্ষ বিশ্লেষণের জন্য রবীন্দ্রানুরাগীদের সহিষ্ণু সহৃদয়তা আমার প্রতি সমভাবে অবিচল থাকবে। মনে রাখার দরকার, শ্রেষ্ঠ গদ্যশিল্পী অভ্রান্ত বৈয়াকরণ হবেন আর শ্রেষ্ঠ ছন্দশিল্পী হবেন অভ্রান্ত ছান্দসিক, এমন কোনো কথা নেই। আর, ভাল ছান্দসিক হলেই যে ভাল ছন্দশিল্পী হওয়া যায় না তার মূর্তিমান প্রমাণ তো আপনাদের সামনেই বিদ্যমান।

সবশেষে জানাই, আমার এই বিচার-বিশ্লেষণে যদি তথ্য বা যুক্তিগত কোনো ত্রুটিবিচ্যুতি কারও চোখে ধরা পড়ে, আমাকে জানালে উপকৃত হব। আমি অভ্রান্ত নই, আর ভ্রান্তিশোধনে আমার কুণ্ঠা বা ক্লান্তিও নেই।★

বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ-পৌষ ১৩৯২, পৃ ১৮৩-২০০

১ 'ছন্দ' গ্রন্থ (১৯৭৬), 'প্রাকৃত মহাপয়ার', পৃ ৭৭-৭৮।

২ 'ছন্দ' গ্রন্থ (১৯৭৬), 'ছন্দের প্রকৃতি', পৃ ১৭০-৭১।

★ বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবনের উদযোগে আয়োজিত সেমিনারে পঠিত (১৯৮০ ডিসেম্বর) এবং বিশ্বভারতী পত্রিকায় প্রকাশ উপলক্ষে পরিমার্জিত ও কোনো-কোনো বিষয়ে কিছু পরিবর্ধিত। ১৮ জানুয়ারি ১৯৮৪

রবীন্দ্রনাথের বই প্রকাশ

পুলিনবিহারী সেন

রবীন্দ্রনাথের প্রথম বই প্রকাশ করেছিলেন তাঁর বন্ধু প্রবোধচন্দ্র ঘোষ, আর তাঁর দ্বিতীয় বই প্রকাশ করেছিলেন তাঁর দাদা সোমেন্দ্রনাথ। প্রথম-প্রকাশিত বই 'কবি-কাহিনী' (১৮৭৮) প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে লিখেছেন—"আমি যখন মেজদাদার নিকট আমেদাবাদে ছিলাম তখন আমার কোনো উৎসাহী বন্ধু[১] এই বইখানা ছাপাইয়া আমার নিকট পাঠাইয়া দিয়া আমাকে বিস্মিত করিয়া দেন। তিনি যে কাজটা ভালো করিয়াছিলেন তাহা আমি মনে করি না, কিন্তু তখন আমার মনে যে-ভাবোদয় হইয়াছিল, শাস্তি দিবার প্রবল ইচ্ছা তাহাকে কোনোমতেই বলা যায় না। দণ্ড তিনি পাইয়াছিলেন, কিন্তু সে বই লেখকের কাছে নহে, বই কিনিবার মালেক যাহারা তাহাদের কাছ হইতে। শুনা যায়, সেই বইয়ের বোঝা সুদীর্ঘকাল দোকানের শেল্‌ফ ও তাঁহার চিত্তকে ভারাতুর করিয়া বিরাজ করিতেছিল।" এই বই প্রকাশের সময় রবীন্দ্রনাথের বয়স সতেরোর কিছু বেশি।

এর মাস পনেরো পরে (১৮৮০) তাঁর দ্বিতীয় বই বেরয়—'বনফুল', চোদ্দ বৎসরের কাছাকাছি বয়সে লেখা। এই বইটি প্রকাশের ব্যবস্থা করেছিলেন তাঁর দাদা সোমেন্দ্রনাথ (১৮৫৯-১৯২৩), তাঁর চেয়ে দু বছরের বড়ো— "আমরা তিনটি বালক একসঙ্গে মানুষ হইতেছিলাম" তাদের একজন। বালক বয়সে রবীন্দ্রনাথ যখন প্রথম কবিতা লিখতে আরম্ভ করেন তখন "আমার দাদা আমার এই সকল রচনায় গর্ব অনুভব করিয়া শ্রোতা সংগ্রহের উৎসাহে" কিভাবে "সংসারকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিলেন" জীবনস্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ তার বিবরণ লিখে গেছেন। তার পর, আরো কিছুকাল পরে, আরো শ্রোতা সংগ্রহের আগ্রহে, বনফুল কাব্য "দাদা সোমেন্দ্রনাথ অন্ধ পক্ষপাতিত্বের উৎসাহে" "গ্রন্থ আকারে ছাপাইয়াওছিলেন।" প্রবীণ বয়স পর্যন্ত এই বইটির কথা স্মরণ করে তিনি গর্ব অনুভব করতেন শোনা গেছে।

এইখানে বলে রাখা যেতে পারে যে, "তিনটি বালকের" অপর বালক রবীন্দ্রনাথের ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়ও পরে রবীন্দ্রনাথের 'প্রকাশক' হয়েছিলেন তাঁর প্রথম 'কাব্য গ্রন্থাবলী' (১৮৯৬) প্রকাশ করে, আকার সাদৃশ্যে 'টালি এডিশন' বলে যা খ্যাত।

প্রথম বয়সের এই বন্ধুভাগ্য বা ভ্রাতৃস্নেহ গ্রন্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে চিরস্থায়ী হয়ে চলবে এমন তো আশা করা যায় না— এর পরে দীর্ঘকাল রবীন্দ্রনাথকে এ বিষয়ে অনেকাংশে আত্মনির্ভরই হতে হয়েছে। রীতিমত প্রকাশক যিনি ধারাবাহিক তাঁর বই ছাপবেন, এমন লোকের সন্ধান তিনি পেলেন চল্লিশ উত্তীর্ণ হয়ে। ইনি প্রিয় সুহৃৎ শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, মজুমদার লাইব্রেরির শৈলেশচন্দ্র মজুমদার—মোহিতচন্দ্র সেন-সম্পাদিত 'কাব্যগ্রন্থ' (১৯০৩-৪) নয় ভাগে ইনি প্রকাশ করেন, পনেরো ভাগে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের গদ্য গ্রন্থাবলীর[২] (১৯০৭-৯) অনেকগুলি বইও ইনি প্রকাশ করেছিলেন। এর পরে ইন্ডিয়ান প্রেস, ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউসের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগ হয়; বিশ্বভারতী রবীন্দ্রনাথের বাংলা গ্রন্থ প্রকাশের ভার গ্রহণ (১৯২৩) করবার পূর্ব পর্যন্ত বিশেষ নি ; এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁরা এই কর্তব্য পালন করেছিলেন, তাঁদের প্রকাশিত শোভন সংস্করণ কাব্যগ্রন্থ (১৯১৫-১৬) বা প্রথম সংস্করণ সচিত্র চয়নিকা (১৯০৯) এখনো গ্রন্থ-সংগ্রাহকদের বিশেষ সমাদরের বস্তু; এ সকলের ব্যবস্থায় কবির পরম অনুরাগী চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম স্মরণীয়।

এ সবই প্রৌঢ় বয়সের কথা, কিন্তু জীবনের প্রথম ভাগে নিজের গ্রন্থ প্রকাশের ব্যবস্থা অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁকে নিজেকেই

করতে হয়েছে— সম্ভবত নিজের সম্বলের উপর নির্ভর করেই ; আর পৈত্রিক অবস্থা যতই সচ্ছল হোক, তাঁর নিজের সম্বল সীমাহীন ছিল না। ব্যবসায়ে লিপ্ত হয়ে দীর্ঘকাল তিনি "পরের অবিবেচনাদোষে ঋণজালে আপাদমস্তক জড়িত" হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের বইয়ের পুরাতন সংস্করণ যাঁরা লক্ষ্য করেছেন তাঁরা দেখেছেন যে, প্রথমদিককার অনেকগুলি বইই আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত, এর অধিকাংশ তিনি নিজ ব্যয়ে প্রকাশ করেছেন। ব্যতিক্রমস্বরূপ কয়েকটি ক্ষেত্রে প্রকাশন-ব্যবসায়ীর নাম প্রকাশকরূপে উল্লিখিত আছে, যেমন 'কড়ি ও কোমল' (১৮৮৬) প্রকাশ করেছেন ৭৮ কলেজ স্ট্রীট থেকে পীপ্‌ল্‌স লাইব্রেরি ; 'চিঠিপত্র' (১৮৮৭) প্রকাশ করেছেন শ্রীশরৎকুমার লাহিড়ী অ্যান্ড কোং, ৫৪ কলেজ স্ট্রীট ; 'পঞ্চভূত' (১৮৯৭) প্রকাশিত হয় ১৪ ডফ স্ট্রীটের সূর কোম্পানি থেকে।[৩] এ সকল ক্ষেত্রেও প্রকাশভার বহনের ব্যবস্থা কী ছিল এখন জানা যায় না— এখনো যেমন অনেক সময় লেখকের ব্যয়ে প্রকাশক বই ছেপে থাকেন সে রকম ব্যবস্থা থাকা আশ্চর্য নয়। 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্রে'র (১৮৮১) প্রকাশকরূপে ভগিনীপতি সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম উল্লিখিত— বইটির স্বত্ব রবীন্দ্রনাথ সারদাপ্রসাদের পুত্র সত্যপ্রসাদকে দিয়েছিলেন ; এই সত্যপ্রসাদ ১৮৯৬ সালে কাব্যগ্রন্থাবলীর প্রকাশক, পূর্বেই সে কথা উল্লিখিত হয়েছে। বন্ধুভাগ্য রবীন্দ্রনাথকে কখনোই সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করে নি ; যোগেন্দ্রনারায়ণ মিত্র রবীন্দ্রনাথের প্রথম গানের সংগ্রহপুস্তক 'রবিচ্ছায়া' (১৮৮৫) বিশেষ উদ্যোগ করে প্রকাশ করেছিলেন।[৪]

এই-সকল ব্যতিক্রম[৫] সত্ত্বেও এ কথা সত্য যে, কিছুকাল আগে পর্যন্ত খ্যাতনামা বাঙালি কবিদেরও যেমন অনেক সময় নিজ ব্যয়ে বই প্রকাশ করতে হত রবীন্দ্রনাথের ভাগ্য তার চেয়ে বেশি সুপ্রসন্ন ছিল না। আর অনুমান হয় যে, এই বই প্রকাশের ব্যয় অন্তত অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁকে নির্বাহ করতে হয়েছে পিতৃপ্রদত্ত নির্দিষ্ট বৃত্তি থেকে ; চাইলে যে বেশি পেতেন না তা নয়, বিশেষত বই ছাপাবার জন্য।[৬] কিন্তু শৃঙ্খলাপ্রিয় পিতা কর্তৃক নির্দিষ্ট বৃত্তির মধ্যেই পুত্রেরা সাধারণত থাকতে চেষ্টা করতেন, সহজে অতিরিক্ত টাকার প্রার্থনা করতেন না, পুরাতন চিঠিপত্রে তার আভাস আছে।

যাই হোক, বই ছাপানোর খরচ পিতার কাছ থেকে পেয়ে থাকুন বা নির্দিষ্ট বৃত্তি থেকে বহন করে থাকুন, সে বইয়ের বিক্রয় ভাগ্যও সেদিন অনুকূল ছিল না— প্রথম বই কবি-কাহিনী সম্বন্ধে যা বলেছিলেন অনেক বই সম্বন্ধেই সে কথা সত্য বলে মনে হয়—"সেই বইয়ের বোঝা সুদীর্ঘকাল দোকানের শেল্‌ফ ও তাঁহার চিত্তকে ভারাতুর করিয়া বিরাজ করিতেছিল।" এজন্য বই তাঁকে সম্ভবত অর্ধমূল্যের কমে বিক্রি করতে হয়েছে ; অর্থাভাবে বইয়ের কপিরাইট বিক্রি করবার কথাও তাঁকে অনেক সময় চিন্তা করতে হয়েছে ; এবং শান্তিনিকেতনের ব্যয় নির্বাহ করবার জন্য, অনেকগুলি বই গ্রন্থাবলী আকারে প্রকাশের অধিকার স্বল্পমূল্যে দিতে হয়েছে।[৭] "সে কথা আজ মনে আছে। তখন আমার বিদ্যানিকেতনের ক্ষুধা মেটাবার জন্যে হিতবাদীর তৎকালীন ধনশালী কর্তৃপক্ষের কাছে আমার চার-পাঁচটা বইয়ের স্বত্ব বন্ধক রেখে সামান্য কিছু টাকা সংগ্রহ করেছিলেম। প্রায় পনেরো বৎসরেও তা শোধ হয় নি। আমার অন্য বইয়ের আয়ও তখন বাধাগ্রস্ত ছিল।"[৮]

২

রবীন্দ্রনাথের বই অর্ধমূল্যে বিক্রয় এক সময়ে বাংলা সাহিত্যে নিষ্ঠুর ব্যঙ্গের উপাদান জুগিয়েছিল। আনন্দ-বিদায় (১৯১২) নাটিকায় দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথকে প্রহসনের বিষয়রূপে ব্যবহার করতে চেষ্টা করেছিলেন এ কথা অনেকে জানেন। এই নাটিকার এক স্থানে কবি নেপালের উক্তি ও তাঁর "পুরুষ ও নারী ভক্তগণের" 'কোরাস' লিপিবদ্ধ আছে—

১

আমি একটা উচ্চ কবি— এমনি ধারা উচ্চ
যে মাইকেল রবি হেমচন্দ্র—
আমার কাছে তুচ্ছ।
আমি নিশ্চয় কোনরূপে স্বর্গ থেকে
টস্‌কে
জন্মেছি এ বঙ্গদেশে বিধাতার হাত
ফস্‌কে।

ভক্তগণের কোরাস।—

মর্ত্যভূমে অবতীর্ণ কুইলের কলম হস্তে—
কে তুমি হে মহাপ্রভু,— নমস্তে নমস্তে।

২

আমি লিখছি যে সব কাব্য মানবজাতির
জন্যে—
নিজেই বুঝি না তার অর্থ বুঝবে
কি তা অন্যে।
আমি যা লিখেছি এবং আজকাল
যা সব লিখছি
সে সব থেকে মাঝে মাঝে আমিই
অনেক শিখছি।

কোরাস। মর্ত্যভূমে ইত্যাদি—

৩

আমি যতই দেখছি ভেবে আমার কাব্যসূত্র,
দেখছি যে জন্মেছি আমি বাণীর বরপুত্র।
তাইতে আমি লিখে যাচ্ছি কাব্য
বস্তা বস্তা—
পাবে গুরুদাসের নিকট— ওজন দরে
সস্তা।

..

"পাবে গুরুদাসের নিকট— ওজন দরে সস্তা"— এই ছত্রের ইতিহাস পাওয়া যাবে রবীন্দ্রনাথের এই চিঠিখানাতে—

শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
বেঙ্গল্ মেডিক্যাল লাইব্রেরি।
৯৭ নং কলেজ্ ষ্ট্রীট্।

আমার ফর্দ্দে লিখিত পুস্তকগুলি আমি আপনার নিকট দুই হাজার তিনশত নয় ২৩০৯ টাকা মূল্যে বিক্রয় করিলাম। তন্মধ্যে অদ্য এগার শত ১১০০ টাকা বুঝিয়া পাইলাম। বাকী টাকা আপনি দুই মাসের মধ্যে দুই বারে পরিশোধ করিবেন। ইহা ব্যতীত দোকানদারদিগের নিকটে যে সকল পুস্তক আছে তাহা ক্রমে পাঠাইয়া দিব, তাহা নগদমূল্যে লইবেন। এ সকল পুস্তক যতদিন না আপনার বিক্রয় শেষ হইবে ততদিন আর এগুলি পুনর্মুদ্রিত করিব না। এ সকল পুস্তক অল্প অবশিষ্ট থাকিতে আমাকে জানাইতে হইবে। পুস্তক আপনার ইচ্ছামত মূল্যে আপনি বিক্রয় করিতে পারিবেন।

১২ই জুলাই
১৮৮৪

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৬নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলি
জোড়াসাঁকো
কলিকাতা।

কবি-প্রেরিত এই 'ফর্দ'টি পাওয়া যায় নি। তবে অনুমান করা যেতে পারে এই চিঠি লেখার কাল পর্যন্ত প্রকাশিত বই, খান বারো-চোদ্দ এই তালিকাভুক্ত ছিল।[৯]

এই চিঠি লেখার অনেককাল পরে পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের বই 'অর্ধমূল্যে' বিক্রয় হত: ফুটপাথে নয়, বইয়ের দোকানে বিজ্ঞাপন দিয়ে, পুরাতন একটি পুস্তক তালিকায় তা দেখতে পাই। ডক্টর শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন মহাশয় এই তালিকাটি আমাদের দেখতে দিয়েছেন—'সুলভ মূল্যের/ শ্রীশ্রী চৈতন্য পুস্তকালয়ের/ বিক্রেয় পুস্তকাবলী ॥ শ্রী উপেন্দ্রকুমার ঘোষ। ১নং কর্নওয়ালিস ষ্ট্রীট। কলিকাতা। সন ১৩০৪ সাল।'

এই তালিকায় মাইকেল বঙ্কিমচন্দ্র সঞ্জীবচন্দ্র স্বর্ণকুমারী দেবী দীনবন্ধু মিত্র নবীনচন্দ্র সেন রবীন্দ্রনাথ চণ্ডীচরণ সেন প্রভৃতির লেখা পুস্তকের তালিকা আছে— 'অর্ধমূল্যে' বিক্রেয় রবীন্দ্রনাথ বাদ দিলে উল্লিখিত সাহিত্যিকদের মধ্যে কেবল চণ্ডীচরণ সেনের বই। রবীন্দ্রনাথের বই "একত্রে সকলগুলি লইলে অর্ধমূল্যে দিই"— সকল বই বলতে কী কী তার তালিকা ঐ পুস্তিকাটি থেকে দেওয়া গেল। লক্ষ্য করবার বিষয় এ সময় মানসী সোনার তরী প্রকাশিত হয়ে গেছে, তাঁর ছোটগল্পের সংগ্রহ পাঁচ খণ্ড বেরিয়ে গেছে— সবই এই অর্ধমূল্যের তালিকার অন্তর্গত।

'শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রাজা ও রাণী	...	১৲
গানের বহি ও বাল্মীকি-প্রতিভা	...	১৷৶
যুরোপপ্রবাসীর পত্র	...	১৷৷
বৌঠাকুরাণীর হাট	...	১।
গোড়ায় গলদ (নাটক)	...	১৲
আলোচনা	...	১৲
য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারী, প্রথম ভাগ	...	৷৷
ঐ দ্বিতীয় ভাগ	...	৷৷

প্রভাত সঙ্গীত	...	৷৹
সন্ধ্যা সঙ্গীত	...	৷৹
কড়ি ও কোমল	...	১৲
সমালোচনা	...	১৲
চিত্রাঙ্গদা	...	১৲
মানসী	...	১৲
সোনার তরী	...	১৲
গল্প চতুষ্টয় [কথা-চতুষ্টয়]	...	১৲
বিচিত্র গল্প ১ম ভাগ	...	৸৹
ঐ ২য় ভাগ	...	৸৹
গল্প দশক	...	১৷৹

একত্রে সকলগুলি লইলে অর্দ্ধমূল্যে দিই।'

৩

প্রিয়নাথ সেন রবীন্দ্রনাথের কাছে যে কেবল সাহিত্যের সাত সমুদ্রের নাবিক ছিলেন তা নয় সংসারসমুদ্রেও অনেক সময় নাবিকের কাজ করেছেন— শুধু যে 'তখনকার দিনে যত কবিতাই লিখিয়াছি সমস্তই তাঁহাকে শুনাইয়াছি' তা নয়, সাংসারিক সুখ-দুঃখের কথাও রবীন্দ্রনাথ এককালে সর্বদাই তাঁকে শুনিয়েছেন ও তাঁর পরামর্শ ও আনুকূল্য প্রার্থনা করেছেন। পূর্বে যে রবীন্দ্রনাথের বইয়ের কপিরাইট বিক্রয় প্রস্তাবের কথা উল্লিখিত হয়েছে, প্রিয়নাথ সেনকে লিখিত কোনো কোনো চিঠিতে তার উল্লেখ পাওয়া যায়—

[১৩০৭]

ভাই

... একটা কাজের ভার দেব ? আমার বাড়ি তৈরি বাবদ লোকেনের[১০] কাছে আমি ৫০০০৲ টাকা ঋণী ঐ সম্বন্ধে খুচরো ঋণ আরো কিছু আছে। আমার গ্রন্থাবলী এবং ক্ষণিকা পর্য্যন্ত সমস্ত কাব্যের copyright কোন ব্যক্তিকে ৬০০০৲ টাকায় কেনাতে পার ? শেষের যে বইগুলি বাজারে আছে সে আমি শিকি মূল্যে তারই কাছে বিক্রি করব— গ্রন্থাবলী যা আছে সে এক তৃতীয়াংশ দামে দিতে পারব (কারণ এটাতে সত্যর অধিকার আছে, আমি স্বাধীন নই) আমার নিজের দৃঢ় বিশ্বাস যে লোক কিনবে সে ঠকবে না। লোকেন ঋণ শোধের জন্যে আমাকে কখনো তাড়া দেবে না আমি সেই জন্যেই নিজের তাড়ায় তার ঋণশোধের জন্যে মনে মনে অত্যন্ত ব্যাকুল হয়েছি। সে অত্যন্ত অসময়ে আমাকে এই টাকাটা দিয়ে নানা বিপত্তি হতে রক্ষা করেচে— তার পর থেকে এই টাকাটা সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্যই করে না। আমার প্রস্তাবটা কি তোমার কাছে দুঃসাধ্য বলে ঠেকচে ? যদি মনে কর ছোটগল্প এবং বৌঠাকুরাণীর হাট ও রাজর্ষি কাব্য গ্রন্থাবলীর চেয়ে খরিদ্দারের কাছে বেশি সুবিধাজনক বলে প্রতিভাত হয় তাহলে তাতেও প্রস্তুত আছি। কিন্তু আমার বিশ্বাস কাব্যগ্রন্থগুলোই লাভজনক।...

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১৩০৭]

ভাই

... আমার কপিরাইট বিক্রি করার কথাটা চিন্তা কোরো এবং পার ত চেষ্টাও কোরো। গ্রন্থাবলীর মধ্যে বিসর্জন ও রাজা ও রাণী স্বতন্ত্র আকারে বাজারে আছে এবং বর্তমান সংস্করণ গুরুদাসকে বিক্রয় করেছি— তেমনি কণিকা থেকে ক্ষণিকা পর্যন্ত পাঁচখানি সম্পূর্ণ নূতন বই আমার হাতেই আছে এবং ব্যবস্থা করে বিক্রি করতে পারলে পূজার কাছাকাছি কিছু ঘরে আসবার সম্ভব। In fact গুরুদাস ঐ বইগুলির জন্যে বারম্বার দূত প্রেরণ করচে কিন্তু লোভ সম্বরণ করে তাকে প্রত্যাখ্যান করেছি।...

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৪ শ্রাবণ, ১৩০৭

লোকেনের দেনা শুধতে যদি দেনা করি তাহলে লোকেন নিশ্চয়ই বিরক্ত হবে, সেই জন্যে আমি কপিরাইট বেচতে প্রস্তুত হয়েছি। নিজের বই এবং নিজের দেহটা ছাড়া সম্প্রতি আর কিছু বিক্রেয় পদার্থ আমার আয়ত্তের মধ্যে নেই— বই কেনবার মহাজন পাওয়া দুর্লভ, এবং নিজেকে বিক্রয় করতে গেলেও খরিদ্দার পাওয়া যেত কিনা সন্দেহ। কোনো ছাপাখানাওয়ালা মহাজন যদি গ্রন্থাবলী কেনে তাহলে ঠকে না এটা নিশ্চয়।

যতদূর জানা যায়, শেষ পর্যন্ত বইয়ের কপিরাইট বিক্রি করা হয় নি।

৪

ইতিপূর্বে লিখিত হয়েছে, রবীন্দ্রনাথকে এককালে নিজের বই সাধারণত নিজেকেই উদ্যোগ ও অর্থব্যয় করে প্রকাশ করতে হত, প্রিয়নাথ সেনকে লিখিত কোনো-কোনো চিঠিতে তারও আভাস আছে, এ বিষয়েও তিনি রবীন্দ্রনাথের পরামর্শদাতা ও ব্যবস্থাপক।

[১৩০৭]

ভাই

... আর একটা কাজের কথা। তুমি পত্রপ্রাপ্তিমাত্র Chunder Brothersদের একটা অনুরোধ করবে ? ইংরাজি ২৪ পাউন্ড ডিমাই সাইজ কাগজ ১০ রীম, সমাজ প্রেসে আমার অ্যাকাউন্টে তাঁরা পাঠিয়ে দেবেন ? এবং যে রকম কাগজে ক্ষণিকা ছাপা হয়েছে সেই রকমের ৩৫ পাউন্ড ডিমাই সাইজ কাগজ ২ রীম তৎসহ ঐ ঠিকানাতেই পাঠাতে পারবেন ? দাম পেতে বিলম্ব হবে না— অর্থাৎ আগামী বাঙ্গলা মাসের আরম্ভেই পাবেন। আমার গল্পাবলী ছাপতে সবসুদ্ধ বোধহয় ৭০।৭৫ রীম ২৪ পাউন্ড ও আট রীম ৩৫ পাউন্ড দরকার হবে। আশা করি Chunder Brotherদের কাছে পেতে কোন ব্যাঘাত হবে না। আমি এই সঙ্গে সমাজপ্রেসওয়ালাদেরও লিখে দিচ্ছি যে তারা Chunder ব্রাদার্সের ওখানে গেলে আমার অ্যাকাউন্টে কাগজ পাবে। আপাততঃ ৭০ রীম পর্যন্ত ক্রমশঃ আবশ্যক মত সমাজের লোকের হাতে তাঁরা কাগজ দিতে পারেন— তার পরে আরো আবশ্যক হলে আমার অর্ডর দেখে তাঁরা যেন দেন। এটা একটু জরুরী— ছাপা বন্ধ হয়ে আছে। তুমি সত্বর এর বন্দোবস্ত করে দিও।...

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৪ শ্রাবণ ১৩০৭

Chunder Brothersদের কাগজের কথাটা বলেচ বোধ হয়— কাগজের নৌকা বোঝাই করে আমার গল্পগুলিকে কালসাগরে ভাসিয়ে দিতে উদ্যত হয়েছি— অতএব ২৪ পাউন্ড ডিমাই কাগজের বন্দোবস্ত করে দিয়ো।

২৮ শ্রাবণ [১৩০৭]

গল্পাবলীর কাগজ সম্বন্ধে গতকল্য সমস্ত আদ্যোপান্ত বিবরণ অবগত হয়েছ। হাতের দশ রিম কাগজ ফুরিয়ে গেলে চন্দ্র ব্রাদার্সদের কাছ থেকে আমদানি সুরু করতে বলেছি। যথাসম্ভব নগদ দাম দেবারই বন্দোবস্ত করা হবে— সুতরাং তাতে তাঁদের অসুবিধা হবে না।

৫

রবীন্দ্রনাথের চল্লিশ-পূর্ব বয়সের গ্রন্থপ্রকাশের আর্থিক ইতিহাস অংশত সংকলিত হল— এর পরবর্তীকালের ইতিহাস এমন বন্ধুর নয়— আয়ের পরিমাণ বহুল না হলেও দায়ের পরিমাণও গুরুতর হয়ে ওঠে নি। রবীন্দ্রনাথের বই বিক্রির যে-পরিমাণ দেখে আমরা এখন আনন্দিত হই তার সূচনা তাঁর জীবনের শেষ বর্ষে ও মৃত্যুর পরে, তার পর থেকে বর্ষে বর্ষে তা বহুগুণিত হয়ে চলেছে।

টীকা

১ প্রসঙ্গক্রমে এই অনুমানের উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বালকবয়সে রবীন্দ্রনাথের প্রথম গদ্য প্রবন্ধ প্রকাশের ইতিহাস এই বন্ধুর নামের সঙ্গেই জড়িত— 'ভানুসিংহের পদাবলী' রচনা করে, সেগুলি প্রাচীন পুথির পদ বলে চালাবার চেষ্টা করে তরুণ কবি এঁরই সঙ্গে পরিহাস করেছিলেন।

২ শ্রীশচন্দ্র মজুমদার ও শৈলেশচন্দ্র মজুমদারের অনুরোধেই রবীন্দ্রনাথ তাঁদের প্রকাশিত নবপর্যায় বঙ্গদর্শনের সম্পাদনাভার স্বীকার করেছিলেন।

৩ প্রকাশন-ব্যবসায়ী কর্তৃক প্রচারিত রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থের সম্পূর্ণ তালিকা এখানে করবার চেষ্টা করা হয় নি।

৪ প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য কবির বন্ধু এইচ্‌. বোস 'কর্মফল' গল্পটি স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে ছেপেছিলেন ১৩১০ সালে (১৯০৩)। 'গ্রন্থকারের বিজ্ঞাপনে' আছে—

"আমার রচিত এই ক্ষুদ্র গল্পটি গ্রহণ করিয়া কুন্তলীনের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রমোহন বসু মহাশয় বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রমের সাহায্যার্থে তিনশত টাকা দান করিয়াছেন।"

১৩২৯ সালের বৈশাখের প্রবাসীতে 'মুক্তধারা' প্রকাশিত হলে, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় বইটি পুস্তকাকারে ছাপিয়ে বিশ্বভারতীকে দান করেন, সেটিই 'মুক্তধারা'র প্রথম সংস্করণ।

রবীন্দ্রনাথের প্রতি প্রবাসী-সম্পাদকের শ্রদ্ধা ও অনুরাগের বিষয় আলোচনার স্থান এ নয়— বর্তমান প্রসঙ্গে শুধু রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠির সামান্য অংশ উদ্‌ধৃত করলেই যথেষ্ট—

"পরমদুঃখের দিনে তিনি আমার প্রবন্ধকে অর্থমূল্য দিয়েছেন— এমন সময়ে দিয়েছেন, যখন দাবি করলেই বিনামূল্যেই পেতেন।... মাসিকপত্র থেকে এই আমার প্রথম আর্থিক পুরস্কার।"— "রবীন্দ্রনাথের পত্র", সবুজপত্র, আশ্বিন ১৩৩৩।

৫ একটি ব্যতিক্রম অনেকের পক্ষে চমৎকারজনক মনে হবে। 'সাহিত্য'-সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি তীব্র রবীন্দ্রবিরোধী বলেই পরিচিত, কিন্তু তিনিই রবীন্দ্রনাথের একখানি কবিতা সংগ্রহ প্রকাশ করতে উৎসাহী হয়েছিলেন। প্রিয়নাথ সেনের প্রতি রবীন্দ্রনাথ অনেক বিষয়েই নির্ভর করতেন, তিনি শিলাইদহে কবি-সন্নিধানে গিয়েছেন জেনে তাঁকে একখানি চিঠিতে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি লিখছেন—

"আপনার স্মরনার্থ এই পত্র লিখিতেছি। শ্রীযুক্ত রবিবাবুর কবিতার সংগ্রহ মুদ্রিত করিবার অনুমতি তিনি ১৩০৫ সালে আমাকে দিয়াছিলেন। তাহার পর রবীন্দ্রবাবুর অনেক রচনা প্রকাশিত হইয়াছে। পরবর্তী কালের রচনা না দিলে সংগ্রহখানি অসম্পূর্ণ হয়। আপনি যদি এই সংগ্রহের জন্য রবীন্দ্রবাবুর অনুমতি লইতে পারেন, তাহা হইলে আমি অনুগৃহীত হইব। আমার বিশ্বাস, আপনি অনুরোধ করিলে রবীন্দ্রবাবু নিশ্চয় রক্ষা করিবেন।"

'সাহিত্য'-যন্ত্রে রবীন্দ্রনাথের কয়েকখানি বই ছাপা হয়েছিল, সোনার তরী (১৩০০) তার অন্যতম।

৬ এ কথা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে যে মহর্ষি রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসাধনা সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহান্বিত ছিলেন। তার একটি দৃষ্টান্ত 'জীবনস্মৃতি'তে উল্লিখিত আছে, রবীন্দ্রনাথ-রচিত গানের জন্য মহর্ষির পুরস্কার দানের কথা—

"গান গাওয়া যখন শেষ হইল তখন তিনি বলিলেন, 'দেশের রাজা যদি দেশের ভাষা জানিত ও সাহিত্যের আদর বুঝিত, তবে কবিকে তো তাহারা পুরস্কার দিত। রাজার দিক হইতে যখন তাহার কোনো সম্ভাবনা নাই তখন আমাকেই সে-কাজ করিতে হইবে।" এই বলিয়া তিনি একখানি পাঁচ-শ টাকার চেক আমার হাতে দিলেন।"

৭ রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী। হিতবাদীর উপহার। ১৩১১। পৃ· ১২৯০।

৮ "রবীন্দ্রনাথের পত্র", সবুজপত্র, আশ্বিন ১৩৩৩।

৯ গুরুদাস-প্রচারিত রবীন্দ্রনাথের কোনো কোনো বইতে, তাঁদের প্রচারিত রবীন্দ্রনাথের অন্য বইয়ের তালিকা মুদ্রিত আছে স্মরণ হয়।

১০ প্রিয় সুহৃৎ লোকেন্দ্রনাথ পালিত, 'জীবনস্মৃতি'তে ঐঁর সম্বন্ধে আলোচনা আছে।

আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৫ বৈশাখ ১৩৬৯

সাহিত্য-মীমাংসক রবীন্দ্রনাথ

বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, যাঁহারা সাহিত্যের স্রষ্টা তাঁহারা প্রায়ই সাহিত্যের সমালোচক বা সাহিত্যতাত্ত্বিক নহেন। আমাদের দেশের প্রাচীন আলংকারিক আচার্যগণও কবির সৃষ্টি-প্রতিভা বা 'কবিত্ব' যে কাব্যের আস্বাদনক্ষমতা বা 'ভাবকত্ব' হইতে স্বতন্ত্র, তাহা বারংবার স্পষ্টভাষায় ঘোষণা করিয়াছেন।[১] তবে ইহার ব্যতিক্রমও যে না আছে, তাহা নয়। এমন দৃষ্টান্তও মাঝে মাঝে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় যেখানে উৎকৃষ্ট কবিত্বের সহিত সমুন্নত ভাবকত্বের মণি-কাঞ্চন-সমবায় ঘটিয়াছে— যেমন বিদেশীয় সাহিত্যে, তেমনি আমাদের স্বদেশের সাহিত্যের ইতিহাসে। আমাদের প্রাচীন সংস্কৃত আলংকারিকগণ প্রায় সকলেই যেমন সহৃদয় ভাবক ছিলেন, তেমনই কবিত্বশক্তির অধিকারীও ছিলেন, যদিও সকলেই সমান স্তরের নহেন।[২] সংস্কৃতে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে :

> "কবিরেব বিজানাতি কবেঃ কাব্যক্রিয়াদরম্।
> ন হি বন্ধ্যা বিজানাতি গুর্বীং প্রসববেদনাম্।।"

বন্ধ্যার পক্ষে যেমন প্রসববেদনার মর্ম উপলব্ধি করা সম্ভব নহে, সেইরূপ যিনি কবিত্বশক্তি হইতে বঞ্চিত, তাঁহার পক্ষেও কাব্যরচনার গূঢ় রহস্য অনুধাবন করা অসাধ্য। যিনি স্বয়ং কবি কেবল তিনিই প্রকৃতপক্ষে কাব্যসৃষ্টির প্রক্রিয়া যথার্থভাবে উপলব্ধি করিতে পারেন। ইহা সার্বত্রিক সত্য না হইলেও, ইহার অন্তর্নিহিত মর্ম অস্বীকার করা অসম্ভব।

বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে আমরা কয়েকটি লোকোত্তর প্রতিভার সন্ধান পাই, যাঁহারা সমানভাবে কবিত্ব ও সমালোচনা শক্তির অধিকারী। ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যজিজ্ঞাসা গম্ভীর ও বিচিত্র হইলেও পরিমাণের দিক দিয়া তাহা স্বল্প।[৩] কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সমালোচনার পরিধি যেমন বিস্তীর্ণ, পরিমাণও তদ্রূপ বিশাল। রবীন্দ্রনাথের এই সমালোচনা একদিকে যেমন প্রায়োগিক বা Practical অপর দিকে সেইরূপ ইহার তাত্ত্বিক বা Theoretical দিকও উপেক্ষণীয় নয়। অবশ্য বহু ক্ষেত্রেই তাঁহার সমালোচনাত্মক প্রবন্ধ, ভাষণ বা পত্রাবলীর মধ্যে এই দুইটি দিক্ই অঙ্গাঙ্গিভাবে মিশ্রিত হইয়া আছে। নিছক তত্ত্বালোচনায় রবীন্দ্রনাথের বিশেষ অভিরুচি ছিল না। 'সাহিত্য'-শীর্ষক সংকলনের অন্তর্গত "মানবপ্রকাশ" নামক প্রবন্ধটির এক জায়গায় কবি বলিতেছেন :

> "একে তত্ত্ব, সাহিত্যের তত্ত্ব, তাতে আবার আমার মতো লোক তার ব্যাখ্যাকারক ! কথা আছে একে বোবা, তাতে আবার বোলতায় কামড়েছে— একে গোঁ গোঁ করা বৈ আর-কিছু জানে না, তার উপরে কামড়ের জ্বালায় গোঙানি কেবল বাড়িয়ে তোলে।"[৪]

অথচ রবীন্দ্রনাথের সমালোচনাত্মক রচনাবলীর নানাস্থলে সাহিত্যের বিশুদ্ধ স্বরূপ সম্পর্কে অতি গম্ভীর বহু সমীক্ষা, বহু তাত্ত্বিক আলোচনা ইতস্ততঃ আকীর্ণ হইয়া আছে। যদি সেগুলিকে সংকলন করিয়া সুবিন্যস্ত ভাবে উহাদের অন্তর্নিহিত যোগসূত্রটুকু অনুধাবন করিবার জন্য আমরা প্রয়াস করি, তবে দেখা যাইবে কবির বিশেষ দৃষ্টিকোণ হইতে সাহিত্য সম্বন্ধে

একটি সর্বতোভদ্র 'সাহিত্য-নীতি' বা 'কাব্য-নয়' (Theory of Poetry) বিকশিত হইয়া উঠিতেছে— যাহার সহিত স্থলবিশেষে যেমন পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য-বিচারপদ্ধতির সাদৃশ্য লক্ষণীয়, সেইরূপ প্রাচীন ভারতীয় আচার্যগণের সাহিত্য ও শিল্প -বিষয়ক তত্ত্বজিজ্ঞাসার সহিত অন্তরঙ্গ সাজাত্য কোনোক্রমেই উপেক্ষণীয় নহে। তাঁহার চিন্তায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য উভয়বিধ বিচার-পদ্ধতিই কখনও সচেতনভাবে, কখনও বা অবচেতনভাবে আপন আপন প্রভাব সঞ্চারিত করিয়াছে, যদিও রবীন্দ্রনাথ কখনোই নিছক 'মত' আকারে উহাদের উল্লেখ করেন নাই। 'ছিন্নপত্রাবলী'-র একখানি পত্রে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য সমালোচনার আদর্শটিকে সংক্ষেপে ব্যক্ত করিয়াছেন নিম্নোদ্ধৃত অংশে—

> "...নিজের ভিতরে যে-একটা আদর্শ আছে সেইটেই মানুষের ধ্রুব আশ্রয়। পড়ে শুনে ভেবে, সাহিত্যচর্চা ক'রে, সেই আদর্শটিকে যথাসাধ্য উন্নত করে তোলা আবশ্যক। আমাদের দেশে যে ভাবে সমালোচনা হয় তাতে কোনো শিক্ষা নেই। 'ভালো লাগিল' বা 'ভালো লাগিল না' সে কথা শুনে কোনো ফল নেই। তাতে কেবল লোকবিশেষের একটা মত পাওয়া গেল, কিন্তু মতবিশেষের সত্যতা পাওয়া গেল না। সে মতও যদি যথার্থ রসজ্ঞ বা সাহিত্যব্যাপারে অভিজ্ঞ লোকের কাছ থেকে পাওয়া যায়, তা হলেও খানিকটা ভাবিয়ে দিতে পারে। কিন্তু যে-কোনো লোকের মত মাত্রের কোনো মূল্য নেই। আমাদের দেশে ভালো সমালোচনা নেই— তার প্রধান কারণ, আমাদের দেশের লোকের সাহিত্যের সঙ্গে যথার্থ ঘনিষ্ঠ পরিচয় নেই। তারা সাহিত্যের সৃজনকার্যের মাঝখানে বাস করছে না। তারা যথার্থ অভিজ্ঞতাদ্বারা জানে না কোন্‌টা সহজ কোন্‌টা কঠিন, কোন্‌টা খাঁটি কোন্‌টা মেকি, কোন্‌টা অনিত্য কোন্‌টা নিত্য, কোন্‌টা সেন্টিমেন্ট এবং কোন্‌টা সেন্টিমেন্টালিজ্‌ম। আমাদের সাহিত্যে অনেকগুলো এবং অনেক রকমের ভালো লেখা না বেরোলে সমালোচনার সময় উপস্থিত হবে না। প্রথমে একটা আদর্শ দাঁড় করানো চাই, তার পরে সেই আদর্শ থেকে সমালোচকের শিক্ষা আরম্ভ হবে। যেমন জল না থাকলে সাঁতার শেখা যায় না, তেমনি ভালো সাহিত্য না থাকলে সমালোচনা অসম্ভব।..."[৫]

আমাদের বর্তমান আলোচনার উদ্দেশ্য রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসম্বন্ধে ঘোষিত আদর্শগুলিকে, তাঁহার সাহিত্যতত্ত্ববিষয়ক ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত উপলব্ধিরাজিকে এমন একটি সূত্রে গ্রথিত করা যাহাতে তাঁহার সাহিত্যসম্পর্কিত মৌলিক সিদ্ধান্তগুলির একটি সুসংহত সামগ্রিক পরিচয় লাভ করা সম্ভব হয়।

২

'সাহিত্য' : ব্যুৎপত্তি ও তাৎপর্য

আমরা সাধারণতঃ কবির বাঙ্‌ময় সৃষ্টিকে বুঝাইবার জন্য যেমন 'কাব্য' শব্দটির ব্যবহার করিয়া থাকি, সেইরূপ 'সাহিত্য' শব্দটিও উহার পর্যায়শব্দরূপে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আমাদের প্রাচীন আলংকারিক আচার্যগণ 'সাহিত্য' শব্দটিকে 'শব্দ ও অর্থের সাহিত্য' বা সহিতত্ব এই অর্থেই ব্যবহার করিয়াছেন। প্রাচীন আচার্য ভামহ কাব্যের লক্ষণ করিতে গিয়া বলিয়াছেন : "শব্দার্থৌ সহিতৌ কাব্যম্‌"। শব্দ ও অর্থের এই সহিতত্ব তখনই সার্থক হইয়া উঠে, যখন শব্দ ও অর্থ পরস্পর তুল্যস্কন্ধভাবে অবস্থান করে, যখন একটির মনোহারিতা অপরটির মনোহারিতা হইতে কিছুমাত্র ন্যূনও নহে, অতিরিক্তও নহে। আচার্য কুন্তক তাঁহার প্রসিদ্ধ 'বক্রোক্তিজীবিত' নিবন্ধে শব্দ ও অর্থের সাহিত্যের এই রহস্যটুকু একটি কারিকায় সুন্দরভাবে প্রকাশ করিয়াছেন :

"সাহিতামনেয়োঃ শোভাশালিতাং প্রতি কাহপাসৌ।
অন্যূনানতিরিক্তত্ব-মনোহারিণ্যবস্থিতিঃ ॥"

মহাকবি কালিদাসও কাব্যে শব্দ ও অর্থের এই অর্ধনারীশ্বর অবস্থানের প্রতিই ইঙ্গিত করিয়াছেন 'রঘুবংশ' মহাকাব্যের প্রসিদ্ধ মঙ্গলাচরণ শ্লোকটিতে—

"বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থপ্রতিপত্তয়ে।
জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্বতী-পরমেশ্বরৌ ।।"

রবীন্দ্রনাথ 'সাহিত্য' শব্দটির এইরূপ ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন কিনা বলা কঠিন।[৬] কেননা, 'সাহিত্যের তাৎপর্য' -শীর্ষক প্রবন্ধের প্রারম্ভেই তিনি বলিতেছেন :

"সাহিত্য শব্দটার কোনো ধাতুগত অর্থব্যাখ্যা কোনো অলংকারশাস্ত্রে আছে কি না জানি না। ঐ শব্দটার যখন প্রথম উদ্‌ভাবন হয়েছিল তখন ঠিক কী বুঝে হয়েছিল তা নিশ্চিত বলবার মতো বিদ্যা আমার নেই। কিন্তু আমি যাকে সাহিত্য বলে থাকি তার সঙ্গে ঐ শব্দটার অর্থের মিল করে যদি দেখাই তবে তাতে বোধ করি দোষ হবে না।
"সাহিত্যের সহজ অর্থ যা বুঝি সে হচ্ছে নৈকট্য অর্থাৎ সম্মিলন। মানুষকে মিলতে হয় নানা প্রয়োজনে, আবার মানুষকে মিলতে হয় কেবল মেলবারই জন্যে, অর্থাৎ সাহিত্যেরই উদ্দেশে।...
"এর থেকে বুঝতে পারি, ভাষার ক্ষেত্রে সাহিত্য শব্দের তাৎপর্য কী। তার কাজ হচ্ছে হৃদয়ের যোগ ঘটানো, যেখানে যোগটাই শেষ লক্ষ্য।"

—'সাহিত্যের পথে' : রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৪ (প. ব. স.) পৃ.৩৬৬

রবীন্দ্রনাথ নানাভাবে 'সাহিত্য' শব্দটির অর্থের মধ্যে মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির, মানুষের সঙ্গে মানুষের, অন্তরের সঙ্গে বাহিরের, জড়ের সঙ্গে চেতনের, অতীতের সহিত বর্তমানের, দূরের সহিত নিকটের এই মিলন, নৈকট্য, সেতুবন্ধ-রচনার তাৎপর্য আমাদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিবার চেষ্টা করিয়াছেন। যেমন "সাহিত্যের তাৎপর্য" প্রবন্ধেরই আর এক জায়গায় তিনি বলিতেছেন :

"...প্রকৃতির সৃষ্টির দূরত্ব থেকে মানুষের ভাষায় সেতু বেঁধে তাকে মর্মঙ্গম নৈকট্য দিতে হবে ; সেই নৈকট্য ঘটায় বলেই সাহিত্যকে আমরা সাহিত্য বলি।"[৭] (তদেব, পৃ. ৩৭২)

"সাহিত্যের উদ্দেশ্য" শীর্ষক প্রবন্ধেও তিনি সেই একই কথা আমাদের স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন :

"সাহিত্যের প্রভাবে আমরা হৃদয়ের দ্বারা হৃদয়ের যোগ অনুভব করি, হৃদয়ের প্রবাহ রক্ষা হয়, হৃদয়ের সহিত হৃদয় খেলাইতে থাকে, হৃদয়ের জীবন ও স্বাস্থ্য -সঞ্চার হয়।... সাহিত্য স্বত উৎসারিত হইয়া সেই যোগসাধন করে। সাহিত্য অর্থেই একত্র থাকিবার ভাব— মানবের 'সহিত' থাকিবার ভাব— মানবকে স্পর্শ করা, মানবকে অনুভব করা। সাহিত্যের প্রভাবে হৃদয়ে হৃদয়ে শীতাতপ সঞ্চারিত হয়, বায়ু প্রবাহিত হয়, ঋতুচক্র ফিরে, গন্ধ গান ও রূপের হাট বসিয়া যায়। উদ্দেশ্য না থাকিয়া সাহিত্যে এইরূপ সহস্র উদ্দেশ্য সাধিত হয়।"

—'সাহিত্য', র.র. ১৩ (প.ব. স) পৃ. ৮২৮

এমন-কি, সাহিত্য-সৃষ্টির জন্যও মানবচিত্তের মধ্যে পরস্পর সহিতত্ব, সংস্পর্শ, মনের সংঘাত ও 'ভাবের সংঘাত' নিতান্ত আবশ্যক। এই সজীব সংশ্রব হইতে বঞ্চিত সঙ্গিহীন মনের পক্ষে সার্থক সাহিত্যসৃষ্টি সম্ভব হইতে পারে না। তাই "বাংলা জাতীয় সাহিত্য" শীর্ষক ভাষণের শুরুতেই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন :

"সহিত শব্দ হইতে সাহিত্য শব্দের উৎপত্তি। অতএব ধাতুগত অর্থ ধরিলে সাহিত্য শব্দের মধ্যে একটি মিলনের ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। সে যে কেবল ভাবে-ভাবে ভাষায়-ভাষায় গ্রন্থে-গ্রন্থে মিলন তাহা নহে, মানুষের সহিত মানুষের, অতীতের সহিত বর্তমানের, দূরের সহিত নিকটের অত্যন্ত অন্তরঙ্গ যোগসাধন সাহিত্য ব্যতীত আর-কিছুর দ্বারাই সম্ভবপর নহে। যে দেশে সাহিত্যের অভাব সে দেশের লোক পরস্পর সজীব বন্ধনে সংযুক্ত নহে ; তাহারা বিচ্ছিন্ন।...
"এ পর্যন্ত বঙ্গসাহিত্যের উন্নতির জন্য যাঁহারা চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহারা এককভাবেই কাজ করিয়াছেন। এককভাবে

সকল কাজই কঠিন, বিশেষত সাহিত্যের কাজ। কারণ, পূর্বেই বলিয়াছি সাহিত্যের একটি প্রধান উপাদান সহিতত্ব। যে সমাজে জনসাধারণের মনের মধ্যে অনেকগুলি ভাব সঞ্চিত এবং সর্বদা আন্দোলিত হইতেছে, যেখানে পরস্পরের মানসিক সংস্পর্শ নানা আকারে পরস্পর অনুভব করিতে পারিতেছে, সেখানে সেই মনের সংঘাতে ভাব এবং ভাবের সংঘাতে সাহিত্য স্বতই জন্মগ্রহণ করে এবং চতুর্দিকে সঞ্চারিত হইতে থাকে। এই মানবমনের সজীব সংস্রব হইতে বঞ্চিত হইয়া কেবলমাত্র দৃঢ় সংকল্পের আঘাতে সঙ্গিহীন মনকে জনশূন্য কঠিন কর্তব্যক্ষেত্রের মধ্য দিয়া চালনা করা, একলা বসিয়া চিন্তা করা, উদাসীনদের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার একান্ত চেষ্টা করা, সুদীর্ঘকাল একমাত্র নিজের অনুরাগের উত্তাপে নিজের ভাবপুষ্পগুলিকে প্রস্ফুটিত করিয়া তুলিবার প্রয়াস করা এবং চিরজীবনের প্রাণপণ উদ্যমের সফলতা সম্বন্ধে চিরকাল সন্দিহান হইয়া থাকা— এমন নিরানন্দের অবস্থা আর কী আছে ? যে ব্যক্তি কাজ করিতেছে কেবল যে তাহারই কষ্ট তাহা নয়, ইহাতে কাজেরও অসম্পূর্ণতা ঘটে। এইরূপ উপবাসদশায় সাহিত্যের ফুলগুলিতে সম্পূর্ণ রঙ ধরে না, তাহার ফলগুলিতে পরিপূর্ণমাত্রায় পাক ধরিতে পায় না। সাহিত্যের সমস্ত আলোক ও উত্তাপ সর্বত্র সর্বতোভাবে সঞ্চারিত হইতে পারে না।" (তদেব, পৃ· ৭৯৩, ৭৯৮)

সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই যে সহিতত্ব, মিলন, ঐক্য, নৈকট্য, সহমর্মিতার কথা রবীন্দ্রনাথ জোর দিয়া বলিয়াছেন, প্রাচীন আলংকারিকগণও সে বিষয়ে যে একেবারে অজ্ঞ বা উদাসীন ছিলেন তাহাও নয়। কেননা আমরা দেখিতে পাই অভিনবগুপ্ত তাঁহার সাহিত্যগুরু আচার্য ভট্টতৌত-প্রণীত অধুনালুপ্ত 'কাব্যকৌতুক' নিবন্ধ হইতে একটি শ্লোকাংশ উদ্ধার করিয়াছেন, যেখানে কবি, নায়ক এবং শ্রোতা সহৃদয়ের 'সমান অনুভবে'-র কথা বলা হইয়াছে— "নায়কস্য কবেঃ শ্রোতুঃ সমানোঽনুভবস্ততঃ"। ভাষার সাহায্যে কবিকর্মের ভিতর দিয়াই অনুভবের এই সাম্য বা অভিন্নতা সাধিত হইয়া থাকে। কবির সৃষ্টিতে অচেতনও চেতনের মতো, কখনও বা চেতনও অচেতনের মতো প্রতিভাত হয়। তাই ধ্বনিকার আচার্য আনন্দবর্ধন কবি সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"ভাবানচেতনানপি চেতনবৎ চেতনানচেতনবৎ।
সম্ভাবয়তি যথেষ্টং সুকবিঃ কাব্যে স্বতন্ত্রতয়া॥"[৮]

তখন একজনের শোক, হর্ষ, ক্রোধ, বিস্ময় প্রভৃতি চিত্তবৃত্তি অপরের চিত্তে সঞ্চারিত হইয়া সকলকে একই ভাবসূত্রে গ্রথিত করিয়া তুলে। কাব্যের আস্বাদনকালে সহৃদয় সামাজিকের এই তন্ময়ীভবনের (Identification) কথা প্রাচীন আচার্যগণ বারংবার আমাদের স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন :

"যস্তুষ্টৌ তুষ্টিমাপ্নোতি শোকে শোকমুপৈতি চ।
ক্রোধে ক্রুদ্ধো ভয়ে ভীরুঃ স শ্রেষ্ঠঃ প্রেক্ষকঃ স্মৃতঃ॥"

এই তন্ময়ীভবনের ফলেই অতীত, অনাগত, বিপ্রকৃষ্ট, পরোক্ষ বিষয়ও প্রত্যক্ষ-কল্প হইয়া আমাদের দৃষ্টির সমক্ষে ভাসমান হয়, যাহা লৌকিক প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না। সুতরাং দৈশিক, কালিক প্রভৃতি দূরত্ব ঘুচিয়া গিয়া সর্ববিধ পদার্থের সহিত সংযোগ ও তাদাত্ম্য সাহিত্যের মধ্য দিয়া সংঘটিত হইয়া থাকে। তাই একজন আচার্য বলিয়াছেন

"কবিশক্ত্যর্পিতা ভাবাস্তন্ময়ীভাবযুক্তিতঃ।
যথা স্ফুরন্ত্যমী কাব্যান্ন তথাঽধ্যক্ষতঃ কিল॥"

রবীন্দ্রনাথ 'সাহিত্য' শব্দের তাৎপর্য বিষয়ে তাঁহার বক্তব্যের সমর্থনে রামায়ণে ক্রৌঞ্চবধের উপাখ্যানটির উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন :

"একবার সেকালের দিকে তাকিয়ে দেখা যাক। সাহিত্যসাধনা সম্বন্ধে তখনকার দিনের মনোভাবের পরিচয় আছে একটি কাহিনীতে , সেটা আলোচনার যোগ্য। ক্রৌঞ্চমিথুনের মধ্যে একটিকে ব্যাধ যখন হত্যা করলে তখন ঘৃণার আবেগে কবির কণ্ঠ থেকে অনুষ্টুভ্ ছন্দ সহসা উচ্চারিত হল।···

"কবিঋষির মনে যখন সহসা সেই বেগবান শক্তিমান ছন্দের আবির্ভাব হল তখন স্বতই প্রশ্ন জাগল, এরই উপযুক্ত

সৃষ্টি হওয়া চাই। তারই উত্তরে রচিত হল রামচরিত। অর্থাৎ এমন-কিছু যা নিত্যতার আসনে প্রতিষ্ঠিত হবার যোগ্য। যার সান্নিধ্য অর্থাৎ যার সাহিত্য মানুষের কাছে আদরণীয়।"[৯]

এখানেও সেই 'সাহিত্য', 'সান্নিধ্য', 'সহমর্মিতা'র প্রতিই তিনি ইঙ্গিত করিয়াছেন।

৩

সাহিত্যতত্ত্ব ও অলংকারশাস্ত্র

প্রাচীন আলংকারিকগণ সাহিত্যবিচার শাস্ত্রকে যেমন 'কাব্য-মীমাংসা', 'সাহিত্য-মীমাংসা', 'সাহিত্য-বিদ্যা', 'কাব্য-লক্ষণ' প্রভৃতি সংজ্ঞার দ্বারা নির্দেশ করিতেন, সেইরূপ 'অলংকারশাস্ত্র' এই নামটিও বহুল প্রচলিত। আধুনিক কোনো কোনো সাহিত্য-বিচারক অলংকারশাস্ত্রের প্রতি নানা বিদ্রূপ বর্ষণ করিয়াছেন। যেন অলংকারশাস্ত্র তাঁহাদের দৃষ্টিতে শুধু কতকগুলি পারিভাষিক শব্দালংকার ও অর্থালংকারের আলোচনা লইয়াই ব্যস্ত, যেন সমগ্র সাহিত্যের স্বরূপ লইয়া, উহার বিচিত্র দিক লইয়া ব্যাপকভাবে কোনো আলোচনা উহার লক্ষ্যের মধ্যে পড়ে না। বস্তুতঃ ভারতীয় অলংকারশাস্ত্র সম্বন্ধে এইরূপ দৃষ্টিভঙ্গি যে নিতান্তই অজ্ঞতাপ্রসূত এবং সংকীর্ণ একদেশদর্শিতারই পরিচায়ক, ইহা ভারতীয় সাহিত্য-বিচার শাস্ত্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ধারাবাহিক ইতিহাস যাঁহারা শ্রদ্ধার সহিত অনুশীলন করিয়াছেন, তাঁহারাই অবগত আছেন। বামনাচার্য তাঁহার 'কাব্যালংকারসূত্রে' স্পষ্টতই বলিয়াছেন :

"কাব্যং গ্রাহ্যমলংকারাৎ। সৌন্দর্য্যমলংকারঃ।"

'কাব্য' অলংকারের দ্বারাই সহৃদয়গণের নিকট আকর্ষণীয় হইয়া থাকে এবং সৌন্দর্যই অলংকার। এখানে 'অলংকার' এবং 'সৌন্দর্য'— এই দুইটি শব্দকে পরস্পর পর্যায় (Synonym) রূপে ব্যবহার করা হইয়াছে। সুতরাং 'অলংকার-শাস্ত্র' প্রকৃতপক্ষে 'সৌন্দর্যশাস্ত্র'— সাহিত্যে শব্দ ও অর্থের সৌন্দর্য কীভাবে আধান করিতে পারা যায়, অলংকারশাস্ত্রে ব্যাপকভাবে নানা দৃষ্টিকোণ হইতে সে সম্বন্ধেই বিচার করিবার প্রয়াস আমরা লক্ষ্য করি। এবং 'উপমা' প্রভৃতি বাগ্-বিকল্প, যেগুলিকে প্রাচীন আচার্যগণ পারিভাষিক 'অলংকার' সংজ্ঞার দ্বারা চিহ্নিত করিয়াছিলেন, সেইগুলি যেহেতু সাহিত্যে সৌন্দর্যবিধানের অন্যতম প্রধান উপাদান, সেইহেতু 'সাহিত্যতত্ত্ব'কে তাঁহারা 'অলংকারশাস্ত্র' রূপেও অভিহিত করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহা ভুলিলে চলিবে না যে উপমা, রূপক প্রভৃতি অলংকার-ই সৌন্দর্য সম্পাদনের একমাত্র উপায় নয়। রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রের পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুশীলন করেন নাই বটে, সুতরাং 'অলংকার' শব্দটির অর্থ বিষয়ে প্রাচীন আচার্যগণের অভিমত প্রত্যক্ষভাবে অবগত হওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও সৌন্দর্যসৃষ্টিতে রূপকাদি অলংকারের গুরুত্ব সম্বন্ধে তিনি যে-সকল মন্তব্য করিয়াছেন, সেগুলি বিচার করিয়া দেখিলে প্রাচীন আচার্যগণের সহিত তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গির গভীর সাদৃশ্য দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। "সাহিত্যধর্ম" শীর্ষক আলোচনায় তিনি বলিতেছেন :

"এর থেকেই বোঝা যাবে, সাহিত্যতত্ত্বকে অলংকারশাস্ত্র কেন বলা হয়। সেই ভাব, সেই ভাবনা, সেই আবির্ভাব, যাকে প্রকাশ করতে গেলেই অলংকার আপনি আসে, তর্কে যার প্রকাশ নেই, সেই হল সাহিত্যের।

"অলংকার জিনিসটাই চরমের প্রতিরূপ। মা শিশুর মধ্যে পান রসবোধের চরমতা— তাঁর সেই একান্ত বোধটিকে সাজে-সজ্জাতেই শিশুর দেহে অনুপ্রকাশিত করে দেন। ভৃত্যকে দেখি প্রয়োজনের বাঁধা সীমানায়, বাঁধা বেতনেই তার মূল্য শোধ হয়। বন্ধুকে দেখি অসীমে, তাই আপনি জেগে ওঠে ভাষায় অলংকার, কণ্ঠের সুরে অলংকার, হাসিতে অলংকার, ব্যবহারে অলংকার। সাহিত্যে এই বন্ধুর কথা অলংকৃত বাণীতে। সেই বাণীর সংকেত-ঝংকারে বাজতে থাকে, 'অলম্'-অর্থাৎ বাস্, আর কাজ নেই। এই অলংকৃত বাক্যই হচ্ছে রসাত্মক বাক্য।"[১০]

এখানে রবীন্দ্রনাথ 'রসাত্মক কাব্য' এবং 'অলংকৃত বাক্য'-কে সমানার্থক বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। অর্থাৎ রসের সঙ্গে অলংকারের সম্পর্ক অন্তরঙ্গ, অবিচ্ছেদ্য। আর অলংকার মাত্রই— তাহা উপমাই হউক, রূপকই হউক, সমাসোক্তিই হউক, পর্যায়োক্তই হউক বা অপ্রস্তুত-প্রশংসাই হউক, যেহেতু 'অত্যুক্তি' বা অতিশয়োক্তিরই প্রকারভেদ মাত্র, তাই রবীন্দ্রনাথ

যখন বলেন : "রসের সৃষ্টিতে সর্বত্রই অত্যুক্তির স্থান আছে, কিন্তু সেই অত্যুক্তিও জীবনের পরিমাণ রক্ষা করে তবে নিষ্কৃতি পায়। সেই অত্যুক্তি যখন বলে 'পাষাণ মিলায়ে যায় গায়ের বাতাসে' তখন মন বলে, এই মিথ্যে কথার চেয়ে সত্য কথা আর হতে পারে না। রসের অত্যুক্তিতে যখন ধ্বনিত হয় 'লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু তবু হিয়ে জুড়ন না গেল' তখন মন বলে, যে হৃদয়ের মধ্যে প্রিয়তমকে অনুভব করি সেই হৃদয়ে যুগযুগান্তরের কোনো সীমাচিহ্ন পাওয়া যায় না। এই অনুভূতিকে অসম্ভব অত্যুক্তি ছাড়া আর কী দিয়ে ব্যক্ত করা যেতে পারে। রসসৃষ্টির সঙ্গে রূপসৃষ্টির এই প্রভেদ, রূপ আপন সীমা রক্ষা করেই সত্যের আসন পায়, আর রস সেই আসন পায় বাস্তবকে অনায়াসে উপেক্ষা করে।"[১১]

তখন আমাদের প্রাচীন আচার্যগণের কথাই মনে হয়। তাঁহারাও অতিশয়োক্তিকেই সকল অলংকার বা বাগ্‌বিকল্পের মূলভূত বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। যেমন আচার্য দণ্ডী বলিয়াছেন :

"অলংকারান্তরাণামপ্যেকমাহুঃ পরায়ণম্।
বাগীশমহিতামুক্তিমিমামতিশয়াহ্বয়াম্ ॥"[১২]

ভামহও 'বক্রোক্তি'-কেই সকল অলংকারের বীজ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন এবং শেষ পর্যন্ত 'বক্রোক্তি' এবং অতিশয়োক্তি' সমানার্থক বলিয়াই স্বীকৃত হইয়া থাকে—

"সৈষা সর্বৈব বক্রোক্তিরনয়াঽর্থো বিভাব্যতে।
যত্নোঽস্যাং কবিনা কার্য্যঃ কোঽলংকারোঽনায় বিনা ॥"

আর সকল অলংকারই যে পর্যবসানে রসকেই অভিব্যক্ত করিয়া থাকে, ইহাও আলংকারিক আচার্যগণ স্পষ্টভাবেই ঘোষণা করিয়াছেন :

"প্রায়ঃ সর্বোঽপ্যলংকারো রসমর্থে নিষিঞ্চতি।"

কাব্যে শব্দ বা অর্থ যতক্ষণ না অলংকারের দ্বারা 'অতিশয়ান্বিত'— তাহা উৎকর্ষের অতিশয় হউক বা অপকর্ষেরই অতিশয় হউক— হইয়া উঠিতেছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাহা রসের অভিব্যঞ্জক হইয়া উঠিতে পারে না, সহৃদয়ের আস্বাদবিধান করিবার সামর্থ্য তাহার থাকে না। আচার্য মহিমভট্ট এই সত্য অতি সুন্দরভাবে প্রকাশ করিয়াছেন নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটিতে—

"বিনোৎকর্ষাপকর্ষাভ্যাং স্বদন্তেঽর্থা ন জাতুচিৎ।
তদর্থমেব কবয়োঽলংকারান্ পর্য্যুপাসতে ॥"

অতএব সার্থক কবিকর্মে রসের সহিত অলংকারের যে অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ তাহা রবীন্দ্রনাথের উক্তিতে যেমন নিঃসন্দেহে প্রকাশিত হইয়াছে, আমাদের চিরন্তন সাহিত্যাচার্যগণের অসংখ্য ঘোষণার মধ্যেও তেমনি তাহার অভ্রান্ত পরিচয় আমরা পাই।

ধ্বনিকার আচার্য আনন্দবর্ধন তো রসপ্রধান কাব্যে অলংকারসমূহ, সেগুলি যতই 'দুর্ঘটন' বা আমাদের মতো প্রাকৃত পুরুষের বুদ্ধিতে দুঃসাধ্য বলিয়া বিবেচিত হউক-না কেন, যে 'অপৃথগ্‌যত্ননির্বর্ত্ত্য' তাহা সংশয়াতীতভাবে খ্যাপন করিয়াছেন :

"রসাক্ষিপ্ততয়া যস্য বন্ধঃ শক্যক্রিয়ো ভবেৎ।
অপৃথগ্‌যত্ননির্বর্ত্ত্যঃ সোঽলংকারো ধ্বনৌ মতঃ ॥"

ইহারই প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই আচার্য কুন্তকের নিম্নোদ্ধৃত কারিকাটিতে—

"ন চালংকারনিষ্পত্তৌ রসবন্ধোদ্যতঃ কবিঃ।
যততে তে হি তৎসিদ্ধি-নান্তরীয়ক-সিদ্ধয়ঃ ॥"

সুতরাং কাব্যে শব্দ ও অর্থ কখনোই অলংকারবর্জিত হইতে পারে না। উহা যেমন প্রাচীন আচার্যগণের সিদ্ধান্ত, সেইরূপ রবীন্দ্রনাথেরও সিদ্ধান্ত। সেইজন্যেই কালিদাসের সম্বন্ধে যখন বলা হয়— "উপমা কালিদাসস্য", তখন তাহা একটি শাশ্বত

কাব্যসত্যেরই প্রতিধ্বনি মাত্র। রবীন্দ্রনাথের লেখনীতে তর্ক-বিতর্কের ভাষাতেও উপমার অজস্র সমাবেশের ফলেই বোধহয় সেগুলিও সরস কাব্যধর্মী হইয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এ বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। কেননা "সাহিত্যের প্রাণ" শীর্ষক একটি রচনায় তিনি নিজের ভাষা সম্বন্ধে বলিতেছেন, যদিও কিছুটা পরিহাস এবং আত্মসমালোচনার ভঙ্গিতে—

"আমার এক-একবার আশঙ্কা হচ্ছে তুমি আমার উপর চটে উঠবে— বলবে লোকটাকে কিছুতেই তর্কের লক্ষ্যস্থলে আনা যায় না।... তার উপরে আবার উপমার জ্বালায় তুমি বোধহয় অস্থির হয়ে উঠেছ। কিন্তু আমার এ প্রাচীন রোগটিও তোমার জানা আছে। মনের কোনো একটা ভাব ব্যক্ত করবার ব্যাকুলতা জন্মালে আমার মন সেগুলোকে উপমার প্রতিমাকারে সাজিয়ে পাঠায়, অনেকটা বকাবকি বাঁচিয়ে দেয়। অক্ষরের পরিবর্তে হাইরোগ্লিফিক্স্ ব্যবহারের মতো। কিন্তু এরকম রচনাপ্রণালী অত্যন্ত বহুকেলে; মনের কথাকে সাক্ষাৎভাবে ব্যক্ত না করে প্রতিনিধিদ্বারা ব্যক্ত করা। এরকম করলে যুক্তিসংসারের আদানপ্রদান পরিষ্কাররূপে চালানো অসম্ভব হয়ে ওঠে। যা হোক. আগে থাকতে দোষ স্বীকার করছি. তাতে যদি তোমার মনস্তুষ্টি হয়।"[১৩]

৪

"বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্"

আমরা দেখিলাম কাব্যে অলংকার ও রসের গভীর অন্তরঙ্গ সম্পর্ক বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের অভিমত কিরূপ স্পষ্ট ছিল এবং প্রাচীন আলংকারিক আচার্যবৃন্দের সিদ্ধান্তের সহিত তাহার কতদূর সঙ্গতি ও অবিরোধ। সাহিত্যে রসের স্থান সম্পর্কেও রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধির সহিত অলংকারশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত যে হুবহু মিলিয়া যায়— উহাও কবির সাহিত্যতত্ত্ববিষয়ক আলোচনা নিপুণভাবে অনুশীলন করিলে আমাদের নিকট অজ্ঞাত থাকে না। বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথ তাঁহার রচনার বিভিন্ন স্থানে নানা প্রসঙ্গে রসের সহিত কাব্যের অন্তরঙ্গ সম্পর্কের কথা অবতারণা করিয়াছেন এবং বিশ্বনাথের 'সাহিত্যদর্পণ' হইতে সুপ্রসিদ্ধ কাব্যলক্ষণটি বারবার শ্রদ্ধার সহিত উদ্ধার করিয়াছেন দেখিতে পাওয়া যায়।

'সাহিত্যের পথে'-র উৎসর্গপত্রে অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীকে উদ্দেশ করিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন:

"সৌন্দর্যপ্রকাশই সাহিত্যের বা আর্টের মুখ্য লক্ষ্য নয়। এ সম্বন্ধে আমাদের দেশে অলংকারশাস্ত্রে চরম কথা বলা হয়েছে: বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্।"[১৪]

"সাহিত্যতত্ত্ব" শীর্ষক প্রবন্ধেও কবি সেই একই উদধৃতির আশ্রয় লইয়াছেন:

"আমাদের অলংকারশাস্ত্রে বলছে, বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্। সৌন্দর্যের রস আছে, কিন্তু এ কথা বলা চলে না যে, সব রসেরই সৌন্দর্য আছে। সৌন্দর্য-রসের সঙ্গে অন্য সকল রসেরই মিল হচ্ছে ঐখানে, যেখানে সে আমাদের অনুভূতির সামগ্রী। অনুভূতির বাইরে রসের কোনো অর্থই নেই। রসমাত্রই তথ্যকে অধিকার ক'রে তাকে অনির্বচনীয়ভাবে অতিক্রম করে। রসপদার্থ বস্তুর অতীত এমন একটি ঐক্যবোধ যা আমাদের চৈতন্যে মিলিত হতে বিলম্ব করে না। এখানে তার প্রকাশ আর আমার প্রকাশ একই কথা।"[১৫]

১৩৩০ সালে কাশীতে 'প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে'-র সভাপতির অভিভাষণে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য-সাধনার তিনটি ভিন্ন মার্গের কথা বলিয়াছেন—

"সাহিত্যসাধনার ভিন্ন ভিন্ন মার্গ আছে। একটি হচ্ছে কর্মকাণ্ড। সভাসমিতির সভাপতিত্ব করে দরবার জমানো, গ্রন্থাবলী সম্পাদন করা, সংবাদপত্র পরিচালনা করা, এগুলি হল কর্মকাণ্ডের অন্তর্গত। এই মার্গের যাঁরা পথিক তাঁরা জানেন কেমন করে স্বচ্ছন্দে সাহিত্যসংসারের কাজ চালাতে হয়। তার পরের মার্গ হচ্ছে জ্ঞানকাণ্ড, যেমন ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, দর্শন প্রভৃতির আলোচনা। এর দ্বারাও সাহিত্যিক সভা জমিয়ে তুলে কীর্তিখ্যাতি হাততালি লাভ করা যায়।

"আমি শিশুকাল থেকেই এই উভয় মার্গ থেকে ভ্রষ্ট। এখন বাকি রইল আর-এক মার্গ, সেটি হচ্ছে রসমার্গ। এই মার্গ অবলম্বন করে রসসাহিত্যের আলোচনা, আমি পারি বা না পারি, করে যে এসেছি সে কথা আর গোপন রইল না। বহুকাল পূর্বে নির্জনে বিরলপথে এই রসাভিসারে বার হয়েছিলুম, দূরে বংশীধ্বনি শুনতে পেয়ে। কিন্তু এই অভিসারপথ যে নিকটের লোকনিন্দা ও লাঞ্ছনার দ্বারা দুর্গম তা যাঁরা রসচর্চা করেছেন তাঁরাই জানেন।...

"রসমার্গের পথিককে পদে পদে নিয়ম লঙ্ঘন করে চলতে হয় সেই কু-অভ্যাসটি আমার অস্থিমজ্জাগত।"[১৬]

রসমার্গই রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে সাহিত্যসৃষ্টি এবং সাহিত্য-আস্বাদনের 'রাজমার্গ'। আমাদের প্রাচীন আচার্যগণেরও সেই একই সিদ্ধান্ত। আচার্য আনন্দবর্ধন তো মুক্তকণ্ঠে রসের ও কাব্যের অঙ্গাঙ্গিভাব সম্বন্ধ নানাভাবে কীর্তন করিয়াছেন। একটি শ্লোকে তিনি বলিয়াছেন :

"নীরসস্তু প্রবন্ধো যঃ সোঽপশব্দো মহান্ কবেঃ।
স তেনাকবিরেব স্যাদন্যেনাস্মৃতলক্ষণঃ ॥"

রামায়ণ ও মহাভারত— ভারতের এই দুই জাতীয় মহাকাব্যেই যে সামগ্রিকভাবে রসেরই প্রাধান্য, একটিতে করুণ রসের অপরটিতে শান্তরসের, 'ধ্বন্যালোকে'র চতুর্থ উদ্দ্যোতে অপূর্ব বাগ্‌বৈদগ্ধ্যের সাহায্যে ধ্বনিকার তাহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। 'রস' হইতেই যে কাব্যের উৎপত্তি, কাব্য যে কবির রসানুভূতিরই উৎসার মাত্র, তাঁহার রসপরিপূর্ণ চিত্তের উচ্ছলন মাত্র, ইহা বুঝাইবার জন্য ধ্বনিকার রামায়ণ রচনার ইতিহাস, ক্রৌঞ্চবধের উপাখ্যানের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন :

"কাব্যস্যাত্মা স এবার্থস্তথা চাদিকবেঃ পুরা।
ক্রৌঞ্চদ্বন্দ্ববিয়োগোত্থঃ শোকঃ শ্লোকত্বমাগতঃ ॥"

রবীন্দ্রনাথও একাধিক প্রসঙ্গে এই উপাখ্যানটির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া করুণ রসই যে রামায়ণের উৎস ইহা বুঝাইতে চাহিয়াছেন। 'সাহিত্য' গ্রন্থের "কবিজীবনী" শীর্ষক আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন :

"কোন্ আঘাতে বাল্মীকির হৃদয় ভেদ করিয়া কাব্য-উৎস উচ্ছ্বসিত হইয়াছিল ? করুণার আঘাতে। রামায়ণ করুণার অশ্রুনির্ঝর। ক্রৌঞ্চবিরহীর শোকার্ত ক্রন্দন রামায়ণকথার মর্মস্থলে ধ্বনিত হইতেছে। রাবণও ব্যাধের মতো প্রেমিক-যুগলকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছে ; লঙ্কাকাণ্ডের যুদ্ধব্যাপার উন্মত্ত বিরহীর পাখার ঝট্‌পটি। রাবণ যে বিচ্ছেদ ঘটাইয়া দিল মৃত্যুবিচ্ছেদের অপেক্ষাও তাহা ভয়ানক। মিলনের পরেও এ বিচ্ছেদের প্রতিকার হইল না।...

"ক্রৌঞ্চমিথুনের গল্পটি রামায়ণের মূল ভাবটির সংক্ষিপ্ত রূপক। স্থূল কথা এই, লোকে এই সত্যটুকু নিঃসন্দেহ আবিষ্কার করিয়াছে যে, মহাকবির নির্মল অনুষ্টুপ্‌ছন্দঃপ্রবাহ করুণার উত্তাপেই বিগলিত হইয়া স্যন্দমান হইয়াছে, অকালে দাম্পত্যপ্রেমের চিরবিচ্ছেদ-ঘটনই ঋষির করুণার্দ্র কবিত্বকে উন্মথিত করিয়াছে।"[১৭]

আমাদের প্রাচীন সাহিত্য-মীমাংসকগণ যেমন, তেমনই রবীন্দ্রনাথও তত্ত্ব নয়, রসকেই কাব্যের বৈশিষ্ট্য বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। তত্ত্ব বুদ্ধিগ্রাহ্য, প্রমাণযোগ্য, কিন্তু 'রস' শুধুই অনুভববেদ্য, ভাষার সাহায্যে তাহাকে প্রকাশ করা অসম্ভব। ভাষার সাহায্যে তাহাকে প্রকাশ করিতে গেলে তাহা আর 'রস' থাকে না, তাহা একটি নীরস তথ্যমাত্রে পর্যবসিত হয়। 'সাহিত্য' গ্রন্থে "কাব্য" শীর্ষক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাই বলিয়াছেন :

"কবিতা হইতে তত্ত্ব বাহির না করিয়া যাহারা সন্তুষ্ট না হয় তাহাদিগকে বলা যাইতে পারে, তত্ত্ব তুমি দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাস প্রভৃতি নানা স্থান হইতে সংগ্রহ করিতে পারো, কিন্তু কাব্যরসই কবিতার বিশেষত্ব।

"এই কাব্যরস কী তাহা বলা শক্ত। কারণ, তাহা তত্ত্বের ন্যায় প্রমাণযোগ্য নহে, অনুভবযোগ্য। যাহা প্রমাণ করা যায় তাহা প্রতিপন্ন করা সহজ ; কিন্তু যাহা অনুভব করা যায় তাহা অনুভূত করাইবার সহজ পথ নাই, কেবলমাত্র ভাষার সাহায্যে একটা সংবাদ জ্ঞাপন করা যায় মাত্র। কেবল যদি বলা যায় 'সুখ হইল' তবে একটা খবর দেওয়া হয়, সুখ দেওয়া হয় না।

"...তত্ত্বপ্রচার করিয়া মানবের সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তি নাই, আত্মপ্রকাশ করিবার জন্য তাহার হৃদয় সর্বদা ব্যগ্র হইয়া আছে। কাব্যের মধ্যে মানবের সেই আত্মপ্রকাশের চেষ্টা কথঞ্চিৎ সফলতা লাভ করে ; কাব্যের মর্যাদাই তাই। একটি ক্ষুদ্র প্রেমের কবিতার মধ্যে কোনো তত্ত্বই নাই, কিন্তু চিরকালীন মানবপ্রকৃতির আত্মপ্রকাশ রহিয়া গেছে। এইজন্য মানব চিরকালই তাহার সমাদর করিবে। ছবি-গান-কাব্যে মানব ক্রমাগতই আপনার সেই চিরান্ধকারশায়ী আপনাকে গোপনতা হইতে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিতেছে। এইজন্যই একটা ভালো ছবি, ভালো গান, ভালো কাব্য পাইলে আমরা বাঁচিয়া যাই।"[১৮]

উদ্ধৃত অংশটুকুতে রস সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের যে ধারণা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার সহিত প্রাচীন আলংকারিকগণের রসসিদ্ধান্তের আশ্চর্য সংবাদ আমরা লক্ষ্য করি। প্রথমতঃ, রবীন্দ্রনাথ রসকে 'ভাষার দ্বারা প্রকাশ করা অসম্ভব' বলিয়াছেন। ধ্বনিকার এবং তাঁহার অনুবর্তী সকল আলংকারিকই রসের 'স্বশব্দবাচ্যত্ব' নিরাকরণ করিয়া উহা যে ব্যঙ্গ্য তাহাই প্রতিপাদন করিয়াছেন। বস্তুতঃ রসের 'স্বশব্দবাচ্যত্ব' অলংকারশাস্ত্রে রসদোষের উদাহরণরূপে স্পষ্টভাবেই নির্দিষ্ট হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, রসকে রবীন্দ্রনাথ শুধুই 'অনুভববেদ্য' বলিয়াছেন, তাহাকে 'আত্মপ্রকাশ' রূপে বর্ণনা করিয়াছেন, ইহাও আলংকারিকগণের সিদ্ধান্তেরই প্রতিরূপ।[১৯] কেননা তাঁহারা রসকে 'স্বপ্রকাশানন্দচিন্ময়' রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। তৃতীয়তঃ, রবীন্দ্রনাথ চিত্র সংগীত কাব্য প্রভৃতি শিল্পকলার ক্ষেত্রে 'চিরান্ধকারশায়ী আপনাকে গোপনতা হইতে উদ্ধার করিবার চেষ্টা'-র কথা বলিয়াছেন তাহা যে আমাদের অজ্ঞানাবৃত আত্মচৈতন্যের 'আবরণভঙ্গ' ভিন্ন আর কিছুই নহে, সে বিষয়েও কোনোরূপ সংশয়ের অবকাশ নাই। 'রসগঙ্গাধর'-কার পণ্ডিতরাজ জগন্নাথের 'ভগ্নাবরণা চিদেব রসঃ'— এই সিদ্ধান্তেরই উহা যেন অনুবাদ মাত্র। আশ্চর্যের বিষয়, 'রসগঙ্গাধরে' যেমন আত্মার বা চৈতন্যেরই রসস্বরূপতা বুঝাইবার জন্য পণ্ডিতরাজ তৈত্তিরীয় উপনিষদের 'আনন্দবল্লী' হইতে "রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি"— এই শ্রুতিবাক্যটি উদ্ধার করিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথও তেমনই সত্য বা সৎ, যাহা চৈতন্যস্বরূপও বটে, তাহা যে আনন্দমাত্রসার এবং তাহাই যে সাহিত্যের চরম লক্ষ্য, তাহার প্রমাণস্বরূপ সেই একই মন্ত্র উদ্ধার করিয়াছেন। "সৌন্দর্যবোধ" প্রবন্ধে কবি বলিতেছেন :

"সত্য যে পদার্থপুঞ্জের স্থিতি ও গতির সামঞ্জস্য, সত্য যে কার্যকারণ-পরম্পরা, সে কথা জানাইবার অন্য শাস্ত্র আছে। কিন্তু সাহিত্য জানাইতেছে সত্যই আনন্দ, সত্যই অমৃত। সাহিত্য উপনিষদের এই মন্ত্রকে অহরহ ব্যাখ্যা করিয়া চলিয়াছে : রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি। তিনিই রস ; এই রসকে পাইয়াই মানুষ আনন্দিত হয়।"[২০]

আত্মচৈতন্যের, রসের এই আনন্দরূপের আবিষ্কারেই রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে কবির মুক্তি, সহৃদয়েরও মুক্তি। এই রস কবিরই আত্মাবিষ্কার মাত্র, তাহাই প্রকৃত মুক্তি। রবীন্দ্রনাথ বারবার এই কথাটি নানাভাবে আমাদের বুঝাইতে চাহিয়াছেন। "ধর্মের অর্থ" প্রবন্ধে তিনি বলিতেছেন :

"এই আনন্দলোকটিকে আবিষ্কার করিতে পারিলেই কাব্য সম্বন্ধে কবি, কর্ম সম্বন্ধে কর্মী মুক্তিলাভ করে। কবির কাব্য কর্মীর কর্ম তখন স্বাভাবিক হইয়া যায়।

"... কবি আপন কবিত্বশক্তির মধ্যে, কর্মী আপন কর্মশক্তির মধ্যে সমস্তের মূলগত আপনাকে লাভ করিতে চেষ্টা করিতেছে। সেই ভিতরকার আপনাকে যতই সে লাভ করে ততই কবির কাব্য অমর হইয়া উঠে ; সে তখন বাহিরের অক্ষরগণ্য কাব্য হয় না ; ততই কর্মীর কর্ম অমর হইয়া উঠে, সে তখন যন্ত্রচালিতবৎ কর্ম হয় না। কারণ প্রত্যেকের এই আপন পদার্থটি আনন্দময়,— এইখানেই স্বত উৎসারিত আনন্দের প্রস্রবণ।...

"মানুষ যখনই আত্মবশ হইয়া আপনার আনন্দকে পায় তখনই বড়ো আনন্দকে সর্বত্র দেখিতে পায়। সেই বড়ো আত্মাকে দেখাই আত্মার স্বভাব, সেই বড়ো আনন্দকে জানাই আত্মানন্দের সহজ প্রকৃতি।"[২১]

আমাদের প্রাচীন আলংকারিকগণও রসাস্বাদকে 'আত্মানন্দসমুদ্ভব' বলিয়াছেন—

"স্বাদঃ কাব্যার্থসম্ভেদাদাত্মানন্দসমুদ্ভবঃ।"

এমন-কি আচার্য ভট্টনায়ক, যিনি অভিনবগুপ্তেরও কিঞ্চিৎ পূর্বভাবী, তাঁহার অধুনালুপ্ত 'হৃদয়দর্পণ' গ্রন্থের একটি শ্লোকে যোগিগণের ব্রহ্মাস্বাদ হইতেও কবির রসাস্বাদকে সমধিক গৌরব দান করিয়া বলিয়াছেন :

"বাগধেনুর্দুগ্ধ এতং হি রসং যদ্ বালতৃষ্ণয়া।
তেন নাস্য সমঃ স স্যাদ্ দুহ্যতে যোগিভির্হি যঃ॥"

বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, কবি, শিল্পী— ইহারা সকলেই বিভিন্ন উপায়ে জগতের মূলতত্ত্ব, সৎস্বরূপকে, সত্যকে অনাবৃত করিয়া দেখাইবার জন্য নিজেদের ব্যাপৃত রাখিয়াছেন, সেই সত্যকে মুক্ত করিয়া দেখানোই প্রকৃত আনন্দে অধিষ্ঠিত হওয়া—

"বৈজ্ঞানিক বলো, দার্শনিক বলো, কবি বলো, তাঁদের কাজই মানুষের এই-সমস্ত মূঢ়তা ও অভ্যাসের আবরণ মোচন করে এই জগতের মধ্যে সত্যের অনন্তরূপকে দেখানো, যা-কিছু দেখছি একেই সত্য করে দেখানো— নূতন কিছু তৈরি করা নয়, কল্পনা করা নয়। এই সত্যকে মুক্ত করে দেখানোর মানেই হচ্ছে মানুষের আনন্দের অধিকার বাড়িয়ে দেওয়া।"[২২]

এখানেও সেই আত্মার আবরণ-ভঙ্গের কথা, আনন্দরূপ মুক্তির বার্তা— যাহা সাহিত্যের পরম তাৎপর্য। প্রাচীন আচার্যগণের সিদ্ধান্তও ইহাই। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে শিল্প-সাহিত্যের সাধনা 'আধ্যাত্মিক সাধনা'-রই প্রকারভেদ মাত্র—

"শিল্প-সাহিত্যের সাধনাটা কী? এই সাধনায় মানুষের চিত্ত আপনাকে বাহিরে রূপ দিয়া সেই রূপের ভিতর হইতে পুনশ্চ আপনাকেই ফিরিয়া দেখিতেছে।

"সৌন্দর্যের মধ্যে আনন্দ আপনাকেই বাহিরে দেখিতে পায়— সেইজন্যই সৌন্দর্যের গৌরব। মানুষ আপনার সৌন্দর্য-সৃষ্টির মধ্যে আপনারই আনন্দময় স্বরূপকে দেখিতে পায়— শিল্পীর শিল্পে কবির কাব্যে মানুষের সেইজন্যই এত অনুরাগ। শিল্পে সাহিত্যে মানুষ কেবলই যদি বাহিরের রূপকেই দেখিত আপনাকে না দেখিত তবে সে শিল্প-সাহিত্য তাহার পক্ষে একেবারে ব্যর্থ হইত।"[২৩]

তাই রবীন্দ্রনাথ 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণে'র "আত্মসংস্কৃতির্বাব শিল্পানি"— সকল শিল্পের দ্বারাই আত্মার সংস্কার সাধিত হয়— এই বাক্যটি উদ্ধার করিয়াছেন কাব্যে ও শিল্পে আধ্যাত্মিক সাধনার বার্তা ঘোষণার উদ্দেশ্যে :

"আমাদের পেট ভরাবার জন্যে— জীবনযাত্রার অভাব মোচন করবার জন্যে আছে নানা বিদ্যা, নানা চেষ্টা ; মানুষের শূন্য ভরাবার জন্যে, তার মনের মানুষকে নানাভাবে নানা রসে জাগিয়ে রাখবার জন্যে আছে তার সাহিত্য, তার শিল্প। মানুষের ইতিহাসে এর স্থান কী বৃহৎ, এর পরিমাণ কী প্রভূত। সভ্যতার কোনো প্রলয়ভূমিকম্পে যদি এর বিলোপ সম্ভব হয় তবে মানুষের ইতিহাসে কী প্রকাণ্ড শূন্যতা কালো মরুভূমির মতো ব্যাপ্ত হয়ে যাবে। তার কৃষ্টির ক্ষেত্র আছে তার চাষে বাসে আপিসে কারখানায়; তার সংস্কৃতির ক্ষেত্র সাহিত্যে— এখানে তার আপনারই সংস্কৃতি, সে তাতে আপনাকেই সম্যক্‌রূপে করে তুলছে, সে আপনিই হয়ে উঠছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ তাই বলেছেন : আত্মসংস্কৃতির্বাব শিল্পানি।"[২৪]

৫

ভাব-ব্যঞ্জনা (Suggestiveness)

রসের স্বরূপ আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ 'ব্যঞ্জনা'-র কথাও অনিবার্যভাবেই অবতারণা করিয়াছেন। কেননা রসকে ব্যঞ্জনার সাহায্য ছাড়া কোনোক্রমেই এক হৃদয় হইতে অপর হৃদয়ে, কবিচিত্ত হইতে সহৃদয়চিত্তে সংক্রামিত করিতে পারা যায় না। রসাস্বাদের স্বরূপ এবং প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা দিবার জন্যই আমাদের প্রাচীন ধ্বনিবাদী আলংকারিকগণ ব্যঞ্জনা ব্যাপারের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন, নানা যুক্তির দ্বারা তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। 'রস' তাঁহাদের মতে 'পরম

ব্যঙ্গ্য'। অভিনবগুপ্তের ভাষায় 'স এষ পরমো ব্যঙ্গ্যঃ'। এই ব্যঞ্জনার স্পর্শেই কবির বাঙ্ময়ী সৃষ্টি কাব্য হইয়া উঠে, অনির্বচনীয় রসের আবির্ভাবে প্রাণবন্ত হইয়া উঠে। ব্যঞ্জনার স্পর্শেই শব্দ তাহার আভিধানিক অর্থের সংকীর্ণ সীমা অতিক্রম করিয়া অসীমের দিকে ধাবিত হয়, ব্যক্ত ও অব্যক্তের মিলনে কবিবাণী অলৌকিক মহিমায় মণ্ডিত হইয়া উঠে। রবীন্দ্রনাথ "ছবির অঙ্গ" শীর্ষক আলোচনায় চিত্রশিল্পের অন্যতম অঙ্গ 'বর্ণিকাভঙ্গে'-র সহিত কাব্যে 'ব্যঞ্জনা'-র সাদৃশ্য দেখাইতে গিয়া বলিয়াছেন :

> "তার পরে, ছবিতে যেমন 'বর্ণিকাভঙ্গ(৬)', কবিতায় তেমনি ব্যঞ্জনা, suggestiveness। এই ব্যঞ্জনার দ্বারা কথা আপনার অর্থকে পার হইয়া যায়। যাহা বলে তার চেয়ে বেশি বলে। এই ব্যঞ্জনা ব্যক্ত ও অব্যক্তের মাঝখানকার মীড়। কবির কাব্যে এই ব্যঞ্জনা বাণীর নির্দিষ্ট অর্থের দ্বারা নহে, বাণীর অনির্দিষ্ট ভঙ্গির দ্বারা, অর্থাৎ বাণীর রেখার দ্বারা নহে, তাহার রঙের দ্বারা সৃষ্ট হয়।"[২৫]

শিল্প-সাহিত্যে যে রসাস্বাদ, যে আপন আত্মার আনন্দময় স্বরূপের উপলব্ধি, তাহা যে ব্যঞ্জনার মহিমাতেই সাধিত হইতে পারে রবীন্দ্রনাথ "রূপ ও অরূপ" শীর্ষক প্রবন্ধে তাহা স্পষ্টভাবেই ঘোষণা করিয়াছেন :

> "... শিল্পে সাহিত্যে মানুষ কেবলই যদি বাহিরের রূপকেই দেখিত আপনাকে না দেখিত তবে সে শিল্প-সাহিত্য তাহার পক্ষে একেবারে ব্যর্থ হইত।
>
> "এইজন্যই শিল্প-সাহিত্যে ভাবব্যঞ্জনার (suggestiveness) এত আদর। এই ভাবব্যঞ্জনার দ্বারা রূপ আপনার একান্ত ব্যক্ততা যথাসম্ভব পরিহার করে বলিয়াই অব্যক্তের অভিমুখে আপনাকে বিলীন করে বলিয়াই মানুষের হৃদয় তাহার দ্বারা প্রতিহত হয় না।...
>
> "মানুষের সাহিত্য শিল্পকলায় হৃদয়ের ভাব রূপে ধরা দেয় বটে কিন্তু রূপে বদ্ধ হয় না। এইজন্য সে কেবলই নব নব রূপের প্রবাহ সৃষ্টি করিতে থাকে। তাই প্রতিভাকে বলে 'নবনবোন্মেষশালিনী বুদ্ধি।' প্রতিভা রূপের মধ্যে চিত্তকে ব্যক্ত করে কিন্তু বন্দী করে না— এইজন্য নব নব উন্মেষের শক্তি তাহার থাকা চাই।"[২৬]

রবীন্দ্রনাথ রসের অনির্বচনীয়তার কথা বলিয়াছেন, প্রাচীন সাহিত্যাচার্যগণ যেমন বলেন। কিন্তু 'বস্তু-অভিজ্ঞতা'-র ভাষা যে 'রস-অভিজ্ঞতা'র ভাষা হইতে স্বতন্ত্র তাহা বুঝাইবার জন্য সেই 'ব্যঞ্জনা' ব্যাপারেরই প্রকারান্তরে সূচনা করিয়াছেন। "ছন্দ" নিবন্ধের সূচনাতেই 'ছন্দের অর্থ' শীর্ষক পরিচ্ছেদে তিনি বলিতেছেন :

> "শুধু কথা যখন খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে তখন কেবলমাত্র অর্থকে প্রকাশ করে। কিন্তু সেই কথাকে যখন তির্যক্ ভঙ্গি বা বিশেষ গতি দেওয়া যায় তখন সে আপন অর্থের চেয়ে আরো কিছু বেশি প্রকাশ করে। সে বেশিটুকু যে কী তা বলাই শক্ত। কেননা তা কথার অতীত, সুতরাং অনির্বচনীয়। যা আমরা দেখ্‌ছি শুনছি জানছি তার সঙ্গে যখন অনির্বচনীয়ের যোগ হয় তখন তাকেই আমরা বলি রস। অর্থাৎ সে জিনিসটাকে অনুভব করা যায়, ব্যাখ্যা করা যায় না। সকলে জানেন, এই রসই হচ্ছে কাব্যের বিষয়।...
>
> "বস্তু-পদার্থের সংজ্ঞা নির্ণয় করা যায় কিন্তু রস-পদার্থের করা যায় না। অথচ রস আমাদের একান্ত অনুভূতির বিষয়।... বরঞ্চ রসের অনুভূতি বস্তুজ্ঞানের চেয়ে আরো নিকটতর প্রবলতর গভীরতর।.. তফাত এই বস্তু-অভিজ্ঞতার ভাষা সাদা কথার বিশেষণ কিন্তু রস-অভিজ্ঞতার ভাষা আকার ইঙ্গিত সুর এবং রূপক।"[২৭]

কাব্যের ভাষা যে লোকব্যবহারের ভাষার তুলনায় প্রায়শই অস্পষ্ট, তাহার কারণ তাহাকে 'ভাব' ব্যক্ত করিতে হয়। 'ভাব-ব্যঞ্জনা'ই কাব্যের উদ্দেশ্য। "কাব্য : স্পষ্ট ও অস্পষ্ট" শীর্ষক আলোচনায় তাই রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন :

> "কাব্যে অনেক সময়ে দেখা যায় ভাষা ভাবকে ব্যক্ত করিতে পারে না, কেবল লক্ষ্য করিয়া নির্দেশ করিয়া দিবার চেষ্টা করে। সে স্থলে সেই অনতিব্যক্ত ভাষাই একমাত্র ভাষা। এই প্রকার ভাষাকে কেহ বলেন 'ধুঁয়া', কেহ বলেন 'ছায়া', কেহ বলেন 'ভাঙা ভাঙা' এবং কিছুদিন হইল নবজীবনের শ্রদ্ধাস্পদ সম্পাদক মহাশয় কিঞ্চিৎ হাস্যরসাবতারণার চেষ্টা করিতে গিয়া তাহাকে 'কাব্যি' নাম দিয়াছেন।...

"যাঁহারা মনোবৃত্তির সম্যক্ অনুশীলন করিয়াছেন তাঁহারাই জানেন, যেমন জগৎ আছে, তেমনি অতিজগৎ আছে। সেই অতিজগৎ জানা এবং না-জানার মধ্যে, আলোক এবং অন্ধকারের মাঝখানে বিরাজ করিতেছে। মানব এই জগৎ এবং জগদতীত রাজ্যে বাস করে। তাই তাহার সকল কথা জগতের সঙ্গে মেলে না। এইজন্য মানবের মুখ হইতে এমন অনেক কথা বাহির হয় যাহা আলোকে অন্ধকারে মিশ্রিত; যাহা বুঝা যায় না, অথচ বুঝা যায়। যাহাকে ছায়ার মতো অনুভব করি, অথচ প্রত্যক্ষের অপেক্ষা অধিক সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি। সেই সর্বত্রব্যাপী অসীম অতিজগতের রহস্য কাব্যে যখন কোনো কবি প্রকাশ করিতে চেষ্টা করেন তখন তাঁহার ভাষা সহজে রহস্যময় হইয়া উঠে। সে স্থলে কেহ বা কেবলই ধুঁয়া এবং ছায়া দেখিয়া ফিরিয়া যায়, কেহ বা অসীমের সমুদ্রবায়ু সেবন করিয়া অপার আনন্দ লাভ করে।"[২৮]

"তথ্য ও সত্য" প্রবন্ধেও রবীন্দ্রনাথ তথ্যবস্তু ও রসবস্তুর মধ্যে পার্থক্য প্রদর্শন প্রসঙ্গে সেই একই কথা বলিয়াছেন :

"কবিতা যে ভাষা ব্যবহার করে সেই ভাষার প্রত্যেক শব্দটির অভিধান-নির্দিষ্ট অর্থ আছে। সেই বিশেষ অর্থই শব্দের তথ্যসীমা। এই সীমাকে ছাড়িয়ে শব্দের ভিতর দিয়েই তো সত্যের অসীমতাকে প্রকাশ করতে হবে। তাই কত ইশারা, কত কৌশল, কত ভঙ্গি।...যাঁরা তথ্য খোঁজেন তাঁদের এই কথাটা বুঝতে হবে যে, নির্দিষ্ট শব্দের নির্দিষ্ট অর্থ যে তথ্যের দুর্গ ফেঁদে বসে আছে, ছলে বলে কৌশলে তারই মধ্যে ছিদ্র করে নানা ফাঁকে নানা আড়ালে সত্যকে দেখাতে হবে। দুর্গের পাথরের গাঁথুনি দেখাবার কাজ তো কবির নয়।"[২৯]

মনে হয় কবি যেন ধ্বনিবাদীদের সিদ্ধান্তেরই আধুনিক ভাষ্য করিয়াছেন। ধ্বনিবাদীরাও কাব্যে বাচ্য ও প্রতীয়মান বা ব্যঙ্গ্য— এই দুই জাতীয় অর্থ স্বীকার করিয়া থাকেন এবং প্রতীয়মান অর্থই, যাহাকে 'ধ্বনি'ও বলা হয়, তাহাকেই কাব্যের আত্মা বা প্রাণ বলিয়া নির্দেশ করেন। সেই ধ্বনিকে বুঝাইবার জন্যই তাঁহারা শব্দের অর্থবোধন-ক্ষমতাকে নানা ভাবে দীর্ঘ দীর্ঘতররূপে প্রসারিত করিবার পথ উদ্ভাবন করিয়াছেন— যাহার চরম পরিণতি দেখিতে পাওয়া যায় 'ব্যঞ্জনা' ব্যাপারের মধ্যে। এই ব্যঞ্জনা ব্যাপারের পরিধি সুবিশাল, ব্যঙ্গ্য অর্থেরও কোনো ইয়ত্তা বা অবধি নাই— 'নিরবধির্ব্যঙ্গ্যোঽর্থঃ'। তবে সর্বপ্রকার ব্যঙ্গ্য অর্থ হইতে— তাহা বস্তুস্বরূপই হউক, বা অলংকারস্বরূপই হউক, রস-ভাবাদিরূপ অর্থই রমণীয়তম। তাই ধ্বনিকার বলিয়াছেন—

"ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকভাবেঽস্মিন্ বিবিধে সম্ভবত্যপি।
রসাদিময় একস্মিন্ কবিঃ স্যাদবধানবান্ ॥"

ব্যঙ্গ্য অর্থের যে সীমা নাই, তাহা যে চিরনবীন তাহা বুঝাইবার জন্য ধ্বনিকার একটি উপমার আশ্রয় লইয়াছেন :

"ন চ তেষাং ঘটতেঽবধি-
র্ন চ তে দৃশ্যন্তে কথমপি পুনরুক্তাঃ।
যে বিভ্রমাঃ প্রিয়াণা-
মর্থা বা সুকবিবাণীনাম্ ॥"

ব্যঞ্জনাই শব্দার্থকে সীমার বন্ধন হইতে অসীমের মধ্যে মুক্তিদান করে। তবে এ কথাও মনে রাখিতে হইবে যে, কেবলমাত্র কাব্যের ক্ষেত্রেই শব্দ ও অর্থের এই ব্যঞ্জনা আশ্রয় সমীচীন, শাস্ত্র বিজ্ঞান দর্শন ইতিহাস প্রভৃতির ক্ষেত্রে নহে। কেননা শেষোক্ত স্থলে শব্দার্থ সুপরিচ্ছিন্ন, সুস্পষ্ট, বুদ্ধিগ্রাহ্য হইলেই উহাদের মর্যাদা রক্ষিত হয়, লক্ষ্য সাধিত হয়। তাই যখন ধ্বনিবিরোধী আচার্যগণ ন্যায়শাস্ত্রের রীতিতে ব্যঞ্জনাকে অনুমানের গণ্ডির মধ্যে বাঁধিয়া রাখিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন, আনন্দবর্ধন, অভিনবগুপ্ত প্রমুখ ধ্বনিতাত্ত্বিকগণ কাব্যের চমৎকারিতার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া তাহাতে সম্মত হইতে পারেন নাই। কেননা অ-পরিচ্ছিন্নতাই, যাহা যুক্তির নিগড়ের মধ্যে বাঁধা পড়ে না, তাহাই কাব্যের সারভূত অর্থের রহস্য, তাহার চমৎকারের নিদান। সেইজন্যই আচার্য মম্মট অনুমিতিবাদীদের যুক্তি খণ্ডন করিয়া ব্যঞ্জনাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে গিয়া শেষপর্যন্ত বলিতে বাধ্য হইয়াছেন : "এবংবিধাদর্থাদেবংবিধোঽর্থ উপপত্ত্যনপেক্ষত্বেঽপি প্রকাশতে ইতি

ব্যক্তিবাদিনস্তদদূষণম্ ।” কেননা, সহৃদয় নিজের অন্তরের প্রত্যক্ষ অনুভবকে কখনও অপলাপ করিতে পারেন না, যতই যুক্তির দ্বারা তাহাকে উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করা হউক-না কেন—

"যুক্ত্যা পর্য্যনুযুজ্যেত স্ফুরন্নুভবঃ কয়া ?"

তবে প্রতীয়মান অর্থ একেবারে স্পষ্ট হওয়াও যেমন বাঞ্ছনীয় নয়, নিতান্ত অস্পষ্টতাও তদ্রূপ দোষাবহ। প্রতীয়মান অর্থ অতিগূঢ়ও হইবে না, অতিস্ফুটও না— তবেই তাহার চারুত্ব, তাহার আকর্ষণ। বাচ্যার্থের অপেক্ষায় প্রতীয়মান অর্থই কবি ও সহৃদয়ের দৃষ্টিতে সমধিক কাঙ্ক্ষণীয় হইলেও বাচ্যার্থকে উপেক্ষা করাও কোনো কবির পক্ষে সমীচীন হইবে না। প্রতীয়মান অর্থের নাতিস্পষ্টতা বাঞ্ছনীয় হইলেও বাচ্যার্থের অস্পষ্টতা বা শৈথিল্যও কোনোক্রমেই অনুমোদনের যোগ্য নয়। আত্মার তুলনায় দেহ গৌণ হইলেও দেহের গঠনসৌষ্ঠব যেমন উপেক্ষণীয় নয়— ঠিক সেইরূপ।

উদ্ধৃত অংশগুলিতে কাব্যে ব্যঞ্জনা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের যে-সকল ধারণার অভিব্যক্তি আমরা লক্ষ্য করি ধ্বনিবাদিগণের সিদ্ধান্তের সহিত তাহার কী আশ্চর্য সাদৃশ্য! বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথ যখন সাহিত্য সম্বন্ধে বলেন:

"সাহিত্য এইরূপ বিকাশ এবং স্ফূর্তি মাত্র। আনন্দই তাহার আদি অন্ত মধ্য। আনন্দই তাহার কারণ এবং আনন্দই তাহার উদ্দেশ্য।"[৩০]

—তখন ইহার মধ্যে আমরা মহর্ষি ভরতের 'নাট্যশাস্ত্রে'-র বিখ্যাত শ্লোক—

"যথা বীজাদ্ ভবেদ্ বৃক্ষো বৃক্ষাৎ পুষ্পং ফলং তথা।
তথা মূলং রসাঃ সর্বে তেভ্যো ভাবা ব্যবস্থিতাঃ ॥"

—ইহারই প্রতিধ্বনি কি শুনিতে পাই না? কেননা, রসই তো আনন্দ— উপনিষদের ভাষায় "রসো বৈ সঃ"।

৬

ট্র্যাজেডি ও আনন্দ

রসের স্বরূপ আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে স্বভাবতই করুণ, ভয়ানক, বীভৎস প্রভৃতি রসের ক্ষেত্রেও কীভাবে আনন্দময় অনুভূতি হইতে পারে— এই অনিবার্য প্রশ্নের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। তিনি নানা প্রসঙ্গে এই প্রশ্নটির সন্তোষজনক সমাধান অন্বেষণ করিয়াছেন, এবং শেষ পর্যন্ত এই উত্তরই তিনি দিয়াছেন যে, অনুভূতিমাত্রই আনন্দময় যদি তাহা সর্বপ্রকার ব্যক্তিগত ব্যাবহারিক সম্বন্ধের আকর্ষণ-বিকর্ষণের ঊর্ধ্বে বিরাজমান হয়। সাহিত্যে বা শিল্পকলায় যে ব্যক্তিস্বরূপ বা বস্তুস্বরূপের চিত্রণ করা হয়, তাহার মূলে আছে 'অনুভূতির ক্ষুধা', 'প্রকাশের ক্ষুধা'— এবং বস্তুর স্ব-লক্ষণ বিশিষ্ট স্বরূপটি (Thing-in-itself, ding-an-sich) যখন অবারিতভাবে কবির চেতনায় অনুভূতির স্পর্শ লাভ করে তখন তাহা যেমন 'চিদ্ঘন' সেইরূপ 'আনন্দঘন' হইয়া উঠে। তাহার পরিপূর্ণ সত্তা বিকশিত হইয়া উঠে। রবীন্দ্রনাথ তাই 'সাহিত্যের পথে'-র অন্তর্গত "রূপকার" শীর্ষক অভিভাষণে বলিয়াছেন:

"এই হল আমাদের অনুভূতির ক্ষুধা, প্রকাশের ক্ষুধা।... এই-যে আত্মচেতনার অনুভূতি আমরা খুঁজি— এই অনুভূতি সর্বদাই আনন্দময়। আমি বলছি, মানুষের সর্বপ্রকার অনুভূতিই আনন্দময়। দুঃখের, বেদনার, ভয়ের অনুভূতি, কোনোটাকেই বাদ দিয়ে বলছি না। ধরা যাক, ভয়ের অনুভূতি। কোন্‌খানে এটা অসুখকর? না, যেখানে এর সঙ্গে ক্ষতি বা অনিষ্টের আশঙ্কা জড়িত— যেমন পাড়ায় বাঘ এলে মানুষ উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠে। কিন্তু বাঘের গল্প যখন পড়ছি, শিকারীর রোমহর্ষক মৃত্যুর সঙ্গে খেলার প্রসঙ্গ, সেখানে যে নিবিড় ভয়ের অনুভূতির মধ্যে দিয়ে মনকে নিয়ে যায় তা সুখকর না হলে বাঘের গল্প আমরা পড়ব কেন? ভূতের ভয় সম্বন্ধেও একই কথা। পয়সা দিয়ে কথক ডেকে সীতার বনবাসের কাহিনী আমরা কেন শুনি? ঘরের পাশে যদি খুন হয় অনিষ্টের আশঙ্কায় আমরা পুলিস ডেকে বসি, কিন্তু ওথেলো যেখানে ডেসডিমোনার প্রাণ নিল সেখানে ব্যক্তিগত ক্ষতি নেই, বেদনার তীব্রতা সেখানে আমাদের প্রোজ্জ্বল অনুভূতির দীপ্ততেজে সমস্ত চৈতন্যকে উদ্ভাসিত করে তোলে। হ্যাম্‌লেট নাটকের গভীর

নৈরাশ্য বেদনার মধ্য দিয়েই তার পূর্ণ সার্থকতা, যদি ওই নাটকের দুঃখভার কমিয়ে সুখের এবং স্বাচ্ছন্দ্যের ঘটনা দিয়ে ভরিয়ে তোলা যেত আমাদের আনন্দ কি বাড়ত ? বীর যে সে ভয়ের কারণ ঘটিয়ে তার উপর জয়ী হয়ে আনন্দিত হতে চায়, সে পরিণামভীরু নয়, সে অনুভূতির পূর্ণতার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলে। ভীরু যারা তাদের ব্যক্তিগত ভয়ভাবনার খোলস এতই কঠিন যে, তারা সংকটের সংঘাতে এসে প্রাণলোকের প্রবল অনুভূতির তরঙ্গে চেতনাকে উদ্‌বেল করে তুলতে জানে না, তারা দাওয়ায় বসে শাস্ত্র এবং জুজুবুড়ির ভয়ে আশঙ্কিত। মানুষের আত্মোপলব্ধির ক্ষুধা তাকে বিচিত্রের জগতে অগ্রসর করিয়ে দেয়— এই বীরত্বের অভিযান সফলভাবে আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত জীবনে ঘটে ওঠে না, সেইজন্যে সাহিত্য এবং কলাবিদ্যার মধ্য দিয়ে বিচিত্র মানবের অনুভূতির নিবিড় রসাস্বাদন করে আমরা আনন্দিত হই।"[৩১]

রবীন্দ্রনাথ 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র নরক বর্ণনার মধ্যে কিন্তু সাহিত্যিক 'বীভৎস রসের' আস্বাদ পান নাই— তাহার কারণ সেখানে কল্পনাশক্তির স্পর্শে বর্ণনীয় বস্তুর প্রকাশ নৈর্ব্যক্তিক, অবারিত হইয়া উঠে নাই :

"মেঘনাদবধের নরকবর্ণনায় বীভৎস রসের অবতারণা উপলক্ষে মাইকেল এক জায়গায় বর্ণনা করেছেন, নারকী বমন ক'রে উদ্‌গীর্ণ পদার্থ আবার খাচ্ছে— এ বর্ণনায় পাঠকের মনে ঘৃণা সঞ্চার করতে কবিত্বশক্তির প্রয়োজন করে না, কিন্তু আমাদের মানসিকতার মধ্যে যে-সব ঘৃণ্যতার মূল তার প্রতি ঘৃণা জাগিয়ে তুলতে কল্পনাশক্তির দরকার। ঘৃণাবৃত্তির প্রকাশটা সাহিত্যে জায়গা পাবে না, এ কথা বলব না কিন্তু সেটা যদি একান্তই একটা দৈহিক সস্তা জিনিস হয় তা হলে তাকে অবজ্ঞা করার অভ্যাসটাকে নষ্ট না করলেই ভালো হয়।"[৩২]

রবীন্দ্রনাথ যেমন দুঃখ ও বেদনাদায়ক সর্বপ্রকার অনুভূতিই যে কবিপ্রতিভার স্পর্শে সংকীর্ণতা পরিহার করিয়া রসরূপতা লাভ করিতে পারে বলিয়াছেন এবং তাহার যে-সকল দৃষ্টান্ত স্বদেশ ও বিদেশের সাহিত্যসৃষ্টি হইতে উল্লেখ করিয়াছেন— আমাদের প্রাচীন সাহিত্য-মীমাংসকগণও বহু পূর্বেই সেই একই কথা অতি স্পষ্টভাবেই বলিয়া গিয়াছেন। 'দশরূপক'-কার ধনঞ্জয় তাঁহার একটি বিখ্যাত শ্লোকে সুন্দরভাবে বলিয়াছেন :

"রম্যং জুগুপ্সিতমুদারমথাপি নীচ-
মুগ্রং প্রসাদি গহনং বিকৃতং চ বস্তু।
যদ্ বাহপ্যবস্তু কবি-ভাবক-ভাব্যমানং
তন্নাস্তি যন্ন রসভাবমুপৈতি লোকে॥"

করুণ, বীভৎস, রৌদ্র, ভয়ানক প্রভৃতি আপাত-বিরস চিত্তাবস্থাও কী কারণে সাহিত্যে অলৌকিক আনন্দময় রস রূপে পরিণতি লাভ করে, তাহা ব্যাখ্যার জন্যই অভিনবগুপ্তের পূর্বভাবী আচার্য ভট্টনায়ক কাব্যের ক্ষেত্রে 'ভাবনা' বা 'ভাবকত্ব'-রূপ একটি স্বতন্ত্র ব্যাপার স্বীকার করিয়াছিলেন, যাহার বলে কাব্য-বর্ণিত বস্তু, পুরুষ প্রভৃতি যাবতীয় পদার্থ এবং তাহাদের চিত্তবৃত্তি প্রভৃতি যাবতীয় অবস্থা সবই 'সাধারণীকৃত' (Universalised) হইয়া যায়। তখন আর তাহা সহৃদয় সামাজিকের নিকট 'সম্বন্ধ-বিশেষ-স্বীকার-পরিহার-নিয়মে'র দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হয় না। সেই সাধারণীকরণের স্বরূপ বর্ণনা করিতে গিয়াই বিশ্বনাথ তাঁহার 'সাহিত্যদর্পণে' বলিয়াছেন :

"ব্যাপারোঽস্তি বিভাবাদের্নাম্না সাধারণীকৃতিঃ।
তৎপ্রভাবেণ যস্যাসন্ পাথোধিপ্লবনাদয়ঃ॥
প্রমাতা তদভেদেন স্বাত্মানং প্রতিপদ্যতে॥
পরস্য ন পরস্যেতি মমেতি ন মমেতি চ।
তদাস্বাদে বিভাবাদেঃ পরিচ্ছেদো ন বিদ্যতে॥"— সাহিত্যদর্পণ, ৩. ১০-১২

এই সাধারণীকরণের ফলেই বাস্তব জগতের বিরস, দুঃখাবহ পদার্থরাজিও কাব্যে পরম নির্বৃতির কারণ হইয়া উঠে। 'সাহিত্যদর্পণ'-কার তাই বলিতেছেন :

"করুণাদাবপি রসে জায়তে যৎ পরং সুখম্।
সচেসামনুভবঃ প্রমাণং তত্র কেবলম্ ।।
কিং চ তেষু যদা দুঃখং ন কোঽপি স্যাৎ তদুন্মুখঃ।
তথা রামায়ণাদীনাং ভবিতা দুঃখহেতুতা ।।"-- ঐ· ৩· ৪-৬।

সাধারণীকরণের ফলেই 'তন্ময়ীভবন' (Identification), বিষয় ও বিষয়ীর তাদাত্ম্যবোধ সংঘটিত হয়।[৩৩] সেই অবস্থায় আর স্ব-পর-বোধ থাকে না, তাহা তখন সকল পরিচ্ছেদের অতীত, সর্ববিধ ব্যাবহারিক প্রয়োজন ও প্রবৃত্তির দ্বারা অসংস্পৃষ্ট। তাহার ফলেই সেই অলৌকিক, আনন্দময় রসানুভূতির আবির্ভাব। রবীন্দ্রনাথ কাব্যাস্বাদনের ক্ষেত্রে এই মানসিক অবস্থাকে 'সম্ভোগদৃষ্টি' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। 'সম্ভোগদৃষ্টি'-র সাহায্যেই নিকট বস্তুকে দূরে স্থাপন করিয়া দেখা সম্ভব হয়, যাহা কাব্যরসাস্বাদনের অপরিহার্য শর্ত।[৩৪] এই সম্ভোগ-দৃষ্টির স্বরূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ মহাভারতের খাণ্ডব-দাহের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়াছেন :

"মহাভারতের খাণ্ডববন-দাহ বাস্তবতার একান্ত নৈকট্য থেকে বহু দূরে গেছে— সেই দূরত্ববশত সে অকর্তৃক হয়ে উঠেছে। মন তাকে তেমনি ক'রেই সম্ভোগদৃষ্টিতে দেখতে পারে যেমন ক'রে সে দেখে পর্বতকে সরোবরকে। কিন্তু, যদি খবর পাই, অগ্নিগিরিস্রাবে শত শত লোকালয় শস্যক্ষেত্র পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে, দগ্ধ হচ্ছে শত শত মানুষ পশুপক্ষী, তবে সেটা আমাদের করুণা অধিকার ক'রে চিত্তকে পীড়িত করে। ঘটনা যখন বাস্তবের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে কল্পনার বৃহৎ পরিপ্রেক্ষিতে উত্তীর্ণ হয় তখনই আমাদের মনের কাছে তার সাহিত্য হয় বিশুদ্ধ ও বাধাহীন।"[৩৫]

রবীন্দ্রনাথ যে দূরত্বসাধনের কথা বলিয়াছেন, ইহা যেমন প্রাচীন আলংকারিকগণের সাধারণীকৃতির সহিত অভিন্ন, সেইরূপ আধুনিক পাশ্চাত্ত্য নন্দনতাত্ত্বিকগণের পরিভাষায় ইহাকেই বলা হয় 'Aesthetic distancing'।[৩৬] রবীন্দ্রনাথ শুধু কাব্যসৃষ্টির ক্ষণেই যে এই 'সম্ভোগদৃষ্টি'-র শরণ লইয়াছেন, তাহা নহে। তাঁহার সামগ্রিক জীবন-সাধনার মধ্যেও ইহার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা লক্ষণীয়। 'পথে ও পথের প্রান্তে'র একখানি চিঠিতে তিনি এই সম্বন্ধে বলিতেছেন :

"সংসারকে বেদনার অভিজ্ঞতাতেই আমাকে জানতে হবে, নইলে প্রকাশ করব কী। আমার তো বৈজ্ঞানিক-দার্শনিকের মতো জ্ঞানের ব্যাখ্যা নয়, আমার-যে প্রাণের প্রকাশ। কিন্তু এক দিকে এই অনুভূতিতেই যেমন প্রকাশের প্রবর্তনা তেমনি আর-এক দিকে তাকে ছাড়িয়ে দূরে আসাও রচনার পক্ষে দরকার। কেননা দূরে না এলে সমগ্রকে দেখা যায় না, সুতরাং দেখানো যায় না। সংসারের সঙ্গে অত্যন্ত এক হয়ে গেলেই অন্ধতা জন্মায়, যাকে দেখতে হবে সেই জিনিসটাই দেখাকে অবরুদ্ধ করে। তা ছাড়া ছোটো হয়ে ওঠে বড়ো এবং বড়ো হয়ে যায় লুপ্ত।..."[৩৭]

সেইজন্যই তিনি 'দ্রষ্টা' নিঃসঙ্গ কবি 'রবীন্দ্রনাথ'-কে 'ভোক্তা' ব্যক্তি 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' হইতে ব্যবধানে রাখিবার সাধনায় রত থাকিতেন :

"...এইজন্যেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে অন্তত এক পঙ্‌ক্তি দূরে সরে বসিয়ে রাখাই রবীন্দ্রনাথের পক্ষে অত্যন্ত দরকার, নইলে নিজের দ্বারা নিজেকে পদে পদে লাঞ্ছিত হতে হয়।... আমার নিজের মধ্যেই বড়ো আছে— যে দ্রষ্টা, আমার নিজের মধ্যে ছোটো হচ্ছে— যে ভোক্তা। ঐ দুটোকে এক করে ফেললে দৃষ্টির আনন্দ নষ্ট হয়, ভোগের আনন্দ দুষ্ট হয়।..."[৩৮]

দূর হইতে নিঃসঙ্গ দ্রষ্টার মতো বিশ্বকে দেখিতেন বলিয়া, তিনি বিধাতার এই বিচিত্র সৃষ্টিকে 'বিশ্বকাব্য' বলিয়া মনে করিতেন, সবই তাঁহার দৃষ্টিতে আনন্দময় রূপে প্রতিভাত হইত— 'রসময়মেব বিশ্বম্'।

"বিশ্বকাব্যকে নিরর্থক অপবাদ দিয়ে পুড়িয়ে নষ্ট করবার তপস্যায় প্রবৃত্ত না হয়ে বিশ্বকাব্য শোনাকে সার্থক করে তোলাই হচ্ছে যথার্থ মুক্তি।"[৩৯]

বিধাতা তাঁহার দৃষ্টিতে 'বিশ্বকবি'। প্রসঙ্গতঃ মনে পড়ে পরমশিবের উদ্দেশে কাশ্মীরক আচার্য উৎপলদেবের বন্দনা, যেখানে তাহাকে এই অপরূপ জগচ্চিত্রের শিল্পীরূপে আবাহন করা হইয়াছে—

"নিরুপাদানসম্ভারমভিত্তাবেব তন্বতে।
জগচ্চিত্রং নমস্তস্মৈ কলাশ্লাঘ্যায় শূলিনে ॥"[৪০]

৭

সাহিত্যে ব্যক্তি ও শ্রেণী : বিশেষ ও সামান্য

রবীন্দ্রনাথ, আমরা দেখিয়াছি, রসের সহিত প্রকাশের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ বারংবার উল্লেখ করিয়াছেন। রস তো স্বয়ং স্বপ্রকাশ বটেই, কিন্তু ইহার সম্পর্কে বাহ্য বা আভ্যন্তর যে-কোনো বিষয়ই আসুক-না কেন, তাহাদেরও সেই চৈতন্যের প্রকাশের দ্বারা প্রকাশিত হইতে হইবে, তবেই সাহিত্যে তাহাদের স্থান সার্থক। বর্ণনীয় পদার্থ একটি বিশেষ শ্রেণীর যেমন হইতে পারে, সেইরূপ তাহার একটি প্রাতিস্বিক সত্তা— Individuality, Particularity আছে, যাহার ফলে উহা বিশ্বের অন্য সকল পদার্থ হইতে স্বতন্ত্র। বিশ্বের স্থাবর অস্থাবর, জড় ও চেতন, জীব অ-জীব, যাবতীয় পদার্থের ব্যক্তিরূপতা, তাহাদের বিশিষ্ট স্বরূপের চিত্রণই কবির সৃষ্টির লক্ষ্য, শ্রেণীগত মানুষ বা বস্তুর বর্ণনায় উহাদের নির্বিশেষ সামান্য (Generic, Universal) রূপ চিত্রণে উহাদের স্বরূপ সম্যক্‌ভাবে প্রকাশিত হয় না, তখন উহারা কাব্যের উপাদান হইয়া রস-পরিণতিতে সাহায্য করিতে পারে না। "সাহিত্য-বিচার" শীর্ষক প্রবন্ধের সূচনাতেই রবীন্দ্রনাথ সেইজন্য বলিয়াছেন :

"সাহিত্যের বিষয়টি ব্যক্তিগত: শ্রেণীগত নয়। এখানে 'ব্যক্তি' শব্দটাতে তার ধাতুমূলক অর্থের উপরেই জোর দিতে চাই: স্বকীয় বিশেষত্বের মধ্যে যা ব্যক্ত হয়ে উঠছে, তাই ব্যক্তি। সেই ব্যক্তি স্বতন্ত্র। বিশ্বজগতে তার সম্পূর্ণ অনুরূপ আর দ্বিতীয় নেই।

"ব্যক্তিরূপের এই ব্যক্ততা সকলের সমান নয়, কেউ-বা সুস্পষ্ট, কেউ-বা অস্পষ্ট। অন্তত, যে মানুষ উপলব্ধি করে তার পক্ষে। সাহিত্যের ব্যক্তি কেবল মানুষ নয়; বিশ্বের যে-কোনো পদার্থই সাহিত্যে সুস্পষ্ট তাই ব্যক্তি; জীবজন্তু, গাছপালা, নদী, পর্বত, সমুদ্র, ভালো জিনিস, মন্দ জিনিস, বস্তুর জিনিস, ভাবের জিনিস, সমস্তই ব্যক্তি— নিজের ঐকান্তিকতায় সে যদি ব্যক্ত না হল তা হলে সাহিত্যে সে লজ্জিত।

"যে গুণে এরা সাহিত্যে সেই পরিমাণে ব্যক্ত হয়ে ওঠে, যাতে আমাদের চিত্ত তাকে স্বীকার করতে বাধ্য হয়, সেই গুণটি দুর্লভ— সেই গুণটিই সাহিত্যরচয়িতার। তা রজোগুণও নয়, তমোগুণও নয়, তা কল্পনাশক্তির ও রচনাশক্তির গুণ।"[৪১]

রবীন্দ্রনাথ আমাদের সাবেকি সাধু-সাহিত্যে (Classical Literature) ব্যক্তির তুলনায় শ্রেণীর প্রাধান্য লক্ষ্য করিয়াছেন। ইহার ফলে সেখানে চেতন ও জড়, বাহ্য ও আভ্যন্তর, মূর্ত ও বিমূর্ত সর্ববিধ বিষয়ের স্বতন্ত্র পরিচ্ছিন্ন ব্যক্তিরূপ প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিতে পারে নাই। নিম্নোদ্‌ধৃত অনুচ্ছেদটিতে রবীন্দ্রনাথ ইহার যে বিবরণ দিয়াছেন এবং কার্যকারণভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য :

"আমরা জাতের চাপ, শ্রেণীর চাপ, দীর্ঘকাল ধরে পিঠের উপর সহ্য করেছি; ব্যক্তিগত মানুষ পঙ্‌ক্তিপূজক সমাজের তাড়নায় আমাদের দেশে চিরদিন সংকুচিত। বাঁধা রীতির বন্ধন আমাদের দেশে সর্বত্রই। এই কারণেই যে সাধু-সাহিত্য আমাদের দেশে একদা প্রচলিত ছিল তাতে ব্যক্তির বর্ণনা ছিল শিষ্টসাহিত্যপ্রথাসম্মত, শ্রেণীগত। তখন ছিল কুমুদকহ্লার-শোভিত সরোবর; যূথীজাতিমল্লিকামালতীবিকশিত বসন্ত ঋতু; তখনকার সকল সুন্দরীরই গমন গজেন্দ্রগমন, তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিম্ব দাড়িম্ব সুমেরুর বাঁধা ছাঁদে। শ্রেণীর কুহেলিকার মধ্যে ব্যক্তি অদৃশ্য। সেই ঝাপসা দৃষ্টির মনোবৃত্তি আমাদের চলে গেছে তা বলতে পারি নে। এই ঝাপসা দৃষ্টিই সাহিত্য-রচনায় ও অনুভূতিতে সকলের চেয়ে বড়ো শত্রু। কেননা সাহিত্যে রসরূপের সৃষ্টি। সৃষ্টি মাত্রের আসল কথাই হচ্ছে প্রকাশ।

"সেইজন্যেই দেখি, আমাদের দেশের সাহিত্যবিচারে ব্যক্তির পরিচয় বাদ দিয়ে শ্রেণীর পরিচয়ের দিকেই ঝোঁক দেওয়া হয়।"[৪২]

রবীন্দ্রনাথের এই বিশ্লেষণের মধ্যে সাহিত্যবিচারের একটি শাশ্বত সত্য ধরা পড়িয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার মন্তব্যের শেষ পঙ্‌ক্তিটি লইয়া বিতর্কের অবকাশ আছে। যে সত্যটি রবীন্দ্রনাথের অভ্রান্ত উপলব্ধিতে প্রতিভাত হইয়াছিল, খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর প্রখ্যাত সাহিত্য-মীমাংসক ধ্বনিবিরোধী আচার্য মহিমভট্টের 'ব্যক্তিবিবেক' গ্রন্থে তাহাই অপূর্ব দার্শনিক প্রজ্ঞার সাহায্যে বিবৃত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। সেখানে তিনি কবির 'প্রতিভা'-কে মহাদেবের 'তৃতীয় চক্ষু'-র সহিত তুলনা করিয়াছেন, যাহার সাহায্যে বস্তুর স্বলক্ষণবিশিষ্ট রূপটি ধরা পড়ে, যে-রূপ প্রাকৃতজনের দৃষ্টিতে লৌকিক প্রমাণের ভিতর দিয়া পরিস্ফুটভাবে প্রকাশিত হইতে পারে না। তাহারা কেবল বস্তুর 'সামান্য' রূপটিই উপলব্ধি করিতে সমর্থ। 'তত্ত্বোক্তি-কোশ' নামক পৃথক্ এক দার্শনিক নিবন্ধে তিনি ইহার বিস্তৃত আলোচনাও করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, যে গ্রন্থখানি বর্তমানে অপ্রাপ্য বা লুপ্ত। কারিকাগুলি এই দার্শনিক তথা সাহিত্যিক মূল তত্ত্বটির সংহত বিশ্লেষণের জন্য আমাদের স্মরণীয় :

> "[উচ্যতে] বস্তুনস্তাবদ্ দ্বৈরূপ্যমিহ বিদ্যতে।
> তত্রৈকমত্র সামান্যং যদ্ বিকল্পৈকগোচরঃ ॥
> স এব সর্বশব্দানাং বিষয়ঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
> বিশিষ্টমস্য যদ্ রূপং তৎ প্রত্যক্ষস্য গোচরঃ ॥
> স এব সৎকবিগিরাং গোচরঃ প্রতিভাভুবাম্ ॥
> সা হি চক্ষুর্ভগবতস্তৃতীয়মিতি গীয়তে।
> যেন সাক্ষাৎকরোত্যেষ ভাবাংস্ত্রৈকাল্যবর্ত্তিনঃ ॥
> ইত্যাদি প্রতিভাতত্ত্বমস্মাভিরুপপাদিতম্।
> শাস্ত্রে তত্ত্বোক্তিকোশাখ্য ইতি নেহ প্রপঞ্চিতম্ ॥"

সুতরাং মহাকবির প্রাতিভদৃষ্টি, যাহা সত্ত্বগুণের উদ্রেকেরই পরিণাম, তাহাই কাব্যে রূপসৃষ্টির, বস্তুর বিশিষ্ট ব্যক্তিরূপ প্রকাশের মূলে ; আবার সেই প্রতিভাই রসসৃষ্টিরও নিদান— কেননা কবিপ্রতিভা শুধুই চক্ষুরিন্দ্রিয় নহে, তাহা রসনেন্দ্রিয়ও বটে। যাহার সাহায্যে একই সঙ্গে কবি যেমন বিশ্বের যাবতীয় পদার্থের ব্যক্তিরূপ উদ্ভাসিত করেন, আবার ব্যাবহারিক প্রপঞ্চের নীরসতার অন্তরালে তাহার রসময় আনন্দরূপতাও আস্বাদন করিতে সমর্থ হন। সেইজন্যই আচার্য আনন্দবর্ধন কবিপ্রতিভাকে 'যা ব্যাপারবতী রসান্ রসয়িতুং কাচিৎ কবীনাং নবা দৃষ্টিঃ' বলিয়াছেন, আচার্য 'রাজশেখর' তাহাকে "জৈহ্বং চক্ষুর্নির্নিমেষং কবীনাম্' বলিয়াছেন। রূপের সঙ্গে রসের এই সমন্বয় সাধনই সাহিত্যের লক্ষ্য, কবির মুখ্য কর্তব্য। তাই রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন :

> "কলাসৃষ্টিতে রসসত্যকে প্রকাশ করার সমস্যা হচ্ছে— রূপের দ্বারাই অরূপকে প্রকাশ করা, অরূপের দ্বারা রূপকে আচ্ছন্ন করে দেখা, পূর্ণের দ্বারা সমস্ত চঞ্চলকে আবৃত করে দেখা···সৃষ্টির তত্ত্বই এই, জগৎ সৃষ্টিই বল, আর কলাসৃষ্টিই বল। রূপকে মানতেও হবে, নাও মানতে হবে, তাকে ধরতেও হবে, তাকে ঢাকতেও হবে। রূপের প্রতি লোভ যেন না থাকে।"[৪৩]

—তখন প্রাচীন সাহিত্য-মীমাংসা শাস্ত্রেরই আধুনিক এক মহাকবির অপরূপ ভাষ্য যেন আমরা শুনিতে পাই।

৮

কাব্য ও ইতিহাস

রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যতত্ত্বের আলোচনা প্রসঙ্গে কাব্যের সহিত ইতিহাসের সম্পর্ক লইয়াও নানাভাবে সমীক্ষা করিয়াছেন। কবি যেহেতু স্রষ্টা, তাই তিনি নিজের স্বাতন্ত্র্যবশত বিশ্বকে যথেচ্ছভাবে পরিবর্তিত করিতে পারেন, করিয়া থাকেনও। আচার্য আনন্দবর্ধন কবিকে প্রজাপতির সহিত তুলনা করিয়া বলিয়াছেন :

"অপারে কাব্যসংসারে কবিরেকঃ প্রজাপতিঃ।
যথাস্মৈ রোচতে বিশ্বং তথৈব পরিবর্ত্ততে ॥"

সুতরাং ইতিবৃত্তকে অবলম্বন করিয়া কবি যখন উপন্যাস, নাটক বা কবিতা রচনা করিবেন, তাহাকে পরিবর্তন করিবার স্বাতন্ত্র্যও কবির থাকিতে পারে। কিন্তু কতদূর পর্যন্ত ? এই প্রশ্নটি রবীন্দ্রনাথের চিত্তকে গভীরভাবে আলোড়িত করিয়াছিল। "ঐতিহাসিক উপন্যাস" শীর্ষক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বিষয়টি লইয়া যে চিন্তা করিয়াছেন, তাহার সহিত আনন্দবর্ধন, অভিনবগুপ্ত প্রমুখ প্রখ্যাত সাহিত্য-মীমাংসকগণের সিদ্ধান্তের সাজাত্য লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত হইতে হয়। ঐতিহাসিক কাব্যেও, তাহা যে শ্রেণীরই হউক-না কেন, কবির একমাত্র উদ্দেশ্য রসসৃষ্টি। সেই রসের মধ্যে হয়তো একটু বিশেষ ধরনের স্বাদ থাকিতে পারে— তাহাকে 'ইতিহাসের রস' বলিয়া রবীন্দ্রনাথ নির্দেশ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ সে সম্বন্ধে বলিয়াছেন :

> "ইতিহাসের সংস্রব উপন্যাসে একটা বিশেষ রস সঞ্চার করে, ইতিহাসের সেই রসটুকুর প্রতি ঔপন্যাসিকের লোভ, তাহার সত্যের প্রতি তাঁহার কোনো খাতির নাই। কেহ যদি উপন্যাসে কেবল ইতিহাসের সেই বিশেষ গন্ধটুকু এবং স্বাদটুকুতে সন্তুষ্ট না হইয়া তাহা হইতে অখণ্ড ইতিহাস-উদ্ধারে প্রবৃত্ত হন তবে তিনি ব্যঞ্জনের মধ্যে আস্ত জিরে-ধনে-হলুদ-সর্ষে সন্ধান করেন। মসলা আস্ত রাখিয়া যিনি ব্যঞ্জনে স্বাদ দিতে পারেন তিনি দিন, যিনি বাঁটিয়া ঘাঁটিয়া একাকার করিয়া থাকেন তাঁহার সঙ্গেও আমার কোনো বিবাদ নাই ; কারণ, স্বাদই এ স্থলে লক্ষ্য, মসলা উপলক্ষমাত্র।
>
> "অর্থাৎ লেখক ইতিহাসকে অখণ্ড রাখিয়াই চলুন আর খণ্ড করিয়াই রাখুন, সেই ঐতিহাসিক রসের অবতারণায় সফল হইলেই হইল।"[৪৪]

এ-যেন আচার্য আনন্দবর্ধনের ধ্বনিকারিকারই অবিকল ভাবানুবাদ মাত্র :

"ইতিবৃত্তবশায়াতাং ত্যক্ত্বাঽননুগুণাং স্থিতিম্।
উৎপ্রেক্ষ্যোঽপ্যন্তরাভীষ্টরসোচিতকথোন্নয়ঃ ॥"

অর্থাৎ ইতিবৃত্ত হইতে যে-সকল উপাদান রসের অননুগুণ, সেগুলি যথাসম্ভব বর্জন করিয়া কবি রসানুগুণ কথা, বৃত্তান্ত বা চরিত্রাদির উদ্ভাবন করিতে পারেন। কেননা— "ন হি কবেরিতিবৃত্তমাত্রনির্বহণেন কিঞ্চিৎ প্রয়োজনম্, ইতিহাসাদেব তৎসিদ্ধেঃ।"

তবে এই স্বাতন্ত্র্যেরও একটি সীমা আছে। রবীন্দ্রনাথ সে বিষয়েও যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :

> "তাই বলিয়া কি রামচন্দ্রকে পামর এবং রাবণকে সাধুরূপে চিত্রিত করিলে অপরাধ নাই ? অপরাধ আছে। কিন্তু তাহা ইতিহাসের বিরুদ্ধে অপরাধ নহে, কাব্যেরই বিরুদ্ধে অপরাধ। সর্বজনবিদিত সত্যকে একেবারে উল্টা করিয়া দাঁড় করাইলে রসভঙ্গ হয়, হঠাৎ পাঠকদের যেন একেবারে মাথায় বাড়ি পড়ে। সেই একটা দমকাতেই কাব্য একেবারে কাত হইয়া ডুবিয়া যায়।
>
> "এমন-কি যদি কোনো ঐতিহাসিক মিথ্যাও সর্বসাধারণের বিশ্বাস আকর্ষণ করিয়া বরাবর চলিয়া আসে, ইতিহাস এবং সত্যের পক্ষ লইয়া কাব্য তাহার বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ করিলে দোষের হইতে পারে। মনে করো আজ যদি নিঃসংশয়ে প্রমাণ হয় যে, সুরাসক্ত অনাচারী যদুবংশ গ্রীকজাতীয় এবং শ্রীকৃষ্ণ স্বাধীন বনবিহারী বংশীবাদক গ্রীসীয়

রাখাল, যদি জানা যায় যে তাঁহার বর্ণ জ্যেষ্ঠ বলদেবের বর্ণের ন্যায় শুভ্র ছিল, যদি স্থির হয় নির্বাসিত অর্জুন এশিয়া-মাইনরের কোনো গ্রীক রাজ্য হইতে য়ুনানী রাজকন্যা সুভদ্রাকে হরণ করিয়া আনিয়াছিলেন এবং দ্বারকা সমুদ্রতীরবর্তী কোনো গ্রীক উপদ্বীপ, যদি প্রমাণ হয় নির্বাসনকালে পাণ্ডবগণ বিশেষ রণবিজ্ঞানবেত্তা প্রতিভাশালী গ্রীসীয় বীর কৃষ্ণের সহায়তা লাভ করিয়া স্বরাজ্য উদ্ধার করিয়াছিলেন, তাঁহার অপূর্ব বিজাতীয় রাজনীতি যুদ্ধনৈপুণ্য এবং কর্মপ্রধান ধর্মতত্ত্ব বিস্মিত ভারতবর্ষে তাঁহাকে অবতাররূপে দাঁড় করাইয়াছে— তথাপি বেদব্যাসের মহাভারত বিলুপ্ত হইবে না এবং কোনো নবীন কবি সাহসপূর্বক কালাকে গোরা করিতে পারিবেন না।"[৪৫]

আনন্দবর্ধন 'ধ্বন্যালোকে' রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি প্রসিদ্ধ মহাকাব্যের উপাখ্যান লইয়া যখন কবিগণ কাব্যরচনায় প্রবৃত্ত হইবেন, তখন তাঁহাদিগকে 'রসবিরোধিনী স্বেচ্ছা' পরিহার করিবার যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহার সহিত রবীন্দ্রনাথের উদ্‌ধৃত বক্তব্যের কী ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গতা! যেন একটি অপরটিরই তাৎপর্য-বিশ্লেষণ বলিয়া মনে হয়। ধ্বনিকার বলিতেছেন :

"সন্তি সিদ্ধরসপ্রখ্যা যে চ রামায়ণাদয়ঃ।
কথাশ্রয়া ন তৈর্যোজ্যা স্বেচ্ছা রসবিরোধিনী ॥"

এইস্থলে 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র সমালোচনা প্রসঙ্গে কিশোর রবীন্দ্রনাথ যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার কিছু অংশ প্রাসঙ্গিকবোধ উদ্ধার করিতে পারা যায় :

"আর-একটা কথা বক্তব্য আছে— মহৎ চরিত্র যদি বা নূতন সৃষ্টি করিতে না পারিলেন, তবে কবি কোন্ মহৎ কল্পনার বশবর্তী হইয়া অন্যের সৃষ্ট মহৎ চরিত্র বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন? কবি বলেন : I despise Ram and his rabble। সেটা বড়ো যশের কথা নহে— তাহা হইতে এই প্রমাণ হয় যে, তিনি মহাকাব্য-রচনার যোগ্য কবি নহেন। মহত্ত্ব দেখিয়া তাঁহার কল্পনা উত্তেজিত হয় না। নহিলে তিনি কোন্ প্রাণে রামকে স্ত্রীলোকের অপেক্ষা ভীরু ও লক্ষ্মণকে চোরের অপেক্ষা হীন করিতে পারিলেন। দেবতাদিগকে কাপুরুষের অধম ও রাক্ষসদিগকেই দেবতা হইতে উচ্চ করিলেন। এমনতর প্রকৃতিবহির্ভূত আচরণ অবলম্বন করিয়া কোনো কাব্য কি অধিক দিন বাঁচিতে পারে? ধূমকেতু কি ধ্রুব-জ্যোতি সূর্যের ন্যায় চিরদিন পৃথিবীতে কিরণ দান করিতে পারে? সে দুই দিনের জন্য তাহার বাষ্পময় লঘু পুচ্ছ লইয়া, পৃথিবীর পৃষ্ঠে উল্কা বর্ষণ করিয়া, বিশ্বজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আবার কোন্ অন্ধকারের রাজ্যে গিয়া প্রবেশ করে।"[৪৬]

এই সমালোচনার মধ্যে অল্পবয়সের উচ্ছ্বাস থাকিলেও একটি গভীর কাব্যসত্য যে উহার ভিতর দিয়া উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা কিভাবে অস্বীকার করিতে পারা যায়?

প্রসঙ্গত সাহিত্যে অনুকরণ (Imitation) ও বাস্তবতা (Realism), সাহিত্যে অশ্লীলতা, সাহিত্যিক, ক্ল্যাসিক ও রোমান্টিক, তস্করতা (Plagiarism) গীতিকাব্য ও মহাকাব্য, বিশ্বসাহিত্য— যাহা রবীন্দ্রনাথ Comparative Literature-এর প্রতিশব্দরূপে ব্যবহার করিয়াছেন— এইরূপ নানা সমস্যা লইয়াও রবীন্দ্রনাথ পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করিয়াছেন। এবং বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, ঐ সকল বিষয়ে আলংকারিকগণের সমীক্ষার সহিত রবীন্দ্রনাথের বিশ্লেষণের কী গভীর বিস্ময়কর সংবাদ! বর্তমান নিবন্ধের মধ্যে তদ্‌বিষয়ে তুলনামূলক আলোচনার স্থান নাই।

৯

উপসংহার

আমরা দেখিলাম রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যবিচারের সহিত প্রাচীন আলংকারিক আচার্যগণের দৃষ্টিকোণের প্রায়শই কোনো বিরোধ নাই। প্রাচীন আচার্যগণ— বিশেষতঃ ধ্বনি ও রসপ্রস্থানের যাঁহারা অনুবর্তী, তাঁহারা যেমন রসকেই সাহিত্যের সৃষ্টি ও আস্বাদনের মৌলিক তত্ত্ব রূপে নির্দেশ করিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথও সেই একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। সাহিত্যের

উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য, সাহিত্যের সহিত অলংকারের সম্পর্ক, ট্র্যাজেডি-তে করুণ রসে আনন্দানুভূতি, সাহিত্যে ব্যক্তি ও শ্রেণীচিত্রণ, সাহিত্য ও ইতিহাসের সম্পর্ক নিরূপণ প্রভৃতি যে কয়েকটি বিষয় লইয়া আমরা এখানে আলোচনা করিলাম, সে সকলের মধ্যে একটি মূলভাব পরিস্ফুট যে রসই কবিকর্মের কেন্দ্র বা তত্ত্ব, রসের দিকে লক্ষ্য নিবদ্ধ রাখিয়াই সুকবিগণ কাব্যনির্মাণ করিয়া থাকেন, কাব্যের আর সকল উপাদানই আনুষঙ্গিক। ভারতীয় চিন্তাধারার সহিত রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গির এই অভিন্নতা বিশেষভাবে অনুধাবনের যোগ্য। কাব্যনির্মাণে কবি যেমন রসসমাহিতচিত্ত হইয়া থাকেন, কাব্যের আস্বাদনে ভাবুক সহৃদয়ও সেইরূপ রসাস্বাদনেই নিমগ্ন থাকেন। কবির প্রতিভা যেমন রসাস্বাদনপ্রবণ, সহৃদয়ের প্রতিভাও তদ্রূপ— উভয়েই প্রতিভাবান্। পার্থক্য শুধু কবির নির্মাণক্ষমতায়— যাহাতে সহৃদয়ের প্রায়শই অধিকার থাকে না। এইজন্যই অলংকারশাস্ত্রে উভয়বিধ প্রতিভা স্বীকৃত হইয়া থাকে— কবির 'কারয়িত্রী' এবং সহৃদয়ের 'ভাবয়িত্রী'। এই রসবোধ কবির ক্ষেত্রেও যেমন দুর্লভ সহৃদয়ের ক্ষেত্রেও তদ্রূপ। ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রে এই রসাস্বাদনক্ষমতা প্রাক্তন পুণ্যের পরিচায়করূপে কথিত হইয়াছে—

"পুণ্যবন্তঃ প্রমিন্বন্তি যোগিবদ্ রসসন্ততিম্।"

রবীন্দ্রনাথ 'ছিন্নপত্রাবলী'র এক জায়গায় বলিয়াছেন :

> "মুশকিল এই-যে, রস যে বোঝে না তাকে বোঝানো যায় না : কারণ, রসবোধ ইন্দ্রিয়বোধের মতো প্রত্যক্ষবোধ।... সমঝদার লোকের লক্ষণ এই যে, তার বোধশক্তি যেমন সূক্ষ্ম সমবেদনাশক্তি তেমনি ব্যাপক, এবং সাহিত্য-অভিজ্ঞতাও খুব বিস্তৃত।... বরঞ্চ লেখক অনেক ভালো পাওয়া যায়, কিন্তু প্রকৃত সমঝদার দুর্লভ।"[৪৭]

"সাহিত্যের বিচারক" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথও সাহিত্য 'রচনার প্রতিভা' এবং 'বিচারের প্রতিভা'— এই দুই জাতীয় প্রতিভার উল্লেখ প্রসঙ্গে বলিতেছেন :

> "যেমন সাহিত্যের স্বাধীন রচনায় এক-একজনের প্রতিভা সর্বকালের প্রতিনিধিত্ব গ্রহণ করে, সর্বকালের আসন অধিকার করে, তেমনি বিচারের প্রতিভাও আছে ; এক-একজনের পরখ করিবার শক্তিও স্বভাবতই অসামান্য হইয়া থাকে। যাহা ক্ষণিক, যাহা সংকীর্ণ, তাহা তাঁহাদিগকে ফাঁকি দিতে পারে না ; যাহা ধ্রুব, যাহা চিরন্তন, এক মুহূর্তেই তাহা তাঁহারা চিনিতে পারেন। সাহিত্যের নিত্যবস্তুর সহিত পরিচয় লাভ করিয়া নিত্যত্বের লক্ষণগুলি তাঁহারা জ্ঞাতসারে এবং অলক্ষ্যে অন্তঃকরণের সহিত মিলাইয়া লইয়াছেন ; স্বভাবে এবং শিক্ষায় তাঁহারা সর্বকালীন বিচারকের পদ গ্রহণ করিবার যোগ্য।"
>
> "...সারস্বতদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া লইবার ভার যাঁহাদের উপরে আছে তাঁহারাও নিজে সরস্বতীর সন্তান ; তাঁহারা ঘরের লোক, ঘরের লোকের মর্যাদা বোঝেন।"[৪৮]

প্রসঙ্গত একটি বিষয়ে কিছু আলোচনার অবকাশ আছে। তাহা হইতেছে এই যে, যদি রসই কাব্যের পরম লক্ষ্য হয়, তবে জ্ঞান ও মননের স্থান তাহাতে কিরূপ হইবে ? শুধুই রসসর্বস্ব রচনা কি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে কাব্যের উচ্চপর্যায়ে স্থান পাইবার যোগ্য ? রবীন্দ্রনাথ নিজেও এই বিষয়টি লইয়া যথেষ্ট চিন্তা করিয়াছিলেন। 'শান্তিনিকেতনে'-র অন্তর্গত "বিকারশঙ্কা" শীর্ষক ভাষণ হইতে উদ্‌ধৃত রবীন্দ্রনাথের একটি মন্তব্য এবিষয়ে আলোকসম্পাত করিতে পারে। তিনি সেখানে প্রাসঙ্গিকভাবে কাব্যে রস সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন :

> "কাব্যের থেকে আমরা ভাবের রস গ্রহণ করে পরিতৃপ্ত হই। কিন্তু সেই রসের সম্পূর্ণতা নির্ভর করে কিসের উপরে ? তার তিনটি আশ্রয় আছে। একটি হচ্ছে কাব্যের কলেবর— ছন্দ এবং ভাষা ; তা ছাড়া ভাবকে, যেটির পরে যেটিকে যেরূপে সাজালে তার প্রকাশটি সুন্দর হয় সেই বিন্যাসনৈপুণ্য ! এই কলেবর রচনার কাজ যেমন-তেমন করে চলে না— কঠিন নিয়ম রক্ষা করে চলতে হয় ; তার একটু ব্যাঘাত হলেই যতি-পতন ঘটে, কানকে পীড়িত করে, ভাবের প্রকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়। অতএব এই ছন্দ ভাষা ও ভাববিন্যাসে কবিকে নিয়মের বন্ধন স্বীকার করতেই হয়, এতে যথেচ্ছাচার খাটে না। তার পরে আর-একটা বড়ো আশ্রয় আছে সেটা হচ্ছে জ্ঞানের

আশ্রয়। সমস্ত শ্রেষ্ঠ কাব্যের ভিতরে এমন একটা-কিছু থাকে যাতে আমাদের জ্ঞান তৃপ্ত হয়, যাতে আমাদের মননবৃত্তিকে উদ্বোধিত করে তোলে, কবি যদি অত্যন্তই খামখেয়ালি এমন একটা বিষয় নিয়ে কাব্য রচনা করেন যাতে আমাদের জ্ঞানের কোনো খাদ্য না থাকে অথবা যাতে সত্যের বিকৃতিবশত মননশক্তিকে পীড়িত করে তোলে তবে সে কাব্যে রসের প্রকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়— সে কাব্য স্থায়িভাবে ও গভীরভাবে আমাদের আনন্দ দিতে পারে না। তার তৃতীয় আশ্রয় এবং শেষ আশ্রয় হচ্ছে ভাবের আশ্রয়— এই ভাবের সংস্পর্শে আমাদের হৃদয় আনন্দিত হয়ে ওঠে। অতএব শ্রেষ্ঠ কাব্যে প্রথমে আমাদের কানের এবং কলাবোধের তৃপ্তি, তার পরে আমাদের বুদ্ধির তৃপ্তি ও তার পরে হৃদয়ের তৃপ্তি ঘটলে তবেই আমাদের সমগ্র প্রকৃতির তৃপ্তির সঙ্গে সঙ্গে কাব্যের যে রস তাই আমাদের স্থায়িরূপে প্রগাঢ়রূপে অন্তরকে অধিকার করে। নইলে, হয় রসের ক্ষীণতা ক্ষণিকতা নয় রসের বিকার ঘটে।"[৪৯]

আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রকারগণও যদিও রসকেই প্রাধান্য দিয়াছিলেন বটে, তথাপি তাঁহারা ব্যুৎপত্তি বা বহুজ্ঞতা যাহার দ্বারা মনন সমৃদ্ধ হয়, তাহার গুরুত্বও উপেক্ষা করেন নাই। আচার্য ভামহ তাঁহার 'কাব্যালংকারে'-র একটি প্রসিদ্ধ শ্লোকে (৫·৪) বলিয়াছেন :

> "ন স শব্দো ন তদ্ বাচ্যং ন স ন্যায়ো ন সা কলা।
> জায়তে যন্ন কাব্যাঙ্গমহো ভারো মহান্ কবেঃ ॥"

সেইরূপ কাব্যের কলারচনার উৎকর্ষ সাধনের জন্যই তাঁহারা কাব্যের 'ক্রিয়াবিধি'রূপ অলংকারশাস্ত্রের প্রবর্তন করিয়াছিলেন। আচার্য দণ্ডীর উক্তি এ-বিষয়ে স্মরণীয় :

> "অতঃ প্রজানাং ব্যুৎপত্তিমভিসন্ধায় সূরয়ঃ।
> বাচাং বিচিত্রমার্গাণাং নিববন্ধুঃ ক্রিয়াবিধিম্ ॥'

কাব্যদেহ, যাহা শব্দ ও অর্থের সমবায়ে গঠিত, তাহা যাহাতে নির্দোষ, রমণীয়, ঔচিত্যমণ্ডিত এবং রসাভিব্যক্তির সাধন হইতে পারে, তাহার জন্যই অলংকারশাস্ত্রের বিচিত্র প্রস্থানের উৎপত্তি ও বিকাশ। কাব্যকে অবশ্যই 'ললিতোচিত-সন্নিবেশ-চারু' হইতে হইবে। সুতরাং কবিকে নিয়মের বন্ধন স্বীকার করিয়াই তাহা হইতে মুক্তি লাভ করিতে হইবে। যে-সকল কবিযশঃপ্রার্থী ছন্দের বন্ধন, শব্দের সাধুত্ব বা সৌশব্দ্য, অর্থের পরিচ্ছিন্নতা প্রভৃতি কলাবিধি লঙ্ঘন করাকেই কৃতিত্ব বলিয়া মনে করিয়া থাকেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদের সেই দম্ভ বা 'আহোপুরুষিকা'-কে ধিক্কার দিয়াছেন। তাঁহার দৃষ্টিতে উহা 'সাহিত্যিক কাপুরুষতা' ভিন্ন আর কিছুই নহে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার "সাহিত্যে নবত্ব" শীর্ষক আলোচনায় তাই তরুণ সাহিত্যিককুলের নিয়মের বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহপ্রবণতাকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন :

> "কোনো-কিছুকে কেয়ার করি নে বলেই যে সাহস, তার চেয়ে বড়ো জিনিস হচ্ছে একটা-কিছুকে কেয়ার করি ব'লেই যে সাহস।··· যাঁরা তুরীয় অবস্থায় উঠেছেন তাঁদের কাছে সাহিত্যও নেই, আর্টও নেই।··· ভাষাকে মানি নে যদি বলতে পারি তা হলে কবিতা লেখা সহজ হয়, দৈহিক সহজ উত্তেজনাকে কাব্যের মুখ্য বিষয় করতে যদি না বাধে তা হলে সামান্য খরচাতেই উপস্থিতমতো কাজ চালানো যায়, কিন্তু এইটেই সাহিত্যিক কাপুরুষতা।"[৫০]

রবীন্দ্রনাথের মতে অসংযম এবং সৌন্দর্যবোধ পরস্পর বিরোধী, শুধু কাব্যেই নহে, সর্বত্র।

আমরা জানি রবীন্দ্রনাথ মূলত কবি, তিনি স্পষ্টভাবেই উহা বারবার আমাদের স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন।[৫১] সুতরাং যখন তিনি তত্ত্বালোচনাও করিতে বসেন, তাহা সাহিত্যতত্ত্বই হউক বা ধর্মতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, দর্শন, রাজনীতি, ইতিহাস বা শব্দতত্ত্ব— যে-কোনো বিষয়ই হউক, তখনও তাঁহার ভাষা কাব্যসৌন্দর্যে ভাস্বর হইয়া উঠে, অলংকারের বিচিত্র সমাবেশে ঝংকৃত হইয়া উঠে। কবি স্বয়ং এ-বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। তাই দেখিতে পাই "সাহিত্যবিচার" প্রবন্ধে তিনি সাহিত্য সমালোচনায় তাঁহার নিজের অযোগ্যতার কথা দ্বিধাহীনভাবে ঘোষণা করিয়াছেন এবং প্রমথ চৌধুরী মহাশয়কে সাহিত্যবিচারকের আসনের যোগ্যতম অধিকারিরূপে চিহ্নিত করিয়াছেন :

"আমার নিজের কথা যদি বল, সত্য-আলোচনাসভায় আমার উক্তি অলংকারের ঝংকারে মুখরিত হয়ে ওঠে। এ কথাটা অত্যন্ত বেশি জানা হয়ে গেছে, সেজন্য আমি লজ্জিত এবং নিরুত্তর। অতএব, সমালোচনার আসরে আমার আসন থাকতেই পারে না। কিন্তু রসের অসংযম প্রমথ চৌধুরীর লেখায় একেবারেই নেই। এ-সকল গুণেই মনে মনে তাঁকে জজের পদে বসিয়েছিলুম।..."[৫২]

তিনি জানিতেন 'সাহিত্য' এবং 'সাহিত্যসমালোচনা' এক কথা নহে।

"আমরা বিচারকের শ্রেষ্ঠতা নিরূপণ করি নিজের মতের শ্রেষ্ঠতার অভিমানে। মোটের উপর নিরাপদ হচ্ছে ভান না করা, সাহিত্যের সমালোচনাকেই সাহিত্য করে তোলা। সেরকম সাহিত্য মতের একান্ত সত্যতা নিয়ে চরম মূল্য পায় না। তার মূল্য তার সাহিত্যরসেই।"[৫৩]

রবীন্দ্রনাথ আচার্য শংকরের দার্শনিক আলোচনার ভাষা এবং রূপসৃষ্টির ভাষা— এই দ্বিবিধ ভাষা ব্যবহারের পার্থক্য অতি সুন্দরভাবে তাঁহার 'ছন্দ' আলোচনায় ব্যক্ত করিয়াছেন :

"জ্ঞানের বিষয়কে প্রাঞ্জল ও যথার্থ করে ব্যক্ত করতে হলেও প্রকাশের উপাদানকে আঁট ক'রে তাকে ঠিকমত শ্রেণীবদ্ধ করা চাই। সে তাকে প্রাণের বেগ দেবার জন্যে নয়, তাকে প্রকৃষ্ট অর্থ দেবার জন্যেই। শংকরের বেদান্তভাষ্য তার একটি নিদর্শন। তার প্রত্যেক শব্দই সার্থক। তার কোনো অংশেই বাহুল্য নেই, তাই তত্ত্বব্যাখ্যা সম্বন্ধে তা এমন সুস্পষ্ট। কিন্তু, এই শব্দযোজনার সংযমটি যৌক্তিকতার সংযম, আর্থিক যাথাতথ্যের সংযম, শব্দগুলি লজিক-সংগত পঙ্‌ক্তিবন্ধনে সুপ্রতিষ্ঠিত। কিন্তু শংকরাচার্যের নামে যে আনন্দলহরী কাব্য প্রচলিত তার ভাবের প্রকাশ লজিকের পক্ষ থেকে অসংযত, অথচ প্রাণবান্ গতিমান্ রূপসৃষ্টির পক্ষ থেকে তার কলাকৌশল দেখতে পাই।..."[৫৪]

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে রবীন্দ্রনাথ তত্ত্বালোচনার ভাষার আদর্শ কিরূপ হওয়া সংগত, সে সম্বন্ধে খুবই সচেতন ছিলেন। কিন্তু তাঁহার নিজের দিক্ দিয়া তত্ত্বালোচনার ক্ষেত্রেও তাঁহার 'মজ্জাগত কবিত্ব'-ই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, তত্ত্বের সারাংশ, তাহা যতই যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং গভীর উপলব্ধির প্রকাশ হউক-না কেন, কাব্যের আবরণে তাহা ঢাকা পড়িয়াছে। ফলে রবীন্দ্রনাথের লেখনীতে সাহিত্যসমালোচনাও সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছে। অধিকাংশ পাঠক উহার অন্তর্নিহিত 'সাহিত্যরস' ও কাব্যসৌন্দর্যের জন্য ঐ-সকল রচনার প্রতি যতখানি আকৃষ্ট হন ততখানি উহাদের তত্ত্বের গাম্ভীর্য ও সারবত্তার জন্য নহে। আমাদের বর্তমান নিবন্ধে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সমালোচনার তাত্ত্বিক ভিত্তির প্রতিই সমধিক গুরুত্ব অর্পিত হইয়াছে, এবং তদুদ্দেশ্যে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য-মীমাংসা শাস্ত্রের সহিত উহার সংবাদ বা স্থলবিশেষে পার্থক্যও দেখানো আবশ্যক হইয়াছে। ইহা হইতে একটি বিষয় পরিষ্কারভাবে বুঝিতে পারা যাইবে যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সাহিত্যের তাত্ত্বিক আলোচনার ক্ষেত্রে ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা সচেতনভাবেই হউক বা অবচেতনভাবেই হউক কতদূর পর্যন্ত এবং কী গভীরভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন। অথচ তাঁহার ব্যাপক অধ্যয়ন বিদেশের সাহিত্য, শিল্প, নন্দনতত্ত্ব প্রভৃতিকেও আপনার উদার পরিধির অন্তর্ভুক্ত করিতে কিছুমাত্র বিমুখ ছিল না। পাশ্চাত্ত্য বিদ্যাকে তিনি যেমন সাদরে আবাহন করিতেন, সেইরূপ প্রাচীন ভারতীয় আদর্শ ও ভাবধারা— যাহা প্রাচ্যবিদ্যার অনুশীলনের সাহায্যেই উপলব্ধি করিতে পারা যায়, তাহার প্রতিও তাঁহার সুগভীর আন্তরিক শ্রদ্ধার অভাব ছিল না। রবীন্দ্রনাথের এই উদার দৃষ্টির পরিচয় আমরা নিম্নোদ্ধৃত পঙ্‌ক্তিগুলির মধ্যে উজ্জ্বলভাবে পাই :

"এখনকার কালের যে দীক্ষা তাহাতে প্রাচ্য পাশ্চাত্য সকল জাতিরই যোগ আছে। কেবল নিজের শাস্ত্র পড়িয়া পণ্ডিত হইবার আশা কেহ করিতে পারে না।... বিদ্যা এখন জ্ঞানের একটি বিশ্বযজ্ঞ হইয়া উঠিতেছে।...আমরা এতদিন পুরাপুরি পাশ্চাত্য শিক্ষা পাইতেছিলাম। এ শিক্ষা যখন এ দেশে প্রথম আরম্ভ হইয়াছিল তখন সকল প্রকার প্রাচ্যবিদ্যার প্রতি তাহার অবজ্ঞা ছিল। আজ পর্যন্ত সেই অবজ্ঞার মধ্যে আমরাও বাড়িয়া উঠিয়াছি। তাহাতে মাতা সরস্বতীর ঘরে গৃহবিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। তাঁহার পূর্ব মহলের সন্তানেরা পশ্চিম মহলের দিকের জানলা বন্ধ করিয়াছে

এবং পশ্চিম মহলের সন্তানেরা পুবে হাওয়াকে জঙ্গলের অস্বাস্থ্যকর হাওয়া জ্ঞান করিয়া তাহার একটু আভাসেই কান পর্যন্ত মুড়ি দিয়া বসিয়াছেন।"

আবার বলিয়াছেন :

"শিক্ষিত সমাজেও যে এমন অদ্ভুত অসংগত ব্যবহার চলিতেছে তাহার একটা কারণ আমার এই মনে হয়, পাশ্চাত্য শাস্ত্র আমরা বিদ্যালয়ে শিখিয়া থাকি এবং প্রাচ্য-শাস্ত্র আমরা স্কুলের কাপড় ছাড়িয়া অন্যত্র অন্য অবস্থার মধ্যে শিক্ষা করি। এইজন্য উভয়ের সম্বন্ধে আমাদের মনের ভাবের একটা ভেদ ঘটিয়া যায়— অনায়াসেই মনে করিতে পারি বুদ্ধির নিয়ম কেবল একজায়গায় খাটে— অন্য জায়গায় বড়োজোর ব্যাকরণের নিয়মই খাটিতে পারে। উভয়কেই এক বিদ্যামন্দিরে এক শিক্ষার অঙ্গ করিয়া দেখিলে আমাদের এই মোহ কাটিয়া যাইবার উপায় হইবে।"[৫৫]

সাহিত্যতত্ত্বের একটি বিশেষ সংকীর্ণ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টির সহিত প্রাচ্য মনীষিগণের সিদ্ধান্তের এই তুলনামূলক (academic) আলোচনা[৫৬] যদি অলংকারশাস্ত্র সম্বন্ধে আধুনিক পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় ও পাশ্চাত্ত্য আদর্শ ও ভাবধারায় দীক্ষিত সাহিত্য সমালোচকগণের ভ্রান্ত ধারণার কিছুটা নিরসন করিতে পারে, তবেই এই নিবন্ধরচনার প্রয়াস সার্থক। অলংকারশাস্ত্র শুধু কয়েকটি বাগ্‌বিকল্পের নিরর্থক বিশ্লেষণ নয়, উহা সাহিত্যসৃষ্টির আদি রহস্য হইতে আরম্ভ করিয়া উহার গভীর তাৎপর্য ও পরিণতি বিষয়ে সামগ্রিক বিচার, উহা সৌন্দর্য ও রসতত্ত্বের দার্শনিক জিজ্ঞাসা, যাহা শুধুই সাহিত্য নয়, সর্ববিধ শিল্পকলার প্রাণস্বরূপ। কেননা বামনাচার্যের ভাষায় :

"সৌন্দর্যমলংকারঃ।"[৫৭]

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-মীমাংসাও সেই সৌন্দর্যতত্ত্ব, সেই আনন্দময় রসতত্ত্বেরই মীমাংসা।

টীকা

১ তু "পৃথগেব হি কবিত্বাদ্ ভাবকত্বং, ভাবকত্বাচ্চ কবিত্বম্। স্বরূপভেদাদ্ বিষয়ভেদাচ্চ।"— রাজশেখর : কাব্যমীমাংসা, চতুর্থ অধ্যায় (Gaekwad's Oriental Series, No.1), পৃ. ১৪।

২ দণ্ডী, উদ্ভট, আনন্দবর্ধন, অভিনবগুপ্ত, বিশ্বনাথ, পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ প্রভৃতি আলংকারিকগণ খুবই উন্নতস্তরের কবিশক্তির অধিকারী ছিলেন।

৩ এই প্রসঙ্গে লেখকের 'বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-জিজ্ঞাসা' নামক নিবন্ধখানি দ্রষ্টব্য। (জিজ্ঞাসা। শ্রাবণ, ১৩৯০)

৪ র.র. ১৩, পশ্চিমবঙ্গ সরকার (প.ব.স.), পৃ. ৮৫৫। 'তত্ত্ব' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই বিরূপ মনোভাব তাঁহার 'আলোচনা' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'কবিতা ও তত্ত্ব' এবং 'তত্ত্বের বার্ধক্য' শীর্ষক অনুচ্ছেদদ্বয়ে স্পষ্টভাবেই ব্যক্ত হইয়াছে। অপিচ তুলনীয় : "তত্ত্ববিদ্যায় আমার কোনো অধিকার নাই। দ্বৈতবাদ-অদ্বৈতবাদের কোনো তর্ক উঠিলে আমি নিরুত্তর হইয়া থাকিব।"— 'আত্মপরিচয়' : র. র. ১০ (প.ব.স.), পৃ. ১৭১।

৫ 'ছিন্নপত্রাবলী' : পত্রসংখ্যা ২০৩ [সোমবার, ১৮ মার্চ। ১৮৯৫] দ্র. র.র. ১১ (প.ব.স.), পৃ. ২২১। 'সাহিত্য' শীর্ষক প্রবন্ধেও রবীন্দ্রনাথ তাঁহার তাত্ত্বিক আলোচনাও যে অভিজ্ঞতাভিত্তিক সে কথা সবিনয়ে নিবেদন করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই : "হয়তো এ-সব কথা তত্ত্বজ্ঞানের কোঠায় পড়ে—আমার মতো আনাড়ির পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ে তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনায় অবতীর্ণ হওয়া অসংগত। কিন্তু আমি সেই শিক্ষকের মঞ্চে দাঁড়িয়ে কথা বলছি নে। নিজের জীবনের অভিজ্ঞতায় অন্তরে বাহিরে রসের যে পরিচয় পেয়েছি আমি তারই কাছ থেকে ক্ষণে ক্ষণে আমার প্রশ্নের উত্তর সংগ্রহ করেছি। তাই আমি এখানে আহরণ করছি।..."— 'সাহিত্যের পথে' : র.র. ১৪ (প.ব.স.), পৃ. ৩১১।
অপিচ : "তত্ত্বজ্ঞানে আমার কোনো অধিকার নেই— আমি সেদিক থেকে কিছু বলছিও নে"— 'আমার জগৎ', সঞ্চয় : র.র. ১২ (প.ব.স.), পৃ. ৫৬৪।

৬ অথচ 'বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ'— রঘুবংশের এই প্রথম মঙ্গলাচরণ শ্লোকটি কবি নানা প্রসঙ্গে উদ্ধার করিয়াছেন। 'সাহিত্য' শব্দটির ব্যুৎপত্তি সম্—√ধা+ক্ত-প্রত্যয় যোগে নিষ্পন্ন 'সহিত' শব্দ হইতে। 'সহিত' এবং 'সন্ধান' শব্দ দুইটির মূল প্রকৃতি একই। 'সন্ধান' শব্দের অর্থ 'যোজনা'। শব্দ ও অর্থের পরস্পর যোজনাই তাহাদের 'সন্ধান'। তু. "শব্দার্থয়োর্যথাবৎ সহভাবেন বিদ্যা সাহিত্যবিদ্যা"— রাজশেখর : কাব্যমীমাংসা, দ্বিতীয় অধ্যায়।

৭ তু০ "এই কারণেই আমি মনে করি আমাদের ভাষায় 'সাহিত্য' শব্দটি সার্থক। ইহাতে আমরা নিজের অত্যাবশ্যককে অতিক্রম করিয়া উদারভাবে মানুষের ও বিশ্বপ্রকৃতির সাহিত্য লাভ করি।"— 'সাহিত্য সম্মিলন' : সাহিত্য, র.র.১৩ (প.ব.স.), পৃ. ৮৭২

৮ রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন সাহিত্যের মধ্যে প্রকৃতি ও মানবের মধ্যে অবিচ্ছিন্ন যোগ অধিক পরিমাণে লক্ষ্য করিয়াছেন— তখন উভয়ের মধ্যে যথার্থই 'সাহিত্য' ছিল। আধুনিক বিজ্ঞানের প্রভাবে সেই পুরাতন যোগসূত্র আজ ছিন্নপ্রায়। 'সাহিত্য' গ্রন্থে 'মানবপ্রকাশ' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি তাই বলিতেছেন :

"... তখন প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের ভিন্নতা ছিল না। উষাকে আকাশকে চন্দ্রসূর্যকে আমরা আমাদের থেকে স্বতন্ত্র শ্রেণীর বলে মনে করতে পারতুম না। এমন-কি, যে-সকল প্রবৃত্তির দ্বারা আমরা চালিত হতুম, যারা মনুষ্যত্বের এক-একটি অংশমাত্র, তাদের প্রতিও আমরা স্বতন্ত্র পূর্ণ মনুষ্যত্ব আরোপ করতুম।... পূর্বোক্ত কারণেই প্রাচীন সাহিত্যে বেশিমাত্রায় সাহিত্য-অংশ ছিল।... তখন মানুষ আপনারই সুখ-দুঃখ বিরাগ-অনুরাগ বিস্ময়-আনন্দে সমস্ত চরাচর অনুপ্রাণিত করে তুলেছিল।... তখন মানবকল্পনার স্পর্শমাত্রে সমস্ত জিনিস মানুষ হয়ে উঠত। এইজন্যই সাহিত্য অতি সহজেই সাহিত্য হয়ে উঠেছিল।..."— র.র. ১৩ (প.ব.স.), পৃ. ৮৫১। ইহার সহিত তুলনীয় : "সাধারণ লোক মেঘদূত কুমারসম্ভব শকুন্তলা পড়ে না। খুব সম্ভব দিঙ্নাগাচার্য এই কটা বইয়ের মধ্যে বাস্তবের অভাব দেখিয়েছিলেন। মেঘদূতের তো কথাই নাই। কালিদাস স্বয়ং এই বাস্তববাদীদের ভয়ে এক জায়গায় নিতান্ত অকবিজনোচিত কৈফিয়ত দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন— কামার্তা হি প্রকৃতিকৃপণাশ্চেতনাচেতনেষু।

"আমি অকবিজনোচিত এইজন্য বলিতেছি যে, কবিমাত্রই চেতন-অচেতনের মিল ঘটাইয়া থাকেন, কেননা তাঁহারা বিশ্বের মিত্র, তাঁহারা ন্যায়ের অধ্যাপক নহেন; শকুন্তলার চতুর্থ অঙ্ক পড়িলেই সেটা বুঝিতে বাকি থাকিবে না।"— বাস্তব : সাহিত্যের পথে। র.র. ১৪, পৃ. ২৯৯।

৯ 'সাহিত্যের তাৎপর্য' : সাহিত্যের পথে, র.র. ১৪ (প.ব.স.), পৃ. ৩৭৪।

১০ সাহিত্যের পথে, র.র. ১৪ (প.ব.স.), পৃ. ৩২৭,

১১ 'সাহিত্যে চিত্রবিভাগ' : সাহিত্যের স্বরূপ, র.র.১৪ (প.ব.স.), পৃ. ৫৩৫।

১২ রবীন্দ্রনাথও এই 'অত্যুক্তি' বুঝাইবার জন্য 'অতিশয়(তা)' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন— ইহা লক্ষণীয়। দ্র০ "এইজন্য সংসারের প্রাত্যহিক তথ্যকে একান্ত যথাযথভাবে আর্টের বেদির উপরে চড়ালে তাকে লজ্জা দেওয়া হয়। কেননা, আর্টের প্রকাশকে সত্য করতে গেলেই তার মধ্যে অতিশয়তা লাগে, নিছক তথ্যে তা সয় না। তাকে যতই ঠিকঠাক করে বলা যাক-না, শব্দের নির্বাচনে, ভাষায়, ভঙ্গিতে, ছন্দের ইশারায় এমন-কিছু থাকে যেটা সেই ঠিকঠাককে ছাড়িয়ে গিয়ে ঠেকে সেইখানে যেটা অতিশয়। তথ্যের জগতে ব্যক্তিস্বরূপ হচ্ছে সেই অতিশয়। কেজো ব্যবহারের সঙ্গে সৌজন্যের প্রভেদ ঐখানে। কেজো ব্যবহারে হিসেব-করা কাজের তাগিদ, সৌজন্যে আছে সেই অতিশয় যা ব্যক্তিপুরুষের মহিমার ভাষা।"— সাহিত্যের পথে, র.র. ১৪ (প.ব.স.), পৃ. ৩৫৭। এই কারণেই বোধহয় প্রাচীন কোনো কোনো আলংকারিক 'স্বভাবোক্তি'-কে অলংকারের মর্যাদা দিতে কুণ্ঠিত হইয়াছেন এবং স্বভাবোক্তি-প্রধান রচনাকে কাব্যের মর্যাদা দিতে স্বীকৃত হন নাই। তু০ "গতোহস্তমর্কো ভাতীন্দুর্যান্তি বাসায় পক্ষিণঃ। ইত্যেবমাদি কিং কাব্যং বার্তামেনাং প্রচক্ষতে ॥"— ভামহ : কাব্যালংকার, ২.৮৭। কিন্তু আচার্য দণ্ডী 'স্বভাবোক্তি' বা 'জাতি'-কে 'আদ্যা' অলংকৃতি বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন এবং শাস্ত্রেই ইহার 'সাম্রাজ্য' হইলেও কাব্যেও যে ইহা আদরণীয়— ইহা উল্লেখ করিতে দ্বিধা করেন নাই : "শাস্ত্রেষ্বস্যৈব সাম্রাজ্যং কাব্যেষ্বপ্যেতদীপ্সিতম্ ॥"— কাব্যাদর্শ : ২·১৩। তবে মহাকবিগণের রচনায় স্বভাবোক্তিও যে অতিশয়-বর্জিত নয়, তাহা একটু প্রণিধানসহকারে আলোচনা করিলেই স্পষ্ট হইয়া উঠে।

১৩ সাহিত্য : র.র. ১৩ (প.ব.স.), পৃ. ৮৪৯-৫০। এই কারণেই বোধহয় প্রাচীন আচার্যগণ শাস্ত্রে স্বভাবোক্তিরই আধিপত্য এবং কাব্যেই 'বক্রোক্তি' বা 'অতিশয়োক্তি' বা অলংকারের প্রসার— এইরূপ বিষয়বিভাগ নির্দেশ করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথও স্পষ্টভাবেই সাহিত্যের ভাষা এবং দর্শন-বিজ্ঞানের ভাষার পার্থক্য ব্যক্ত করিয়াছেন। তু০ "সাহিত্যও আপন চেষ্টাকে সফল করিবার জন্য অলংকারের, রূপকের, ছন্দের, আভাসের, ইঙ্গিতের আশ্রয় গ্রহণ করে। দর্শন-বিজ্ঞানের মতো নিরলংকার হইলে তাহার চলে না।

"অপরূপকে রূপের দ্বারা ব্যক্ত করিতে গেলে বচনের মধ্যে অনির্বচনীয়তাকে রক্ষা করিতে হয়। নারীর যেমন শ্রী এবং হ্রী, সাহিত্যের অনির্বচনীয়তাটিও সেইরূপ। তাহা অনুকরণের অতীত। তাহা অলংকারকে অতিক্রম করিয়া উঠে, তাহা অলংকারের দ্বারা আচ্ছন্ন হয় না।"— 'সাহিত্যের তাৎপর্য' : সাহিত্য, র.র. ১৩ (প.ব.স.), পৃ. ৭৩৮।

১৪ সাহিত্যের পথে : র.র. ১৪ (প.ব.স.), পৃ. ২৯২।

১৫ তদেব, পৃ. ৩৫৪-৫৫। 'সাহিত্য সম্মিলন' শীর্ষক রচনাতেও সেই একই কথা : "আমাদের দেশে বলিয়াছেন : বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্। রসাত্মক বাক্যই কাব্য। বস্তুত কাব্যের সংজ্ঞা আর-কিছুই হইতে পারে না"— সাহিত্য : র.র. ১৩ (প.ব.স.), প. ৮৭১। এখানে বলিয়া রাখা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, রসই যে কাব্যের আত্মা— এ সিদ্ধান্ত শুধু বিশ্বনাথেরই নহে। তাঁহার পূর্বে

ভরতমুনি, আনন্দবর্ধন, অভিনবগুপ্ত, মহিমভট্ট প্রমুখ বহু সাহিত্যবিদ্ মনীষী কাব্যে রসেরই সর্বাতিশায়িতার কথা উচ্চারণ করিয়াছেন। তু° "কাব্যস্যাত্মনি সংজ্ঞিনি রসাদিরূপে ন কস্যচিদ্ বিমতিঃ"— ব্যক্তিবিবেক। এমন-কি 'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্'এই লক্ষণটিও হুবহু মহিমভট্টেরই প্রতিধ্বনি। তু° "রসাত্মকং বাক্যমেব কাব্যম্"। হেমন্তবালা দেবীকে লিখিত এক পত্রেও কবি 'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্'-এই লক্ষণটি উদ্ধার করিয়াছেন, যদিও লঘু পরিহাসচ্ছলে। দ্র· "এমন কি বৌমা তোমার রচিত পৈষ্টিকী সাহিত্য সযত্নে রক্ষা করবার অভিপ্রায় প্রকাশ করচেন— শাস্ত্র অনুসারে তোমার এই লেখাগুলিকে কাব্য বলা যেতে পারে কেননা সাহিত্যদর্পণ বলেছেন 'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্।"

১৬ সাহিত্যের পথে: র.র. ১৪ (প.ব.স.), পৃ. ৩৭৫-৭৬। অনুরূপভাবে এক সংস্কৃতি কবি 'রসধ্বনি'-র পথের কথা বলিয়াছেন একটি শ্লোক· "রসধ্বনেরধ্বনি যে চরন্তি সংক্রান্তবক্রোক্তিরহস্যমুদ্রাঃ।
তে মৎপ্রবন্ধানবধারয়ন্তু কুর্বন্তু শেষাঃ শুকবাক্যপাঠম্॥"—পত্রগুপ্ত

১৭ র.র. ১৩ (প.ব.স.), পৃ. ৮২২-২৩। 'ছন্দ' গ্রন্থেও এই ক্রৌঞ্চবধ বৃত্তান্ত ও মহর্ষি বাল্মীকির শাপের উপাখ্যানটি ছন্দের উৎপত্তি বর্ণনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করিয়াছেন: তু° "আমাদের পুরাণে ছন্দের উৎপত্তির কথা যা বলেছে তা সবাই জানেন। দুটি পাখির মধ্যে একটিকে যখন ব্যাধ মারলে তখন বাল্মীকি মনে যে-ব্যথা পেলেন সেই ব্যথাকে শ্লোক দিয়ে না জানিয়ে তাঁর উপায় ছিল না।... সেইজন্যে কবির শাপ ছন্দের বাহনকে নিয়ে কাল থেকে কালান্তরে ছুটতে চাইলে।... এই শাশ্বতকালের কথাকে প্রকাশ করবার জন্যেই তো ছন্দ।" অপি চ: "শিল্পকলায়, কাব্যে এবং রসসাহিত্যমাত্রেই আমাদের চিত্তকে সেই সমস্ত দায় থেকে মুক্তি দেয়।... তমসীতীরে ক্রৌঞ্চবিরহিণীর দুঃখ কোনোখানেই নেই, কিন্তু আমাদের চিত্তের আত্মানুভূতির মধ্যে সেই বেদনার তার বাঁধা হয়েই আছে। সে ঘটনা এখন ঘটছে না, বা সে ঘটনা কোনো কালেই ঘটে নি, এ কথা তার কাছে প্রমাণ করে কোনো লাভ নেই।"—র.র. ২১ (বিশ্বভারতী), পৃ. ২৯৭-৯৮। এখানে প্রসঙ্গতঃ লক্ষ্য করার বিষয় যে রবীন্দ্রনাথ কখনও 'ক্রৌঞ্চবিরহী', কখনও 'ক্রৌঞ্চবিরহিণী' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অর্থাৎ ক্রৌঞ্চমিথুন বিচ্ছেদের দ্বারা তিনি কখনও 'ক্রৌঞ্চবধ' কখনও বা 'ক্রৌঞ্চীবধ' বুঝিয়াছেন।

'ধ্বন্যালোকে'ও 'ক্রৌঞ্চাক্রন্দ' এবং 'ক্রৌঞ্চ্যাক্রন্দ'—উভয়বিধ পাঠের অস্তিত্ব দেখা যায়। ইহার মূল হয়তো রামায়ণের ক্রৌঞ্চমিথুন-বিয়োগের বর্ণনায় পাঠভেদের মধ্যেই নিহিত। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের পক্ষে 'ধ্বন্যালোকে'র সহিত পরিচয় লাভ বা এই জাতীয় নিছক academic আলোচনার কোনও সম্ভাবনা ছিল না। তৎসত্ত্বেও সাদৃশ্যটি আকস্মিক হইলেও কৌতুককর বটে।

রবীন্দ্রনাথ নানা স্থলে, রসের এই উচ্ছলন 'ছাপিয়ে যাওয়া'র কথা বলিয়াছেন— সে শুধু করুণ রসের ক্ষেত্রেই নয়। দ্র· "রসের অনুভূতি প্রবল হলে সে ছাপিয়ে যায় আমাদের মনকে। তখন তাকে প্রকাশ করতে চাই নিত্যকালের ভাষায়; কবি সেই ভাষাকে মানুষের অনুভূতির ভাষা ক'রে তোলে; অর্থাৎ জ্ঞানের ভাষা নয়, হৃদয়ের ভাষা, কল্পনার ভাষা।"— 'সাহিত্যের তাৎপর্য', সাহিত্যের পথে, র·র· ২৩ (বিশ্বভারতী), পৃ ৪৫৪।

১৮ র·র· ১৩ (প·ব·স·), পৃ· ৮৫৬। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা প্রয়োজন যে রবীন্দ্রনাথ 'ছবি গান ও কাব্য'— এইগুলিকে একই শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করিলেও সাহিত্যকেই সর্বোচ্চ স্থান দিয়াছেন: "কিন্তু যতই আলোচনা করছি ততই অধিক অনুভব করছি যে, সমগ্র মানবকে প্রকাশের চেষ্টাই সাহিত্যের প্রাণ।··· সংগীতে চিত্রে বিজ্ঞানে দর্শনে সমস্ত মানুষ নেই। এইজন্যই সাহিত্যের এত আদর। এইজন্যই সাহিত্য সর্বদেশের মনুষ্যত্বের অক্ষয় ভাণ্ডার।···"— সাহিত্য: 'সাহিত্যের প্রাণ', র·র· ১৩ (প·ব·স·), পৃ· ৮৪৯।

১৯ তু° "অনুভূতির বাইরে রসের কোনো অর্থই নেই। রসমাত্রই তথ্যকে অধিকার করে তাকে অনির্বচনীয়ভাবে অতিক্রম করে। রস পদার্থ বস্তুর অতীত এমন একটি ঐক্যবোধ যা আমাদের চৈতন্যে মিলিত হতে বিলম্ব করে না। এখানে তার প্রকাশ আর আমার প্রকাশ একই কথা।"— 'সাহিত্যতত্ত্ব': সাহিত্যের পথে, র·র· ১৪ (প·ব·স·), পৃ· ৩৫৫।

কাব্যে রসের ক্ষেত্রে এই 'তথ্য' তাহার বাচ্যার্থ, যাহা অলংকারশাস্ত্রের পরিভাষায় 'বিভাব' ও 'অনুভাব'। আর রসের অনির্বচনীয়তা ব্যঞ্জনার স্পর্শে সাধিত হয়। অপি চ: "আমরা যাকে বলি সাহিত্য, বলি ললিতকলা, তার লক্ষ্য এই উপলব্ধির আনন্দ, বিষয়ের সঙ্গে বিষয়ী এক হয়ে যাওয়াতে যে আনন্দ।···"— 'সাহিত্যতত্ত্ব': সাহিত্যের পথে, র·র, ১৪, পৃ· ৩৫৩।

এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় যে রবীন্দ্রনাথ উদ্ধৃত অংশে 'বিষয়' ও 'বিষয়ী' শব্দদুটি 'জ্ঞেয় বস্তু' এবং 'জ্ঞাতা আত্ম-চৈতন্য' অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন— হুবহু বেদান্তদর্শনের রীতিতে।

২০ সাহিত্য: র·র· ১৩ (প·ব·স·), পৃ· ৭৬১-৬২।

'শান্তিনিকেতনে'র অন্তর্গত 'বিশ্ববোধ' শীর্ষক রচনাতেও রসাত্মক অনুভূতি যে আনন্দস্বভাব তাহা বুঝাইতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ সেই উপনিষদ্‌বাক্যই উদ্ধার করিয়াছেন: "... তোমার যে বিশ্বব্যাপী অনুভতি তা রসময় অনুভূতি। বলেছেন 'রসো বৈ সঃ'— সেইজন্যেই জগৎ জুড়ে এত রূপ, এত রঙ, এত গন্ধ, এত গান, এত সখ্য, এত স্নেহ, এত প্রেম। এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি— তোমার এই অখণ্ড পরামানন্দ রসকেই আমরা সমস্ত জীবজন্তু দিকে দিকে মুহূর্তে মুহূর্তে মাত্রায় মাত্রায় কণায় কণায় পাচ্ছি— দিনে রাত্রে, ঋতুতে ঋতুতে, অন্নে জলে, ফুলে ফলে, দেহে মনে, অন্তরে বাহিরে বিচিত্র করে ভোগ করছি।...

মানবজীবনে সকলের এই শেষ কথাটি ততক্ষণ বলবার সাহস হবে না যতক্ষণ অন্তরের ভিতর থেকে বলতে না পারব, রসো বৈ সঃ, রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি— তিনিই রস, যা-কিছু আনন্দ সে এই রসকে পেয়েই।"— র.র, ১৪ (বিশ্বভারতী), পৃ· ৫১৮-১৯। অপি চ 'প্রার্থনার সত্য', 'বিশ্ববোধ', 'রসের ধর্ম', 'কর্মযোগ' প্রভৃতি ভাষণেও কবি 'রসো বৈ সঃ' এই উপনিষদ বাক্যটি নানা প্রসঙ্গে উদ্ধার করিয়াছেন, নানা দৃষ্টিকোণ হইতে উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। দ্র°· শান্তিনিকেতন : র·র· ১২ (প·ব·স·), পৃ· ১৫৬, ৩২৮, ৩৩১, ৩৮৪।

২১ দ্র° সঞ্চয় : র·র· (প·ব·স·) ১২; পৃ· ৫৩৭,৫৩৮, ৫৪২।

২২ 'মুক্তি' : শান্তিনিকেতন, র·র· ১২ (প·ব·স·), পৃ· ২৮৯।

২৩ সঞ্চয় : 'রূপ ও অরূপ', তদেব, পৃ· ৫১৯।

২৪ সাহিত্যের পথে : 'সাহিত্যতত্ত্ব' (র·র·, ১৪ (প·ব·স·), পৃ· ৩৬০। রবীন্দ্রনাথ 'কৃষ্টি' ও 'সংস্কৃতি'-এই দুটি শব্দের অর্থ বিষয়ে ব্যবধানের উপর জোর দিতেন— কখনোই উহাদের পর্যায়-শব্দরূপে প্রচলন অনুমোদন করেন নাই। 'সংস্কৃতি' শব্দের তাৎপর্য রবীন্দ্রনাথ তাঁহার রচনার একস্থলে এইরূপভাবে প্রকাশ করিয়াছেন : "আমাদের দেশে সাধনা বলতে সাধারণত মানুষ আধ্যাত্মিক মুক্তির সাধনা, সন্ন্যাসের সাধনা ধরে নিয়ে থাকে। আমি যে সংকল্প নিয়ে শান্তিনিকেতনে আশ্রম-স্থাপনার উদ্যোগ করেছিলুম, সাধারণ মানুষের চিত্তোৎকর্ষের সুদূর বাইরে তার লক্ষ্য ছিল না। যাকে সংস্কৃতি বলে তা বিচিত্র ; তাতে মনের সংস্কার সাধন করে, আদিম খনিজ অবস্থার অনুজ্জ্বলতা থেকে তার পূর্ণ মূল্য উদ্ভাবন করে নেয়। এই সংস্কৃতির নানা শাখা প্রশাখা, মন যেখানে সুস্থ সবল, মন সেখানে সংস্কৃতির এই নানাবিধ প্রেরণাকে আপনিই চায়।"— বিশ্বভারতী : র·র· ১১ (প·ব·স·),পৃ· ৮০২।

২৫ বিচিত্র প্রবন্ধ : র·র· ১৪ (প·ব·স·), পৃ· ৭৭৪।

২৬ সঞ্চয় : র·র· ১২ (প·ব·স·), পৃ· ৫১৯।

২৭ ছন্দ : র·র· ২১ (বিশ্বভারতী), পৃ· ২৯৫।

২৮ সাহিত্য : র·র· ১৩ (প·ব·স·), পৃ· ৮২৪, ৮২৬-২৭।

২৯ সাহিত্যের পথে : র·র· ১৪ (প·ব·স·), পৃ· ৩১৭। তু° "ভাষার মধ্যেও যখন প্রবল অনুভূতির সংঘাত লাগে তখন তা শব্দার্থের আভিধানিক সীমা লঙ্ঘন করে।"— 'সাহিত্যতত্ত্ব' : সাহিত্যের পথে, র·র· ১৪ (প·ব·স·), পৃ· ৩৫৭।

৩০ 'সাহিত্যের উদ্দেশ্য' : সাহিত্য, র·র· ১৩ (প·ব·স·), পৃ· ৮২৯।

৩১ র·র·, ১৪ (প·ব·স·), পৃ· ৪১৩-১৪। 'সাহিত্যের পথে'-র ভূমিকাতেও রবীন্দ্রনাথের অনুরূপ বক্তব্য লক্ষণীয় : "দুঃখের তীব্র উপলব্ধিও আনন্দকর, কেননা সেটা নিবিড় অস্মিতাসূচক; কেবল অনিষ্টের আশঙ্কা এসে বাধা দেয়। সে আশঙ্কা না থাকলে দুঃখকে বলতুম সুন্দর। দুঃখে আমাদের স্পষ্ট করে তোলে, আপনার কাছে আপনাকে ঝাপসা থাকতে দেয় না। গভীর দুঃখ ভূমা ; ট্র্যাজেডির মধ্যে সেই ভূমা আছে, সেই ভূমৈব সুখম্। মানুষ বাস্তব জগতে ভয় দুঃখ বিপদকে সর্বতোভাবে বর্জনীয় বলে জানে, অথচ তার আত্ম-অভিজ্ঞতাকে প্রবল এবং বহুল করবার জন্যে এদের না পেলে তার স্বভাব বঞ্চিত হয়। আপন স্বভাবগত এই চাওয়াটাকে মানুষ সাহিত্যে আর্টে উপভোগ করছে'। একে বলা যায় লীলা, কল্পনায় আপনার অবিমিশ্র উপলব্ধি। রামলীলায় মানুষ যোগ দিতে যায় খুশি হয়ে; লীলা যদি না হত তবে বুক যেত ফেটে।"— র·র· ২৩ (বিশ্বভারতী), পৃ· ৩৫৭।

৩২ 'সাহিত্যে নবত্ব' : সাহিত্যের পথে, র·র· ২৩ (বিশ্বভারতী), পৃ· ৪১২। এই প্রসঙ্গে 'সমালোচনা'-র অন্তর্গত 'মেঘনাদবধ কাব্য' শীর্ষক পরিচ্ছেদে মহাভারতে ট্র্যাজেডি-তত্ত্ব লইয়া যে আলোচনা আছে তাহা প্রণিধানযোগ্য।

৩৩ এই সাধারণীকরণ যে শুধু কাব্যবর্ণিত বা নাট্যাভিনীত পদার্থসমূহের ক্ষেত্রেই ঘটিয়া থাকে, তাহা নহে। সহৃদয়ের ক্ষেত্রে, এমন-কি কবির ক্ষেত্রেও ইহা স্বীকার্য। রবীন্দ্রনাথ 'ছিন্নপত্রাবলী'-র একটি পত্রে নিজের সম্বন্ধে বলিতেছেন : "কোনো মতে ঘাড় ধরে নিজেকে একবার লেখার স্রোতের মাঝখানে টেনে এনে ফেলতে পারলে আমি আর জগৎসংসারকে কেয়ার করিনে— তখন আমার জগৎ আমার নিজেরই জগৎ, সেখানে আমি একমাত্র রাজা, সেখানে আমি সমস্ত সুখ দুঃখ সৌন্দর্যের বিধাতাপুরুষ।... সেই ভাবরাজ্যে আমি সমস্ত মনুষ্য, আমি রবি-নামক ব্যক্তিবিশেষ নই—সেখানে আমার আনন্দ এবং বেদনা বিশ্বব্যাপী।"— পত্রসংখ্যা ২৪৩।

অপিচ তুলনীয় : "নিবিড় আসক্তিপ্রবণতা সাহিত্যের ক্ষতি করে। কাছে থেকেও দূরত্ব না রাখতে পারলে স্পষ্টদৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে। সকল সাধনাতেই এই কথা খাটে।"— চিঠিপত্র : ৯, পৃ· ২০০।

৩৪ 'ছিন্নপত্রাবলী'-র, ২২৬ সংখ্যক পত্রেও (২৫ অগস্ট্ ১৮৯৫) রবীন্দ্রনাথ এই 'সম্ভোগশক্তি'-র কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

৩৫ 'সাহিত্যের তাৎপর্য' : সাহিত্যের পথে, র·র· ২৩ (বিশ্বভারতী), পৃ· ৪৫৭।

৩৬ এই বিষয়টি সম্পর্কে মূল্যবান আলোচনার জন্য প্রসিদ্ধ সমালোচক Edward Bullough-প্রণীত *Aesthetics: Lectures and Essays*-গ্রন্থের 'Psychical Distance as a Factor in Art and Aesthetic Principle' শীর্ষক পরিচ্ছেদ (পৃ. ৯১-১৩০) দ্রষ্টব্য [Edited with an Introduction by Elizabeth M. Wilkenson/ Bowes & Bowes, London, 1957]. রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাঁর এই দূরত্বের কথা, নিঃসঙ্গতার কথা চিঠিপত্রের নানা জায়গায় স্পষ্টভাবেই প্রকাশ করিয়াছেন : "... আমার সত্যকার স্বভাবটা বোধহয় নৈঃসঙ্গিক— সঙ্গের প্রভাব তাকে বল দেয় না, তাকে অলস করে। এই আলস্যের মন্থরতায় নিজের যা-কিছু শ্রেষ্ঠ সে-সমস্ত আচ্ছন্ন হয়ে যায়— আর তার থেকেই আসে ক্লান্তি।"— পথে ও পথের প্রান্তে : পত্রসংখ্যা, ৩৫।

৩৭ পত্রসংখ্যা ৪৩। র.র. ১০ (প.ব.স.), পৃ. ৮৪৪-৪৫।

৩৮ তদেব, পৃ. ৮৪৫। অপিচ তুলনীয় : "জানালার কাছে বসে বসে প্রায়ই ভাবি; দূর বলে একটা পদার্থ আছে, সে বড়ো সুন্দর। বস্তুত সুন্দরের মধ্যে একটি দূরত্ব আছে, নিকট তার স্থূল হস্ত নিয়ে তাকে যেন নাগাল পায় না।..." তদেব, পৃ. ৮২৬। উপরি-উদ্‌ধৃত পত্রাংশে 'দ্রষ্টা' ও 'ভোক্তা'-র বিভাগটি উপনিষদের "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। তয়োরেকঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি অনশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি ॥"— এই মন্ত্রটির রূপকের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। তু° "এসব লেখা রবীন্দ্রনাথের নয়, তার গভীরতম মর্মস্থানে যে কবি আছে তারই, সে কবির আসন সকল দেশেই, সকল মানুষেরই অন্তরে"— চিঠিপত্র : ৯, পৃ. ৬১।

৩৯ 'শান্তিনিকেতন' : 'মুক্তির পথ', র.র. ১২ (প.ব.স.), পৃ. ২৯১। অপিচ : "জগৎ যদি আমাদের আনন্দ না দেয়, তবে বিশ্বকবির এই বিরাট কাব্যকে অর্থহীন অমূলক পদার্থ বলে এর থেকে নিষ্কৃতি পাওয়াকেই আমরা চরিতার্থতা বলব।"— তদেব।

৪০ এই প্রসঙ্গে একটি উক্তি প্রণিধানযোগ্য : "এই বিশ্বের অনেকখানিকেই যদিও আমরা চোখে দেখি, কানে শুনি নে, তবুও বহুকাল থেকে অনেক কবি এই বিশ্বকে গানই বলেছেন। গ্রীসের ভাবুকেরা আকাশে জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর গতায়াতকে নক্ষত্রলোকের গান বলেই বর্ণনা করেছেন। কবিরা বিশ্বভুবনের রূপবিন্যাসের সঙ্গে চিত্রকলার উপমা অতি অল্পই দিয়েছেন তার একটা কারণ, বিশ্বের মধ্যে নিয়ত একটা গতির চাঞ্চল্য আছে। কিন্তু শুধু তাই নয়— এর মধ্যে গভীরতর একটা কারণ আছে।"— শান্তিনিকেতন : 'শোনা', র.র. ১৩ (বিশ্বভারতী), পৃ. ৪৮৫।

সেই বিশ্বকাব্যের স্রষ্টা বিশ্বকবিকে রবীন্দ্রনাথ একজায়গায় 'মহারসিক' বলিয়াছেন : "মহারসিক আপন রস দিয়ে চিরকাল এর কাছ থেকে নবরস আদায় করে নেবেন, এর সমস্ত সুখ সমস্ত দুঃখ সার্থক করে তুলবেন।"— 'আমার জগৎ' : সঞ্চয়, র.র. ১২ (প.ব.স.), পৃ. ৫৬৫।

৪১ সাহিত্যের পথে : র.র. ২৩ (বিশ্বভারতী), পৃ. ৪১৪।

৪২ তদেব, পৃ. ৪১৫। কবি যেমন একদিকে 'সামান্য' লৌকিক জগৎকে প্রতিভার (Intuition), সাহায্যে বিশেষ করিয়া লহেন, সেইরূপ সাহিত্যে ভাষা, ছন্দ ও অলংকারের সাহায্যে, যাহার মূলেও সেই প্রতিভাই (Expression) তাহাকে বিশ্বমানবের হৃদয়ে 'সামান্য' করিয়া তুলেন। ভট্টনায়কের 'ভাবকত্ব' এবং ধ্বনিবাদীদের 'ব্যঞ্জনা'-রও তাহাই কাজ। এ সম্বন্ধে 'শান্তিনিকেতন'-এর অন্তর্গত 'বিশেষত্ব ও বিশ্ব' শীর্ষক রচনা আলোচ্য। তু° "কবি যখন নিজের ভাবের আনন্দে ভোর হয়ে ওঠেন তখন তিনি সেই আনন্দকে বিশ্বের আনন্দ করতে চান।... তখন তাঁকে এমন ভাষা আশ্রয় করতে হয় যা সকলের ভাষা, যা তাঁর খেয়ালমতো একেবারে উল্টোপাল্টা হয়ে চলে না। তাঁকে এমন ছন্দ মানতেই হয় যে ছন্দে সকলের শ্রবণ পরিতৃপ্ত হয়।..."— র.র. ১২ (প.ব.স.), পৃ. ৪৪০-৪১। "সাহিত্যের সামগ্রী"-শীর্ষক প্রবন্ধেও সেই একই কথা কবি বলিয়াছেন : "অতএব দেখিতেছি, ভাবকে নিজের করিয়া সকলের করা ইহাই সাহিত্য, ইহাই ললিতকলা।... সাধারণের জিনিসকে বিশেষভাবে নিজের করিয়া, সেই উপায়েই তাহাকে পুনশ্চ বিশেষভাবে সাধারণের করিয়া তোলা সাহিত্যের কাজ।"— সাহিত্য : র.র. ১৩ (প.ব.স.), পৃ. ৭৪৩।

৪৩ তু° "রূপই আমার কাছে আশ্চর্য, রসই আমার কাছে মনোহর"— সঞ্চয় : 'আমার জগৎ', র. র. ১২ (প.ব.স.), পৃ. ৫৬৫।

৪৪ সাহিত্য : র.র., ১৩ (প.ব.স.), পৃ. ৮২০।

৪৫ সাহিত্য : তদেব।

৪৬ সমালোচনা : র.র. ১৩ (প.ব.স.), পৃ. ৬০২-৬০৩।

৪৭ 'ছিন্নপত্রাবলী' : পত্রসংখ্যা ২৩৩। র.র. ১১ (প.ব.স.), পৃ. ২৪৪-৪৫।

৪৮ সাহিত্য : র.র. ১৩ (প.ব.স.), পৃ. ৭৪৮। অভিনবগুপ্ত সেইজন্যই 'ধ্বন্যালোকে'র 'লোচন'-ব্যাখ্যার মঙ্গলশ্লোকে কবি-সহৃদয়ের উদ্দেশ্যে বলিয়াছেন : "সরস্বত্যাস্তত্ত্বং কবি-সহৃদয়াখ্যং বিজয়তে।" সংগীতের ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ অনুরূপভাবে দুইজাতীয় প্রতিভার উল্লেখ করিয়াছেন— গায়কের এবং শ্রোতার। তু° "রসবোধের নাড়ি যখন ক্ষীণ হইয়া আসে কৌশল তখন কলাকে ছাড়াইয়া যায়, সাহিত্যের ইতিহাসেও ইহা বরাবর দেখা গেছে।... কেননা, শুনিবারও প্রতিভা থাকা চাই কেবল শুনাইবার নয়।"—

সংগীত : 'সংগীতের মুক্তি', র·র· ১৪ (প·ব·স·), পৃ· ৮৯৪।

৪৯ র·র· ১২ (প·ব·স·), পৃ· ১২১-২২। রবীন্দ্রনাথ নিজের রচনা সম্বন্ধে বলিতে গিয়া তাহাতে চিন্তা ও রসের সমাহারের কথা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন। তুং° "আমার রচনা যে জাতীয় ফল, জীর্ণ রসনা ও নির্জীব মস্তিষ্কের কাছে তা পথ্য নয় এ কথা স্পর্ধা করেই বলতে পারি।"— চিঠিপত্র, ৯, পৃ· ৩১৭ (হেমন্তবালা দেবীকে লিখিত। ১৭ বৈশাখ ১৩৪৩)। ইহার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে পুপের সঙ্গে কবির কথোপকথনে নিজের 'হাস্যরস' সম্পর্কে মন্তব্য : "পিতামহের দুই জাতের হাসি আছে—একটা দন্ত্য, একটা মূর্ধন্য। আমাতে লেগেছে মূর্ধন্য হাসি, ইংরেজিতে যাকে বলে উইট।"— 'সে' : র·র· ৭ (প·ব·স·), পৃ· ৯২৯-৩০। ইহার সহিত তুলনীয় কবির প্রতি বিষ্ণুরামের উক্তি : "দাদা, রাগ করছ বটে, কিন্তু আমি বলে দিলুম, বুদ্ধির ঝাঁজে তোমার রস যাচ্ছে শুকিয়ে... বল তো আজই তাকে আমি একটুখানি হাসিয়ে দিইগে— বিশুদ্ধ হাসি, তাতে বুদ্ধির ভেজাল নেই।"— সে : র·র·৭ (প·ব·স·), পৃ ৮৬৫।

৫০ সাহিত্যের পথে : র·র· ১৪ (প·ব·স·), পৃ· ৩৩৫, ৩৩৬। ইহার সহিত তুলনীয় একটি উদ্ভট সংস্কৃত শ্লোক উচ্ছৃঙ্খল নিয়মবিমুখ রসিকপ্রবণ কবিদের সম্বন্ধে :

"গণয়ন্তি নাপশব্দং ন বৃত্তভঙ্গং ক্ষয়ং ন বাহর্থস্য।
রসিকত্বেনাকুলিতা বেশ্যাপতয়ঃ কুকবয়শ্চ ॥"

৫১ তুং "এ কবিত্ব আমার হাড়ের মজ্জার মধ্যে—এ আমার সঙ্গের সঙ্গী"— 'ছিন্নপত্রাবলী' : পত্রসংখ্যা ১৮৫ (র·র· ১১, পৃ· ২০৩)। অপিচ : "শুধায়ো না মোরে তুমি মুক্তি কোথা, মুক্তি কারে কই / আমি তো সাধক নই, । / আমি কবি, আছি / ধরণীর অতি কাছাকাছি /"— পরিশেষ : 'পান্থ'।

৫২ সাহিত্যের স্বরূপ : র·র· ১৪ (প·ব·স·), পৃ· ৫৩১।

৫৩ তদেব, পৃ· ৫৩০।

৫৪ ছন্দ : র·র· ২১ (বিশ্বভারতী), পৃ· ৩৬৬। উদাহরণরূপে রবীন্দ্রনাথ 'বহন্তী সিন্দূরং প্রবলকবরীভারতিমির—' এই শ্লোকটি উদ্ধার করিয়াছেন।

৫৫ পরিচয় : 'হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়', র·র· ১৩ (প·ব·স·), পৃ· ১৮৪, ১৮৬।

৫৬ এই জাতীয় 'একাডেমিক' তত্ত্বালোচনার প্রতি রবীন্দ্রনাথের মনোভাব নিম্নের পত্রাংশে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে যাহা ব্যাজস্তুতির একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ :

"সামান্য কথাটা ভেবে দেখো-না, মনে রাখবার মতো বুদ্ধি যদি থাকত তা হলে অন্তত পরীক্ষা পাসের পালা শেষ পর্যন্ত চুকিয়ে সংসারটাকে সেলাম ঠুকে এবং সেলাম কুড়িয়ে বুক ফুলিয়ে চলে যেতে পারতুম। একটা কিছু বলতে যদি চাই তার রেফারেন্স্ দিতে পারি নে, পণ্ডিতসভায় বোকার মতো কেবল নিজের বকুনি দিয়েই বিদ্যের অভাব চাপা দিয়ে রাখি। কাব্যালোচনা-সভায় প্যারাফ্রেজ ও প্যারালাল-প্যাসেজ মাথায় জোটে না বলে কবিতা রচনা করে নিজের মান রাখি। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তুমি পড়ে যাচ্ছ আর হাসছ মনে মনে এবং প্রকাশ্যে। বলছ, এটা হল ফাঁকা বিনয়। অহংকারের বন্যা।..."— পথে ও পথের প্রান্তে : পত্রসংখ্যা ৪৮ : র·র· ১০ (প·ব·স·), পৃ· ৮৪৯।

৫৭ তুং° "আমি হয়তো ঠিক প্রকাশ করতে পারব না এবং প্রকাশ করতে গেলে হয়তো অলীক কবিত্বের মতো শোনাতে পারে—সৌন্দর্য আমার কাছে প্রত্যক্ষ দেবতা— যখন মনটা বিক্ষিপ্ত না থাকে এবং যখন ভালো করে চেয়ে দেখি তখন এক-প্লেট গোলাপ ফুল আমার কাছে সেই ভূমানন্দের মাত্রা যার সম্বন্ধে উপনিষদে আছে : এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি। সৌন্দর্যের ভিতরকার এই অনন্ত গভীর আধ্যাত্মিকতা এটা কেবল পুরুষরা উপলব্ধি করতে পেরেছে। এই জন্যে পুরুষের কাছে মেয়ের সৌন্দর্যের একটা বিশ্বব্যাপকতা আছে। সেদিন শঙ্করাচার্যের আনন্দলহরী বলে একটা কাব্যগ্রন্থ পড়ছিলুম, তাতে সে সমস্ত জগৎসংসারকে স্ত্রীমূর্তিতে দেখছে— চন্দ্র সূর্য আকাশ পৃথিবী সমস্তই স্ত্রীসৌন্দর্যে পরিব্যাপ্ত করে দিয়েছে—অবশেষে সমস্ত বর্ণনা সমস্ত কবিতাকে একটা স্তবে একটা ধর্মোচ্ছ্বাসে পরিণত করে তুলেছে।..."— ছিন্নপত্রাবলী : পত্রসংখ্যা ১৯৭। র·র· ১১ (প·ব·স·), পৃ· ২১৫।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শ

অম্লান দত্ত

এমন একটি ব্যক্তি অথবা সত্তাকে যদি কল্পনা করা যায় যিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বনির্ভর তবে তাঁর শিক্ষার কোনো প্রয়োজন নেই। তাঁদেরই শিক্ষার প্রয়োজন যাঁরা সম্পূর্ণ নন। জন্মসূত্রেই সম্পূর্ণ এবং স্বনির্ভর কোনো সত্তার শিক্ষার প্রয়োজন হয় না। আবার এমন একটি ব্যক্তি অথবা সত্তাকে যদি চিন্তা করা যায় যিনি অসম্পূর্ণ এবং নিজেকে নতুন করে গড়বার শক্তি যাঁর একেবারেই নেই, তবে তাঁর শিক্ষাগ্রহণের শক্তিও নেই। কাজেই তাঁর পক্ষেও শিক্ষা নিষ্প্রয়োজন। একদিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মানুষ আর অন্যদিকে সেই অপূর্ণ মানুষ যে নিজেকে গড়বার শক্তিও লাভ করে নি, নিজেকে নতুন করে ক্রমে ক্রমে সৃষ্টি করবার শক্তি যার নেই, এই দুই প্রান্তে শিক্ষা অনুপস্থিত, এর মাঝামাঝি জায়গাতে শিক্ষার স্থান। যিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ নন, নিজেকে পূর্ণ করবার জন্য তাঁর অন্যের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে হয়। কাজেই শিক্ষার মূলে এইরকম একটা সম্পর্কের কথা এসে যায়, সেই সম্পর্ককে বিশেষ পদ্ধতিতে গড়ে তোলবার, রূপদান করবার, প্রশ্ন ওঠে।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শনের মূলেও এইরকম কিছু সম্পর্ক সম্বন্ধে ধারণা আছে। মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক, মানুষের সঙ্গে প্রতিবেশীর সম্পর্ক, মানুষের সঙ্গে বিশ্বমানবের সম্পর্ক, এই-সবই তাঁর শিক্ষাদর্শনের উপাদান।

প্রকৃতি নিয়েই কথাটা শুরু করা যাক ; কারণ শিক্ষার কেন্দ্র হিসেবে রবীন্দ্রনাথ এমন একটি স্থান বেছে নিয়েছিলেন যেখানে মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কে আবদ্ধ হতে পারবে। মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির যে সম্পর্ক, অথবা মানুষ ও প্রকৃতিকে নিয়ে শিক্ষার যে ধারণা, সেই সম্পর্ক অথবা ধারণার আবার দুটি প্রান্ত আছে। সেই দুটি প্রান্ত নিয়ে একটু ভাবা যাক। একদিকে প্রকৃতিকে ভাবা যায় যেন সে নিয়মের দ্বারা চালিত এক যন্ত্র। ভাবা যায় যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এইটেই বের করতে চায়, প্রকৃতির যন্ত্রটা কীভাবে কাজ করে বা কীভাবে তাকে দিয়ে কাজ করানো যায়। প্রকৃতিকে যদি আমরা যন্ত্র হিসেবে ভাবি তা হলে শিক্ষার ঝোঁক হবে ঐদিকে। শিক্ষা ব্যাপারটা অবশ্য আরো বেশি যান্ত্রিক ও বোধশূন্যও হতে পারে। শিক্ষক অনেক সময় গতানুগতিক বিদ্যালয়ে অতি বোধহীন পদ্ধতিতে শিক্ষাদান করে থাকেন। কিন্তু এটা প্রকৃত শিক্ষা নয়। প্রকৃতি শুধু যন্ত্রই নয়।

মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির যে সম্পর্ক তাতে অন্য একটি প্রান্ত আছে। একপ্রান্তে যেমন যান্ত্রিকতা অন্যপ্রান্তে তেমনি প্রকৃতি এমন একটি অবয়ব যার ভিতর দিয়ে মানুষের প্রেম বিস্তার লাভ করতে পারে। এই কথাটা যদি শিক্ষায় ধরা না পড়ে তবে সেই শিক্ষা সম্পূর্ণ নয়, রাবীন্দ্রিক নয়। একটা কথা কবি শিক্ষক সহজ অথচ গভীরভাবে বুঝেছিলেন— সেটা শিশুর ভালোবাসার ধরন সম্বন্ধে। আর মনে রাখতে হবে যে শিশু এখানে মানুষেরই প্রতিভূ। একটু দূর থেকে শিশুকে যখন দেখি তখন এই জিনিসটা লক্ষ করা যায়। শিশুর কান্নার সাধারণত কোনো কারণ থাকে— ক্ষিদে পেয়েছে, কোনো অস্বাচ্ছন্দ্য, কি যা হোক কিছু। শিশুর খুশির মধ্যে কিন্তু একটা অকারণ আনন্দ আছে। অকারণে পুলকিত হয়ে ওঠে শিশু, অকারণে নাচতে থাকে। এটা একটা মূল কথা। এই বিশ্ব সম্বন্ধে, প্রকৃতি সম্বন্ধে, মানুষের একটা অকারণ আনন্দবোধ আছে। আমরা যতটুকু মানুষ সেই পরিমাণে আমাদের সকলের মধ্যে এটা আছে।

সাংসারিক অর্থে যাকে বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ বলে, আমরা যখন ক্রমে তাই হয়ে উঠি তখন এই অকারণ-আনন্দটাকে পাগলামি মনে করি। আমরা কতগুলো কাজের কথা শুধু যে শিখি তাই নয়, সেটাকেই যেন একমাত্র শিক্ষণীয় মনে করি।

এই পৃথিবীকে দেখবার এই দুটো ধরন আছে। একটা হল, এটাকে কাজের বিষয় ভাবা। আরেকটা অকাজের বিষয়, অকাজের বিষয় মানে আনন্দের বিষয়। অর্থাৎ উদ্দেশ্যরহিত আনন্দের বিষয়, অহেতুকী প্রীতির বিষয়। রবীন্দ্রনাথ শিশুর শিক্ষায় কাজের কথাটা বাদ দিতে চেয়েছিলেন তা নয়। কিন্তু ঐ অকাজের কথাটাকে তিনি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শনের এটা একটা প্রধান কথা— একটা মৌল দার্শনিক ভিত্তি বলা যেতে পারে।

আরেকটা কথা এইসঙ্গে এসে পড়ে। এই-যে আমরা প্রয়োজন এবং অপ্রয়োজনের জানার মধ্যে একটা পার্থক্য করেছি এই পার্থক্যটা করবার পরও এ দুয়ের মধ্যে একটা সম্পর্কের কথাও মনে রাখা দরকার। প্রকৃতির দ্বারা আমাদের কিছু প্রয়োজন সিদ্ধ হয় ; প্রকৃতি আমাদের ধারণ করে, লালন করে। আবার প্রকৃতি আমাদের আনন্দের ক্ষেত্র, যেমন শিশুর কাছে, যেমন শিল্পীর কাছে। মা তো শিশুর কাছে এই রকমই। মাও শিশুর কিছু প্রয়োজন মেটান, আবার মায়ের মধ্যে শিশু কিছু অকারণ আনন্দের ক্ষেত্র খুঁজে পায়। উল্টো করেও বলা যায়, শিশুর মধ্যে মা একটা অকারণ আনন্দের ক্ষেত্র খুঁজে পান, তা নইলে তিনি মা নন। এখন এ দুটোর মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে। যে মা শিশুর প্রয়োজন একেবারেই মেটাতে পারেন না সে মায়ের পক্ষে শিশুর কাছে অকারণ আনন্দের ক্ষেত্র হয়ে ওঠাটাও কঠিন। অতএব শিক্ষার ব্যাপারেও মানুষ এবং প্রকৃতির সম্পর্কের এমন একটা আদল গড়ে তুলতে হয় যাতে প্রকৃতি মানুষের কিছু প্রয়োজন পূর্ণ করবে, আবার প্রকৃতিকে মানুষ শিল্পীর মন নিয়ে, শিশুর মন নিয়ে, আনন্দের আর ভালোবাসার সামগ্রী হিসেবে গ্রহণ করতে পারবে।

প্রয়োজন পূর্ণ করার দিকটাও তা হলে গুরুত্বপূর্ণ। সেই কথাটা রবীন্দ্রনাথ ভালো করেই বুঝেছিলেন। ভালো করেই বুঝেছিলেন তখনই বিশেষত যখন গ্রামের মানুষের দারিদ্র্য তিনি চোখের সামনে দিনের পর দিন দেখলেন। এই অসহায় এবং দরিদ্র মানুষদের এমন শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন যাতে প্রকৃতির সহায়তায় মানুষের অভাব দূর করবার পথ প্রশস্ত হয়। বিজ্ঞানের সেটা একটা লক্ষ্য। রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞানকে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন, বিশেষত দরিদ্র পল্লীবাসীর অভাব দূর করবার কাজে। শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ের দিকে তাকালে যেমন আমরা শিশু এবং প্রকৃতির মধ্যে আনন্দের সম্পর্কটাই প্রথম দেখি, শ্রীনিকেতনের দিকে তাকালে তেমনি দরিদ্র গ্রামবাসী এবং প্রকৃতির মধ্যে বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রয়োজন মেটাবার প্রয়াসের দিকটা স্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করি।

আমি প্রথমেই বলেছিলাম যে প্রকৃতি একদিকে নিয়মে আবদ্ধ, অন্য দিকে প্রকৃতি অকারণ ভালোবাসার ক্ষেত্র— এ দুয়ের মধ্যে কোনোটাকেই তুচ্ছ করবার মতো কথা মনে করা যায় না। প্রকৃতি যে নিয়মে আবদ্ধ সেই নিয়মকেও জানা চাই। শ্রীনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ সেই কথাটা পরিষ্কারভাবে বলেছেন। প্রকৃতি যে নিয়মে আবদ্ধ, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যে নিয়মে চলে, সেটা যদি আমরা না জানি না বুঝি তবে আমাদের মনে নানা কুসংস্কার সহজে আশ্রয় পায়। এই বিশ্বপ্রকৃতি নিয়মে আবদ্ধ এ কথা জানলে সেই-সব কুসংস্কার ধীরে ধীরে দূর হয়। এই-সব কুসংস্কারকে কেন্দ্র করে মানুষের মনে অনেক অন্ধ ভয় জমে ওঠে। প্রকৃতি যে নিয়মে চলে সে কথা জানলে সেই-সব অন্ধভয় ধীরে ধীরে দূর হয়। মনের মুক্তির জন্য এটা প্রয়োজন। আবার প্রকৃতির নিয়ম জানবার ফলে আমরা প্রকৃতিকে নিজের প্রয়োজনে আরো পরিপূর্ণভাবে লাগাতে পারি, অতি সাধারণ ব্যাপারেও। মাটিতে কী সার দিতে হবে, কী করে ফসল ফলবে, এই সবের মূলেও তো বিজ্ঞান এবং নিয়ম আছে। শ্রীনিকেতনের পল্লীসংগঠনবিভাগ গড়বার কাজে প্রথম যুগে এলমহার্স্ট ছিলেন নেতৃস্থানীয়। তাঁর সঙ্গে পত্রালাপে এবং অন্যান্য লেখায় রবীন্দ্রনাথ খুবই পরিষ্কারভাবে বলেছেন যে বিজ্ঞানকে প্রয়োজন পল্লীসংগঠনের কাজে এই দুই উদ্দেশ্যেই— এক, মানুষের মনকে অন্ধভয় থেকে মুক্ত করবার জন্যে আর, দুই, বিজ্ঞানসম্মত কৃষিপ্রথা ও উৎপাদনব্যবস্থার জন্য।

এইখানে ব্যক্তির সঙ্গে প্রতিবেশীর সম্পর্কের কথাটাও এসে যায়। এতক্ষণ বলছিলাম প্রধানত ব্যক্তি বা মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্কের কথা। এখন আসছি প্রতিবেশীর সম্পর্কের বিষয়ে। প্রতিবেশীর ভিতর ব্যক্তি নিজের আত্মাকে প্রসারিত করে। আক্ষরিক অর্থে এবং দার্শনিক অর্থে আত্মীয়তার এটাই অর্থ। যদিও আত্মীয়তার গ্রাম্য অর্থ রক্তের সম্পর্ক নিয়ে তবুও তার বৃহত্তর দার্শনিক অর্থ যার ভিতর আত্মার সম্পর্ক প্রসারিত হয়েছে। যার ভিতর আমাদের আত্মার সম্পর্ক

প্রসারিত হয় নি সে রক্তের সম্পর্কে যদিও আত্মীয় হয় তবুও গভীরতর অর্থে সে আত্মীয় নয়। আর যাকে আমরা বন্ধু প্রতিবেশী বলে জেনেছি— সেই আত্মীয়।

আমাদের ভাষায় পাতানো দাদা দিদি, পাতানো মাসি পিসি, এইরকম অনেক সম্পর্ক থাকে। সে-সব রক্তের সম্পর্ক নয়, কিন্তু সেগুলো অনেক সময় আসল সম্পর্ক— যদি না সেগুলো মামুলী নিষ্প্রাণ হয়ে যায়। প্রতিবেশীও ঐরকম। যীশুখ্রীষ্ট এক সময় প্রশ্ন তুলেছিলেন, কে তোমার প্রতিবেশী ? এ নিয়ে অনেক আলোচনা সম্ভব। প্রতিবেশীর একটা আদর্শ রূপ ও সংজ্ঞা আছে। তাকেও আবার দুইভাবে ব্যবহার করা যায় প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কের মতোই। এক হল কাজের দিনে কাজের ভিতর, আরেক হল উৎসবের দিনে আনন্দের ভিতর। কাজের দিনে কাজের ভিতর প্রতিবেশী সম্পর্কের সবচেয়ে সার্থক রূপায়ণ হচ্ছে সমবায়ে। সমবায়ের ভিতর দিয়ে প্রতিবেশীরা একত্র হয়ে যাতে সকলের প্রয়োজন সুষমভাবে ন্যায়সংগত ভাবে সৃজনশীল ভাবে পূর্ণ হতে পারে এমন প্রচেষ্টা করে। আর উৎসবের দিনে মানুষ আনন্দের জন্যে, শুধুই আনন্দের কারণে মিলিত হয়। এই দুই মিলে প্রতিবেশী, এই দুই মিলে আদর্শ পল্লীসমাজ। আমাদের দেশে প্রাচীন মেলাতেও এই দুই একসঙ্গে এসে মিলেছিল, প্রয়োজন আর আনন্দের সেটা মিলনক্ষেত্র।

পল্লী কথাটার শেষ পর্যন্ত অর্থ ঐ। এই-যে পৃথিবীজোড়া মানুষ, এদের সকলের সঙ্গে তো আমাদের সোজাসুজি পরিচয় ঘটে না, আমরা তো প্রত্যেকের চোখে চোখ রেখে কথা বলতে পারি না, প্রত্যেকের সঙ্গে তো আমাদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপিত হয় না। এ ওকে চেনে, একে অন্যকে আত্মীয় বলে মানে। এই নিয়ে পল্লীসমাজ। বাস্তবে অবশ্য তার ভিতর অনেক কলহ কলঙ্ক থাকে, হিংসা দ্বন্দ্ব সবই থাকে। বাস্তবটা জানা নিশ্চয়ই প্রয়োজন। কিন্তু শুধু বাস্তব যদি আমরা জানি, আদর্শ যদি না জানি, তবে শিক্ষার প্রশ্ন নেই। আদর্শ যদি না জানি তবে কিসের দিকে আমরা এগবার চেষ্টা করছি ? কিসের জন্য আমরা নিজেকে নতুন করে গড়বার চেষ্টা করব ? আগেই বলেছি, যদিও শিক্ষার শুরু অপূর্ণতাতে তবু শিক্ষা তখনই সম্ভব এবং সার্থক যখন একটা পূর্ণতার দিকে যাবার ধারণাও সেইসঙ্গে থাকে। কাজেই বাস্তব পল্লীসমাজকে জানতে হয়, কিন্তু একটা আদর্শ পল্লীসমাজের চিত্রও সেইসঙ্গে প্রয়োজন। বাস্তব পল্লীকে রবীন্দ্রনাথ জানতেন না এমন নয়। গ্রামকে তিনি ভিতর থেকে দেখেছেন। তাঁর ছোটো গল্পগুলো পড়লেই বোঝা যায় যে তিনি বাস্তব পল্লীকে ভালোভাবেই জানতেন। তবে বাস্তব পল্লী তো আরো অনেকের লেখাতে রূপায়িত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধে আরো পাই একটা আদর্শ চিত্র, যেমন 'স্বদেশী সমাজ' নামে সেই বিখ্যাত লেখায়। বাস্তব থেকে আদর্শে যাবার পথে বিজ্ঞান ও সমবায় এবং কোনো একটা গভীর অর্থে আত্মীয়তা অথবা আত্মবিধৃত আনন্দের ধারণা, এই-সব মিলে তিনি পল্লীকে স্থান দিয়েছিলেন তাঁর শিক্ষাচিন্তার ভিতর। বিশ্বভারতীর অংশ যেমন শান্তিনিকেতন তেমনি শ্রীনিকেতন। আর শ্রীনিকেতনের প্রথম কথাটাই পল্লীসংগঠন নিয়ে। পল্লীসংগঠন— অথবা রবীন্দ্রনাথ কখনো পল্লীসঞ্জীবন কথাটাও ব্যবহার করেছেন— তারই সঙ্গে সম্পর্ক রেখে বিদ্যালয়ের শিক্ষা। অনেকেই জানেন, শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ই একমাত্র নয়, শ্রীনিকেতনে আরো একটি বিদ্যালয় রবীন্দ্রনাথ স্থাপন করেছিলেন এবং একদিন এমন সিদ্ধান্তেও এসেছিলেন যে, শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ের চেয়েও শ্রীনিকেতনের বিদ্যালয়ের তাৎপর্য বেশি, দেশের গভীরতর প্রয়োজনের সঙ্গে তার সম্পর্ক।

এর পর আসছে মানুষের সঙ্গে বিশ্বমানবের সম্পর্কের কথা। যাকে আমরা আত্মীয়তার সম্পর্ক বলেছি সেটা অনেক সময় একটা সীমাবদ্ধ গোষ্ঠীর সম্পর্ক। পল্লীসমাজ হাতের কাছের উদাহরণ, কিন্তু আরো বড়ো বড়ো গোষ্ঠীকেও আত্মীয়তার সম্পর্কের আদলেই চিন্তা করা হয়। জাতি বা ধর্মকে ভিত্তি করে যে-সব সম্পর্ক সেখানেও এক ধরনের আত্মীয়তার সম্পর্ককে মৌল বস্তু বলেই মনে করা হয়। এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। তবু সতর্ক হবার প্রয়োজন আছে। কারণ এই ধরনের সীমাবদ্ধ আত্মীয়তার সম্পর্কগুলো অতি সহজে অনাত্মীয় শত্রু খুঁজে নেয়। তখন সেটা বিরোধী আত্মীয় গোষ্ঠীর ভিতরে যুদ্ধের ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ায়। সেটাই আত্মীয় সম্পর্কের আদর্শরূপের বিপরীত। আমরা যখনই কোনো আদর্শরূপ নিয়ে চিন্তা করি তখনই তার বিপরীতটা সম্পর্কেও সতর্ক হতে হয়। রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন কীভাবে জাতীয়তাবাদ একটা জঙ্গীরূপ ধারণ করে, চীনকে আক্রমণ করে জাপান, ইউরোপের নানা জাতি মেতে ওঠে যুদ্ধের অমানুষিক উত্তেজনায়।

এই-সব দেখে, এই কথাটাই তিনি বুঝেছিলেন যে, তাঁর শিক্ষা সম্পর্কে যে ধারণা তাতে যদিও স্বদেশী সমাজের কথা থাকবে তবুও সমানভাবেই রাখা প্রয়োজন বিশ্বমানবতার কথাও। আর সেইজন্যই তিনি যে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করলেন তার নাম দিলেন বিশ্বভারতী। এইখানে স্বদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েও তিনি আমন্ত্রণ জানাতে পারবেন বিশ্বকে। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে ও শিক্ষাচিন্তায় একদিকে রইল পাশের গ্রাম সুরুল যার উন্নয়নের জন্য শ্রীনিকেতন, আর অন্য দিকে বিশ্বমানব, সমস্ত বিশ্ব। সারা বিশ্ব থেকে জ্ঞানীগুণী মানুষকে তিনি আমন্ত্রণ জানালেন তাঁর ছোটো শান্তিনিকেতনে, যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্। চীন থেকে জাপান থেকে ইউরোপ আমেরিকার নানা দেশ থেকে বহু জ্ঞানীগুণী মানুষকে তিনি টেনে এনেছিলেন তাঁর শান্তিনিকেতনে। এই বিশ্বমানবতা তাঁর শিক্ষাদর্শের পূর্ণতার জন্য আবশ্যিক।

কথাগুলোকে এবার একত্র সংগ্রহ করে দেখা যাক। শিক্ষার ভিতর দিয়ে মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক পূর্ণ হয়ে ওঠে। একদিকে সেটা আনন্দের সম্পর্ক, অন্য দিকে জ্ঞানবিজ্ঞানের সম্পর্ক। শিক্ষার ভিতর দিয়ে মানুষ আরো শেখে তার প্রতিবেশীর সঙ্গে সাথকভাবে যুক্ত হতে। বিজ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সমবায়ের বাহনে দূর হয় দারিদ্র্য। শিক্ষার ভিতর দিয়ে মানুষ একটা স্বাভাবিক আনন্দকে উৎসবের পর্যায়ে তুলে নিতে শিখুক এটাও ছিল কবির আকাঙ্ক্ষা, যার কিছু পরিকল্পিত অনিন্দ্যসুন্দর রূপও তিনি সৃষ্টি করে গিয়েছিলেন। আবার ছোটো গোষ্ঠী যেন কোনো বিরোধী গোষ্ঠীর সঙ্গে দ্বন্দ্বের ভিতরই তার চরম অর্থ খুঁজতে না যায়, ছোটো গোষ্ঠীকে যাতে শেখানো হয় যে, সব গোষ্ঠীরই সার্থকতা বৃহত্তর কোনো মানবসমবায়ের জন্যে নিজেকে সেবা ও আনন্দে সার্থক করে তোলার ভেতর, এই দিকেও দৃষ্টি রাখতে হবে। সেইজন্য স্বদেশী সমাজের ধারণার সঙ্গে যোগ করতে হয় মানুষের ধর্মের ধারণাকে।

শান্তিনিকেতনের প্রাঙ্গণে রবীন্দ্রনাথ রাজনীতিকে সহজে ঢুকতে দিতেন না। তারও একটা কারণ ছিল। রবীন্দ্রনাথ রাজনীতিসচেতন ছিলেন না এমন তো নয়। তাঁর রাজনীতিবিষয়ক নানা ভাষণ ও কর্ম দেশবাসীর অজানা নয়। তাঁর জীবনের শেষ চল্লিশ বছরে এর উদাহরণের অভাব নেই। নানা তেজস্বী ভাষণ এবং কর্মের উল্লেখ করা যায় সহজেই। অথচ অতখানি রাজনীতিসচেতন হয়েও শান্তিনিকেতনের প্রাঙ্গণে তিনি দলীয় রাজনীতিকে ঢুকতে দিতে চাইতেন না। তার একটা কারণ অবশ্য এই যে, রাজনীতির সঙ্গে প্রায় অনিবার্যভাবে বড়ো বেশি দলাদলি এসে যায়। আশ্রমপ্রাঙ্গণকে সেই দলাদলি থেকে তিনি মুক্ত রাখতে চেয়েছিলেন। আরো একটা কথা আছে। রাজনীতির প্রধান কাজটা হল ক্ষমতা নিয়ে দ্বন্দ্ব। প্রথমে সেটা ছিল বিদেশীর হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেবার প্রশ্ন। তার পর একদলের হাত থেকে অন্যদলের ক্ষমতা কেড়ে নেওয়াটাই প্রধান হল। ক্ষমতা নিয়ে দ্বন্দ্ব রাজনীতির একটা মৌল ব্যাপার। সেই দ্বন্দ্বের ভালোমন্দ যাই থাকুক, প্রয়োজন যাই থাকুক, রবীন্দ্রনাথ জানতেন যে তার বাইরেও একটা বড়ো কাজ আছে। গান্ধীর যেমন রাজনীতির পাশে ছিল একটা গঠনমূলক কার্যক্রম, রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় ছিল পল্লীসংগঠন এবং মানুষের জীবনে কতগুলো আদর্শকে মূল্যবান বলে শুধু দার্শনিকভাবে প্রচার করা নয়, জীবনচর্যার ভিতরেও প্রতিষ্ঠিত করার সংকল্প। এই ধরনের কিছু কাজকে তিনি গভীরভাবে গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন, যে কাজ কখনো রাজনীতির ভিতর দিয়ে পূর্ণ হয় না। যাঁরা রাজনীতি করবেন, সক্রিয় রাজনীতি, তাঁরা তো সে কাজের জন্য আছেনই। রবীন্দ্রনাথ অনুভব করেছিলেন যে, তাঁর যেটা বিশেষ প্রতিভা তাকে তিনি মানুষের কাজে নিযুক্ত করতে পারবেন অন্য এক গঠনমূলক ও সৃজনশীল কর্মের ভিতর দিয়ে, যেটাকে রাজনীতির আবর্ত থেকে অনেকখানি দূরে রাখাই ভালো। প্রশ্নটা এই নয় যে, শিক্ষা ভালো কি রাজনীতি ভালো ; প্রশ্নটা এই যে, শিক্ষাকে রাজনীতির হাতে তুলে দেওয়া ভালো কি না। রবীন্দ্রনাথ স্থির করেছিলেন যে, শিক্ষাকে রাজনীতির নিয়ন্ত্রণ থেকে যথাসম্ভব মুক্ত রাখাটাই মঙ্গলজনক। শান্তিনিকেতনে তিনি সেটাই যথাসম্ভব চেষ্টা করেছিলেন।

শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ কাজ শুরু করেছিলেন এই শতকের গোড়ায়। আজ শতাব্দী অবসিত হতে চলেছে। তাঁর শিক্ষাচিন্তা তবু প্রাসঙ্গিকতা হারায় নি। বরং কালের এই ব্যবধানে দাঁড়িয়ে আমরা আরো নিশ্চিতভাবে জানি যে, ঐ-সব চিন্তা শুধু অতীতের নয়, বর্তমান আর ভবিষ্যতেরও। পল্লী ও নগরের ভিতর বিচ্ছিন্নতা অতিক্রম করতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। স্বাধীনতালাভের পর এ দেশে যে শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠেছে তাতে ছাত্রসমাজের ভিতর একটা

গভীর বিভেদ ক্রমে দৃঢ় হচ্ছে। একদিকে আছে সেই অতিনাগরিক ছাত্রগোষ্ঠী, স্বদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে যাদের যোগ অতিসামান্য, এ দেশটাকে গড়ে তুলবার চিন্তা যাদের উদ্‌বুদ্ধ করে না, বরং বিদেশে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই যাদের অভিলাষ। অন্য দিকে পাই গ্রাম ও ছোটো শহর থেকে আগত সদ্যশিক্ষিত গোষ্ঠী, ইংরেজির সঙ্গে যাদের পরিচয় কম, বিশ্বের সঙ্গেও সেই মতো, যাদের চিন্তার দিগন্ত আঞ্চলিক। আগামী শতকের ভারত গড়বার কাজে নেতৃত্ব তবে আসবে কোন্ পথে ? সমস্যার এই এক রূপ। সত্যের সঙ্গে মানুষের, মানুষের সঙ্গে মানুষের, বিচ্ছিন্নতা আরো নানা রূপে ছড়িয়ে আছে বিশ্বময়। বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতা তো সমাজের ভিতর আছেই। কিন্তু শিক্ষা যখন তাকে আরো বাড়িয়ে তোলে তখন শিক্ষাব্রতীর কাছে সেটা বিশেষ দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে ওঠে। সেটাকে তখন বলি, শিক্ষার বিকার। কোথাও সৃজনশীলতা আর আনন্দের পথ রোধ করে দাঁড়ায় বিদ্যালয়, মানুষের ব্যক্তিত্বকে করে পঙ্গু, সেই পঙ্গুতা থেকে আসে ধ্বংসাত্মক আক্রোশ। কোথাও শেখানো হয় স্বজাতির শ্রেষ্ঠত্ব, বিজাতি ও বিধর্মীর প্রতি সন্দেহ, মানুষের ঐক্যের অস্বীকৃতি।

বিচ্ছিন্নতা দূর করবার পথ রচনা করতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। যে সমন্বয়সাধন তাঁর শিক্ষাদর্শের মূল কথা সেটা শুধুই কবির কল্পনা নয়। এ যুগের সংকটের সঙ্গে তার যোগ। এইখানে তার বাস্তবতা, তার গভীরতর প্রাসঙ্গিকতা।*

* ঢাকায় বাংলা একাডেমীর বিশেষ সভায় ২৪ মে ১৯৮৬ সালে প্রদত্ত মৌখিক ভাষণের ভিত্তিতে লিখিত।

'শিক্ষার মিলন' ও 'শিক্ষার বিরোধ'

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮৯৩ সালে 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধ দিয়া যাহার সূচনা, ১৯৩৭ সালে 'ছাত্রসম্ভাষণে' তাহার পরিসমাপ্তি— প্রায় চুয়াল্লিশ বৎসর ধরিয়া রবীন্দ্রনাথ তেইশটি প্রবন্ধ, আলোচনা, ভাষণ, অভিভাষণ ও সমালোচনায় শিক্ষার তাত্ত্বিকতা ও প্রয়োগগত সমস্যা লইয়া সুদীর্ঘ, সুশৃঙ্খল ও যুক্তিক্রমানুসারী আলোচনা করিয়াছেন। প্লেটোর 'Republic' হইতে আরম্ভ করিয়া রোমের পণ্ডিতদের অধীনে Tribium অর্থাৎ ত্রিবিদ্যা (ব্যাকরণ, তর্কশাস্ত্র, অলংকারশাস্ত্র) এবং তাহার সীমা বাড়াইয়া Quadrivium অর্থাৎ চতুর্বিদ্যার (জ্যামিতি, গণিত, সংগীত, জ্যোতির্বিদ্যা) প্রচারকগণ যেভাবে শিশু, বালক ও তরুণের শিক্ষার জন্য ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা তাহার মতো সংকীর্ণ খাতে বহমান নহে। মধ্যযুগের 'literator' অর্থাৎ স্কুলমাস্টারগণ য়ুরোপীয় বালকদের কতটুকু শিখাইতে পারিত ? ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলংকারের যৎকিঞ্চিৎ, কাব্য, ইতিহাস, দর্শনশাস্ত্র এবং গ্রীকভাষা— এই পর্যন্ত তাঁহাদের শিক্ষাব্যবস্থার পরিসর। বোধহয় কুইন্টিলিয়নের (খ্রীঃ ৪০-১০০ অব্দ) ইনস্টিটিউশন অরাটোরিও-তে সর্বপ্রথম শিশুশিক্ষা হইতে আরম্ভ করিয়া বয়স্ক শিক্ষার ক্রম ও প্রণালী ব্যাখ্যাত হইত। রেনেসাঁসের যুগে ইরাসমাস (১৪৬৭-১৫৩৬), মেলাংথন (১৪৯৭-১৫৬০) এবং তাঁহাদের শিষ্যপ্রশিষ্যের দল লাটিন ভাষা শিক্ষার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন। ক্রমে য়ুরোপে, বিশেষত ইংল্যান্ডে হেলেনিক সংস্কৃতির মূল বাণী অর্থাৎ মানবতন্ত্রবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্প্রসারিত হইল। কোমেনিয়াস (১৫৯১-১৬৭১) শিক্ষাসংক্রান্ত একাধিক গ্রন্থ লিখিয়া স্কুলমাস্টারদের শিক্ষাপদ্ধতিকে অনেকটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে পেস্টালোৎজি (১৭৪৬-১৮২৭) এবং ফ্রোয়বল্ (১৭৮২-১৮৫২) তাঁহার অনেকগুলি রীতিপদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। শিশুকে ক্রমে ক্রমে শিক্ষার অভিজ্ঞতা ও পরিবেশের মধ্য দিয়া মানুষ করিয়া তুলিতে হইলে তাহার মানসিক প্রবণতা সর্বাগ্রে লক্ষ্য করিতে হইবে। বোধ হয় রুশো (১৭১২-১৭৭৮) সর্বপ্রথম তাঁহার *Emile* (১৭৬২) গ্রন্থে শিশুর মানসিক প্রবণতার উপর অধিক গুরুত্ব দিয়াছিলেন। পেস্তালোৎজি তাঁহার রচনা হইতে শিক্ষার বাস্তব দিকটি উপলব্ধি করিয়া শিশুকে তাহার শিশুত্বের মধ্যে শিক্ষাপ্রকরণ স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। পেস্তালোৎজির শিক্ষাদর্শই ফ্রোয়বলের নিয়মপদ্ধতিকে বৈজ্ঞানিক ক্রমপর্যায়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার মতে, শিশু, বালক ও তরুণ তখনই যথার্থ শিক্ষা লাভ করে, যখন শিক্ষক তাহাদের বয়োধর্ম ও চরিত্রের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সম্যক অবহিত হন। বালক-বালিকাদের যথাযথ পরিবেশে স্থাপন করিতে পারিলে তাহারা সহজেই কাজ ও খেলাকে একসূত্রে মিলাইতে পারিবে। অর্থাৎ শিক্ষাকে তাহারা জুজুর মতো ভয় করিবে না এবং খেলাকেও লঘু মুহূর্তের পলায়নী অবকাশ বলিয়া মনে করিবে না।

মারায়া মন্টেসোরি (১৮৭০-১৯৫২) ১৯০৬ সালের দিকে জড়বুদ্ধি বালক-বালিকার শিক্ষা ও মনঃপ্রকৃতির গঠনের জন্য যে বৈজ্ঞানিক মনোবিদ্যা অবলম্বন করিয়াছিলেন, ১৯০৯ সালের দিকে শিশুশিক্ষা ও মনের গঠনে তাঁহার পদ্ধতি পৃথিবীর সর্বত্র স্বীকৃত হইয়াছে। শুধু য়ুরোপ-আমেরিকায় নহে, এ দেশেও (মাদ্রাজ, করাচি, সিংহল, পুনা) শিশুশিক্ষার পরীক্ষাকেন্দ্রগুলিকে নূতনভাবে সঞ্জীবিত করেন। তাঁহার মতে শিশু ও বালকের শিক্ষাদানের মূল উদ্দেশ্য হইবে তাহাদের স্বাভাবিক বুদ্ধি ও কল্পনার নির্বাধ বিকাশের সুযোগ দান। একালে তাঁহার পদ্ধতি স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয়,

কোম্‌নিয়াস, পেস্টালোৎজি, ফ্রোয়বল্ এবং মন্টেসোরি শিশু ও বালক-বালিকার শিক্ষাসংক্রান্ত যে-সমস্ত রীতিপদ্ধতির কথা বলিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ তৎ-সংক্রান্ত কেতাবি বিদ্যা আয়ত্ত না করিয়াও বালকদের শিক্ষাকে যে-রীতিতে চিন্তা করিয়াছিলেন তাহার সহিত শিশুশিক্ষা-বিশেষজ্ঞদের অভিমতের আশ্চর্য সাদৃশ্য আছে। অথচ তিনি বৃত্তির দিক দিয়া শিক্ষাব্যবসায়ী ছিলেন না।

বাল্যকালে শিশুশিক্ষা নামে যে খাঁচার মধ্যে তিনি কিছুদিন বন্দী-জীবন যাপন করিয়াছিলেন তাহা হইতেই এই-সমস্ত শিক্ষাপ্রণালীর অভিশাপ নিদারুণভাবে ভোগ করিয়াছিলেন। তাই দেখা যাইতেছে, ব্রহ্মচর্য আশ্রম খুলিয়া, বালশিক্ষার নূতন পরিবেশ রচনা করিয়া, হাতেকলমে শিক্ষার জীবন্ত রূপটি প্রত্যক্ষ করিবার অভিপ্রায়ে দীর্ঘ দিন ধরিয়া যাহা চিন্তা করিয়াছিলেন তাহাই প্রায় অর্ধশতাব্দী (১৮৯৩-১৯৩৭) ধরিয়া নানা প্রবন্ধ, বক্তৃতা ও আলোচনায় ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শিক্ষা যে বৃত্তি শিখাইবার কল নহে, বাঁধা বুলি মুখস্থ করিয়া ইহজগতে সাফল্যলাভের একমাত্র চাবিকাঠি নহে এই কথাটা সমগ্র জীবন ধরিয়া তিনি বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। দেশীয় বালকের সঙ্গে বিদেশী শিক্ষাপদ্ধতির জোড়কলম বাঁধিবার হাস্যকর অবস্থাটা তিনি নানাভাবে দেখাইয়া দিয়াছেন। শিক্ষার মান, ভাষা, বিষয় ও পদ্ধতি কেমন হওয়া উচিত, শিক্ষক ও ছাত্রের মানসিক গঠন, প্রবৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির সম্পর্কই বা কী, এই সম্পর্কে তিনি শুধু অলস চিন্তায় অবসর যাপন করেন নাই, ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হইতে বিশ্বভারতী স্থাপনা পর্যন্ত, শিক্ষার নানা রূপ ও রীতি তিনি হাতেকলমে পরীক্ষা করিয়াছেন। যাঁহারা বাঁধাপথের শিক্ষাবিধি ধরিয়া নিরাপদ জীবনের সৌধ রচনা করিতেন, তাঁহারা মনে করিলেন রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাবিষয়ক চিন্তা কবিজনোচিত কাল্পনিকতা মাত্র। তিনি যে প্রাচীন ভারতের আশ্রম ও গুরুকুলকে আধুনিক জীবনের ইট-কাঠ-পাথরের মধ্যে আনিতে চাহিতেছেন তাহাও দুরাশা এবং একপ্রকার রোমান্টিক অতীতচারিতা, যাহাতে মেঘডম্বর যতটা আছে, বর্ষণ ততটা নাই। কিন্তু এই-সব সংশয়ীদের চিন্তার দুর্বলতা ও সিদ্ধান্তের ভীরুতা ছাড়িয়া দিলে দেখা যাইবে, রবীন্দ্রনাথ মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের প্রস্তাব শুধু সমর্থন করেন নাই, কাজেও দেখাইয়াছেন। আরো দেখাইয়াছেন, বিজ্ঞান শুধু পরীক্ষাগারের চারি দেওয়ালের মধ্যে নাই, তাহার স্থান ক্লাসঘরের বাহিরে, হাটে মাঠে, মাটিতে। আমাদিগকে ভারতের নিজস্ব ধাতুপ্রকৃতি অনুসারে আধুনিক জীবনে চলিবার উপযোগী শিক্ষাকে একসূত্রে বাঁধিতে হইবে। ইংরাজি আমাদের মাতৃভাষা নহে, প্রাণপণ চেষ্টা করিলেও ইহা কোনোদিনই আমাদের প্রাণের ভাষা হইতে পারিবে না, বড়ো জোর কাজের ভাষা হইবে। কিন্তু পশ্চিম দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া শুধু প্রাচীনভারতের হোমধূমপূত এবং বেদধ্বনিমুখরিত স্বপ্ন দেখিলেই চলিবে না, ভারতবর্ষকে পাশ্চাত্য জগতের জ্ঞানভাণ্ডারও আয়ত্ত করিতে হইবে। অন্নং বহু কুর্বীত বলিলেই অন্নের সমস্যা মিটিবে না, তাহাকে বিজ্ঞানের মধ্য দিয়ে ভূরিপরিমাণে ফলাইতে হইবে। তাহার জন্য মাটি, হালবলদ যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন য়ুরোপের ভূমি ও কৃষিবিজ্ঞান এবং পরিবেশ-বিজ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষা। এ দেশের জলবায়ু-মাটির সহিত সেই লব্ধ বিদ্যাকে মিলাইয়া দিতে হইবে।

শাস্ত্র বলিতেছেন, অবিদ্যার সাধনা করিয়া মৃত্যু উত্তীর্ণ হইতে হইবে, তার পর বিদ্যার সাধনা— অমৃতের সাধনা। বস্তুবিদ্যা, যন্ত্রবিজ্ঞান, ভিষকশাস্ত্র— আরো নানা বিদ্যা, শাস্ত্র, বিজ্ঞান, যাহা হয়তো অধ্যাত্মবিদ্যা নহে এবং তদ্দ্বারা অধ্যাত্মবিদ্যা লাভ করাও যায় না। কিন্তু তাহার সাধনা না করিলে পঞ্চভূতাত্মক দেহটাকে কীভাবে রক্ষা করা যাইবে? ব্যাধি, পীড়া, বিপর্যয়, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, শীতাতপের পীড়ন, জলোচ্ছ্বাস, প্লাবন, মহামারী— ইহাদের আক্রমণ হইতে দুর্বল দেহযন্ত্রটাকে কীভাবে রক্ষা করা যাইবে? দেহ নিপাত গেলে অধ্যাত্মবিদ্যা দাঁড়াইবে কোথায়? আত্মার যেমন দেহ-আধারের প্রয়োজন, তেমনি দেহকে রক্ষা করিবার জন্য অ-বিদ্যার অনুশীলনও প্রয়োজন। আমরা অধ্যাত্মবাদী বলিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া ইষ্টনাম জপ করিলে মৃত্যু ছাড়িয়া দিবে না। একদা ভারতবর্ষ অবিদ্যারও যথেষ্ট চর্চা করিয়াছিল, নাস্তিক ও সংশয়বাদীদের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প ছিল না ; লোকায়তিক, বার্হস্পত্য, চার্বাকপন্থীরা তো কোনো পারমার্থিক সত্তাকেই মানিত না। বস্তুর বাহিরে সত্য নাই, এমন কথা বলিতেও কেহ কেহ কিছুমাত্র সংকোচ বোধ করেন নাই। ধনুর্বেদ, আয়ুর্বেদ— সবই প্রত্যক্ষ জীবনের ব্যাপার। অধ্যাত্মশাস্ত্রের পার্শ্বেই কামশাস্ত্র বুক ফুলাইয়া বসবাস করিয়াছে। উপনিষদ

গীতার সঙ্গে অনঙ্গরঙ্গ ও কুট্টনীমতম্ টীকা-টিপ্পনীসহ অবিরোধে ঘর বাঁধিয়াছে। শুনা যায় মণ্ডনমিশ্রের বিদুষী পত্নী উভয়ভারতী তর্কে পরাজিত করিবার অভিপ্রায়ে আজন্মব্রহ্মচারী শঙ্করাচার্যকে কামশাস্ত্র সম্পর্কে কয়েকটি গূঢ় প্রশ্ন করিলে আচার্য তাহার যথোচিত উত্তর খুঁজিবার জন্য একবৎসর সময় চাহিয়া লইয়াছিলেন। ইহাতে মনে হইতেছে সেকালের সমাজে বিদ্যা ও অবিদ্যা, অন্যকথায় পরাবিদ্যা ও অপরাবিদ্যা ভাই-বোনের মতো পাশাপাশি বাস করিত। সুতরাং জীবনের শিক্ষা পুরা করিতে হইলে বিদ্যা ও অবিদ্যা— দুয়েরই চর্চা করিতে হইবে। গার্হস্থ্য-আশ্রমবাসী ব্যক্তি ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ সমভাবে প্রত্যেকটির সেবা করিবেন, যিনি কেবল একটিতে (হোক তাহা মোক্ষ) লগ্ন হইয়া থাকেন শাস্ত্র তাঁহাকে জঘন্য বলিয়াছেন। অতএব আধুনিক ভারতবর্ষকে যদি আত্মশক্তিতে জাগ্রত করিতে হয় তাহা হইলে 'বলা' ও 'অতিবলা' দুই মন্ত্রেরই সাধনা প্রয়োজন। একটিতে পার্থিব শক্তি, অপরটিতে আত্মার বিকাশ। দুই পদক্ষেপে মানুষের চলা অব্যাহত থাকে, গতিটি সুষ্ঠু হয়, চলাকে বাদ দিয়া যাহারা স্থাণুত্বের সাধনা করে, তাহারা 'ইতো ভ্রষ্টস্ততো নষ্ট : ন পূর্ব ন পর'— হইয়া মূঢ়ত্ব প্রাপ্ত হয়। অপর দিকে যাহারা উদ্দাম অনিবার চলাটাকে জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করে তাহারা দিনশেষে হিসাব করিলে দেখিবে, তাহারা একস্থানে খাড়া থাকিয়া চলার ভান করিয়াছে। মনে হইতেছে, চলিতেছি, আসলে "আপনারে শুধু ঘেরিয়া ঘেরিয়া ঘুরে মরি পলে পলে।" যিনি স্থিতধী, সত্যসন্ধ ও সিসৃক্ষু, তিনিই যথার্থ গতি ও বিরতির সামঞ্জস্য করিতে পারেন। শিক্ষার অর্থ— এই দুই বৈপরীত্যের স্বাঙ্গীকরণ। রবীন্দ্রনাথ ১৯২১ সালে "শিক্ষার মিলন" শীর্ষক প্রবন্ধে সুচিন্তিত যুক্তিক্রমের সাহায্যে এই মিলন দেখাইতে গিয়া বিপাকে পড়িয়াছিলেন এবং শরৎচন্দ্রের কলমের খোঁচায় কিছু বিব্রত বোধ করিয়াছিলেন। এইবার সেই প্রসঙ্গে আসা যাক।

২

রবীন্দ্রনাথ ১৯২০ সালের ১২ মে হইতে ১৯২১ সালের জুলাই মাসের মাঝামাঝি— প্রায় চৌদ্দ মাস য়ুরোপ-আমেরিকা ভ্রমণ করিয়া ১৬ জুলাই শান্তিনিকেতনে প্রত্যাবর্তন করিলেন। বিদেশে বাস করিয়া তিনি পশ্চিমের প্রাণবহুল কর্মযজ্ঞ ও শিক্ষাব্যবস্থা অত্যন্ত নিকট হইতে লক্ষ্য করিয়াছিলেন। ভারতে তখন অসহযোগ আন্দোলনের যুগ, খিলাফৎ আন্দোলন চলিতেছে। রবীন্দ্রনাথ মহাত্মা গান্ধীকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিলেও তাঁহার কোনো কোনো কর্মপন্থা সমর্থন করিতে পারেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন : "I refuse to waste my manhood in lighting the fire of anger and spreading it from house to house." এই আগুনের আঁচ যেন শান্তিনিকেতনকে স্পর্শ না করে। "Santiniketan must be saved from the whirlwind of dusty politics." মহাত্মা গান্ধী খিলাফৎ লইয়া নিষ্ফল আন্দোলন করিতেছেন। তিনি কি ইতিহাসের চাকা উল্টাদিকে ঘুরাইয়া দিতে চাহেন ? অ্যান্ড্রুজের নিকটে লেখা চিঠিতে তাহা কবুল করিতে দ্বিধা বোধ করিলেন না। এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথকে মহাত্মা গান্ধী অপেক্ষা দূরদর্শী বলিতে হইবে। তুর্কীরাই কামাল আতাতুর্কের নেতৃত্বে ১৯২৪ সালে খলিফা পদ বাতিল করিয়া তুরস্ককে আধুনিক রাষ্ট্র বলিয়া ঘোষণা করিল। ইহাই ইতিহাসের নির্দেশ, যাহা রবীন্দ্রনাথ যেন দিব্যদৃষ্টিতে দেখিতে পাইয়াছিলেন। অবশ্য তখন ভারতে যেমন অশান্তির দক্ষযজ্ঞ চলিতেছিল, তেমনি য়ুরোপেও তো শান্তি ছিল না। বুদ্ধিজীবী দানবশক্তির অনলনিশ্বাস এবং অস্ত্রভাণ্ডারের ভয়াবহ ঝন্‌ঝনা য়ুরোপের নিরীহ মানুষকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছিল রবীন্দ্রনাথ তাহাও লক্ষ্য করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষ য়ুরোপের মতো ম্যামনের পূজা করে না, কুবেরকে হৃদয়ের ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদনও তাহার স্বভাববিরুদ্ধ। মহাতাপস শিবই ভারতের প্রতীক, অন্তত হিন্দুভারতবর্ষের। কুবের যাঁহার ভাণ্ডারী এবং অন্নপূর্ণা যাঁহার গৃহিণী, শ্মশানেমশানে তাঁহার অধিষ্ঠান, দারিদ্র্যই তাঁহার ভূষণ। আমাদের মধ্যবিত্ত সাধারণ ব্যক্তি মাঝে মাঝে অভাবে অনটনে কাতর হইয়া পড়ে বটে, কিন্তু অল্পেই সে অবস্থা কাটাইয়া উঠিতে পারে, শান্তম্, শিবম্, অদ্বৈতম্ কেবল কথার কথা নহে। তাহাই ভারতের একমাত্র অন্বেষ্টব্য। কিন্তু পশ্চিমের শিব শান্তও নহেন, অদ্বৈতও নহেন। তাঁহার ঝোলাঝুলি খুঁজিলে ব্যাঙ্কের পাসবহি বাহির হইয়া পড়িতে পারে। অবশ্য ভারতীয় শিব ও পশ্চিমের শিবের একস্থানে মিল আছে। উভয়ের গৃহিণীই গৌরাঙ্গী। কিন্তু পরিহাসের কথা থাক্।

ভারত যেখানে সাধকের কৃপা ভিক্ষা করে, পশ্চিম সেখানে 'an·efficient accountant' হইয়া হিসাবের খাতা খুলিয়া বসে। উগ্র স্বদেশপ্রেমী ব্যক্তি এবং নিছক নীতিবাগীশ মানুষ মনুষ্যত্বের আধখানাও নহে, এ কথা কবুল করিতে রবীন্দ্রনাথ সংকুচিত হন নাই। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি বৈরাগ্যের নামে শূন্য ঝুলিরও সমর্থন করেন নাই। শুধু রাজনৈতিক আন্দোলনের দ্বারা স্বরাজলাভ ভারতের একমাত্র উদ্দেশ্য নহে, ন্যাশনালিজ্‌ম্‌-এর লূতাতন্তু হইতে মুক্ত হইতে না পারিলে ভারতবর্ষের ভরাডুবি হইবে— ইহা তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস। শুধু চরখা ঘুরাইয়া দেশের স্বাধীনতা আসিবে, অর্থনীতির দিক হইতে চরখার সুতা দেশকে অন্নবস্ত্রে স্বয়ম্ভর করিয়া তুলিবে, এরূপ অবৈজ্ঞানিক, অনৈতিহাসিক ভোজবাজিতে তাঁহার বিশ্বাস ছিল না। মহাত্মা গান্ধীকে তিনি শ্রেষ্ঠ মানুষ বলিয়া শ্রদ্ধা করিলেও তাঁহার কোনো কোনো অবৈজ্ঞানিক মত মানিতে পারেন নাই, তাহার পরিচয় মিলিবে 'কালান্তরে'। যাহা হউক, তাঁহার দেশে ফিরিবার পূর্বে এ-দেশে অসহযোগ আন্দোলন তুঙ্গে উঠিয়াছে, প্রিন্স অব ওয়েল্‌স্‌-এর আগমন উপলক্ষে বোম্বাই নগরীতে দাঙ্গা বাধিয়া যায়, তাহাতে পঞ্চাশ জন নিরীহ মানুষ নিহত হইল, আহতের সংখ্যা চারিশতকেও ছাড়াইয়া গেল। যুক্তপ্রদেশের চৌরীচৌরাতে জনসাধারণ ক্ষিপ্ত হইয়া থানায় আগুন লাগাইয়া দেয়, ফলে একুশ জন সিপাহি ও চৌকিদার জীবন্ত দগ্ধ হয়। মহাত্মাজী বুঝিলেন, অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যে পাপ প্রবেশ করিয়াছে। তিনি আন্দোলন স্থগিত রাখিলেন। রবীন্দ্রনাথ বিদেশে বসিয়া সব সংবাদই পাইতেছিলেন। শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া সেই উদ্‌বেজিত আবহাওয়ায় রচনা করিলেন "শিক্ষার মিলন"। ১০ আগস্ট তাহা শান্তিনিকেতনের আশ্রমবাসীদের শুনাইলেন। যদিও শিক্ষার সমন্বয়ীকরণ তাঁহার মূল বক্তব্য, কিন্তু শ্রোতারা বুঝিলেন, সমকালীন রাজনীতির সমালোচনা প্রবন্ধটির প্রথমাংশের অনেকটা জায়গা জুড়িয়া আছে। ইহার পাঁচদিন পরে ১৫ আগস্ট তিনি ঐ প্রবন্ধটি কলিকাতায় য়ুনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের সভায় পাঠ করিলেন— অগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়িল। প্রকাশ্যেই তিনি গান্ধীজীর কর্মনীতির সমালোচনা করিলেন। তখন একচক্ষু সাইক্লোপ্‌স্‌-এর মতো অসহযোগ আন্দোলন একরোখা পথ ধরিয়া চলিয়াছে, উদ্ধত জাতিপ্রেম ফুঁসিয়া উঠিয়াছে। মহাত্মাজীর যে অসহযোগ আত্মিক শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তাহাতে গ্রহণ লাগিল। শাসকশক্তিও সময় বুঝিয়া একটা আঘাতের বদলে দশটা আঘাত ফিরাইয়া দিল। অসহযোগ-অহিংসার দিকে পাশব হিংসা অলক্ষ্যে অগ্রসর হইতে লাগিল। শিক্ষার নামে সংকীর্ণ সংস্কার শিক্ষাসত্রের উন্মুক্ত বাতায়ন বন্ধ করিয়া দিল। যাহা-কিছু য়ুরোপীয়, তাহাই শিক্ষাবিধি হইতে বর্জিত হইল। রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের এই সংকটকালে নিজেকে নিরাপদ নিষ্ক্রিয়তার মধ্যে গুটাইয়া লইলেন না, শিক্ষার সমস্যা আলোচনা করিতে গিয়া দেশের বৃহত্তর সমস্যা ও আদর্শভ্রান্তির দিকটিও ঐ প্রবন্ধে স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া দিলেন। মহাত্মাজীর কর্মপন্থার সমালোচনা এবং শিক্ষাকে পূর্ণতা দিবার জন্য পাশ্চাত্য আদর্শের আনুকূল্য অনেকেই সহিতে পারিলেন না। আঁধির অন্ধকারে যাঁহারা ক্ষণকালের জন্য আবৃতচক্ষু হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহারা মনে মনে ক্ষুব্ধ হইলেন। সেই ক্ষোভ রোষের আকারে শরৎচন্দ্রের লেখনীমূলে আত্মপ্রকাশ করিল। ঐ বৎসরেই 'গৌড়ীয় সর্ববিদ্যা আয়তনে' তিনি "শিক্ষার বিরোধ" শীর্ষক প্রবন্ধ পড়িলেন, যাহাতে রবীন্দ্রনাথের "শিক্ষার মিলন" প্রবন্ধের কঠোর সমালোচনা করিলেন, ভাষায় ব্যঙ্গের ঝালমসল্লাও মিশাইয়া দিলেন। যদিও যথোচিত বিনয়সহকারে বলিলেন, "রবীন্দ্রনাথ আমার গুরুতুল্য পূজনীয়। সুতরাং মতভেদ থাকলেও প্রকাশ করা কঠিন। কেবল ভয় হয় পাছে অজ্ঞাতসারে তাঁর সম্মানে কোথাও লেশমাত্র আঘাত করে বসি"— কিন্তু এতটা সংকোচ ও সাবধানতা অবলম্বন করিয়াও তিনি 'গুরুতুল্য পূজনীয়' রবীন্দ্রনাথের অভিমতের সমালোচনা করিতে গিয়া ব্যঙ্গের ছিটেগুলি বর্ষণের ত্রুটি করিলেন না।

এখন দেখা যাক রবীন্দ্রনাথ তাঁহার প্রবন্ধে প্রধানত কোন্‌ কোন্‌ যুক্তির সাহায্যে কোন্‌ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে চাহিয়াছিলেন। দীর্ঘ কয়েকমাস ধনকুবের আমেরিকায় বাস করিয়া এবং রাজনৈতিক-বিক্ষোভ-উত্তাল য়ুরোপ পরিভ্রমণ করিয়া তিনি ঐ-সমস্ত দেশের কর্মযজ্ঞ ও শিক্ষাবিধি বিশ্লেষণ করিয়া আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে নূতন দিক হইতে

চিন্তা করিবার প্রয়োজন বোধ করিলেন। কিন্তু প্রবন্ধটির গোড়ার দিকের অনেকটা অংশেই ছিল মহাত্মাজীর নেতৃত্বে পরিচালিত, রাজনৈতিক আন্দোলনের সমালোচনা এবং ভারতীয় শিক্ষাসংস্কারের জন্য পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান ও শিল্পকলার উদার সহায়তা গ্রহণ। পশ্চিম দিকের জানালা বন্ধ করিয়া পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান, শিল্পকর্মাদি হইতে সরিয়া আসিয়া দ্বৈপায়ন একপার্শ্বিকতার মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ রবীন্দ্রনাথের নিকট আত্মঘাতী নীতি বলিয়া মনে হইয়াছিল।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সহায়তা গ্রহণ প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন যে, আধুনিক পাশ্চাত্য নীতি যে প্রাচীন এশিয়ার মস্তকের উপর রাজত্ব করিয়া বিশ্বের যাবতীয় সুখ ও আনন্দ ভোগ করিতেছে, ইহার কারণ য়ুরোপ-আমেরিকা বিজ্ঞানবুদ্ধি ও বাস্তববিদ্যার জোরে বিশ্বের কামধেনু দোহন করিতেছে। ইহার একটি মাত্র কারণ, তাহারা কোনো কিছু বাধার নিকট হার মানে নাই, বৈজ্ঞানিক বিশ্বাসকেই মূলমন্ত্র হিসাবে গ্রহণ করিয়া বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করিয়াছে, এবং যজ্ঞদেবতার হাত হইতে যজ্ঞভাগ বলপূর্বক কাড়িয়া লইয়াছে। কিন্তু আধুনিক যুগেও ভারতবর্ষ বুদ্ধির ভীরুতা ও সংস্কারের জড়তা কাটাইয়া উঠিতে পারিল না, আমরা যৌক্তিক বিজ্ঞানসাধনাকে সকলের উপরে স্থান দিতে পারিলাম না। তাঁহার মতে, এই মানসিক 'ইতি-উতি'-ভাব এবং বাহিরের ভীরুতাই আমাদিগকে শক্তিহীন নির্জীব করিয়া রাখিয়াছে। বিশ্বনিয়মকে বুদ্ধির নিয়মে আবিষ্কার করা, এবং সেই আবিষ্কারের ফলস্বরূপ আশমানদারি হইতে দুনিয়াদারিকে রক্ষা করা— পাশ্চাত্য দেশ এই সিধা পথ ধরিয়া চলিয়াছে। অবশ্য সেই লৌহ পথটা যে সদা-সর্বদা নির্বিঘ্ন হইয়াছে, এ কথা রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেন নাই। তাহাদের সভ্যতার রথ মাঝে মাঝে বিপথেও গিয়াছে, কোথাও ভোগের জাহাজ লোভোদ্ধত সমুদ্রের সফেন তরঙ্গে সলিলসমাধি লাভ করিয়াছে। তবে তাহারা কোনো বিপর্যয়কেই গ্রাহ্য করে নাই, মানুষ বা প্রকৃতি কাহারও নিকট হার মানে নাই। ভারতীয় পুরাকাহিনীতে আছে দেবগুরু বৃহস্পতির পুত্র কচ দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের কাছে মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা শিক্ষা করিতে গিয়াছিলেন। পুরাতন কাহিনীর তাৎপর্য এই যে, মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা দেবতাদের জানা ছিল না, মৃতকে বাঁচাইবার গূঢ় বিদ্যা দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যই জানিতেন। তাই কচ তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া এই বিদ্যা আয়ত্ত করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষ যদি যথার্থ শিক্ষা পুরা করিতে চায়, তাহা হইলে দৈত্যগুরু অর্থাৎ পাশ্চাত্য গুরুর নিকট ঐ বিদ্যা আয়ত্ত করিতে হইবে। যাহারা বিলাতি বিদ্যা বলিয়া স্বদেশী বিদ্যামন্দিরে তাহার ঠাঁই করিয়া দিতে চাহে না, তাহাদিগকে তিনি বুদ্ধির দিক হইতে কাপুরুষ বলিয়াছিলেন, "এইরকম বুদ্ধিগত কাপুরুষতা থেকে দেশকে বাঁচাবার জন্যে আমাদের যেতে হবে শুক্রাচার্যের ঘরে। সে-ঘর পশ্চিম-দুয়ারি বলে যদি খামকা বলে বসি 'ও ঘরটা অপবিত্র' তা হলে যে বিদ্যা বাইরের নিয়মের কথা শেখায় তার থেকে বঞ্চিত হব, আর যে বিদ্যা অন্তরের পবিত্রতার কথা বলে তাকেও ছোটো করা হবে।" শাস্ত্র বলিয়াছেন, বিদ্যা ও অবিদ্যা, উভয়কেই জানিতে হইবে, অবিদ্যার দ্বারা মৃত্যু পার হইয়া বিদ্যার দ্বারা অমৃত লাভ করিতে হইবে। অবিদ্যা, অর্থাৎ যাহা অধ্যাত্মবিদ্যা নহে, যাহা বাস্তব জীবনের বাধা মুক্তির জন্য প্রয়োজন। বিজ্ঞান ও যুক্তিকে অবলম্বন করিয়া বাস্তব প্রয়োজনের দিকে চাহিয়া যাহা সৃষ্টি হয়, নির্মিত হয়, তাহাও অনুশীলনের যোগ্য। কিন্তু অবিদ্যাই চূড়ান্ত লক্ষ্য নহে। ইহার দ্বারা মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে হইবে, এইমাত্র। শোকদুঃখ, আধিব্যাধি, দারিদ্র্য, মহামারী— ইহাদের গ্রাস হইতে পার্থিব সত্তাকে রক্ষা করিতে হইলে অবিদ্যার অনুশীলন প্রয়োজন। সেই বিদ্যায় যাহারা পারঙ্গম সেই আধুনিক শুক্রাচার্যদের আধুনিক যন্ত্রাগার হইতে সেই বিদ্যা আহরণের জন্য সচেষ্ট না হইলে অধ্যাত্মবিদ্যা দাঁড়াইবে কোথায়? "অবিদ্যার পথ দিয়ে মৃত্যু থেকে বাঁচতে হবে, তার পরে বিদ্যার তীর্থে অমৃত লাভ হবে। শুক্রাচার্য এই মৃত্যু থেকে বাঁচাবার বিদ্যা নিয়ে আছেন। তাই অমৃতলোকের ছাত্র কচকেও এই বিদ্যা শেখবার জন্যে দৈত্যপাঠশালার খাতায় নাম লেখাতে হয়েছিল।" অর্থাৎ তাঁহার মতে জড়বিশ্বে জড়ের প্রতিকূলতা এবং গোলামি হইতে বাঁচিবার জন্য ইহার বাস্তব রহস্য ভেদ করিতে হইবে। অবশ্য এ কথাও ঠিক পশ্চিমবিশ্ব জড়বিশ্বকে করতলগত করিতে গিয়া জড়েরই অধীন হইয়া পড়িতেছে— ইহাও একপ্রকার বিনষ্টির সাধনা। অতিভোগজনিত ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া পশ্চিমের অপঘাতে মৃত্যু হইবার আশঙ্কা, খাদ্যাভাবজনিত শূন্য জঠরে ভারতবর্ষও মৃত্যুকে ঠেকাইতে পারিবে না। তবে তাহা অপঘাত মৃত্যু নহে, রোগে ভুগিয়া, অনাহারে অনিদ্রায় শীর্ণ হইয়া ঘৃণ্য অবসান। সুতরাং পূর্ব ও পশ্চিমকে মিলিতে ও মিলাইতে হইবে। দ্বৈপায়ন চেতনার

উদ্ধত প্রতীক কিপলিঙের ছড়ার মতো 'পূর্ব পূবই, পশ্চিমও পশ্চিম, এই দুইজনে কখনো মিলিবে না' এ কথা রবীন্দ্রনাথ মানিতে পারেন নাই। দুই চেতনার স্বরূপটি তিনি এইভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "পশ্চিম মহাদেশ বাহ্যবিশ্বে মায়ামুক্তির সাধনা করছে ; সেই সাধনা ক্ষুধাতৃষ্ণা শীত গ্রীষ্ম রোগ দৈন্যের মূল খুঁজে বের করে সেইখানে লাগাচ্ছে ঘা ; এই হচ্ছে মৃত্যুর মার থেকে মানুষকে রক্ষা করবার চেষ্টা আর পূর্ব মহাদেশ অন্তরাত্মার যে সাধনা করছে সেই হচ্ছে অমৃতের অধিকার লাভ করবার উপায়। অতএব, পূর্বপশ্চিমের চিত্ত যদি বিচ্ছিন্ন হয় তা হলে উভয়েই ব্যর্থ হবে…।" বিজ্ঞান ও অধ্যাত্মবিদ্যা— উভয়কে মিলাইতে না পারিলে ভারতবর্ষ কী শিক্ষায়, কী রাজনীতিতে, কী সমাজবোধে, একপায়ে চলিবার চেষ্টা করিবে। ফলে পদে পদে পদস্খলন, পতন এবং অবশেষে মরণং ধ্রুব। রবীন্দ্রনাথের এই যুক্তিক্রম ও 'থীসিস' কোনো দিক দিয়াই আপত্তিকর নহে। মহাত্মা গান্ধী, যিনি শুধু মহাত্মা নহেন, দেশের আত্মাও বটে, তিনি সমগ্র দেশকে সেই উদার পরিমণ্ডলে আহ্বান করিতে পারিতেন এবং মন্ত্রতন্ত্র ঝাড়ফুঁক তাবিজ-কবচ-মাদুলির অনাবশ্যক ভার হইতে দেশের মনটিকেও রক্ষা করিতে পারিতেন। তাঁহার নিকট রবীন্দ্রনাথের অনেক প্রত্যাশা। কিন্তু যখন কবি লক্ষ্য করিলেন, পুরাতন সংস্কারের যে জীর্ণ রথটা আধুনিক ভারতের রাজপথের উপর মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া আছে, মহাত্মাজী অসহযোগ-অহিংস আন্দোলন, খিলাফৎ আন্দোলন, চরকা এবং বিদেশী বস্ত্রের বহ্ন্যুৎসবের ঢালাও আয়োজনের দ্বারা তাহাকেই খাড়া করিবার বৃথা চেষ্টা করিতেছেন ; কলকারখানা, বিজ্ঞানের আবিষ্কারকেও ছোটো করিয়া তাহার ধূমনিশ্বাসী অভিশাপটাকেই বড়ো করিয়া দেখিয়া শিক্ষাকেও ম্লেচ্ছ সংস্পর্শ হইতে বাঁচাইয়া অসহযোগের দড়াদড়ি কষিয়া বাঁধিবার পরামর্শ দিতেছেন, তখন রবীন্দ্রনাথ আর কবিত্বের হর্ম্যে নীরবে বসিয়া থাকিতে পারিলেন না, এই সংস্কারান্ধ দৃষ্টির সমালোচনা করিলেন।

রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করিয়াছিলেন, দুর্বুদ্ধিই ন্যাশনালিজ্‌ম্-এর ছদ্মবেশে য়ুরোপকে গ্রাস করিতে চলিয়াছে। পূর্বদেশেও সেই দুর্বুদ্ধির নির্বাধ প্রকাশ ঘটিতেছে। য়ুরোপ স্বাজাত্যের অহমিকায় প্রাচ্য বিশ্বে নানাপ্রকার অমানুষিক ব্যাপার ঘটাইতেছে। তাহারা গ্রাস করাকেই ঐক্য বলিয়া জানিয়াছিল, জাতীয় আত্মম্ভরিতাকে আত্মপ্রতিষ্ঠার উপায় হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিল। তাই মহাযুদ্ধ দ্বারপ্রান্তে হানা দিল, য়ুরোপের বহু মানুষ কামানের খাদ্য হইয়া রণক্ষেত্রে প্রাণ দিল। শান্তিপর্বে কিন্তু লক্ষ্য করা গেল, আগামী মহাযুদ্ধের সম্ভাবনা সন্ধিপত্রের ছত্রে ছত্রে প্রচ্ছন্নভাবে রহিয়া গিয়াছে। ইহার কারণ তাহারা পূর্বকে মানবশিকারের অভয়-অরণ্য বলিয়া মনে করিয়াছিল। এইখানেই তাহাদের পাপবৃত্তি মধ্যযুগীয় খৃস্টান ধর্মের সাধনা, রেনেসাঁস ও রিফর্মেশনের সংস্কারমুক্তি— সব-কিছুকেই লেহন করিয়া লইয়াছে। প্রথম মহাযুদ্ধের বিভীষিকার পর তাহারা শান্তিভিক্ষু হইয়াছে। যখন তাহারা সভয়ে লক্ষ্য করিল, তাহাদের লোভের অজগরটা শুধু পূর্বদেশকে গ্রাস করিয়াই ক্ষান্ত হইল না, তাহাদেরও জঠরে পুরিবার উদ্যোগ করিতেছে, তখনই তাহারা থমকিয়া দাঁড়াইয়া নিজেদের প্রশ্ন করিল, ততঃ কিম্‌ ? তাহারা মঙ্গলকে আঘাত করিয়াছে, তাই তাহাদের এই শাস্তি। আমরাও কি তাহা করি নাই ? এখনো তো যুক্তি, বিবেক, সত্যকে ঝাঁটাইয়া বিদায় দিয়া তামসী পূজার জয়ধ্বনি করিতেছি না ? রবীন্দ্রনাথ ঐ প্রবন্ধে নানা দিক হইতেই সমস্ত প্রসঙ্গের পুনর্বিবেচনা করিয়াছেন। য়ুরোপ তাহার ঘরের সমস্যা লইয়া ব্যস্ত ও উদ্‌বিগ্ন। তাহারা পূর্বপশ্চিমে ভেদ করিয়াছিল, অজগরের মতো গ্রাস করাকেই এক করা মনে করিয়াছিল এবং প্রাচ্যবিশ্ব তাহাদের ঐক্যনীতি মানিতে পারিতেছে না বলিয়া তাহাদিগকে অকৃতজ্ঞ বলিয়া গালি দিয়াছে। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের পর বিকলাঙ্গ দেহ, ছিন্নভিন্ন মন ও ভাঙাচোরা সমাজনীতি লইয়া তাহারা অন্য পন্থার সন্ধান করিতেছে। বোধ হয় ওদেশে এখনো কিছু সৎ মানুষ অবশিষ্ট আছেন, এখনো তাঁহারা মনে করেন, জাতিবৈর দূর করিয়া ওয়েন্ডেল উইল্‌কির *One World*-এর মতো এক-ভুবন গড়িতে গেলে ভারতবর্ষকে সঙ্গে লইতে হইবে। কিন্তু যখন তাহারা দেখে, আধুনিক ভারতবর্ষের লোকেরা তাহাদেরই স্কুলে শেখা বিদ্যার অর্ধেকটারও কম অর্জন করিয়া তাহাই উদ্‌গীরণ করিতেছে, তখন তাহারা নিশ্চয় বুঝিতে পারে, ঘরে তাহারা ব্যর্থ হইয়াছে, বাহিরকেও নষ্ট করিয়াছে। ইহার সদুপায় কোথায়।

রবীন্দ্রনাথের মতে শিক্ষার মধ্য দিয়া দুই বিরোধী বোধের মধ্যে সামঞ্জস্য করিতে হইবে। রাজনৈতিক আন্দোলনের বাতাস দিয়া ভিজা কাঠে আগুন জ্বালাইবার চেষ্টা করিলে শ্বাসরোধী ধূমশিখা জীবনের স্বভাববৈশিষ্ট্যকে ঢাকিয়া ফেলিবে।

পশ্চিম বিদ্যার নকলনবিশি নহে, পশ্চিম হইতে জীবনযুদ্ধের হাতিয়ার সংগ্রহ করিতে হইবে, কিন্তু বিশ্বাস রাখিতে হইবে আত্মশক্তির উপর। "মোক্ষমুলর বলেছে আর্য, তাই শুনে সব ছেড়েছি কার্য"— এ-জাতীয় আত্মপ্রসাদ একপ্রকার হীনমন্য দাসমনোবৃত্তির পরিচায়ক। শুধু আমাদের জন্য নহে, 'অনাগত বিধাতা'দের জন্যও এখনই একটি সমন্বয়মূলক শিক্ষাদর্শ গ্রহণ করিতে হইবে। পশ্চিমের বস্তুদর্শন এবং ভারতের আত্মদর্শন, পশ্চিমের ভোগ এবং ভারতের ভোগবিরতি, পশ্চিমের মোহ এবং ভারতের মুক্তি যতই স্বতোবিরোধী হোক-না কেন তাহাদের মধ্যেও মিলনসূত্র খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। যদি ভারতবর্ষ সেই সমন্বয়ী শিক্ষা ও সাধনাকে জাতির মর্মমূলে সঞ্চার করিতে পারে, তাহা হইলে দারিদ্র্যের কলঙ্কচিহ্ন ধারণ করিয়া ভারতবর্ষকে পশ্চিমের দুয়ারে দাঁড়াইতে হইবে না। তাহার বাহ্যিক ঐশ্বর্যের হাঁকডাক না থাকিলেও রহিয়াছে অন্তরের ঐশ্বর্য। য়ুরোপ যেদিন সেই সত্যটা আবিষ্কার করিবে সেইদিন সে অপঘাত হইতে মুক্তি পাইবে। ভারতবর্ষও যেদিন আধ্যাত্মিক তামসিকতা ত্যাগ করিয়া তাহার সনাতন ঋক্‌থ-কে হাতে পাইবে, তখন সেও মৃত্যুসাগর মন্থন করিয়া অমৃতাত্মাকে লাভ করিবে। এই দুয়ের মিলন চাই। আমরা যখন আপনার মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকি, তখনই আমাদের আত্মা কলুষিত হয়। তখন আমরা দীন, দয়াপ্রার্থী, ভীরু ভিখারী মাত্র। ভিখারীকে কেহ শ্রদ্ধা করে না। পশ্চিমের কাছে আমাদের ভিক্ষাপাত্রটা মেলিয়া ধরিলে তাহারা কৃপাভরে তাহাতে দুই-চারিটা পাউন্ড ডলার ফেলিয়া দিবে। কিন্তু ভারতবর্ষ যেদিন বলিতে পারিবে, স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রাধান্য উভয়েরই লক্ষ্য হওয়া উচিত ; দাবাইয়া দলিয়া টিপিয়া পিষিয়া সত্যের কণ্ঠরোধ করা যায় না তখনই সে আপনাকে পাইবে। পশ্চিম প্রথম মহাযুদ্ধের আগুনে ঝলসাইয়া এই সত্যটা বোধহয় খানিকটা বুঝিয়াছে। কিন্তু তাহাদের প্রকৃত শিক্ষা হইয়াছে কি ? হইয়া থাকিলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রয়োজন হইত না এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কবরের উপর ঘাস গজাইবার পূর্বেই আবার 'গণকবরে'র ক্ষুধার্ত গহ্বর খুঁড়িবার প্রয়োজন হইত না, বিদায়মুহূর্তে বিষণ্ণ রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয় তাহার আভাস পাইয়াছিলেন।

৪

শিক্ষার মূল আদর্শ কী ? প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরিয়া রবীন্দ্রনাথ তাহার স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শিক্ষার মূল আদর্শ, মানুষের প্রকাশকে অব্যাহত রাখা, আত্মাকে প্রচ্ছন্নতা হইতে মুক্তি দেওয়া এবং একের সঙ্গে অপরকে মিলাইয়া দেওয়া। মহাত্মাজী-পরিকল্পিত অসহযোগনীতি প্রায়ই সেই কথাটা ভুলিয়া গিয়া একপার্শ্বিকতাকেই সমগ্রতা বলিয়া ভুল করিয়াছে। এই নির্মম সত্য কথাটা রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কেই-বা এমন করিয়া বলিতে পারিতেন ? শিক্ষার মধ্য দিয়া নবযুগের উদ্‌বোধন করিতে হইবে. তাঁহার "শিক্ষার মিলন" প্রবন্ধে সন্দেহের কোনো অবকাশ না রাখিয়াই বলিলেন, "সত্যকে চাই অন্তরে উপলব্ধি করতে এবং সত্যকে চাই বাহিরে প্রকাশ করতে ; কোনো সুবিধার জন্যে নয়, সম্মানের জন্যে নয়, মানুষের আত্মাকে তার প্রচ্ছন্নতা থেকে মুক্তি দেবার জন্যে। মানুষের সেই প্রকাশতত্ত্বটি আমাদের শিক্ষার মধ্যে প্রচার করতে হবে, কর্মের মধ্যে প্রচলিত করতে হবে, তা হলেই সকল মানুষের সম্মান করে আমরা সম্মানিত হব ; নবযুগের উদ্‌বোধন করে আমরা জরামুক্ত হব…।" তাঁহার মন্তব্য ও অভিমত তাঁহার ব্যক্তিগত চিন্তা ও পরীক্ষামূলক শিক্ষাব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও সমকালীন ভারতবর্ষের শিক্ষার খঞ্জত্ব অনেকটা দূর হইতে পারে— যদি আমরা তাঁহার উপদেশ ও প্রস্তাব আংশিক ভাবেও গ্রহণ করিতে পারি। কিন্তু তাঁহার এই সুযুক্তিপূর্ণ অভিমত কাহারও কাহারও কাছে বড়ো বেশি আবেগবহুল ও কবিত্বময় বলিয়া উপেক্ষিত হইল। এই প্রবন্ধে প্রকাশ্যে এবং পরোক্ষে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও আদর্শের প্রশংসা, ভারতীয় চিত্তের জড়তা ও গতানুগতিকতার নিন্দা এবং মহাত্মা গান্ধীর সমালোচনায় কেহ কেহ ক্ষুব্ধ হইয়া তাঁহার যুক্তিপূর্ণ অভিমতেরও সমালোচনা করিয়াছেন, এবং সে প্রতিবাদ নিতান্ত নিরামিষ ধরনের ছিল না। শরৎচন্দ্র এই দলের বক্তব্যগুলি যুক্তির ক্রমানুসারে সাজাইয়া রবীন্দ্রসমালোচনায় নামিয়া পড়িলেন। আমাদের দেশের সমালোচনার অর্থ ছিদ্রান্বেষণ। শরৎচন্দ্র তাহার ব্যতিক্রম নহেন।

রবীন্দ্রনাথ মহাত্মাজীর কর্মপন্থার সমস্তটা অনুমোদন করিতে পারেন নাই। চরখা, অসহযোগ, বিদেশী বস্ত্রের দাহকর্ম

প্রভৃতি ব্যাপার কবিগুরুর কাছে অযৌক্তিক বলিয়া মনে হইয়াছিল। এই আন্দোলনের পক্ষে প্রচুর জনসমর্থন সত্ত্বেও তিনি সমস্ত আয়োজনের পশ্চাতে দুর্বুদ্ধির পদক্ষেপ শুনিতে পাইয়াছিলেন। শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের 'শিক্ষার মিলন'-এর বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় রচনা করিলেন 'শিক্ষার বিরোধ'। রবীন্দ্রনাথের অনেক যুক্তি ও সিদ্ধান্ত তাঁহার মনোমত হয় নাই, সুতরাং তাঁহার মনেও তিক্ততা ঘনাইয়া আসিয়াছিল— ইহার মূলে ছিল অযৌক্তিক ক্রোধ ও চণ্ডীমণ্ডপে-অনুষ্ঠিত গ্রাম্য দলাদলির ঘোঁটপাকানো কোন্দল। রবীন্দ্রনাথ-উপস্থাপিত শিক্ষার আদর্শের অন্তরে প্রবেশ করিতে অনেকেই বাধা পাইলেন। ফিরিঙ্গী দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক এই ভাবিয়া খুশি হইলেন যে, রবীন্দ্রনাথ এতদিনে বুঝিয়াছেন যে পশ্চিমের শিক্ষা ভিন্ন ভারতের আশা নাই। এই ব্যাপারে শরৎচন্দ্র চটিলেন বটে, কিন্তু তাহার কোনো কারণ ছিল না। কারণ রবীন্দ্রনাথ যে-যুক্তি উত্থাপন করিয়াছেন তাহাকে প্রতিযুক্তির দ্বারা ফিরানো যায় না। পশ্চিম-বিশ্ব প্রাচ্যদেশ অপেক্ষা অনেক আগাইয়া গিয়াছে তাহাতে সন্দেহ কোথায়? তাহারাই তো আমাদের কাঁধের উপর চড়িয়া ছড়ি ঘুরাইতেছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের অবাধ অনুশীলন এবং অতিশয় pragmatic বুদ্ধির জোরে পৃথিবীর যাবতীয় সুখ আনন্দ তাহাদের দখলে চলিয়া গিয়াছে। কামধেনুটি দোহন করিয়া যাবতীয় ক্ষীর সর ননী ভোজনের একমাত্র অধিকার যেন তাহাদেরই। আমাদের ভাগ্যে জুটিয়াছে ধেনুটির দানাপানি জোগাইবার ভার। ইহার কী কারণ? ইহার কারণ— একদিকে তাহারা পশুবল ও হীন স্বার্থবুদ্ধিতে উদ্ধত, আর-এক দিকে তাহারা অগ্রপশ্চাদবোধযুক্ত অতন্দ্র বাস্তব বুদ্ধির অধিকারী, তাহার সহিত হাত মিলাইয়াছে বিজ্ঞানমনস্কতা ও নব নব সৃষ্টির কলাকৌশল। সুতরাং বৈরাগ্যের কন্থাধারী ভারতবর্ষকেও তাহাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানলব্ধ সত্যগুলিকে গ্রহণ করিতে হইবে। রবীন্দ্রনাথের এই অভিমত কোনো দিক দিয়াই অযৌক্তিক নহে। কিন্তু তাঁহার গান্ধী-প্রতিকূলতা ও স্বরাজ-আন্দোলন সম্বন্ধে সংশয় শরৎচন্দ্রকে ক্রুদ্ধ করিয়া তুলিল। ক্রোধ অনেক সময়ে আমাদের হিতাহিত জ্ঞান কাড়িয়া লয়, তখন কুযুক্তি-অযুক্তিকেই সুযুক্তি বলিয়া মনে হয়। সদুপদেশ নিম্বতিক্ত স্বাদ সৃষ্টি করে। তাই শরৎচন্দ্র যুক্তিতর্কের ধার না ধারিয়া রবীন্দ্রনাথের প্রতি তীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ করিলেন।

শরৎচন্দ্রের ধারণা, পশ্চিম-বিশ্ব যে সুখে স্বস্তিতে জীবন যাপন করে, অথচ আমরা উপবাসী আছি ইহার সব দায় তাহাদের। তাহারা যে জ্ঞানবিজ্ঞানের উন্নতি করিয়াছে, মানুষকে প্রকৃতির দাসত্ব হইতে মুক্তি দিয়াছে, শাসনকার্যে জনবাণীকে ঈশ্বরবাণী ('vox populi vox dei') বলিয়া মানিয়াছে, তাহা কি শুধু মুনাফা শিকারের দ্বারা সম্ভব হইয়াছে? শরৎচন্দ্র য়ুরোপের সামাজিক, রাষ্ট্রিক ইতিহাস সম্বন্ধে সম্যক অবহিত থাকিলে দেখিতেন, রেনেসাঁস হইতে রিফর্মেশন পর্যন্ত— তাহারাই মানবমুক্তির পথ খুলিয়া দিয়াছিল। চিত্তের বাধা ও প্রকৃতির প্রতিকূলতা— সব-কিছুকেই তাহারা জয় করিয়াছিল। তাহাদের বিদ্যাই তাহাদিগকে ভুবনের ঘাটে ঘাটে পণ্যের তরী বাহিয়া লইতে সাহায্য করিয়াছে। অবশ্য সে বিদ্যাকে যখন তাহারা কালা-ধলার ব্যবধান হিসাবে ব্যবহার করিল তখনই তাহাদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশে গ্রহণ লাগিয়াছে, তাহাদের নিজেদের মধ্যেই রক্তবীজের জন্ম হইয়াছে; তাহার অস্পষ্ট প্রেতচ্ছায়াকে মহাযুদ্ধের কবরখানায় খাদ্য-সন্ধানে ঘুরিতে দেখিয়া উপনিবেশ-শিকারীর দল চমকাইয়া উঠিল। কিন্তু তাহারা যে বিদ্যা দিয়া বিশ্ব জয় করিয়াছে, তাহা শাস্ত্রমতে পরাবিদ্যা না হইলেও, তাহা তাহাদের নিজস্ব পরিশ্রমলব্ধ বিদ্যা, ধার করা ব্যাপার নহে। এই মোটা কথাটা শরৎচন্দ্র কেন বুঝিতে চাহিলেন না তাহার কারণ স্পষ্ট নহে। রবীন্দ্রনাথের মতের প্রতিবাদ করিতে হইবেই বলিয়া যেন তাঁহাকে কলম ধরিতে হইয়াছে, এবং সেজন্য অযুক্তি-কুযুক্তি ও অযথার্থ কথার সাহায্য লইতে হইয়াছে। তাঁহার মন্তব্য: "কবি জোর দিয়ে বলেছেন, একথা মানতেই হবে পশ্চিম জয়ী হয়েছে এবং সে শুধু তাঁদের সত্যবিদ্যার অধিকারে। হয়ত মানতেই হবে তাই। কারণ সম্প্রতি সেইরকম দেখাচ্ছে। কিন্তু কেবলমাত্র জয় করেছে বলে এই জয়করা বিদ্যাটা সত্য শিক্ষা, অতএব শেখা চাই-ই একথা কোনোমতেই মেনে নেওয়া যায় না।" শরৎচন্দ্রের এ উক্তি কতটা বালকোচিত তাহা নিজে তিনি ধরিতে পারেন নাই, কিন্তু তাঁহার বন্ধুমহলও কেন তাঁহার মন্তব্যের দুর্বলতা দেখাইয়া দেন নাই তাহাও জিজ্ঞাস্য। রবীন্দ্রনাথ মহাত্মাজীর নেতৃত্বে স্বাধীনতা-সংগ্রামের কর্মপন্থা যুক্তিযুক্ত মনে করেন নাই, তাই কি শরৎচন্দ্রের এই অযৌক্তিক আক্রমণ? খৃস্টজন্মের পূর্ব হইতেই ভারতবর্ষ কেন বার বার পরপদানত হইয়াছে সে কথাটাও শরৎচন্দ্র তলাইয়া দেখিলেন না।

পাশ্চাত্য গুরুমহাশয়গণ কালা পড়ুয়াদের কিছুই শিখাইবে না, কারণ তাহা হইলে সে-বিদ্যা কুলত্যাগ করিয়া নেটিভের ঘরে গিয়া সংসার পাতিবে। কিন্তু একালের ভারতীয়গণ কালোপযোগী জ্ঞান-বিজ্ঞান কারুবিজ্ঞানের শিক্ষা কাহার কাছে পাইল ? মনু-পরাশরের খুঁট ধরিয়া একালের ভোজসভায় ডাক পাওয়া যাইবে কি ? বিদ্যার জাতি নাই, অপরের ঘরে উঠিলেও তাহার কুলভঙ্গ হয় না। বরং অপরের ঘরে না উঠিলে তাহার সতীত্বের পরীক্ষা হয় না। কারণ চতুঃষষ্টি-কলাবিদ্যা বহুবল্লভা। ফলিত বিজ্ঞানের সাহায্যে পাশ্চাত্য জাতি জীবনযুদ্ধে জয়ী হইয়াছে— কেবল পূর্ব দুনিয়া লুণ্ঠনের সাহায্যে নহে। আফগান লুঠেরাগণ অশ্বপৃষ্ঠে ও শকট বোঝাই করিয়া ভারতের ধনরত্ন লুঠিয়া লইয়া স্বদেশে প্রস্থান করিয়াছে। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যের এই মানুষগুলি ধর্মীয় কুসংস্কার ত্যাগ করিয়া কোনো দিন আধুনিক হইতে পারে নাই। একদা প্রচণ্ড শক্তিশালী অটোমান তুর্কী পূর্ব-য়ুরোপকে নতজানু হইতে বাধ্য করিয়াছিল। কিন্তু মধ্যযুগীয় সংস্কার ত্যাগ না করার জন্য তাহারা "sick man of Europe" বলিয়া সকলের পরিহাসের পাত্র হইয়া রহিল, কামাল আতাতুর্কের প্রচণ্ড প্রতিভার সংস্পর্শে আসিয়াও তাহারা এখনো পুরাপুরি আধুনিক হইতে পারে নাই। কারণ তাহারা এখনো মধ্যযুগীয় সংস্কারের মধ্যে বাস করিতেছে।

পাশ্চাত্য রাজনীতি শোষণের নামান্তর মাত্র, কিন্তু পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান সেই শোষণের প্রধান হাতিয়ার নহে। অবশ্য ধুরন্ধর রাজশক্তি বিজ্ঞানকে মানুষ-মারা কল হিসাবে ব্যবহার করিলে সে দায় বিজ্ঞানের নহে। "তরবারি দিয়ে দাড়ি চাঁচা"-য় তরবারির গৌরব লাঘব হয়, গণ্ডদেশের প্রতিও সুবিচার করা যায় না। পরমাণুর বিস্ফোরণ ঘটাইয়া মরুবালুরাশির অভ্যন্তরে-সুপ্ত ভোগবতীকে টানিয়া বাহির না করিয়া তাহা যদি হিরোশিমা নাগাসাকির নিরপরাধ নরনারীর শির লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করা হয়, তবে সে পাতক কাহার উপর বর্তাইবে ? বোমাবারুদের সাহায্যে দুর্গম পাহাড় বিদীর্ণ করিয়া পথ কাটা যায়, বদ্ধ জলধারাকে মুক্তধারা করা যায়। কিন্তু তাহা যদি দরিদ্র কৃষকের ভুট্টাক্ষেত ভাসাইয়া লইয়া যায়, ক্ষুধাতুরের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লয়, বিষবাষ্পে মানুষের গলনালী ঢাকিয়া ফেলে, তাহা হইলে কি বারুদের ফরমুলা আবিষ্কারক ফ্রায়ার রোজার বেকন ও শোয়ার্টর্জ্-এর কঙ্কালকে কবর হইতে তুলিয়া গ্যাসচেম্বারে পুরিতে হইবে ? অথবা আরো পিছাইয়া গিয়া বারুদের অজ্ঞাতনামা চীনা আবিষ্কারককে ইতিহাস ঢুঁড়িয়া বাহির করিয়া তাহার স্মৃতিটাকে রাস্তার নিকটতম আলোকস্তম্ভে ঝুলাইয়া অবমাননা করিতে হইবে ? ও-দেশের পণ্ডিতগণ প্রাচ্যকে যে তাহাদের বিদ্যার অংশ দিবে না, সে সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের কোনো সন্দেহ নাই। অথচ প্রাচ্যদেশের আধুনিক সাজসরঞ্জাম পাশ্চাত্য বিদ্যালয় হইতেই পাওয়া গিয়াছে। শরৎচন্দ্র অবশেষে প্রশ্ন করিয়াছেন, "কথা উঠতে পারে, মানবকল্যাণকর এমন কি কিছুই এর থেকে আবিষ্কৃত হয় নি ? হয়েছে বৈকি, কিন্তু সে নিতান্তই by-product-এর মত বলা যেতে পারে।" এই মন্তব্যও মহাত্মাজীর আধুনিক যন্ত্রশালা বিরোধিতার মতো। তিনি কলকারখানা ও যন্ত্রতন্ত্রকে মহাপাপ বলিয়াই মনে করিতেন। শরৎচন্দ্রও সেই একই ধরনের অবৈজ্ঞানিক মন্তব্যের সাহায্যে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধটির কড়া ভাষায় প্রতিবাদ করিয়াছেন। "সে নিতান্তই by-product" ইহার অর্থ বোধ হয় এই— পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের একমাত্র উদ্দেশ্য নরহত্যা, অর্থাৎ প্রাচ্যদেশের মানুষ নিকাশ করা, উপকার ছিটেফোঁটা যাহা হইয়াছে, তাহা by-product বা গৌণফল মাত্র। সুতরাং পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান ভারতের উপকারের চেয়ে অপকারই করিবে। ইহাদের শিক্ষাব্যবস্থায় ভারতবর্ষ যে কোনোদিন মানুষ হইয়া উঠিবে সে সম্ভাবনা বিরল, রবীন্দ্রনাথও তাহা কিয়দংশে বিশ্বাস করিতেন। কিন্তু তিনি তাহার উপর আর-একটু বিশ্বাস করিতেন। জ্ঞানবিজ্ঞানের জাতি নাই, ভারতীয়েরা পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান হইতে জাতিগঠনের সুফলগুলি আয়ত্ত করিতে পারে। কিন্তু কাহার অপরাধে আমাদের এই দুর্গতি ? আমাদের শিক্ষা আশ্রয় পাইতেছে না কেন ? ইহা কি পাশ্চাত্য গুরুমহাশয়দের কারসাজি ? অথবা আমাদের বুদ্ধিগত অক্ষমতা ? শরৎচন্দ্র তাহার কারণ নির্দেশ করিতে না পারিয়া শেষপর্যন্ত অদৃষ্টের উপর সব অপরাধ চাপাইয়া দিয়াছেন— "আমার মনে হয়, প্রত্যেক মানবজীবনের দুঃখের অধ্যায়েই তার অপরাধ ছাড়াও একটা জিনিস আছে যা তার অদৃষ্ট, যে বস্তু তাহার দৃষ্টির বাহিরে, এবং যার ওপর তার কোনো হাত নেই···।" অদৃষ্টের উপর একান্ত আশ্রয় অসহায় পরাভূত দীনসত্ত্ব মনের শেষ অবলম্বন। রবীন্দ্রনাথ যদি অদৃষ্টবাদ বাদ দিয়া থাকেন, তবে তাহা

ভালোই করিয়াছেন। শরৎচন্দ্রের মন্তব্যটি স্মরণীয়, "দুঃখ ও হীনতার মূলে আমাদের অদৃষ্ট বস্তুও অনেকটা দায়ী, যার ওপর আমাদের কর্তৃত্ব ছিল না।" এ মন্তব্য নির্জীবের কণ্ঠেই মানায়। শরৎচন্দ্র বলিতেছেন, tradition বাদ দিয়া পাশ্চাত্য গুরুর বাণী শিরোধার্য করিলে তাহা একপ্রকার আত্মহত্যাই হইবে। রবীন্দ্রনাথও তাহা স্বীকার করিয়াছেন, সব-কিছু দেওয়া-নেওয়াকে নিজস্ব সংস্কৃতি অনুযায়ী গ্রহণ করিতে হইবে, ইহা তো তিনি সারা জীবন ধরিয়া প্রচার করিয়াছেন। শুধু শরৎচন্দ্র অপেক্ষা আর-একটু আগাইয়া গিয়া বলিয়াছেন, ভারতের ট্রাডিশন অর্থাৎ বহুকালাগত ঐতিহ্য এবং পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানমূলক আধুনিক সংস্কার— দুই ধারাকেই আমাদের শিক্ষাবিধানে সংযুক্ত করিতে হইবে। শরৎচন্দ্র প্রধানত কথাকার ও মানবজীবন-শিল্পী। চিন্তা বা বুদ্ধিবাদ তাঁহার প্রধান অবলম্বন নহে। তাই ভাবাবেগে উত্তেজিত হইয়া, কোন্‌টি যুক্তি আর কোন্‌টি অযুক্তি তাহা তাঁহার খেয়াল থাকিত না। ঐ প্রবন্ধেই তিনি উগ্রজাতিপ্রেমের উজানে ভাসিতে ভাসিতে কূল ছাড়িয়া কোথায় ভিড়িয়াছেন, ভাবিলে তাঁহার যুক্তির অসারতা সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ জাগে না। ট্রামগাড়ি, মোটর, বৈদ্যুতিক পাখা এবং বিদ্যুৎ-বাহিত আলোর মালা ও কলকারখানা— "ঐ যে বিদেশী সভ্যতার তোড়জোড় বিদেশ থেকে বয়ে এনে জমা করেছি, ওর কোনোটা কি আমাদের যথার্থ সম্পদ?" তাঁহার উত্তর— নিশ্চয় নহে। এগুলি আমাদের চেষ্টায় এদেশে প্রস্তুত করিতে পারিলে শরৎচন্দ্রের নজিরে ইহার উদ্ভাবক বিলাতি বিদ্যাকে গালি দেওয়ার প্রয়োজন হইবে না। তাঁহার বিচিত্র উক্তি আবার উদ্ধার করি, "ওসকল আমরা সৃষ্টি করি নি, করতেও জানি নে। পরের কাছ থেকে বয়ে আনা; আজও ওসকল আমাদের না হলেও নয়, অথচ ওর কোনোটাই আমাদের যথার্থ প্রয়োজনের ভিতর দিয়ে গড়ে ওঠে নি।" অথচ দেখা যাইতেছে, তাঁহার সময়েও অনেক ভারতীয় শিক্ষার্থী য়ুরোপ-আমেরিকা-জাপানে গিয়া বিদেশী চিকিৎসাশাস্ত্র, পূর্তবিদ্যা, বিভিন্ন প্রকার কারিগরিবিদ্যা আয়ত্ত করিয়া দেশে ফিরিয়াছে এবং নানাভাবে দেশকে স্বয়ম্ভর করিতে চেষ্টা করিতেছে। একালে বাস করিয়া রেড়ির তেলের শেজ জ্বালাইয়া, হাতপাখা টানিয়া, কবিরাজী বাকল সংগ্রহ করিয়া, মলিন উত্তরীয়খানি কাঁধে ফেলিয়া চণ্ডীমণ্ডপ উত্তপ্ত করিলে দেশ আগাইবে, না পিছাইয়া পড়িবে, তাহা শরৎচন্দ্র ধীর মস্তিষ্কে ভাবিয়া দেখেন নাই। তাই যে-কোনো বিদেশী বস্তুকে তিনি "আমাদের যথার্থ সম্পদ নয়— নিছক আবর্জনা"— বলিয়া ঘৃণাপূর্ণ কোপকটাক্ষে ফিরাইয়া দিয়াছেন। ভাগ্যে গোটা দেশ তাঁহার মতে মত দেয় নাই এবং তাঁহার ভর্ৎসনাবাক্যে সংকুচিত হইয়া স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের দুয়ার বন্ধ করিয়া দেয় নাই, লেবরেটরি, লাইব্রেরি, যন্ত্রশালায় তালা ঝুলায় নাই। তাহা হইলে সমগ্র দেশ আরো এক শতাব্দী পিছাইয়া যাইত এবং মধ্যপ্রাচ্যের মতো বিশ্বের কৃপাপ্রার্থী হইয়া থাকিত। তবে শরৎচন্দ্র কথাপ্রসঙ্গে ঐ প্রবন্ধের শেষের দিকে এমন একটি প্রশ্ন তুলিয়াছেন যাহার যৌক্তিকতা অস্বীকার করা যায় না। রবীন্দ্রনাথও সে সম্বন্ধে বেশ খোলাখুলিভাবে আলোচনা করেন নাই। কথাটা কিন্তু ভাবিয়া দেখিবার মতো।

প্রায় দুইশত বৎসর ইংরাজ শাসনে বাস করিয়া ভারতবর্ষ পাশ্চাত্য সভ্যতার শিক্ষাদীক্ষা ও জ্ঞানবিজ্ঞানের অনেকটা গ্রহণ করিয়াছে, কোথাও কোথাও কিছু মৌলিক প্রতিভারও পরিচয় দিয়াছে, কোথাও-বা নকলনবিশির ঊর্ধ্বে উঠিতে পারে নাই। তবু পশ্চিমের জ্ঞানবিজ্ঞানের অনেকটা আয়ত্ত করিয়া ভারতবর্ষ স্বল্পপরিমাণে ঔপনিবেশিকতার অভিশাপ হইতে মুক্ত থাকিতে পারিয়াছে। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা কি আগাগোড়াই 'one way traffic' হয় নাই? শরৎচন্দ্র এই দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছেন। "দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে" ইহা কি য়ুরোপ-ভারতের সাম্প্রতিক ইতিহাস হইতে প্রমাণ করা যাইবে? আমরা পাশ্চাত্যের নিকট অঞ্জলি ভরিয়া অনেক কিছু গ্রহণ করিয়াছি, জ্ঞানে বিজ্ঞানে বিদ্যায় তাহাদের পাঠশালার পড়ুয়া হইয়া পাত পাতিয়া বসিয়া গিয়াছি। পশ্চিমের গুরু পূর্বদেশের ছাত্রকে হেলাভরে যাহাই দিন-না কেন, তাহা হইতেও আমরা আধুনিক জগতের বাঁচিবার মতো বিদ্যা আয়ত্ত করিয়াছি। কিন্তু আমরা তো হাত ভরিয়া গ্রহণ করিলাম, তাঁহারাও নাহয় ঝুলি ভরিয়া ভিক্ষা দিলেন, কিন্তু ইহার সমস্তটাই কি একপেশে হয় নাই? দুইশত বৎসর ঘর করিয়া, তাহারা আমাদের কোনো খোঁজ রাখিল না, টগরের মতো নন্দমিস্ত্রীকে হেঁসেলে ঢুকিতে দিল না, আমাদেরও যে একটা জীবন আছে, আছে তাহার নানা আলোছায়ার লীলা, তাহার সহিত তাহারা পরিচিত হইবার জন্য বিন্দুমাত্র আগ্রহ

দেখাইল না, শুধু শ্বেতজাতির ভূতের বোঝা বহিয়া মরিল ভাবিয়া আত্মসন্তুষ্টিতে ফুলিয়া উঠিল, এ সংবাদ শাসক ও শাসিত— কাহারও পক্ষেই শুভকর নহে। দুই-চারিজন পুরাতাত্ত্বিক, ইন্ডোলজিস্ট, ভারতপ্রেমিক এবং কচিৎ কদাচিৎ হিন্দু স্টুয়ার্ট, উইলকিন্স্, হোরেস হেম্যান উইলসন প্রভৃতি দুই-চারি জন খাঁটি ব্রিটন হয়তো ভারতের সাধনা ও সংস্কৃত ভাষার প্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কোনো কোনো প্রাচ্যবিৎ পাশ্চাত্য পণ্ডিত ও গবেষক ভারতবর্ষের ইতিহাস, ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে বড়ো মাপের গ্রন্থও লিখিয়াছিলেন। মাঝে মাঝে য়ুরোপ-আমেরিকার দু-চার জন ভারতপ্রেমিকের মুখে রামমোহন, বিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধী, রবীন্দ্রনাথের নাম উচ্চারিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহার সহিত শাসককুলের কোনো সম্পর্ক ছিল না। শরৎচন্দ্রের এ মন্তব্য সম্পূর্ণ যুক্তিসংগত : "আমাদের সংসর্গে তার বহুযুগ কেটে গেল, কিন্তু আমাদের সভ্যতার আঁচটুকু পর্যন্ত সে কখনো তার গায়ে লাগতে দেয় নি। আপনাকে এমনি সতর্ক, এমনি স্বতন্ত্র, এমনি শুচি করে রেখেছে যে, কোনোদিন এর ছায়াটুকু মাড়ায় নি।" কথাটা শরৎচন্দ্র যেমন ভাবেই বলুন-না কেন, ইতিহাস ইহার সম্পূর্ণ সমর্থন করিবে। বাস্তবিক সুদূর শ্বেতদ্বীপের অধিবাসী নর্ডিক জাতির ধ্বজাবাহী ব্রিটনের নীলচক্ষু ও নীলশিরায় যে আভিজাত্য বহমান, তাহার দম্ভে তাহারা কখনো কালা-আদমিকে 'ভাই-বেরাদর' বলিয়া গ্রহণ করে নাই। এমন-কি, খৃস্টান ধর্ম গ্রহণ করিলেও কালা খৃস্টান ও মেটে খৃস্টান কোনো দিন খাঁটি ইংরাজের বৈঠকখানায় প্রবেশাধিকার পায় নাই, অন্তঃপুর তো দূরস্থান। শ্বেতাঙ্গ ধর্মযাজক ব্রাউন ধর্মযাজককে কখনো সমপর্যায়ভুক্ত মনে করেন নাই, তাই কোনো কোনো বাঙালি খৃস্টান ধর্মযাজক ব্রিটিশ চার্চের মতো ইন্ডিয়ান চার্চের পরিকল্পনা করিয়া শ্বেত প্রভুদের অসন্তোষের কারণ হইয়াছিলেন। এ কথা অবশ্যই সত্য যে, একজন পিয়ার্সন, একজন অ্যান্ডরুজ, একজন লেভি সমগ্র পাশ্চাত্য জাতির প্রতিভূ নহেন। তাঁহারা যে-মাপের মানুষ তাহাতে তাঁহাদিগকে বিশ্বনাগরিক বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। তাঁহারা যেখানে গিয়াছেন, তা সে জুলু-বান্টু-হটেনটট হউক, মাওরি হউক বা ভারতবর্ষের অরণ্যচারী আদিবাসীই হউক, সকলকেই আপন করিয়া লইতে পারিয়াছেন। কিন্তু শাসক ইংরাজ কি কখনো ভারতবর্ষ হইতে কোনো চিত্তসম্পদ, কোনো সংস্কৃতি গ্রহণযোগ্য মনে করিয়াছে? কোনো কোনো অবসরপ্রাপ্ত ইংরেজ কর্মচারী 'হোমে' ফিরিয়া যাইবার সময়ে কিউরিও শপ, যাদুঘর ও বৈঠকখানার শ্রীবৃদ্ধি করিবার জন্য পুরাতন পুঁথিপত্র, মুদ্রা, বিবসনা কালীমূর্তি ও স্ফীতোদর যক্ষকে সমাদরে স্থান দিয়াছে। ঐশ্বর্য ও সংগ্রহের দম্ভই তাহার মূল প্রেরণা, ভারতীয় চেতনা ও হৃদয়ের সহিত তাহার কোনো সম্পর্ক নাই। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ বলিতে পারিতেন যে, শাসক ইংরাজ যতই অমানুষ হউক, তাহাদের মধ্যে এমন দুই-চারি জন ছিলেন যাঁহাদিগকে জাতিগত ক্ষুদ্রতার দম্ভ স্পর্শ করে নাই। তাহা সত্য বটে। কিন্তু সংখ্যায় তাঁহারা কয়জন? বাদবাকি শাসক ইংরাজ এবং ইংলন্ডের সাধারণ নাগরিক ভারতবর্ষকে কী চক্ষে দেখিত, এখনো দেখিয়া থাকে, তাহা এমন নির্মমভাবে প্রত্যক্ষ যে, ইতিহাসে তাহার পাঁতি খুঁজিবার প্রয়োজন যাই। সে যাহা হউক, রবীন্দ্রনাথ এমন একটি পরিমণ্ডল হইতে সমস্ত শিক্ষা-ব্যাপারটাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন যে, কয়েকটি অসামঞ্জস্য তাঁহার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। পর্বতশিখর হইতে সমভূমির সবই একপ্রকার বলিয়া মনে হয়। মাটিতে নামিলে তবে ছোটোবড়োর পার্থক্য বুঝা যায়। সেই দিক হইতে শরৎচন্দ্রের বক্তব্য অযৌক্তিক নহে।

শরৎচন্দ্রের তিরোধানের চারি বৎসর পরে রবীন্দ্রনাথও মর্ত্যধাম ত্যাগ করিয়া যান। তার পর প্রায় অর্ধশতাব্দী কাটিয়া গেল, শিক্ষা লইয়া অনেক কমিশন বসিল, বিদেশ হইতে বহু বিশেষজ্ঞ আসিলেন, ভারী ভারী রিপোর্ট ছাপা হইল, তদনুসারে কিছু কাজও শুরু হইল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ "শিক্ষার মিলন" প্রবন্ধে পূর্ব ও পশ্চিমের যে মিলন প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন, এখনো কি তাহার পুরা রূপটা ফুটিতে পারিয়াছে? শরৎচন্দ্র যেজন্য সমালোচনা করিয়াছিলেন তাহা কি অন্তর্হিত হইয়াছে? রবীন্দ্রনাথ অর্ধশতাব্দী ধরিয়া শিক্ষা বিষয়ে যাহা ভাবিয়াছেন, অমূর্ত শিক্ষাকে যেভাবে শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনে রূপময় করিতে চাহিয়াছিলেন, উপাদান ও আয়োজনকে সংক্ষিপ্ত করিয়া তাহার আন্তর সত্তাটিকে ছাত্রদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন, একালের আকাশস্পর্শী বিশাল ভবনের মধ্যে হাজার উপকরণ সাজাইয়া যে শিক্ষা-সরস্বতীকে স্থাপন করা হইয়াছে, তাঁহার অঙ্গে বারাণসি শাড়ি, না কৃত্রিম তন্তুজাত বনেট, কোন্‌টি অধিকতর মানানসই

হইবে তাহা লইয়া চিন্তার অবধি নাই। তবে যদি শিক্ষা-নিগমের কর্তৃস্থানীয়েরা মাঝে মাঝে শিক্ষাব্রতী রবীন্দ্রনাথের কথাগুলি একটু তলাইয়া বুঝিবার চেষ্টা করেন তাহা হইলে হয়তো কোনো দূর-ভবিষ্যতের নবশিক্ষার্থীরা শিক্ষার যথার্থ তাৎপর্য বুঝিবে। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, মানুষের অন্তর্জীবনে সুপ্ত দেবভাবকে জাগাইয়া তোলাই শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য। এই 'দেবভাবের' অর্থ— মানুষের বৃহৎ সত্তা, তাহার আদর্শ স্বরূপ— অসীমকে সীমায়িত করিবার জন্য মানসিক বিনয় বা ডিসিপ্লিন। রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘদিন ধরিয়া সেই বিষয় বিস্তর আলোচনা করিয়াছেন, হাতেকলমে কাজ করিয়া শিক্ষাকে জীবনের মধ্যে পুনর্জীবিত করিতে চাহিয়াছেন, আমরা তাহার কতটা গ্রহণ করিতে পারিয়াছি, অথবা আদৌ কোনো চেষ্টা করি নাই, তাহা ভবিষ্যৎ বিচার করিবে।

হাউজ অব কমন্স-এ তরুণ রবীন্দ্রনাথ

দেবীপদ ভট্টাচার্য

"আমরা সেদিন House of Commons-এ গিয়েছিলেম, ভারী নিরাশ হয়েছিলেম। পার্লামেন্টের অভ্রভেদী চূড়া, প্রকাণ্ড বাড়ি, হাঁ-করা ঘরগুলো দেখলে খুব তাক লেগে যায়; কিন্তু ভিতরে গেলে তেমন ভক্তি হয় না।"

এই কথাগুলি দিয়ে 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র' বইয়ে সংকলিত চতুর্থ পত্রটির সূচনা। কিন্তু ঠিক কোন্ তারিখে এই বঙ্গীয় তরুণ গিয়েছিলেন পার্লামেন্টের এক অধিবেশনে সে কথা রবীন্দ্রজীবনীকারেরা জানান নি। কিন্তু জানবার উপায় রবীন্দ্রনাথ ঐ চিঠিতেই বলে দিয়েছেন—

> "আমরা যখন গেলেম তখন O'Donnel বলে একজন Irish member ভারতবর্ষ সংক্রান্ত বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, Press act-এর বিরুদ্ধে ও অন্যান্য নানা বিষয় নিয়ে তিনি আন্দোলন করছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে Irish member-রা House-এ অত্যন্ত অপ্রিয়— তাঁর প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়ে গেল।"

পার্লামেন্টের কাগজপত্র থেকে জানতে পারা যায় রবীন্দ্রনাথ ১৮৭৯ সালে ২৩ মে তারিখে পার্লামেন্টের (হাউজ অব কমন্স) অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। কেননা ঐদিন আইরিশ সদস্য ও'ডোনেল 'ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন'-কর্তৃক লর্ড লিটনের 'ভার্নাক্যুলার প্রেস অ্যাক্ট'-এর প্রচলনের বিরুদ্ধে প্রেরিত ভারতীয়দের দরখাস্তের পক্ষে বক্তৃতা করছিলেন। শেষে ভোটে দেওয়া হলে 'প্রেস অ্যাক্ট'-এর পক্ষে পড়ে ২১৬ ভোট এবং বিপক্ষে ৩৬ ভোট। ১৭৯ ভোটের ব্যবধানে লিটন-প্রবর্তিত 'প্রেস অ্যাক্ট' (১৮৭৮) পাস হয়ে যায়। ১৮৭৮ সালে ২৩ জুলাইয়ের অধিবেশনে ও'ডোনেল লিটনের 'প্রেস অ্যাক্ট'-এর বিরুদ্ধে বলেন, কিন্তু তখনো রবীন্দ্রনাথ বিলেতে যান নি, ১৮৭৮ সালে ২০ সেপ্টেম্বর তারিখে 'পুনা' জাহাজে তিনি সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে বিলেতে রওনা হন।

১৮৭৮ সালে ২৩ জুলাই তারিখের ঐ অধিবেশনে 'ভার্নাক্যুলার প্রেস অ্যাক্ট'-এর বিরুদ্ধে গ্ল্যাডস্টোনও সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। সংশোধনের নানা পন্থার প্রস্তাব করেন। সে 'ঐতিহাসিক' বক্তৃতা শোনবার সৌভাগ্য রবীন্দ্রনাথের হয় নি।

এখন স্বভাবতই ও'ডোনেল সম্পর্কে আরো তথ্য জানবার আগ্রহ আমাদের মনে জাগে। তাঁর পুরো নাম ফ্রাঙ্ক হিউ ও'ডোনেল, তিনি ডানগারভ্যান্ (Dungarvan) কেন্দ্র থেকে পার্লামেন্টে নির্বাচিত হন। পেশায় তিনি ছিলেন সাংবাদিক, লন্ডনে। ১৮৭৪ সালের নির্বাচনে চার্লস স্টুয়ার্ট পার্নেলের (১৮৪৬-৯১) 'হোমরুল'দল আয়ার্ল্যান্ডে জয়ী হয়ে হাউজ অব কমন্সে প্রবেশ করল। ১৮৭০ সালে আইজাক্ বাট (Isaac Butt) 'হোমরুল অ্যাসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠা করেন। হোমরুল আন্দোলনের সঙ্গেই চলেছিল আইরিশ ক্যাথলিক কৃষকের জমিতে ন্যায্য অধিকার লাভের আন্দোলন। পার্নেল নিজে ধর্মে প্রোটেস্ট্যান্ট এবং ইঙ্গ-আইরিশ ভূম্যধিকারী হয়েও, তিনি চেয়েছিলেন দশলক্ষ আইরিশ ক্যাথলিক কৃষকের নিজের জমিতে 'মালিকানা স্বত্ব' (peasant proprietorship)। ১৮৭৯ সালে আয়ার্ল্যান্ডে 'ল্যান্ড লীগ' প্রতিষ্ঠিত হয়। পার্নেল হন 'আইরিশ ন্যাশনাল ল্যান্ড লীগে'র প্রথম সভাপতি। পার্নেল, বিগার, ও'ডোনেল প্রভৃতি আইরিশ সদস্যারা নানাভাবে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে আইরিশ স্বার্থবিরোধী আইন-কানুন প্রণয়নে ইচ্ছাকৃত বাধার সৃষ্টি করেছেন। নিজের সম্বন্ধে গভীর আস্থা

ছিল ও'ডোনেলের। তিনি নানা প্রসঙ্গে ভারতীয়দের দাবিকে সজোরে তুলে ধরেছেন, তার পক্ষে বক্তৃতা করেছেন সঙ্গে সঙ্গে তাঁর স্বদেশ আয়ার্ল্যাণ্ডের অনুরূপ প্রবঞ্চনা, অত্যাচার ও অবিচারকে মিলিয়ে জড়িয়ে দিয়েছেন। যে 'ভার্নাক্যুলার প্রেস অ্যাক্ট' লর্ড লিটন ১৮৭৮ সালে ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলির বিরুদ্ধে প্রয়োগ করেন, তার পূর্বরূপ রয়েছে ১৮৭০ সালে প্রবর্তিত 'আইরিশ কোয়ের্সান অ্যাক্ট' (Irish Coercion Act)-এ। আয়ার্ল্যান্ডে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সংবাদপত্রের মতামত প্রকাশের অধিকার খর্ব করবার জন্য ঐ অ্যাক্ট পাস হয়। সেজন্যই ও'ডোনেল 'ভার্নাকুল্যার প্রেস অ্যাক্ট'-এর তীব্র নিন্দা করেছিলেন। ১৮৭৮ সালে ২৩ জুলাই ও'ডোনেল তাঁর বক্তৃতায় দেখান আইরিশ প্রেস ও ভারতের ভার্নাকুল্যার প্রেস উভয়ের লাঞ্ছনা। আইরিশ মেম্বাররা সংখ্যায় অল্প ছিলেন ঠিকই, ১৮৭৭ সালে পার্নেলের দলে প্রকৃতপক্ষে ছিলেন মোট আট জন, তাঁরা হলেন পার্নেল স্বয়ং, বিগার, ও'ডোনেল, কার্ক, ও'কোনর পাওয়ার, ফিনি গ্যান, ফিলিপ ক্যালান ও ক্যাপটেন নোলান।[১] আরো যে আঠাশ ভোট এই 'ভার্নাক্যুলর প্রেস অ্যাক্ট'-এর বিরুদ্ধে পড়েছিল সে হল গ্ল্যাডস্টোন-পরিচালিত লিবারেল পার্টির ভোট। ও'ডোনেল নিজের ভূমিকা সম্বন্ধে স্বরচিত গ্রন্থে লিখেছেন—

> 'এমন কোনো বছর নেই যখন পার্ল্যামেন্টে আমি আমার নির্ধারিত সময়ের এক বড়ো অংশ ভারতীয়দের স্বার্থরক্ষার জন্য ব্যয় করি নি।'[২]

ও' ডোনেল 'বোম্বে গেজেট'-এর লন্ডনস্থ 'সংবাদদাতা' ছিলেন, সেই সূত্রে ভারতের নানা ঘটনাবলী বিলেতে ও পার্ল্যামেন্টের অধিবেশনে তুলে ধরতেন। রমেশচন্দ্র দত্ত এর জন্য ও'ডোনেলের প্রশংসা করেছেন। তিনি জানিয়েছেন 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র সম্পাদক কৃষ্টদাস পাল (ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন-এর প্রভাবশালী সদস্য) ছিলেন তাঁর 'close advisor and confidant'। ও'ডোনেল আরো জানিয়েছেন 'ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন'-এর প্রতিনিধিদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার ঘটে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের পুত্র জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরের 'কেনসিংটন'-এর গৃহে। ১৮৭৮ সালে এমন প্রস্তাব উঠেছিল যে আইরিশ জাতীয়তাবাদীরা একজন 'ভারতীয়'কে তাঁদের একটি 'আসন' ছেড়ে দেবেন পার্ল্যামেন্টে ভারতের দাবিকে জোরালো করবার জন্য এবং ভারতীয়রা তার বিনিময়ে আইরিশদের স্বাধিকার অর্জনের দাবিকে সর্বতোভাবে সমর্থন করবেন দেশে ও বিদেশে। কিন্তু সেদিন সে-প্রস্তাব কার্যকর করা যায় নি।

যাই হোক, এই যে অধিবেশনে এই 'ভার্নাকুল্যার প্রেস অ্যাক্ট' পাস হয় তার প্রকৃতপক্ষে বিশদ কোনো বিবরণ রবীন্দ্রনাথ দেন নি। ১৮৭৯ সালের ২৩ মে তারিখের অধিবেশনে শুধু ও'ডোনেলের উল্লেখ করেছেন। ও'ডোনেল বলেছিলেন,

> On the 18th of March there appeared in the official media of India, a notice that the printer and publisher of a leading Native paper had been ordered to enter into a joint and special bond in the sum of Rs 1000 rupees for having published on the 24th of February a letter containing remarks and suggestions which were likely to excite dissatisfaction to the government and antipathy to the English race.

এই আদেশ জারি করা হয়েছিল দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের 'সোম প্রকাশে'র 'পর'[৩]। তিনি এই ধরনের আদেশকে 'an oppressive tyranny equal to anything that existed in Russia' আখ্যা দেন। ও'ডোনেলের প্রতিবাদকে সমর্থন করেছিলেন স্যার ডেভিড ওয়েডারবার্ন। কিন্তু ও'ডোনেল বা ওয়েডারবার্নের উক্তির বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় আপত্তি জানিয়েছিলেন 'রক্ষণশীল' দলের ই· স্ট্যানহোপ।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন 'দুর্ভাগ্যক্রমে Irish member-রা House-এ অত্যন্ত অপ্রিয়'— 'দুভার্গ্যক্রমে' নয় অনিবার্য কারণে। আয়ার্ল্যান্ডের মানুষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও সংস্কৃতিগত কোনো স্বাধীনতা ছিল না, ছিল না মতামত

প্রকাশের স্বাধিকার। ব্রিটিশ অপশাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ করেছে আইরিশ বিপ্লবীরা, নিস্পিষ্ট হয়েছে, ফাঁসিকাঠে প্রাণ দিয়েছে।[৪] ১৮৬৭ সালে আয়ার্ল্যান্ডের 'ফেনিয়ান বিদ্রোহ' ঘটে, তার নেতাদের ধরে নিয়ে গিয়ে 'ম্যানচেস্টারে' ফাঁসি দেওয়া হয়। এর মাত্র দশ বছর পরে তরুণ রবীন্দ্রনাথ বিলেতে যান। এরই মধ্যে ঘটেছে 'আইরিশ হোমরুল আন্দোলন', পার্ল্যামেন্টের নির্বাচন, পার্নেলের অভ্যুত্থান প্রভৃতি ঘটনা। তখনো 'সিন্‌ফিন' আন্দোলন গড়ে ওঠে নি, 'সিন্‌ফিনরা' অবশ্য হোমরুল আন্দোলন সম্পর্কে আশাবাদ পোষণ করে নি।

আমাদের আলোচ্য 'চতুর্থ' পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

> 'একবার দেখলেম যে, ভারতবর্ষীয় বিষয় নিয়ে একটা বক্তৃতার সময় ৯।১০ জনের বেশি মেম্বর ছিল না, অন্যান্য সবাই ঘরের বাইরে হাওয়া খেতে বা supper খেতে গিয়েছেন'

কথাটি কঠোর সত্য। এই তো ছিল সেকালের অবস্থা ব্রিটিশের রাজত্বে। জাস্টিস ম্যাকার্থি তাঁর স্মৃতিকথায় *(Reminiscences)* লিখেছেন "as not uncommonly happened in those days when a discussion on India was going on, there were but few occupants of the benches on either side."[৫]

এর পরে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন

> "গত বৃহস্পতিবারে House of Commonsএ ভারতবর্ষ নিয়ে খুব বাদানুবাদ চলেছিল, সেদিন ব্রাইট সিভিল সার্ভিস সম্বন্ধে ও গ্ল্যাডস্টোন তুলাজাতের শুল্ক ও আফগান যুদ্ধ সম্বন্ধে ভারতবর্ষীয়দের দরখাস্ত দাখিল করেন।..."

আসলে 'চতুর্থ' পত্রে রবীন্দ্রনাথ পার্ল্যামেন্টের দুটি অধিবেশনের প্রসঙ্গে লিখেছেন। প্রথমটি ১৮৭৯ সালে ২৩ মে তারিখের। আর যে "গত বৃহস্পতিবারে'র কথা লিখেছেন, তার তারিখ ১২ জুন। অর্থাৎ পরের মাসের। জন ব্রাইট (১৮১১-৮৯) বহুকাল পার্ল্যামেন্টের সদস্য ছিলেন (১৮৪৮-৮৯)। তিনি শেষ বক্তৃতা করেন হাউজ অব কমনস্-এ ১৮৮৭ সালে। রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁর বক্তৃতা শুনেছিলেন তখন তাঁর বয়স আটষট্টি, বার্ধক্যে পৌঁচেছেন। ব্রাইট অ্যাব্রাহাম লিঙ্কনের অনুরাগী হলেও গ্ল্যাডস্টোনের (১৮৩২-৯৫) উদার 'আইরিশ হোমরুল নীতি'কে সমর্থন করেন নি। গ্ল্যাডস্টোন ১৮৮৬ সালে যে 'আইরিশ হোমরুল বিল' আনেন ব্রাইট সে বিলেরও বিরোধিতা করেন।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

> "দুই-একটা বক্তৃতার পর ব্রাইট উঠে সিভিল সার্ভিসের রাশি রাশি দরখাস্ত হৌসে দাখিল করলেন। বৃদ্ধ ব্রাইটকে দেখলে অত্যন্ত ভক্তি হয়, তাঁর মুখে ঔদার্য ও দয়া যেন মাখানো। ব্রাইটকে যখন আমি প্রথম দেখি, যখন আমি তাঁকে ব্রাইট বলে চিনতেম না, তখন অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাঁর মুখ থেকে আমি চোখ ফেরাতে পারি নি। দুর্ভাগ্যক্রমে ব্রাইট সেদিন কিছু বক্তৃতা করলেন না।"

রবীন্দ্রনাথ ঠিকই লিখেছেন। হ্যানসার্ডের সংকলিত পার্ল্যামেন্টারি কাগজপত্র থেকে জানা যাচ্ছে জন ব্রাইট দরখাস্তগুলি পেশ করেন, ঐ দরখাস্তগুলিতে দশ হাজার ভারতীয়ের স্বাক্ষর ছিল। সিভিল সার্ভিসে যাতে অধিক সংখ্যায় ভারতীয়েরা প্রবেশাধিকার লাভের সুযোগ পান তার জন্যই এই 'রাশিরাশি' দরখাস্ত। সেগুলি দাখিল করে ব্রাইট বলেন "The petition gives strong and I should say, abundant, reasons for the fairness of the proposition which the petitioners make to the House." ব্রাইট চেয়েছিলেন ভারতীয়দের সিভিল সার্ভিস প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় প্রবেশাধিকারের বয়ঃসীমা ২৩ বৎসর করা হোক। পূর্বে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বয়ঃসীমা নিয়ে আই· সি· এস· পরীক্ষার সময় তীব্র সংকট দেখা দিয়েছিল।

তার পর রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

> "হৌসে অতি অল্প মেম্বারই অবশিষ্ট ছিলেন, যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই নিদ্রার আয়োজন করছিলেন—এমন সময়ে গ্ল্যাডস্টোন উঠলেন।... গ্ল্যাডস্টোনের স্বর শুনতে পেয়ে আস্তে আস্তে বাইরে থেকে দলেদলে মেম্বর আসতে লাগলেন, দুই দিকের বেঞ্চি পূরে গেল।"

আগেই বলা হয়েছে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন "গ্ল্যাডস্টোন তূলাজাতের শুল্ক ও আফগান যুদ্ধ সম্বন্ধে ভারতবর্ষীয়দের দরখাস্ত দাখিল করেন।"

গ্ল্যাডস্টোন বললেন—

> এই দরখাস্ত বিশেষ করে আফগান যুদ্ধজনিত ব্যয়ভার বহন এবং কয়েকটি তূলাজাত পণ্যের উপর থেকে শুল্ক রহিত করা সম্পর্কে দাখিল করা হচ্ছে। বর্তমান হাউজের কাছে এই আবেদন রাখা হচ্ছে যে এখন থেকে ভারতবাসীদের আফগান যুদ্ধের বিপুল ব্যয়ভার বহন থেকে তাঁরা নিষ্কৃতি দান করুন এবং ভারতসরকার কয়েকটি তূলাজাত পণ্যের উপর থেকে আমদানী শুল্ক রেহাই দেবার যে 'আদেশ' দিয়েছেন, তার নিন্দা করুন।

আফগান যুদ্ধের ব্যয়ভার ভারতের উপর চাপানোর নিন্দা করে তিনি বলেন— "এই যুদ্ধ ভারতীয়দের স্বার্থে নয়, য়ুরোপীয়ানদের [ব্রিটিশের] স্বার্থে চালানো হয়েছে"। আফগান যুদ্ধের মূলে ছিল ব্রিটিশ সরকারের সহজাত রুশভীতি। রাশিয়ার জারের আধিপত্য যদি আফগানিস্তানে বিস্তৃত হয় তা হলে ব্রিটিশ-শাসিত ভারতের তো সমূহ বিপদ। ভারতে লর্ড অকল্যাণ্ডের শাসনকালে (১৮৩৬-৪২) প্রথম আফগান যুদ্ধ বাধে (১৮৩৯ সালে ৭ অগাস্ট) যদিও প্রথম পর্বে ব্রিটিশরা আফগানিস্তানের দোস্ত মুহম্মদকে সরিয়ে শাহ সুজাকে কাবুলে আমীরাসনে বসাতে পেরেছিল কিছুকালের জন্য, কিন্তু সর্বগোষ্ঠী-নিন্দিত সেই শাহ সুজাকে সরতে হয়েছিল এবং দোস্ত মুহম্মদকে পুনরায় মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল ব্রিটিশ সরকার (১৮৪১ সালে ১১ ডিসেম্বর)। ব্রিটিশ সরকারের আফগান যুদ্ধের ব্যয়ভারের মোটা অংশ দেড়কোটি টাকার অধিক সেদিন ভারতকে বহন করতে হয়েছিল। অক্‌ল্যান্ডের পর আসেন লর্ড অ্যালেনবরো। তাঁর শাসনকাল ১৮৪২-৪৪।

১৮৫৫ সালে আফগানিস্তানে হস্তক্ষেপ না করার নীতিগত শর্ত মেনে নেওয়া হয়। ১৮৭০ সাল থেকে পুনরায় ইঙ্গ-রুশ স্বার্থের সংঘাত গুরুতর সম্ভাবনাময় হয়ে ওঠে। গভর্নর জেনারেল লর্ড লিটন ১৮৭৬ সালে বললেন—

> A tool in the hands of Russia I will never allow him to become. Such a tool it would be my first duty to break before it could be used."

এই 'him' হলেন আফগানিস্তানের আমীর শের আলি। ১৮৭৮ সালে ব্রিটিশ সৈন্য তাঁর রাজ্য আক্রমণ করল, ১৮৭৯ সালে মে মাসে শের আলির ছেলে ইয়াকুব খান সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করলেন, ব্রিটিশেরা তাঁদের যা কাম্য তাই হয়তো পেলেন। কিন্তু কিছুদিন পরেই ১৮৭৯ সালে ৩০ সেপ্টেম্বর আফগানরা সে জয়গৌরবকে ভেঙে চুরমার করে দিল। ওদিকে বিলেতে ১৮৮০ সালে নতুন মন্ত্রীসভা কার্যভার গ্রহণ করলেন, লিটনকে সরিয়ে প্রধানমন্ত্রী গ্ল্যাডস্টোন পাঠালেন ভারতবন্ধু লর্ড রিপনকে।

রবীন্দ্রনাথ যেদিনের কথা লিখেছেন তখনো গ্ল্যাডস্টোন বিরোধীপক্ষের নেতা। সবগুলি আফগান যুদ্ধের ব্যয়ভার ভারতীয় বাজেটের অংশীভূত হয়। অ্যালেনবরোর সময়ে আফগান যুদ্ধের জন্য যে 'বন্ড' বাজারে ছাড়া হয় ৩১/২ % সুদে তারই নাম "কোম্পানির কাগজ"। তখনো 'ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি'র শাসন চলছিল।

তূলাজাত বিলিতী পণ্য ভারতে আমদানী করা হত কিন্তু তার উপর থেকে আমদানী শুল্ক রেহাই দিলে ভারতের তূলাজাত পণ্যের বিক্রয় মূল্য প্রতিযোগিতায় ক্ষতিগ্রস্ত হতে বাধ্য। উনবিংশ শতকের শেষার্ধে ভারতবর্ষে কাপড়ের কল গড়ে উঠেছে' এ কথা স্মরণ রাখা দরকার। দাদাভাই নাওরোজি, মাধবগোবিন্দ রাণাডে ভারতের অর্থনীতির কথা মনে রেখে ব্রিটিশের এই আমদানী শুল্ক রেহাই-এর নীতির প্রতিবাদ করেছেন। গ্ল্যাডস্টোন তাঁর প্রস্তাব ব্যাখ্যা করে বললেন—

> এই 'আমদানী শুল্ক' রেহাই দেওয়া সম্পর্কে যে পদ্ধতিতে এই নীতি গৃহীত হয়েছে আমার মতে তা অত্যন্ত আপত্তিকর। যে ভাবে ভারতবাসীর এই দুঃসময়ে একটি দলীয় সরকার [রক্ষণশীল] তাঁদের ক্ষমতাবলে নিজেদের দেশে 'সংরক্ষণ শুল্ক' (protective duty) বজায় রাখছেন, অথচ লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর সামনে তার বিপরীত

চিত্র প্রদর্শন করছেন ("picture of inequality we exhibit to The millions of India")। গ্ল্যাডস্টোন এই বক্তৃতায় 'আর্মস অ্যাক্ট' ও 'ভার্নাক্যুলার প্রেস অ্যাক্ট' -এর বিরোধিতা করেন ও বলেন 'I confess it a most objectionable measure of the time'.

১৮৭৯ সালে লর্ড লিটন বিলেতে তৈরি তুলাজাত পণ্যের উপর এতদিন যে 'আমদানী' কর ভারতে বসানো ছিল তা রহিত করেন। লেজিস্‌লেটিভ কাউনসিলের সামনে 'বিল'টি উপস্থাপিত না করেই, গভর্নর জেনারেল লিটন তাঁর 'বিশেষ' ক্ষমতাবলে তাকে কার্যকর করলেন। এক্‌জিকিউটিভ কাউনসিলের সভ্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ এই 'আমদানী' কর রেহাইদানের বিরোধী ছিলেন। কিন্তু গভর্নর জেনারেল এই ব্যাপারটিতে জরুরি অবস্থায় প্রয়োগযোগ্য তাঁর 'বিশেষ ক্ষমতা' প্রয়োগ করলেন।

বিলেতে তদানীন্তন সেক্রেটারি অব স্টেট, লর্ড লিটনের গৃহীত পন্থাকে সমর্থন করলেও 'কাউনসিল অব স্টেট'-এর অন্তত ৭ জন সভ্য তাঁর মতের বিরোধিতা করেন।

১৮৭৯ সালে ৪ এপ্রিল হাউজ অব কমনস্‌ নিম্নোদ্‌ধৃত প্রস্তাবটি পাস করেন :

> The House accepts the recent reduction in those duties as a step towards their total abolition to which Her Majesty's Government are pledged.

রবীন্দ্রনাথ এর দুমাস পরে শুনলেন গ্ল্যাডস্টোনের বক্তৃতা বিলিতী বস্ত্রশিল্পের উপর থেকে ভারতে 'আমদানী কর' রেহাইদানের প্রসঙ্গে।

এর পাঁচ বছর আগে ১৮৭৪ সালের গোড়ার দিকে ম্যানচেস্‌টার 'চেম্বার অব কমার্স' সেক্রেটারি অব স্টেট-এর কাছে একটি স্মারকপত্রে এই অভিযোগ করেন যে ভারতে তাদের প্রেরিত সুতার ও তুলাজাত পণ্যের উপর যথাক্রমে শতকরা ৩১/২% ও শতকরা ৫ টাকা হারে যে 'কর' ধার্য করা আছে, তার ফলে তাঁদের সুতার ব্যাবসা এবং মোটা ও কমদামী কাপড়ের ব্যাবসা চূড়ান্ত ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। যেহেতু ভারতে নব-উদ্‌ভূত কাপড়কলগুলি 'সংরক্ষণ' ('protection')-এর জন্য কিছু সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে সেজন্য তাঁরা ভারতের দরিদ্রতম জনসাধারণকে খুব কম দামে কাপড় দিতে পারছেন না এবং তাদের 'স্বাস্থ্য, স্বাচ্ছন্দ্য ও উন্নতি' ('health, comfort and general well-being') ঘটাতে অপারগ হচ্ছেন! অতএব 'আমদানী কর' সম্পূর্ণ তুলে দেওয়া হোক!

১৮৭৭ সালে ৩০ অগাস্ট তারিখে 'হাউজ অব কমনস্‌' ম্যানচেস্‌টার চেম্বার অব কমনস্‌-এর আবেদনে সাড়া দিলেন এবং ভারতে সদ্যঃ গড়ে-ওঠা বস্ত্রশিল্প যাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তার ব্যবস্থাগ্রহণে উদ্‌যোগী হলেন— অর্থাৎ ঐ ন্যায্য 'আমদানী কর' থেকে বিলিতী সুতা ও তুলাজাত পণ্যকে রেহাই দেবার প্রস্তাব পাস করলেন, শুধু একটু লেজুড় রাখলেন 'যত শীঘ্র না ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা সেই সুযোগ ঘটার অনুকূল হয়'।

অর্থাৎ হাউজ অব কমনস্‌ জানালেন—

> "That in The opinion of the House of Commons the duties now levied upon cotton manufactures imported into India being protective in their nature, are contrary to sound commercial policy and ought to be repeated without delay as soon as the financial condition of India will permit."

পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে 'দয়াবতী' মহারানী ভিক্‌টোরিয়ার আমলে ভারতের মাটিতে মাথা-তোলা বস্ত্রশিল্পের প্রসার যাতে না ঘটে, যাতে তাকে শৈশবেই গলা টিপে হত্যা করা যায়, নিদেন পক্ষে পঙ্গু করে রাখা যায় তার জন্য বিলেতের পুঁজিবাদী গোষ্ঠী তাদের বস্ত্রশিল্পের উপর থেকে আমদানী কর রেহাই দেবার জন্য অর্থাৎ ভারতীয় বস্ত্রশিল্প যে সংরক্ষণ বা

'প্রোটেকশন' পাচ্ছিল তা বাতিল করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিলেন। কার্ল মার্কস্ -কথিত 'to buy cheap and to sell dear' নীতি অক্ষরে অক্ষরে কার্যকর হচ্ছিল। পুঁজিবাদী দেশ আর তদধীন উপনিবেশের সম্পর্ক তো এই একটাই।

বৃহস্পতিবারের এই অধিবেশনে (অর্থাৎ ১৮৭৯ সালে ১২ জুন তারিখে) ও'ডোনেল নামে একজন Irish member

> "উঠে জিজ্ঞাসা করলেন যে Echo এবং আরো দুই-একটি খবরের কাগজে জুলুদের প্রতি ইংরাজ সৈন্যদের অত্যাচারের যে বিবরণ বেরিয়েছে সে বিষয়ে গবর্নমেন্ট কি কোনো সংবাদ পেয়েছেন? আর সে সকল অত্যাচার কি খৃস্টানদের অনুচিত নয়? অমনি গবর্নমেন্টের দিক থেকে সার মাইকেল হিক্‌সবিচ উঠে ও'ডোনেলকে খুব কড়া কড়া দুই-এক কথা শুনিয়ে দিলেন"।...

সেদিন হাউজ অব কমন্‌স-এর অন্যান্য আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে ছিল 'South Africa—The zulu war— Estimate of Expenditure' দক্ষিণ আফ্রিকায় কৃষ্ণাঙ্গ জুলুদের উপর শ্বেতাঙ্গ ব্রিটিশ ও তাদের লেজুড় কৃষ্ণাঙ্গ সৈন্যদলের নির্মম অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলেছিলেন ও'ডোনেল। আইরিশরা ব্রিটিশ সৈন্যের নির্লজ্জ নিপীড়নের জ্বলন্ত সাক্ষী। রবীন্দ্রনাথ ঠিকই লিখেছেন— ও'ডোনেল 'Echo' ছাড়া 'Daily Chronicle' এবং 'Tiverton Gazette' পত্রিকারও উল্লেখ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন—

> ৩রা জুনের 'ডেইলি ক্রনিকলে'র সংবাদদাতার প্রেরিত সংবাদ থেকে জানা যাচ্ছে যে ক্যামবুলা (Kambula) যুদ্ধের পর, পরাজিত, শ্রমক্লান্ত শত শত জুলু সৈন্যেরা রণক্ষেত্রে লুটিয়ে পশ্চাদ্‌ধাবনকারী ব্রিটিশ সৈন্যদের কাছে দয়া ভিক্ষা করেছিল। কিন্তু দয়ার পরিবর্তে তাদের গুলি করে ও তরবারির আঘাতে খণ্ড খণ্ড করে হত্যা করা হয়। তবু ভাগ্যক্রমে দু-দশজন যারা রক্তাক্ত দেহে করুণ ভাবে প্রাণ ভিক্ষা করছিল তারাও নির্মম ভাবে নিহত হয়েছে।

'Echo' পত্রিকা ৩ জুন এই মর্মে তার সংবাদদাতার পত্র ছাপে। আসলে ২৭ মে তারিখের 'Tiverton Gazette'-এ এটি প্রথম বার হয়, Echo পত্রিকায় সেটি পুনর্মুদ্রিত হয়। ও'ডোনেল ঐ সংবাদকে ভিত্তি করে তাঁর অভিযোগ আনেন। সংবাদদাতার প্রেরিত একজন ব্রিটিশ সৈন্যের লিখিত পত্র থেকে ও'ডোনেল পড়লেন—

> "গত ৩০ মার্চ অর্থাৎ যুদ্ধের পরদিন আমাদের ক্যাম্প থেকে প্রায় আট মাইল দূরে আমরা দেখতে পেলাম প্রায় পাঁচ শো কেউবা গুরুতর আহত, কেউবা মৃতকল্প, করুণভাবে মিনতি করছিল, তাদের প্রাণভিক্ষা চাইছিল। কিন্তু না, তারা আইসানডুলার (Isandula) যুদ্ধে আমাদের সৈন্যদের প্রতি যে অন্যায় ব্যবহার করেছে, তার প্রতিদান হিসেবে তাদের বেঁচে থাকবার কোনো সুযোগ দেওয়া হল না।"

পত্রাংশ পাঠ করে ও'ডোনেল কমনস্ সভার কাছে প্রশ্ন তোলেন, দক্ষিণ আফ্রিকায় ব্রিটিশ সৈন্যদের এই আচরণ কি সভ্যসমাজের স্বীকৃত ও আচরিত বিধিসম্মত? খৃস্টধর্মের প্রসঙ্গও তিনি তুলে ধরেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠিকই লিখেছেন যে ও'ডোনেলকে ওহো! ওহো! (Oh) রব করে বাধা দেওয়া হয় এবং স্যার মাইকেল হিক্‌সবিচ উঠে ও'ডোনেলের বক্তৃতার তীব্র প্রতিবাদ জানান। হিক্‌সবিচ (১৮৩৭-১৯১৬) ইটন ও অক্সফোর্ডের ছাত্র, ১৮৫৪ সালে পার্ল্যামেন্টে প্রবেশ করেন। ১৮৭৪-৭৮ কাল পর্বে তিনি ব্রিটিশ-শাসিত আয়ার্ল্যান্ডের চীফ্ সেক্রেটারি ছিলেন এবং কলোনিয়াল সেক্রেটারি ছিলেন ১৮৭৮-৮০ সালে। তিনি ছিলেন যাকে বলা যায় কড়া রক্ষণশীল। সেজন্য আইরিশরা তাঁকে হাড়ে-হাড়ে চিনতেন।

স্যার মাইকেল হিক্‌সবিচ আরো বললেন—

> দক্ষিণ আফ্রিকায় স্যার গার্নেট উলস্‌লে (Wolsley)কে নির্দেশ দেওয়া হবে যে মহারানীর গভর্নমেন্টের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ব্রিটিশ-অধিকৃত অঞ্চলের সীমানা বাড়িয়ে যাওয়া নয় বরঞ্চ যে-সব অঞ্চল এখন আমাদের অধিকারে আছে তাদের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা রক্ষা করা মাত্র। তাঁকে আরো নির্দেশ দেওয়া হবে যেন তিনি জুলুরাজের পক্ষ থেকে উত্থাপিত আপস আলোচনার শর্তাবলীকে যথাযোগ্যভাবে গ্রহণ করেন।

এইদিনের সভায় আইরিশ হোমরুলের নেতা চার্লস্ স্টুয়ার্ট পার্নেল উপস্থিত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ পার্নেলের মতো

নেতৃস্থানীয় বক্তার উল্লেখ কেন করলেন না, বোঝা গেল না। কেননা হিকস্‌বিচের বক্তৃতার জবাবে পার্নেল প্রশ্ন করেন—

স্যার উলস্‌লের প্রতি প্রেরিত নির্দেশনামায় ঐ দেশীয় ব্যক্তিদের দ্বারা গঠিত সেনাদল ('নেটিব অক্‌জ্যুলারি') যাতে জুলু সৈন্যদের পশ্চাদ্‌ধাবন ও হনন না করে তার জন্য কি কোনো নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে ? কেননা— 'The practice had given rise to horrors that was a disgrace to humanity and civilisation'.

১৮৩৮-৪৩ কাল পর্বে ব্রিটিশ ও ডাচ বুয়র উভয়েই জুলুল্যাণ্ডের বিশেষ অংশ দখল করে নেয়। তারপর ১৮৬৭ সালে অরেঞ্জ নদী-বাহিত এলাকায় প্রচুর সোনা ও হীরার সন্ধান মেলে। ১৮৭১-এ ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট কেপ কলোনির গবর্নর স্যার হেনরি বার্কলেকে 'হীরক অঞ্চল'কে তাঁর শাসনাধীনে নিয়ে আসবার জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষমতা দান করেন। একটা অজুহাত অবশ্য সৃষ্টি করা হয়েছিল— খনি অঞ্চলের খনকদের শৃঙ্খলাহীনতা দূর করার উপযুক্ত পাত্র হলেন একমাত্র ব্রিটিশ রাজ। তারই ফল ১৮৭৭ সালে ব্রিটিশ শক্তির যুদ্ধ ঘোষণা প্রথমে আফ্রিকান্ জুলুদের ও পরে ডাচ বুয়রদের বিরুদ্ধে। 'বানটু'ভাষী জুলুদের রাজা কেট্‌সোয়াইও (Cetshwayo) ব্রিটিশের কথায় জুলু সৈন্যদল ভেঙে দিতে ও নিজেকে পুরোপুরি ব্রিটিশের নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখতে অস্বীকার করলেন। আইসানডুল্‌ওয়ানার (Isandulwana) যুদ্ধে (২২ জানুয়ারি ১৮৭৯) ব্রিটিশ সৈন্যেরা প্রবল বাধার সম্মুখীন হয়, বেশ-কিছু ব্রিটিশ সৈন্য হতাহত হয় কিন্তু পরে ১৮৭৯র জুলাই মাসে সাবেক অস্ত্রধারী জুলু সৈন্যেরা পরাজিত হয়। রবীন্দ্রনাথ ১৮৭৯ সালে ১২ জুন যখন হাউজ অব কমন্‌সে বিতর্ক শুনেছিলেন, তখন যুদ্ধ চলছে। গ্ল্যাডস্টোনের বক্তৃতা তরুণ রবীন্দ্রনাথকে খুবই মুগ্ধ করেছিল। তিনি লিখেছেন—

গ্ল্যাডস্টোনের কী-এক রকম দৃঢ়স্বরে বলবার ধরন আছে, তাঁর প্রতি কথা মনের ভিতরে গিয়ে যেন জোর করে বিশ্বাস জন্মিয়ে দেয়। একটা কথায় জোর দেবার সময় তিনি মুষ্টিবদ্ধ করে একেবারে নুয়ে নুয়ে পড়েন, যেন প্রত্যেক কথা তিনি একেবারে নিংড়ে নিংড়ে বের করছেন।...

সত্তর বয়সী গ্ল্যাডস্টোন সম্পর্কে প্রখ্যাত লর্ড অ্যাকটন্ ঠিকই বলেছিলেন ১৮৭৯ সালে গ্ল্যাডস্টোনের কন্যাকে—

'in the three elements of greatness combined— the man, the power and the result— character, genius and success— none reached his level.'

আর তাঁর কণ্ঠস্বর সম্পর্কে সেকালের লোকেরা বলেছেন—

'his voice was clear, deep and sonorous with a touch of Lancashire accent'.

তরুণ রবীন্দ্রনাথ গ্ল্যাডস্টোনের বক্তৃতা সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তার সঙ্গে স্বতঃই এর মিল—

"কিছুমাত্র তর্জন-গর্জন ছিল না, অথচ তাঁর প্রতি কথা ঘরের যেখানে যে-কোনো লোক বসেছিল সকলেই একেবারে স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিল।"

এই সূত্রে রবীন্দ্রনাথ আইরিশ মেম্বর সলিভানের বক্তৃতার সঙ্গে গ্ল্যাডস্টোনের বক্তৃতার তুলনা করে লিখেছেন—

"সলিভান খুব হাত পা নেড়ে, চেঁচিয়ে-মেচিয়ে, হুট পাট করে বলে যান। তাঁর বক্তৃতা মনে লাগে বটে, কিন্তু সে ভাব বড়ো বেশিক্ষণ থাকে না। তাঁর তর্জন-গর্জনও যেমন থামে, শ্রোতাদের মনও অমনি জুড়িয়ে যায়।"

এই সলিভান হলেন আলেকজান্ডার মার্টিন সলিভান (Sullivan ১৮৩০-৮৪)। আয়ার্ল্যান্ডে ১৮৪৬-৪৭-এর দারুণ দুর্ভিক্ষের সময়ে তিনি দুর্ভিক্ষ-ত্রাণ বিভাগের কর্মী ছিলেন। উইলিয়ম স্মিথ ও'ব্রায়েন -পরিচালিত আইরিশ স্বাধীনতা-প্রেমী 'ইয়ং আয়ার্ল্যান্ডার্স' যোগ দেন ও ১৮৪৮ সালের বৈপ্লবিক কার্যক্রমের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেন। ১৮৬৫তে তাঁর ফাঁসির আদেশ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে রদ হয়। ১৮৬৭ সালে 'ম্যানচেস্টার শহীদদে'র সম্পর্কে 'উইক্‌লি নিউজ'-এ লেখার জন্য ছয়মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। তিনি আইজাক বাট-পার্নেল পরিচালিত আইরিশ হোমরুল দলের প্রতিনিধিরূপে ১৮৭৪ সালে পার্ল্যামেন্টের সদস্য হন। তিনি আয়ার্ল্যান্ডের উপর কয়েকখানি বই লেখেন : *The Story of Ireland* (১৮৭০), *New Ireland* (১৮৭৭), *A Nutshell History of Ireland* (১৮৮৩)। আইরিশদের সঙ্গে বাঙালির

প্রকৃতিগত খানিকটা মিল আছে— উভয়েই বেশি আবেগপ্রবণ, সলিভান ব্যতিক্রম নন। রবীন্দ্রনাথ সলিভানের বক্তৃতার ভঙ্গির বর্ণনা দিয়েছেন কিন্তু বক্তব্যের কোনো উল্লেখ করেন নি। দক্ষিণ আফ্রিকায় জুলুদের নির্দয়ভাবে হত্যার প্রসঙ্গ তুলে যখন ও'ডোনেল বক্তৃতা করছিলেন তখন তাঁকে বারংবার ওহ্ ওহ্ (oh! oh!) করে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা হয়। হিক্সবিচের জবাব দিতে উঠে ও'ডোনেল বাধা পান।

তখন সলিভান বলেন—

> যে ভাষায় কলোনিয়াল সেক্রেটারি তাঁর বক্তব্য পেশ করেছেন আমি তার নিন্দা করছি। তিনি ভুলে যাচ্ছেন যে সংবাদপত্রে [জুলুদের উপর] এই অত্যাচারের বিবরণ বেরিয়েছে সেটি খোদ ইংরেজের কাগজ, আইরিশদের নয়।...
> যে সৈন্য ঐ চিঠিটি লিখেছে সে একজন ইংরেজ সৈন্য, আইরিশ নয়।...

আইরিশ সদস্যদের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ নিক্ষেপ ছিল তখনকার প্রায় প্রতিদিনের ঘটনা। রবীন্দ্রনাথ ঠিকই লিখেছেন—

> "আইরিশ মেম্বাররা এইরকম জ্বালাতন হয়ে আজকাল খুবই প্রতিহিংসা পরায়ণ হয়েছেন। হাউসে যে-কোনো কথা ওঠে প্রায় সকল বিষয়েই তারা বাধা দেন ;... আমার স্বভাবতই আইরিশ মেম্বারদের প্রতি টান...মনে করো আইরিশদের অনুগ্রহ করে পার্ল্যামেণ্টে স্থান দেওয়া হয়েছে আইরিশরা সেই অনুগ্রহ পেয়েই যদি শান্ত ছেলেগুলির মত চৌসে বসে থাকত, তাদের অস্তিত্ব আছে কিনা আছে যদি জানা না যেত, তাহলে অনুগ্রহকর্তারা সন্তুষ্ট থাকতেন।"

'আমার স্বভাবতই আইরিশ মেম্বারদের প্রতি টান' লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ। কেননা তাঁর মনে হয়েছে এই একই ব্যাপার ঘটত ভারতবর্ষীয় মেম্বারদের বেলায় যদি তাঁরা কমন্স-সভায় এসে ব্রিটিশ সরকারের অন্যায় নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতেন। পরাধীন ভারতবর্ষের সন্তান তরুণ রবীন্দ্রনাথ অন্তরের দিক থেকে ব্রিটিশ শাসনাধীন আইরিশদের আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং তাঁদের প্রতিবাদ-প্রতিরোধের প্রতি সহানুভূতিবোধ করেছিলেন। এ কথা সত্য দ্বারকানাথ ঠাকুর ১৮৪৬ সালে আয়ার্ল্যাণ্ডে দুর্ভিক্ষের সূচনা পর্বে দুর্ভিক্ষত্রাণে অর্থ সাহায্য করেছিলেন এবং ১৮৭৯ সালে যখন আয়ার্ল্যাণ্ডে প্রবল শস্যহানি ঘটেছিল এবং আইরিশরা খাদ্যাভাবের কবলে পড়েছিল তখন রবীন্দ্রনাথের পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৭০ পাউণ্ড পাঠিয়েছিলেন আর্ত আইরিশদের জন্য। দ্বারকানাথের সাহায্যের কথা রবীন্দ্রনাথ জানতেন বলে মনে হয় না, কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের অর্থ প্রেরণের কথা তাঁর অজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু তা ছাড়াও তরুণ রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীতে অত্যাচার, অবিচারের জন্য বেদনাবোধ করেছিলেন, বায়রনের কাব্য, কবি শেলীর Ode to Liberty তাঁর পঠিত ছিল বলে মন হয়। না হলে তার 'কবিকাহিনী'তে (১৮৭৮) কেন লিখবেন—

> কি দারুণ অশান্তি এ মনুষ্যজগতে—
> রক্তপাত, অত্যাচার, পাপ কোলাহল
> দিতেছে মানবমনে বিষ মিশাইয়া!
> কত কোটি কোটি লোক, অন্ধকারাগারে
> অধীনতা শৃঙ্খলেতে আবদ্ধ হইয়া
> ভরিছে স্বর্গের কর্ণ কাতর ক্রন্দনে,
> অবশেষে মন এত হোয়েছে নিস্তেজ,
> কলঙ্ক শৃঙ্খল তার অলঙ্কার রূপে
> আলিঙ্গন করে তারে রেখেছে গলায়!
> দাসত্বের পদধূলি অহঙ্কার কোরে
> মাথায় বহন করে পর প্রত্যাশীরা!

যে পদ মাথায় করে ঘৃণার আঘাত
সেই পদ ভক্তিভরে করে গো চুম্বন!
যে হস্ত ভ্রাতারে তার পরায় শৃঙ্খল,
সেই হস্ত পরশিলে স্বর্গ পায় করে।...
কোটি কোটি মানবের শান্তি স্বাধীনতা
রক্তময় পদাঘাতে দিতেছে ভাঙ্গিয়া।...ইত্যাদি

কবি শেলীর রচনা পাঠের প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ নিজেই তুলেছেন 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র' বইটির 'দ্বিতীয় পত্রে'—

> কিন্তু Shelley [শেলী] বলে যে একজন কবি তাঁদের দেশে জন্মেছিল সেই খবরটুকু মাত্র জানেন, কিন্তু শেলী যে চেঞ্চি (Cenci) বলে একখানা নাটক লিখেছেন বা তাঁর Epipsychidion বলে যে একটি কবিতা আছে তা আমার মুখে প্রথম শুনতে পেলেন।

তরুণ রবীন্দ্রনাথ কমন্স সভার বিতর্ক শুনতে দুদিন সেখানে গিয়েছিলেন, আফ্রিকা, আয়ার্ল্যান্ড ও ভারতের উপর ব্রিটিশ শাসক গোষ্ঠীর নির্দয় মনোভাব হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন, সারা জীবন ধরে তিনি সেই অপশাসনের বর্বরতার নিন্দা করে গেছেন।

টীকা

১ O Brien, R. B. *Parnell and his Party 1880-1890* (Oxford, 1957), p. 23n. 1.
২ O'Donnell, F. H. *A History of The Irish Parliamentary Party* (London, 1910), p. 434
৩ লাহোরের সংবাদদাতার একটি পত্র প্রকাশের জন্য এক হাজার টাকা জামানত ও মুচলেকা চেয়ে পাঠালে দ্বারকানাথ পত্রিকা বন্ধ করে দেন (মার্চ ১৮৭৯)।
৪ ১৮০৩ সালে ফাঁসির কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে রবার্ট এমেট বলেছিলেন:
"I acted as an Irishman, determined on delivering my country from this doubly riveted despotism."
৫ *My Reminiscences*, London, 1899, p. 333
৬ ১৮৫৪ সাল থেকে ভারতে বোম্বাই অঞ্চলে কাপড়ের কল গড়ে উঠতে থাকে। ১৮৬৫ সালে মাত্র ১০টি কাপড়ের কল ছিল, ১৮৭২-৭৮ কালপর্বে আরো ৩২টি নতুন কাপড়ের কল বসে। এতে স্বভাবত ম্যানচেস্টারের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হচ্ছিল।

জাতীয় ঐক্য ও সংহতির প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথ

নেপাল মজুমদার

ভারতের জাতীয় ঐক্য ও সংহতির প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথ প্রায় সারা জীবনই চিন্তাভাবনা করেছেন— বিস্তর লিখেছেন, এবং কথা বলেছেন। তার বিস্তারিত আলোচনার স্থান অন্যত্র। দেশের কয়েকটি চরম সংকট মুহূর্তে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি-সমস্যার সমাধানে কবি কী চিন্তা-ভাবনা করেছিলেন, এখানে সংক্ষেপে তার একটি রূপরেখা দেবার চেষ্টা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, জাতীয় ঐক্য ও সংহতির এবং আমাদের জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের মূল স্রোতোধারার সঠিক পরিপ্রেক্ষিত ও ঐতিহাসিক পটভূমিটিও স্মরণ রাখা দরকার।

দেশ তখন ইংরেজের অধীন। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী— ইংরেজ-শাসনের হাত থেকে দেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিলাভ করা— এইটাই ছিল দেশের বুদ্ধিজীবীদের 'পরে ইতিহাস-নির্দেশিত দায়িত্ব।

উনিশ শতকে জাতীয় চেতনা ও জাগরণের ক্ষেত্রে রামমোহন ডিরোজিও বিদ্যাসাগর অক্ষয় দত্ত দেবেন্দ্রনাথ মধুসূদন রঙ্গলাল দীনবন্ধু বঙ্কিমচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ বাংলার পুরোধাগণ যে ঐতিহ্য-ধারার সৃষ্টি করেছিলেন, বাংলার বাইরে ভারতের সর্বত্র তা তেমন বিস্তৃতি লাভ করতে পারে নি। বিশেষ করে, এই পর্বে বাংলাতে জাতীয়তাবাদ ও স্বদেশপ্রেমের প্রথম যে জোয়ার এসেছিল, তার মধ্যে সংকীর্ণ 'বাঙালীয়ানা' বা প্রাদেশিকতা ছিল না ; তাঁরা অখণ্ড ও ঐক্যবদ্ধ ভারতেরই জয়গান করেছেন। এমন-কি যে 'সিন্দুমেলা' (বা চৈত্রমেলায়) কিছুটা সাম্প্রদায়িকধর্মী বলে মনে হয় (যার পশ্চাতে সত্যেন্দ্রনাথ গণেন্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ 'ঠাকুরবাড়ি'র যুবকেরাই প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন), সেখান থেকেও 'হিন্দুস্থান'-এর নয়,—'ভারতের'('গাও ভারতের জয়') জয়গান করা হয়েছিল। এই 'হিন্দুমেলা'তেই সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর বিখ্যাত 'মিলে সব ভারত সন্তান' এবং গণেন্দ্রনাথের বিখ্যাত 'লজ্জায় ভারত যশ গাহিব কি করে' গাওয়া হয়েছিল। এমন-কি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁর বালক বয়সে হিন্দুমেলায় যে-কয়টি কবিতা পাঠ করেছিলেন— সবগুলিতেই সমগ্র ভারতের পরাধীনতার গ্লানি ও দুর্গতির জন্য বিলাপ করা হয়েছিল, এ-সব কথা সকলেই জানেন।

উনিশ শতকের শেষ ভাগেই, প্রথমে বাংলায়, পরে বোম্বাই ও দক্ষিণ ভারতে সংঘবদ্ধ রাজনৈতিক আন্দোলন ও দল গঠনের সূচনা হয়। বস্তুত বাংলাতেই সর্ব প্রথম সুরেন্দ্রনাথ, আনন্দমোহন প্রমুখের নেতৃত্বে 'ভারতসভা' (Indian Association 1876) গঠিত হয়। তার কয়েক, বৎসর পর ১৮৮৫ সালেই, বোম্বাইয়ে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয়। লক্ষণীয় ব্যাপার এই, কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই প্রায় অধিকাংশ মুসলমান কংগ্রেসের দূরে-দূরে রইলেন।

সাম্রাজ্যবাদীরা সর্বত্রই 'divide and rule' নীতি অবলম্বন করে এসেছে। আমাদের জাতীয় আন্দোলন ও কংগ্রেসের প্রায় সূচনাকাল থেকেই ইংরেজরা এই নীতি-কৌশল অবলম্বন করে জাতীয় ঐক্য ও সংহতিকে বিপর্যস্ত করার চেষ্টা করে এসেছে।

সকলেই জানেন, ১৮৯০ সালে টিলকের নেতৃত্বে 'গণপতি উৎসব' 'শিবাজী উৎসব' ও 'গো-রক্ষা' প্রভৃতি আন্দোলন উপলক্ষে ভারতে হিন্দু-মুসলমানের সর্বপ্রথম রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক বিরোধ-সংঘর্ষের সূচনা হয়। অবশ্য, টিলকের এই-সব আন্দোলনের মধ্যে জঙ্গী হিন্দু-জাতীয়তাবাদী চিন্তার প্রভাবও কম ছিল না' কিন্তু এই আন্দোলনে সব চেয়ে হীন ও বিপজ্জনক ভূমিকা ছিল ইংরেজ বুরোক্র্যাটদের। রবীন্দ্রনাথ সেটা প্রথম থেকেই গভীরভাবে লক্ষ্য করেছিলেন। এইসময়

"ইংরাজের আতঙ্ক" প্রবন্ধে[১] ইংরেজদের উদ্‌বেগ ও আতঙ্কের আসল রহস্যটি উদ্‌ঘাটন করতে গিয়ে কবি লিখলেন :

"ইংরাজ হঠাৎ কংগ্রেসের মূর্তি দেখিয়া প্রথমটা আচমকা ডরাইয়া উঠিয়াছিল।... এইজন্য ভারতবর্ষের সুখশয়নাগারে হঠাৎ সেই পোলিটিকাল জুজুর আবির্ভাব দেখিয়া ইংরাজের সুস্থ প্লীহাও চমকিয়া উঠিয়াছিল।

"কিন্তু কন্‌গ্রেসটার উপরে প্রত্যক্ষভাবে কোনোরূপ আঘাত করা হয় নাই।... এই নবনির্মিত জাতীয় জয়ঢাকটার উপরে কাঠি না মারিয়া তাহাকে তলে তলে ছিদ্র করিবার আয়োজন করা হইল। মুসলমানেরা প্রথমে কন্‌গ্রেসে যোগ দিবার উপক্রম করিয়া সহসা যে বিমুখ হইয়া দাঁড়াইল তাহার কারণ বোঝা নিতান্ত কঠিন নহে।...

"কিন্তু এতদিনে ইংরেজ এ কথা কতকটা বুঝিয়া থাকিবে যে, হিন্দুর হস্তে পলিটিক্‌স তেমন মারাত্মক নহে।... মুসলমান যদি দূরে থাকে তবে কন্‌গ্রেস হইতে আশু আশঙ্কার কারণ নাই।"

বছর খানেক পরে, "সুবিচারের অধিকার" প্রবন্ধে[২] ইংরেজ সরকারের হীন ও গূঢ় অভিসন্ধি উদ্‌ঘাটন করতে গিয়ে কবি বললেন,

"অনেক হিন্দুর বিশ্বাস, বিরোধ মিটাইয়া দেওয়া গবর্মেন্টের আন্তরিক অভিপ্রায় নহে। পাছে কন্‌গ্রেস প্রভৃতির চেষ্টায় হিন্দু-মুসলমানগণ ক্রমশ ঐক্যপথে অগ্রসর হয় এইজন্য তাঁহারা উভয় সম্প্রদায়ের ধর্মবিদ্বেষ জাগাইয়া রাখিতে চান, এবং মুসলমানের দ্বারা হিন্দুর দর্প চূর্ণ করিয়া মুসলমানকে সন্তুষ্ট ও হিন্দুকে অভিভূত করিতে ইচ্ছা করেন।"

বলা বাহুল্য, এ অভিযোগ শুধু রবীন্দ্রনাথেরই নয়, দেশের তৎকালীন ছোটো-বড়ো সব নেতারই। তাঁরা মনে করতেন, ইংরেজরাই উস্কানি দিয়ে আমাদের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এবং জাতীয় ঐক্যকে বিনষ্ট করছে। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু শুধুমাত্র ইংরেজদেরকেই দায়ী করতেন না। তৃতীয়পক্ষ অর্থাৎ শুধুমাত্র ইংরেজের উস্কানি, মদত বা প্রশ্রয়ে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ-সংঘর্ষ ঘটছে বা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট হচ্ছে, কবি তা বিশ্বাস করতেন না।

কবি বিশ্বাস করতেন, শুধু হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্কই নয়— সামগ্রিকভাবে আমাদের জাতীয় ও সমাজ জীবনে সকল বিভেদ অনৈক্য ও বিরোধ-সংঘর্ষের বাস্তব কারণ আছে।— পারস্পরিক ঘৃণা অবমাননা পীড়ন লাঞ্ছনায় বিরোধ-বিদ্বেষের বিষ সমাজের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে প্রবেশ করেছে। এর জন্য তিনি বিত্তবান উচ্চবর্ণের হিন্দু সমাজকেই অধিক দায়ী করেছেন। প্রসঙ্গত তিনি আরো স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, ভারতের অতীত ইতিহাসে ঠিক আধুনিককালের রাজনৈতিক সংহতি ও ঐক্য-চেতনা ছিল না ;— প্রদেশে-প্রদেশে বা অঞ্চলে-অঞ্চলে বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর সঙ্গে রাজশক্তির বিরোধ-সংঘর্ষ লেগেই ছিল। দেশের স্বাধীনতা ও রাজনৈতিক প্রয়োজনে দেশবাসীর সেই জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় ঐক্য-চেতনাকে জাগ্রত করতে হলে আমাদের প্রাদেশিকতা আঞ্চলিকতা সাম্প্রদায়িকতা এবং উগ্র ধর্মান্ধতা ও সমস্ত রকমের সংকীর্ণতাকে পরিহার করতে হবে। তিনি ভারতের জাতীয় ঐক্য ও সংহতির প্রশ্নটি আলোচনা প্রসঙ্গে বললেন[৩] :

"...রাষ্ট্রতন্ত্রীয় একতা আমাদের ছিল না। শত্রুকে আক্রমণ, শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা এবং এক শাসনতন্ত্রের অধীনে পরস্পরের স্বার্থ ও শুভাশুভের একত্ব অনুভব আমরা কখনো দীর্ঘকাল করি নাই। আমরা চিরদিন খণ্ড খণ্ড দেশে খণ্ড খণ্ড সমাজের সংকীর্ণ প্রাদেশিকতা-দ্বারা বিভক্ত।... আমরা প্রাদেশিক, আমরা পল্লীবাসী ; বৃহৎ দেশ ও বৃহৎ সমাজের উপযোগী মতের উদারতা, প্রথার যুক্তিসংগতি এবং সাধারণ স্বার্থরক্ষার উদ্‌যোগপরতা আমাদের মধ্যে নাই।...

"... এক্ষণে আমাদের প্রাদেশিক বিচ্ছেদগুলি ভাঙিয়া ফেলিবার সময় হইয়াছে।...

"বর্তমানকালে হিঁদুয়ানির পুনরুত্থানের যে একটা হাওয়া উঠিয়াছে তাহাতে সর্বপ্রথমে ওই অনৈক্যের ধুলা, সেই প্রাদেশিক এ ক্ষণিক তুচ্ছতাগুলিই উড়িয়া আসিয়া আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়াছে।...

"অতএব এক দিকে আমাদের দেশীয়তা, অপর দিকে আমাদের বন্ধনমুক্তি, উভয়ই আমাদের পরিত্রাণের পক্ষে অত্যাবশ্যক। সাহেবি অনুকরণ আমাদের পক্ষে নিষ্ফল এবং হিঁদুয়ানির গোঁড়ামি আমাদের পক্ষে মৃত্যু।"

এর কয়েক বৎসর পরেই ঐতিহাসিক 'বঙ্গভঙ্গ' ও 'স্বদেশী'-আন্দোলনের সূচনা হয়। বাংলার তথা সারা ভারতের জাতীয় ও স্বাদেশিক চেতনা এবং আন্দোলনের ক্ষেত্রেই শুধু নয়, নানা দিক থেকেই এই 'বঙ্গভঙ্গ' আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ

অবদান ও তাৎপর্য আছে। সে আলোচনার স্থান অন্যত্র। কিন্তু এটাও ভুলে গেলে চলবে না, এই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সূচনার অল্পকাল পরেই বাংলাদেশে উগ্র সাম্প্রদায়িকতা ও হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ-সংঘর্ষের সূচনা হয়। বলা বাহুল্য, এর পশ্চাতে ইংরেজ ঝানু ব্যুরোক্র্যাটদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ হাত ছিল।

সকলেই জানেন, কলকাতায় রবীন্দ্রনাথ ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রমুখের নেতৃত্বেই বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যেই এই ঐতিহাসিক আন্দোলনের সূচনা হয়। 'রাখীবন্ধন উৎসব' ও 'অরন্ধন'-এর পরিকল্পনা তাঁরাই করেন। এখানে যেটা লক্ষণীয়— রবীন্দ্রনাথ একেবারে প্রথম থেকেই হিন্দু-মুসলমানের মিলিত বা ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার উপর গুরুত্ব দেবার আহ্বান জানান। আন্দোলন শুরু হওয়ার প্রায় মাস দেড়েক আগে, ৯ ভাদ্র (১৩১২) কলকাতা টাউন হলে "অবস্থা ও ব্যবস্থা" শীর্ষক ঐতিহাসিক ভাষণে কবি এই হিন্দু-মুসলমানের যৌথ ও ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে বলেন :

"...এখন হইতে আমরা হিন্দু ও মুসলমান, শহরবাসী ও পল্লীবাসী, পূর্ব ও পশ্চিম, পরস্পরের দৃঢ়বদ্ধ করতলের বন্ধন প্রতিক্ষণে অনুভব করিতে থাকিব।...

"এই অভিপ্রায়টি মনে রাখিয়া দেশের কর্মশক্তিকে একটি বিশেষ কর্তৃসভার মধ্যে বদ্ধ করিতে হইবে। অন্তত একজন হিন্দু ও একজন মুসলমানকে আমরা এই সভার অধিনায়ক করিব— তাঁহাদের নিকটে নিজেকে সম্পূর্ণ অধীন, সম্পূর্ণ নত করিয়া রাখিব, তাঁহাদিগকে কর দান করিব, তাঁহাদের আদেশ পালন করিব; নির্বিচারে তাঁহাদের শাসন মানিয়া চলিব..."[৩ক]

শুধু মৌখিক আহ্বান জানিয়েই নয়— ৩০ আশ্বিন সেই ঐতিহাসিক 'রাখীবন্ধন' অনুষ্ঠানের দিন কবি স্বয়ং সকলের পুরোভাগে থেকে 'বাংলার মাটি বাংলার জল' গানটি গাইতে-গাইতে নেতৃত্ব দিলেন।— পথে বীরু মল্লিকের আস্তাবলের সহিসদের হাতে—এমন-কি খোদ নাখোদা মসজিদের ভেতরে ঢুকে প্রার্থনারত মুসলমান ভাইদের হাতে রাখী পরিয়ে দিয়ে এলেন। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর 'ঘরোয়া' গ্রন্থে এর সরস ও সজীব বর্ণনা দিয়েছেন।

আগেই বলেছি, আন্দোলন শুরু হওয়ার কিছুদিন পরেই একদিকে ইংরেজ সরকারের প্রবল দমননীতি অপরদিকে ইংরেজ শাসনকর্তাদের মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাকে উস্কানি ও প্রশ্রয় দেওয়ার ফলে হিন্দু-মুসলিম বিরোধ-সংঘর্ষ ক্রমেই বাড়তে থাকে— বিশেষ করে, বলপূর্বক বিলিতিপণ্য বয়কট উপলক্ষে। দেশের নেতারা প্রায় সকলেই এক বাক্যে ইংরেজকেই দায়ী করতে থাকেন। বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ ঘটনার গতিপ্রবাহ দেখে গভীর মর্মাহত হন। তিনি আন্দোলনের ব্যর্থতা এবং হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ-সংঘর্ষ ও সাম্প্রদায়িক সমস্যার গভীরে প্রবেশ করে মূল কারণগুলি উদ্ঘাটনে প্রয়াসী হন। এই সময় 'ব্যাধি ও প্রতিকার' প্রবন্ধে[৪] তিনি বললেন :

"আজ আমরা সকলেই এই কথা বলিয়া আক্ষেপ করিতেছি যে, ইংরেজ মুসলমানদিগকে গোপনে হিন্দুর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া দিতেছে। কথাটা যদি সত্যই হয় তবে ইংরেজের বিরুদ্ধে রাগ করিব কেন।...

"হিন্দু-মুসলমানের সম্বন্ধ লইয়া আমাদের দেশের একটা পাপ আছে ; এ পাপ অনেকদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে।...

"এবার আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে হিন্দু-মুসলমানের মাঝখানে একটা বিরোধ আছে। আমরা যে কেবল স্বতন্ত্র তাহা নয়। আমরা বিরুদ্ধ।

"আমরা বহুশত বৎসর পাশে পাশে থাকিয়া এক খেতের ফল, এক নদীর জল, এক সূর্যের আলোক ভোগ করিয়া আসিয়াছি, আমরা এক ভাষায় কথা কই, আমরা একই সুখদুঃখে মানুষ ; তবু প্রতিবেশীর সঙ্গে প্রতিবেশীর যে সম্বন্ধ মনুষ্যোচিত, যাহা ধর্মবিহিত তাহা আমাদের মধ্যে হয় নাই।...

"আমরা জানি, বাংলাদেশের অনেক স্থানে এক ফরাশে হিন্দু-মুসলমানে বসে না— ঘরে মুসলমান আসিলে জাজিমের এক অংশ তুলিয়া দেওয়া হয়, হুঁকার জল ফেলিয়া দেওয়া হয়।...

"যদি-বা শাস্ত্রের সেই বিধানই হয় তবে সে শাস্ত্র লইয়া স্বদেশ-স্বজাতি-স্বরাজের প্রতিষ্ঠা কোনোদিন হইবে না। মানুষকে ঘৃণা করা যে দেশে ধর্মের নিয়ম, প্রতিবেশীর হাতে জল খাইলে যাহাদের পরকাল নষ্ট হয়, পরকে অপমান করিয়া যাহাদিগকে জাতিরক্ষা করিতে হইবে, পরের হাতে চিরদিন অপমানিত না হইয়া তাহাদের গতি নাই। তাহারা যাহাদিগকে

ম্লেচ্ছ বলিয়া অবজ্ঞা করিতেছে সেই ম্লেচ্ছের অবজ্ঞা তাহাদিগকে সহ্য করিতে হইবেই।"

শুধু মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতিই নয়, ধনী ও ওপরতলার হিন্দুরা গ্রামের অস্পৃশ্য ও নীচের তলার গরিব চাষী-মজুরের সঙ্গে যে ঘৃণ্য ও অমানুষিক ব্যবহার করে থাকে, তাতে করে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি গড়ে উঠতে পারে না। যাদের আমরা চিরকাল ঘৃণা অবজ্ঞা ও পীড়ন-নির্যাতন করে এসেছি, আজ স্বদেশী আন্দোলনের তাগিদে 'ভাই' সম্বোধন করে বিলিতি পণ্য বয়কটের এবং চড়া দামে স্বদেশী পণ্য কেনার ডাক দিলে তারা তাতে সাড়া দেবে কেন? কবি সেই কথাটাই পরিষ্কার করে বললেন :

"...আজ আমাদের ইংরেজি-পড়া শহরের লোক যখন নিরক্ষর গ্রামের লোকের কাছে গিয়া বলে 'আমরা উভয়ে ভাই'— তখন এই ভাই কথাটার মানে সে বেচারা কিছুই বুঝিতে পারে না। যাহাদিগকে আমরা 'চাষা বেটা' বলিয়া জানি, যাহাদের সুখদুঃখের মূল্য আমাদের কাছে অতি সামান্য, যাহাদের অবস্থা জানিতে হইলে আমাদিগকে গবর্মেন্টের প্রকাশিত তথ্যতালিকা পড়িতে হয়, সুদিনে দুর্দিনে আমরা যাহাদের ছায়া মাড়াই না, আজ হঠাৎ ইংরেজের প্রতি স্পর্ধা প্রকাশ করিবার বেলায় তাহাদের নিকট ভাই-সম্পর্কের পরিচয় দিয়া তাহাদিগকে চড়া দামে জিনিস কিনিতে ও গুর্খার গুঁতা খাইতে আহ্বান করিলে আমাদের উদ্দেশ্যের প্রতি সন্দেহ জন্মিবার কথা। সন্দেহ জন্মিয়াও ছিল। কোনো বিখ্যাত 'স্বদেশী'-প্রচারকের নিকট শুনিয়াছি যে, পূর্ববঙ্গে মুসলমান শ্রোতারা তাঁহাদের বক্তৃতা শুনিয়া পরস্পর বলাবলি করিয়াছে যে, বাবুরা বোধ করি বিপদে ঠেকিয়াছে।... চাষা ঠিক বুঝিয়াছিল।... উদ্দেশ্যসাধনের উপলক্ষে প্রেমের সম্বন্ধ পাতাইতে গেলে ক্ষুদ্র ব্যক্তির কাছেও তাহা বিস্বাদ বোধ হয়— সে উদ্দেশ্য খুব বড়ো হইতে পারে, হউক তাহার নাম 'বয়কট' বা 'স্বরাজ', দেশের উন্নতি বা আর-কিছু।"[৮]

এই সময় থেকেই জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সমস্যা নিয়ে কবি গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা শুরু করেন। ভারতবর্ষ যে বহু জাতি-গোষ্ঠীর দেশ (Multi-national country) এবং তাদের মধ্যে বহুকালের অনৈক্য, বিদ্বেষ ও বিরোধ-সংঘর্ষ চলে আসছে এই সত্যটি ক্রমেই কবি উপলব্ধি করতে সমর্থ হন। কিভাবে, কী পন্থায় এই-সব জাতিগোষ্ঠীর অনৈক্য ও বিরোধ-বিদ্বেষের অবসান ঘটিয়ে ভারতের 'মহাজাতীয় ঐক্য' গড়ে তোলা যায়, এই-সব সমস্যার আলোচনা করতে গিয়ে কবি তাঁর বিখ্যাত 'পথ ও পাথেয়' নিবন্ধে[৫] বললেন :

"...ভারতবর্ষে এত জাতিবিভাগ সত্ত্বেও কেমন করিয়া এক মহাজাতি হইয়া স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করিব এই প্রশ্ন যখন উঠে তখন আমাদের মধ্যে যাঁহারা বিশেষ ত্বরান্বিত তাঁহারা এই বলিয়া কথাটা সংক্ষেপে উড়াইয়া দেন যে, সুইজরল্যাণ্ডেও তো একাধিক জাতির সমাবেশ হইয়াছে, কিন্তু সেখানে কি তাহাতে স্বরাজের বাধা ঘটিয়াছে।"

কবি তার জবাবে বলেন :

"...সুইজরল্যান্ড যদি নানা জাতিকে লইয়াই এক হইয়া থাকে তবে ইহাই বুঝিতে হইবে সেখানে নানাত্বকে অতিক্রম করিয়াও একত্ব কর্তা হইয়া উঠিতে পারিয়াছে। সেখানকার সমাজে এমন একটি ঐক্যধর্ম আছে। আমাদের দেশে বৈচিত্র্যই আছে, কিন্তু ঐক্য ধর্মের অভাবে বিশ্লিষ্টতাই ভাষা জাতি ধর্ম সমাজ ও লোকাচারে নানাবিধ আকার ধারণ করিয়া এই বৃহৎ দেশকে ছোটো-বড়ো বহুতর ভাগে শতধা বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে।"

দেশের নেতারা দেশের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর এই বিরোধ-বিদ্বেষজনিত ঐক্য-সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাতে বা সময় নষ্ট করতে চান না। তাঁদের বক্তব্য ইংরেজ দেশের সবারই সাধারণ শত্রু— সুতরাং ইংরেজ তাড়ানো আন্দোলন বা স্বাধীনতা সংগ্রামই আমাদের জাতীয় সংগ্রামী-ঐক্য ও সংহতি গড়ে তুলবে। কবি তার জবাবে বললেন :

"...এ কথা যদি সত্যই হয় তবে বিদ্বেষের কারণটি যখন চলিয়া যাইবে, ইংরেজ যখনই এ দেশ ত্যাগ করিবে তখনই কৃত্রিম ঐক্যসূত্রটি তো এক মুহূর্তে ছিন্ন হইয়া যাইবে। তখন দ্বিতীয় বিদ্বেষের বিষয় আমরা কোথায় খুঁজিয়া পাইব। তখন আর দূরে খুঁজিতে হইবে না, বাহিরে যাইতে হইবে না, রক্তপিপাসু বিদ্বেষবুদ্ধির দ্বারা আমরা পরস্পরকে ক্ষতবিক্ষত করিতে থাকিব।"

সেদিন রবীন্দ্রনাথের এই সতর্কবাণীর প্রতি উপেক্ষা আজ যেন 'অভিশাপের কাল-সর্পের' মতো ভারতবর্ষের বুকে বার বার 'ছোবল মারিয়া আঘাত করিতেছে'।— ভারতের সাম্প্রতিককালের ধর্ম-সম্প্রদায়-জাতি-গোষ্ঠীর বিরোধ-বিদ্বেষ, ভাষা-বিদ্বেষ, আঞ্চলিকতা ও প্রাদেশিকতার বিদ্বেষ-বিষে তার সর্বাঙ্গ জর্জরিত। নানা বিচ্ছিন্নতা-প্রবণতা আজ মাথা তুলে খুনোখুনি করে দেশটাকে টুকরো-টুকরো করে দিতে চাইছে।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ভারতেতিহাসের মধ্যে শুধু অনৈক্য ও বিরোধ-সংঘর্ষই দেখেন নি। বহুদিন থেকেই কবি ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির ঐতিহ্যগত মূল বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে একটা কথা বার বার বলার চেষ্টা করেছেন যে, নানা বৈচিত্র্য এবং জাতি-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়গত ধর্মমতের বিরুদ্ধতা-বিভিন্নতা সত্ত্বেও তা ঐক্য ও মিলনমূলক।— সমস্ত বিরোধ ও বিভিন্নতা সত্ত্বেও তার একটা সামঞ্জস্য ও সমন্বয় সাধনের প্রক্রিয়া ভিতরে-ভিতরে কাজ করছে। সমগ্র ভারত-সংস্কৃতির মধ্যে এই ঐতিহ্য লক্ষ করা যায়। ভারতের জাতীয় ও স্বাদেশিক মুক্তিসাধনায় এই ঐক্য ও মিলনতত্ত্বকেই বাস্তবায়িত ও সফল করে তোলার জন্য দেশনেতা ও কর্মীদের সচেষ্ট হবার আহ্বান জানিয়ে কবি ঐ প্রবন্ধেই বললেন :

"...এই ভারতবর্ষে যুগযুগান্তরীয় মানবচিত্তের সমস্ত আকাঙ্ক্ষাবেগ মিলিত হইয়াছে— এইখানেই জ্ঞানের সহিত জ্ঞানের মন্থন হইবে, জাতির সহিত জাতির মিলন ঘটিবে। বৈচিত্র্য এখানে অত্যন্ত জটিল ; বিচ্ছেদ এখানে অত্যন্ত প্রবল, বিপরীতের সমাবেশ এখানে অত্যন্ত বিরোধসংকুল— এত বহুত্ব, এত বেদনা, এত সংঘাত কোনো দেশই এত দীর্ঘকাল বহন করিয়া বাঁচিতে পারিত না— কিন্তু একটি অতিবৃহৎ অতিমহৎ সমন্বয়ের পরম অভিপ্রায়ই এই-সমস্ত একান্ত বিরুদ্ধতাকে ধারণ করিয়া আছে, পরস্পরের আঘাতে কাহাকেও উৎসাদিত হইতে দেয় নাই।... জানিয়া এবং না জানিয়া বিশ্বের মানব এই ভারতক্ষেত্রে মনুষ্যত্বের যে পরমাশ্চর্য মন্দির, নানা ধর্ম, নানা শাস্ত্র, নানা জাতির সম্মিলনে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছে সেই সাধনাতেই যোগদান করিব ; নিজের অন্তরের সমস্ত শক্তিকে একমাত্র সৃষ্টিশক্তিতে পরিণত করিয়া এই রচনাকার্যে তাহাকে প্রবৃত্ত করিব।..."

এই চিন্তাই পরবর্তীকালে 'ভারততীর্থ' কবিতায় প্রকাশ পায়।

কিন্তু মুখে শুধু ভারত-সংস্কৃতির অতীত ঐতিহ্যের মহিমাগান করলেই কাজ শেষ হবে না। ভারতের মতো বিশাল দেশে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী ধর্মসম্প্রদায়কে নিয়ে এখনই আমাদের **'মহাজাতীয় ঐক্য'** গড়ে তুতে হবে, তা যত কঠিন কাজই হোক-না কেন, কবি পরিষ্কার ঘোষণা করেন, এই **'মহাজাতীয় ঐক্য'** গড়ে তুলতে না-পারলে 'স্বরাজ' 'স্বাধীনতা'— কিছুই আমরা পাব না। এই সময় "সমস্যা" শীর্ষক প্রবন্ধেই[৬] কবি বললেন :

"এ কথা বলাই বাহুল্য, যে দেশে একটি মহাজাতি বাঁচিয়া ওঠে নাই সে দেশে স্বাধীনতা হইতেই পারে না। কারণ স্বাধীনতার 'স্ব' জিনিসটা কোথায় ? স্বাধীনতা কাহার স্বাধীনতা ? ভারতবর্ষে বাঙালি যদি স্বাধীন হয় তবে দাক্ষিণাত্যের নায়ার জাতি নিজেকে স্বাধীন বলিয়া গণ্য করিবে না এবং পশ্চিমের জাঠ যদি স্বাধীনতা লাভ করে তবে পূর্বপ্রান্তের আসামি তাহার সঙ্গে একই ফল পাইল বলিয়া গৌরব করিবে না। এক বাংলা দেশেই হিন্দুর সঙ্গে মুসলমান যে নিজের ভাগ্য মিলাইবার জন্য প্রস্তুত এমন কোনো লক্ষণ দেখা যাইতেছে না।...."

মাসখানেক পর "সদুপায়" প্রবন্ধে[৭] বাঙালি বিহারি ওড়িয়া ও আসামিদের সংকীর্ণ প্রাদেশিকতা ও বিরোধ-বিদ্বেষের সম্পর্কটির উল্লেখ এবং উদ্বেগ প্রকাশ করতে গিয়ে কবি লিখলেন :

"... বেহারিগণ বাঙালির প্রতিবেশী এবং বাঙালি অনেকদিন হইতেই বেহারিগণের সঙ্গে কাজ কারবার করিতেছে, কিন্তু বাঙালির সঙ্গে বেহারির সৌহৃদ্য নাই সে কথা বেহারবাসী বাঙালি মাত্রেই জানেন। শিক্ষিত উড়িয়াগণ বাঙালি হইতে নিজেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বলিয়া দাঁড় করাইতে উৎসুক এবং আসামিদেরও সেইরূপ অবস্থা। অতএব উড়িষ্যা আসাম বেহার ও বাংলা জড়াইয়া আমরা যে দেশকে বহুদিন হইতে বাংলাদেশ বলিয়া জানিয়া আসিয়াছি তাহার সমস্ত অধিবাসী আপনাদিগকে বাঙালি বলিয়া কখনো স্বীকার করেন নাই। এবং বাঙালিও বেহারী উড়িয়া এবং আসামিকে আপন করিয়া লইতে কখনো

চেষ্টা মাত্র করে নাই, বরঞ্চ তাহাদিগকে নিজেদের অপেক্ষা হীন মনে করিয়া অবজ্ঞা দ্বারা পীড়িত করিয়াছে।....

"এমন অবস্থায় এই বাঙালির বাংলাটুকুকেও এমন করিয়া যদি ভাগ করা যায় যাহাতে মুসলমান-বাংলা ও হিন্দু-বাংলাকে মোটামুটি স্বতন্ত্র করিয়া ফেলা যায় তাহা হইলে বাংলা দেশের মতো এমন খণ্ডিত দেশ ভারতবর্ষে আর একটিও থাকিবে না।"

সারা জীবনই কবি এইভাবেই ভারতের বিভিন্ন জাতি-ধর্ম-সম্প্রদায়গত বিরোধ-বিদ্বেষ, প্রাদেশিকতা আঞ্চলিকতা ও নানা সংকীর্ণ স্বার্থবুদ্ধি-প্রণোদিত বিরোধ-সংঘর্ষের বিপদ সম্পর্কে দেশের নেতা ও কর্মীদের হুঁসিয়ার করে দিতে চেয়েছেন। বলা বাহুল্য, নেতারা তাঁর কথায় কোনো আমলই দেন নি। তাঁদের বক্তব্য : দেশের মুক্তি সংগ্রামের মধ্যেই যে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মোর্চা *(Anti Imperialist Front)* গড়ে উঠবে তাতেই জাতীয় ঐক্য ও সংহতি দৃঢ়তর হবে—এবং 'স্বরাজ' বা 'স্বাধীনতা লাভের' পর আপনিই জাতীয় ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠিত হবে। এইখানেই দেশের নেতাদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মৌলিক মত-পার্থক্য। কবির বক্তব্য : এই-সব জাতিগোষ্ঠী-ধর্ম-সম্প্রদায়গত অনৈক্য ও বিরোধ-সংঘর্ষের এবং সমস্ত কুসংস্কার ও প্রতিক্রিয়াশীল প্রবণতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের কর্মসূচীকে আমাদের স্বাধীনতা বা স্বরাজ-সাধনার অঙ্গীভূত বা যোযুক্ত করতে হবে এবং তাহলেই আমাদের লক্ষ্য সিদ্ধি ঘটবে। তা না-হলে আমাদের বহু শতবর্ষের পুঞ্জিভূত এইসব 'পাপ' ও দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে সাম্রাজ্যবাদীরা নানা কূট-কৌশলে সেই সংগ্রামকেই ব্যর্থ করে দেবার চেষ্টা করবে।

দেশের পরবর্তী ইতিহাস কিন্তু কতকটা সেই সাক্ষ্যই দেয়। 'খিলাফৎ' আন্দোলনের মত উগ্র-ধ্বংসাত্মাদনা ও প্রতিক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িক আন্দোলনকে (যা 'অটোমান এম্পায়ার অটুট রাখার স্বার্থেই চালাত) গান্ধীজী 'অসহযোগ আন্দোলনে' যোগযুক্ত করার অনতিকাল পূর্বে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে হিন্দু-মুসলমানের ভয়াবহ বিরোধ সংঘর্ষ বেধে যায়। অবশ্য এর পশ্চাতে ইংরেজেরও হাত ছিল। সকলেই জানেন, রবীন্দ্রনাথ এই খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন সমর্থন করেন নি। এই সময় 'সমস্যা' ও 'সমাধান' (১৩৩০ অগ্রহায়ণ) শীর্ষক পর পর দুটি প্রবন্ধে কবি হিন্দু মুসলমানকে এবং জাতীয় ঐক্য ও সংহতি-সমস্যা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। কবির মূল বক্তব্য : আমরা এত শত জাতি-গোষ্ঠী ছোঁয়াছুঁয়ি বাঁচিয়ে স্ব-স্ব ধর্ম ও সম্প্রদায়গত সংকীর্ণ গণ্ডীর প্রাচীর তুলে আপন স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখব, আবার সেই সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয় ঐক্য ও সংহতি গড়ে তুলব—এমন অবাস্তব জিনিস হয় না।—পারস্পরিক গভীর সমপ্রীতি ও মানবিক মর্যাদাদান এবং বিবাহাদির দ্বারা 'রক্ত বিমিশ্রণ' ও সামাজিক নানা ক্রিয়াকর্ম ও উৎসবাদি উপলক্ষে গভীর আত্মীয়তা-স্থাপন করে এই মহাজাতীয় ঐক্য ও সংহতি গড়ে তোলা সম্ভব হবে। নেতারা সুইজারল্যান্ডের বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর অস্তিত্বের নজির দেন, কবি তার জবাবে বলেন :

"... সুইজরল্যান্ডে ভেদ যতগুলোই থাক্, ভেদবুদ্ধি তো নাই। সেখানে পরস্পরের মধ্যে রক্ত বিমিশ্রণে কোনো বাধা নেই ধর্মে বা আচারে বা সংস্কারে। এখানে সে বাধা এত প্রচণ্ড যে, অসবর্ণ বিবাহের আইনগত বিঘ্ন দূর করবার প্রস্তাব হবা মাত্র হিন্দুসমাজপতি উদ্‌বেগে ঘর্মাক্তকলেবর হয়ে হরতাল করবার ভয় দেখিয়েছিলেন। সকলের চেয়ে গভীর আত্মীয়তার ধারা নাড়ীতে বয়, মুখের কথায় বয় না। যাঁরা নিজেদের এক মহাজাত বলে কল্পনা করেন তাঁদের মধ্যে সেই নাড়ীর মিলনের পথ ধর্মের শাসনে চিরদিনের জন্যে যদি অবরুদ্ধ থাকে, তা হলে তাঁদের মিলন কখনোই প্রাণের মিলন হবে না, সুতরাং সকলে এক হয়ে প্রাণ দেওয়া তাঁদের পক্ষে সহজ হতে পারবে না। তাঁদের প্রাণ যে এক প্রাণ নয়।..."[৮]

খিলাফতের '*ঠেকো-দেওয়া*' রাজনীতিক কৌশলে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন না। সে-কথার উল্লেখ করে তিনি বললেন,

..."খেলাফতের *ঠেকোদেওয়া* সন্ধিবন্ধনের পর আজকের দিনে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। মূলে ভুল থাকলে কোনো উপায়েই স্থূলে সংশোধন হতে পারে না।"[৯] তিনি আরও বললেন,

"আজ অসহকার আন্দোলনে মুসলমান যোগ দিয়েছে, তার কারণ রুম-সাম্রাজ্যের অখণ্ড অঙ্গকে ব্যঙ্গীকরণের দুঃখটা তাদের কাছে বাস্তব। এমনতরো মিলনের উপলক্ষটা কখনোই চিরস্থায়ী হতে পারে না।"...[১০]

সকলেই জানেন, 'অসহযোগ আন্দোলনে'র সময়ই মালাবারে 'মোপলা-বিদ্রোহে'র সময় হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা-বিরোধ হয়। সেই ঘটনার উল্লেখ করে কবি তার থেকে শিক্ষা গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে বললেন,

"মালাবারে মোপলাতে-হিন্দুতে যে কুৎসিত কাণ্ড ঘটেছিল সেটা ঘটেছিল খিলাফৎসূত্রে হিন্দু-মুসলমানের সন্ধির ভরা জোয়ারের মুখেই। যে দুই পক্ষে বিরোধ তারা সুদীর্ঘকাল থেকেই ধর্মের ব্যবহারকে নিত্যধর্মনীতির বিরুদ্ধে প্রয়োগ করে এসেছে। নম্বুদ্রি ব্রাহ্মণের ধর্ম মুসলমানকে ঘৃণা করেছে, মোপলা মুসলমানের ধর্ম নম্বুদ্রি ব্রাহ্মণকে অবজ্ঞা করেছে। আজ এই দুই পক্ষের কংগ্রেস মঞ্চ-ঘটিত ভ্রাতৃভাবের জীর্ণ মসলার দ্বারা তাড়াতাড়ি অল্প কয়েক দিনের মধ্যে খুব মজবুত করে পোলিটিকাল সেতু বানাবার চেষ্টা বৃথা। অথচ আমরা বার বারই বলে আসছি, আমাদের সনাতন ধর্ম যেমন আছে তেমনিই থাক্, আমরা অবাস্তবকে দিয়েই বাস্তব ফল লাভ করব, তার পরে ফল লাভ হলে আপনিই সমস্ত গলদ সংশোধন হয়ে যাবে। বাজিমাত করে দিয়ে তার পরে চালের কথা ভাবব, আগে স্বরাট্ হব, তার পরে মানুষ হব।"[১১]

আরও একটা বিরাট সমস্যা। এই সময় থেকেই ভাষা-সমস্যা নিয়ে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে উত্তেজনা ও আলোড়ন সৃষ্টি হয়। সকলেই জানেন, ইংরেজরা দেশ শাসনের সুবিধের জন্য এক-একগুচ্ছ প্রদেশ ও অঞ্চলকে নিয়ে বোম্বাই মাদ্রাজ কলকাতার মতো কয়েকটি প্রেসিডেন্সি তৈরি করেছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ই (১৯১৩-১৪) সর্ব প্রথম অন্ধ্রতেই 'ভাষা ভিত্তিক প্রদেশ' পুনর্গঠনের আন্দোলন শুরু হয়। ১৯১৭ সালে কলকাতা— কংগ্রেসে অ্যানি বেদান্ত ও টিলক এই নীতিতে প্রাদেশিক পুনর্গঠনকেই প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের পূর্বশর্ত হিসেবে গ্রহণের প্রস্তাব করেছিলেন। অপরদিকে গান্ধীজী প্রায় ১৯১৮ সাল থেকেই হিন্দীকে কংগ্রেসের মধ্যে এবং আন্তপ্রাদেশিক যোগাযোগের ও রাষ্ট্রভাষা করার জন্য আন্দোলন শুরু করেছিলেন। বলাবাহুল্য, রবীন্দ্রনাথও দেশের ভাষা-সমস্যার বিরোধ-উত্তেজনার সমাধান সম্পর্কে অনেক চিন্তা-ভাবনা করেছেন। এই সময় কাশীতে 'উত্তর ভারতীয় বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন' উপলক্ষে দেশের ভাষা সমস্যা ও জাতীয়-ঐক্য প্রসঙ্গে তাঁর ভাষণে কবি বললেন :

"আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে, আমরা যেমন মাতৃক্রোড়ে জন্মেছি তেমনি মাতৃভাষার ক্রোড়ে আমাদের জন্ম, এই উভয় জননীই আমাদের পক্ষে সজীব ও অপরিহার্য।...

"সুতরাং প্রত্যেক দেশ যখন তার স্বকীয় ভাষাতে পূর্ণতালাভ করবে তখনই অন্য দেশের ভাষার সঙ্গে তার সত্যসম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। ভাষার এই সহযোগিতায় প্রত্যেক জাতির সাহিত্য উজ্জ্বলতর হয়ে প্রকাশমান হবার সুযোগ পায়।

"...ভারতবর্ষে আজকাল পরস্পরের ভাবের আদান-প্রদানের ভাষা হয়েছে ইংরেজি ভাষা। অন্য একটি ভাষাকেও ভারতব্যাপী মিলনের বাহন করবার প্রস্তাব হয়েছে। কিন্তু, এতে করে যথার্থ সমন্বয় হতে পারে না; হয়তো একাকারত্ব হতে পারে, কিন্তু একত্ব হতে পারে না। কারণ এই একাকারত্ব কৃত্রিম ও অগভীর, এ শুধু বাইরে থেকে দড়ি দিয়ে বাঁধা মিলনের প্রয়াস মাত্র।... যদি বাহ্য বন্ধন-পাশের দ্বারা মানুষকে মিলিত করতে বাধ্য করা যায়, তবে তার পরিণাম হয় পরম শত্রুতা।..."

তিনি আরও বললেন,

"...এমন বাহ্য সাম্যকে যারা চায় তারা ভাষা-বৈচিত্র্যের উপর স্টীমরোলার চালিয়ে দিয়ে আপন রাজরথের পথ সমভূম করতে চায়। কিন্তু পাঁচটি বিভিন্ন ফুলকে কুটে দলা পাকালেই তাকে শতদল বলা যেতে পারে না। অরণ্যের বিভিন্ন পত্রপুষ্পের মধ্যে যে-ঐক্য আছে তা হল বসন্তের ঐক্য।"....[১২]

সকলেই জানেন, ১৯৩৮ সালে হরিপুরা কংগ্রেস হিন্দীকে ভারতের ভাবী রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব গৃহীত হয়। অল্পকাল পরেই, কবি দেশ নেতাদের পুনরায় সতর্ক করে দিয়ে তাঁর 'বাংলাভাষা-পরিচয়' গ্রন্থের একজায়গায় বললেন :

"...তাই হিন্দুস্থানীকে ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যবহারের জন্যে এক ভাষা বলে গণ্য করা যেতে পারে। তার মানে, বিশেষ কাজের প্রয়োজনে কোনো বিশেষ ভাষাকে কৃত্রিম উপায়ে স্বীকার করা চলে, যেমন আমরা ইংরেজি ভাষাকে স্বীকার করেছি। কিন্তু ভাষার একটা অকৃত্রিম প্রয়োজন আছে। সে প্রয়োজন কোনো কাজ চালাবার জন্যে নয়, আত্মপ্রকাশের জন্যে।

"রাষ্ট্রিক কাজের সুবিধা করা চাই বৈকি, কিন্তু তার চেয়ে বড়ো কাজ দেশের চিত্তকে সরস, সফল ও সমুজ্জ্বল করা। সে কাজ আপন ভাষা নইলে হয় না। দেউড়িতে একটা সরকারি প্রদীপ জ্বালানো চলে ; কিন্তু একমাত্র তারই তেল জোগাবার খাতিরে ঘরে ঘরে প্রদীপ নেবানো চলে না।"

কবি ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ও রাষ্ট্রের বিকাশের ক্ষেত্রে তাঁদের স্বতন্ত্র ভাষার ভূমিকা ও অবদানের উল্লেখ করতে গিয়ে বললেন :

"তেমনি ভারতবর্ষেও ভিন্ন ভিন্ন ভাষার উৎকর্ষ-সাধনে দ্বিধা করলে চলবে না। মধ্যযুগে য়ুরোপে সংস্কৃতির এক ভাষা ছিল ল্যাটিন। সেই ঐক্যের বেড়া ভেদ করেই য়ুরোপের ভিন্ন ভিন্ন ভাষা যেদিন আপন আপন শক্তি নিয়ে প্রকাশ পেলে সেই দিন য়ুরোপের বড়ো দিন। আমাদের দেশেও সেই বড়োদিনের অপেক্ষা করব— সব ভাষা একাকার করার দ্বারা নয়, সব ভাষার আপন আপন বিশেষ পরিণতির দ্বারা।"[১৩]

অর্থাৎ একটি মাত্র 'রাষ্ট্রভাষারা' সাহায্যে ভারতের জাতীয় ঐক্য ও সংহতি রক্ষা করা যাবে না, সেই সঙ্গে প্রতিটি রাজ্য ও অঞ্চলের আপন আপন ভাষা-সাহিত্যেরও পূর্ণ বিকাশ ঘটাতে হবে,— এই ছিল কবির মত।

প্রসঙ্গত আরও একটা কথা স্মরণ রাখা দরকার। ইংরেজরা একটু একটু করে শাসন সংস্কারের অছিলায় সাম্প্রদায়িক বিভেদ অনৈক্য ও বিরোধ বিদ্বেষকে প্রচুর ইন্ধন ও প্ররোচনা জুগিয়েছে। মর্লির ১৯০৯ সালের 'ভারত শাসন আইনে'ই সর্বপ্রথম হিন্দু-মুসলমানের পৃথক বা স্বতন্ত্র নির্বাচনের প্রথাকে (অর্থাৎ কার্যত যা হিন্দু-মুসলমান স্বতন্ত্র দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে রচিত) ইংরেজরা চালু করতে সমর্থ হয়। ১৯১৯-২০ সালের 'মন্টেগু চেমসফোর্ড শাসন সংস্কারে'র ফলে,— এমন-কি কাউন্সিলে প্রবেশ ইত্যাদি নিয়ে কংগ্রেসের অভ্যন্তরেই বিরোধ ও অনৈক্য সৃষ্টি হয়েছে। অসহযোগ, আন্দোলন, এমন-কি ১৯৩০ সালে, যখন 'আইন-অমান্য' ও বিপ্লবী আন্দোলন সবচেয়ে প্রবল আকার ধারণ করেছে, সেই সময়ই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও বিরোধ-সংঘর্ষ প্রবল হয়েছে। স্মরণ রাখা দরকার, ১৯৩০ সালে ডিসেম্বরে এলাহাবাদে মুসলিম লীগের অধিবেশনেই 'পাকিস্তান' প্রস্তাব গৃহীত হয়। উল্লেখযোগ্য, ভারত-বিখ্যাত কবি, সহঃ ইক্‌বাল স্বয়ং তাঁর ভাষণে এই 'পাকিস্তান'-পরিকল্পনা (অবশ্য ইকবালের ও জিন্নার 'পাকিস্তান' পরিকল্পনা ঠিক এক ধরনের ছিল না) উত্থাপন করেন। বলা বাহুল্য, এই সময় থেকেই উগ্র-সাম্প্রদায়িকতার প্রচারে সমগ্র যুব ও ছাত্র সমাজ ও খুবই চঞ্চল। রবীন্দ্রনাথ এই-সব ঘটনায় খুবই উদ্বিগ্ন হন। ১৯৩১ সালে ৪ অক্টোবর 'নিখিলবঙ্গ মুসলিম ছাত্র-সম্মেলনে' প্রেরিত বাণীতে এই ভ্রাতৃঘাতী বিরোধ-সংঘর্ষের আত্মঘাতী পরিণাম সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে কবি বলেন[১৪] :

"আমাদের দেশে অন্ধকার রাত্রি। মানুষের মন চাপা পড়েছে। তাই অবুদ্ধি, দুর্বুদ্ধি, ভেদবুদ্ধিতে সমস্ত জাতি পীড়িত। আশায় আশায় অল্প মাত্র যা-কিছু গড়ে তুলি তা নিজেরই মাথার উপরে ভেঙে ভেঙে পড়ে। আত্মীয়কে আঘাত করার আত্মঘাত যে কি সর্বনেশে সে কথা বুঝেও বুঝি নে। যে শিক্ষা লাভ করচি ভাগ্যদোষে সেই শিক্ষাই বিকৃত হয়ে আমাদের ভ্রাতৃবিদ্বেষের অস্ত্র জোগাচ্ছে।

"আজ অন্ধ রাত্রির অবসান হোক, তরুণদের নবজীবনের মধ্যে। আচারভেদ, স্বার্থভেদ, মতভেদ ধর্মভেদের সমস্ত ব্যবধান বীরতেজে উত্তীর্ণ হয়ে তারা ভ্রাতৃপ্রেমের আহ্বানে নবযুগের অভ্যর্থনায় সকলে মিলিত হোক। যে দুর্বল সেই ক্ষমা করতে পারে না। তারুণ্যের বলিষ্ঠ ঔদার্য সকল প্রকার কলহের দীনতাকে নিরস্ত করে দিক, সকলের হাতে হাত মিলিয়ে দেশের সর্বজনীন কল্যাণকে অটল ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করি।"

ভারতের 'আইন-অমান্য আন্দোলন' চলাকালেই ইংরেজরা গুরুত্বপূর্ণ শাসন সংস্কারের উদ্যোগ নেয়। এর পর বিলেতে দুটো গোল টেবিল বৈঠক, দ্বিতীয়টিতে গান্ধীজীর যোগদান, সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষা ও সাম্প্রদায়িক প্রশ্নে আলোচনা ব্যর্থ, পুনরায় উদ্যোগ, সাম্প্রদায়িক এবং বর্ণ ও 'তফশীল' শ্রেণীভুক্ত হিন্দুর প্রশ্নে আপোষরফা,, 'হোয়াইট পেপার' 'জে· পি· সি·'-রিপোর্ট— যা শেষ পর্যন্ত ১৯৩৫ সালের 'ভারত শাসন আইনের' জন্ম দেয়। এই আইনের 'সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা'র প্রশ্নে সারা দেশে, বিশেষ হিন্দুদের দারুণ উত্তেজনা ও বিক্ষোভ দেখা দেয়। কবির মানসিক অবস্থার কথা সহজেই

অনুমেয়। 'বিশ্বভারতী' তখন চরম আর্থিক সংকট চলছে। অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে কবি বিহার উত্তর-প্রদেশ পাঞ্জাব দিল্লী— যেখানে গেছেন, সেখানেই দেশের সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ও বিরোধ বিদ্বেষ সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করে জাতীয় ঐক্য ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার আবেদন জানিয়েছেন। ১৭ মার্চ (১৯৩৬), পাটনায় এক প্রেস-বিবৃতিতে তিনি দেশবাসীর উদ্দেশে সেই আবেদন জানাতে গিয়ে বললেন :

"আমাদের মধ্যে পরস্পর-বিরোধী স্বার্থ বর্তমান— এই যদি আমাদের বর্তমান মনোভাব হয় তাহা হইলে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার আলোচনা নিষ্ফল প্রয়াসে পর্যবসিত হইবে। আমাদের দেশের সর্বপ্রধান সমস্যা হইতেছে, একই সম্প্রদায়ের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার মধ্যে আত্মকলহ। শুধু তাহাই নহে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যেও আত্মকলহের ভাব সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। এমন-কি আত্মরক্ষার জন্যও আমরা সংঘবদ্ধ হইতে পারি না— ইহা আমাদের মজ্জাগত হইয়া গিয়াছে। আমাদের ইতিহাস চিরকালই এই সাক্ষ্য দিয়া আসিয়াছে যে, দেশের গুরুতর সংকট সময়েও আমরা একতাবদ্ধ হইয়া বিপদের প্রতিকার কল্পে দণ্ডায়মান হইতে পারি নাই। এইরূপে আমরা বিপর্যস্ত হইয়াছি। আমাদের এই প্রকৃতিগত ত্রুটি-বিচ্যুতি এখনও বর্তমান রহিয়াছে। নৈরাশ্যপূর্ণ ধারণা পোষণ করিবার পক্ষে যথেষ্টই কারণ রহিয়াছে বলিয়া আমি মনে করি।

"আমাদের সমস্ত জাতীয় আন্দোলন ও প্রতিষ্ঠানসমূহের এই দুর্বলতা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ফলে আমাদের উপলব্ধি করা দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে। তদুপরি বর্তমানে আমাদের মধ্যে প্রাদেশিকতার মনোভাব প্রবল হইয়া উঠিতেছে এবং ইহাতে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার মূলে কুঠারাঘাত করা হইয়াছে। কোন জাতি বহুধা আরোহণ করিতে পারিয়াছে বলিয়া ইতিহাসে কোনো দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। কংগ্রেসের বিভিন্ন দলের মধ্যে যে ঈর্ষা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার মনোভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে তাহাও উপেক্ষার বিষয় বলিয়া আমি মনে করি না, আমরা চিরকালই বহিঃশক্তির প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া আসিয়াছি।"

পাঞ্জাবে গিয়ে সেখানকার প্রচণ্ড সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও উত্তেজনা দেখে কবি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও মর্মাহত হন। লাহোর ত্যাগের প্রাক্কালে কবি এক বিবৃতিতে তাঁর এই মনোবেদনা ব্যক্ত করতে গিয়ে বললেন :

…"যাইবার পূর্বে আমি তাঁহাদিগকে ইহাই বলিতে চাই যে, কেবল ভোটের ভাগ-বাঁটোয়ারা কিংবা আইনসভা সদস্য সংরক্ষণ দ্বারা স্বরাজলাভ হয় না। জনগণের মধ্যে ঐক্যভাব জাগ্রত হওয়া প্রয়োজন যাহাতে তাহারা তাহাদের দায়িত্ব ও ভবিষ্যৎ এক বলিয়া বুঝিতে পারে। যতদিন সেই ভাব জাগ্রত না হয়, ততদিন আমরা স্বরাজ লাভের যোগ্য হইব না। স্বরাজ লাভ আমাদের ভাগ্যে জুটিবেও না।"[১৫]

নতুন গঠনতন্ত্র মতে, কয়েক মাস পরে, ১৯৩৭ সালের প্রথম ভাগে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশগুলিতে সাধারণ নির্বাচন হয়। নির্বাচনের পর মন্ত্রিত্ব গঠন, দফ্‌তর-বন্টন, চাকরির ভাগাভাগি এবং প্রাদেশিক সীমানা নির্ধারণ, ইত্যাদি নিয়ে এই-সব বিরোধ-বিদ্বেষ ক্রমেই তীব্রতর হতে থাকে। এমন-কি কংগ্রেস-শাসিত প্রদেশগুলিতেও এই সময়ই 'Son of the soil' কথাটি বেশি করে চালু হয়।

এ-সবের সঙ্গে যুক্ত হয়, কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও বিরোধ-সংঘাতজনিত ঘটনাবলী। ত্রিপুরী-কংগ্রেসের (মার্চ, ১৯৩৯) পরবর্তী ঘটনায় রবীন্দ্রনাথ কংগ্রেসের প্রবীণ নেতৃত্বের 'পরে যে কতখানি ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন, অন্যত্র তা বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে। এই সময়ই "কন্‌গ্রেস" শীর্ষক পত্রপ্রবন্ধে কবি তাঁর ক্ষোভ ও মনোবেদনা ব্যক্ত করতে গিয়ে বললেন[১৬] :

"…দুর্ভাগ্যক্রমে দেশে মিলনকেন্দ্ররূপে কন্‌গ্রেসের প্রতিষ্ঠা হওয়া সত্ত্বেও ভারতবর্ষে এক প্রদেশের সঙ্গে আর-এক প্রদেশের বিচ্ছেদের সাংঘাতিক লক্ষণ নানা আকারেই থেকে থেকে প্রকাশ পাচ্ছে। ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলমানের অনৈক্য শোচনীয় এবং ভয়াবহ সে কথা বলা বাহুল্য।… কিন্তু এক প্রদেশের সঙ্গে আর-এক প্রদেশের যে আত্মীয়বুদ্ধির ক্ষীণতা তার কারণ পরস্পরের মধ্যে পরিচয়ের অভাব ও আচারের পার্থক্য।…

"কারণ যাই হোক, প্রদেশে প্রদেশে জোড় মেলে নি।… ভারতবর্ষের মুক্তিযাত্রাপথের রথখানাকে আজ কন্‌গ্রেস টেনে

রাস্তায় বের করেছে। পলিটিকসের দড়ি-বাঁধা অবস্থায় চলতে যখন শুরু করলে তখন বারে বারে দেখা গেল তার এক অংশের সঙ্গে আর-এক অংশের আত্মীয়তার মিল নেই। অবস্থাটা যখন এমন তখন কন্‌গ্রেস-কর্তৃপক্ষদের অত্যন্ত সতর্ক হয়ে চলা কর্তব্য।"।

এ কথা সত্যি, সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেসের সর্বোচ্চ নেতৃপদে অধিষ্ঠিত দেখে কবি খুবই আনন্দিত ও আশান্বিত হয়েছিলেন এবং ভেবেছিলেন এই সুযোগে বাঙালি জাতিকে নতুন শক্তিতে পুনর্গঠিত করা সম্ভব হবে। কোনো সংকীর্ণ 'বাঙালীয়ানা'র ভাবাবেগের তাড়নায় নয় ;— সামগ্রিকভাবে ভারতের সংহতি এবং ও শক্তি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে নব-বলে বলীয়ান হয়ে বাঙালি জাতি এই গৌরবজনক সহযোগীর ভূমিকা গ্রহণ করবে,— এই ছিল কবির মনের একান্ত আশা ও কামনা। তাঁর বিখ্যাত 'দেশনায়ক',[১৭] ভাষণের (অপঠিত) এক জায়গায় পরিষ্কার ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন :

"এমন ভুল কেউ যেন না করেন যে, বাংলাদেশকে আমি প্রাদেশিকতার অভিমানে ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চাই, অথবা সেই মহাত্মার প্রতিযোগী আসনে স্থাপন করতে চাই···। সমগ্র ভারতবর্ষের কাছে বাংলার সম্মিলন যাতে সম্পূর্ণ হয়, মূল্যবান হয়, পরিপূর্ণ ফলপ্রসূ হয়, যাতে সে রিক্তশক্তি হয়ে পশ্চাতের আসন গ্রহণ না করে, তারই জন্যে আমার এই আবেদন। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রমিলনযজ্ঞের যে মহদনুষ্ঠান আজ প্রতিষ্ঠিত, প্রত্যেক প্রদেশকে তার জন্যে উপযুক্ত আহুতির উপকরণ সাজিয়ে আনতে হবে।"

এর কিছুদিন পর ঐতিহাসিক 'মহাজাতি সদন'[১৮]-এর ভিত্তিস্থাপন অনুষ্ঠানে কবি তাঁর ভাষণে নতুন ভারতবর্ষ গঠনে বাঙালি জাতিকে তার মহান ভূমিকা গ্রহণের আবেদন জানিয়ে বললেন :

"বাংলার যে জাগ্রত হৃদয় মন আপন বুদ্ধির ও বিদ্যার সমস্ত সম্পদ ভারতবর্ষের মহাবেদীতলে উৎসর্গ করবে বলেই ইতিহাস-বিধাতার কাছে দীক্ষিত হয়েছে, তার সেই মনীষিতাকে এখানে আমরা অভ্যর্থনা কবি। আত্মগৌরবে সমস্ত ভারতের সঙ্গে বাংলার সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য থাকুক, আত্মাভিমানের সর্বনাশা ভেদবুদ্ধি তাকে পৃথক না করুক— এই কল্যাণ-ইচ্ছা এখানে সংকীর্ণচিত্ততার ঊর্ধ্বে আপন জয়ধ্বজা যেন উড্ডীন রাখে।"···

শুধু বাঙালি জাতি নয়,— এইভাবে ভারতের সকল জাতি-গোষ্ঠী, প্রদেশ বা 'অঙ্গরাজ্য', ঐক্যবদ্ধভাবে নব ভারতকে শক্তিকে সম্পদে এবং সমস্ত দিক থেকে সমৃদ্ধিশালী ও মহীয়ান করে গড়ে তুলুক, এই ছিল রবীন্দ্রনাথের সারা জীবনের ঐকান্তিক বাসনা ও কামনা।

টীকা

১ সাধনা, পৌষ ১৩০০ ; রবীন্দ্র-রচনাবলী ১০ বিশ্বভারতী, পৃ· ৫৩৮
২ সাধনা, অগ্রহায়ণ ১৩০১ ; রবীন্দ্র-রচনাবলী ১০-১৯ বিশ্বভারতী, পৃ· ৪১৮
৩ ভারতী, 'প্রসঙ্গ কথা', শ্রাবণ ১৩০৫ ; রবীন্দ্র-রচনাবলী ১০ বিশ্বভারতী, পৃ· ৫৫৭-৫৮
৩ক রবীন্দ্র-রচনাবলী ৩ বিশ্বভারতী, পৃ· ৬১২
৪ প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩১৪ ; রবীন্দ্র-রচনাবলী ১০ বিশ্বভারতী, পৃ· ৬২৭-৩০
৫ বঙ্গদর্শন, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৫ ; রবীন্দ্র-রচনাবলী ১০ বিশ্বভারতী, পৃ· ৪৬৩-৬৭
৬ প্রবাসী, আষাঢ় ১৩১৫ ; রবীন্দ্র-রচনাবলী ১০ বিশ্বভারতী, পৃ· ৪৭৯
৭ প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩১৫ ; রবীন্দ্র-রচনাবলী ১০ বিশ্বভারতী, পৃ· ৫২৩-২৪
৮ "সমস্যা", রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৪ বিশ্বভারতী, পৃ· ৩৪৬
৯ তদেব, পৃ· ৩৪৭ ১০· তদেব, পৃ· ৩৫৪ ১১· তদেব, পৃ· ৩৫৬
১২ রবীন্দ্র-রচনাবলী, ২৩, পৃ· ৪৭৩-৭৫। ১৩· রবীন্দ্র-রচনাবলী, ২৬, পৃ· ৩৯২
১৪ প্রবাসী, কার্তিক ১৩১৮
১৫ আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৬ মার্চ ১৯৩৬
১৬ 'কালান্তর' পৃ· ৩৭৪ ১৭· 'কালান্তর' পৃ· ৩৮৭ ১৮· 'কালান্তর' পৃ· ৩৯১

রবীন্দ্রনাথ, ভাষা, সমাজ

অশোক মিত্র

আমার মতো অকাট মূর্খের পক্ষে হদিশ রাখা সম্ভব নয়। কিন্তু কিশোর বয়সে যখন রবীন্দ্রনাথের ঝলোমলো সৃষ্টিভাণ্ডারে বিজয়ী বীরের মতো আমি বিহাররত, তাঁর কোনো প্রবন্ধে একটি বিশেষ সমাজ চিন্তার মুখোমুখি হয়ে চমকে উঠেছিলাম। ঘরোয়া প্রসঙ্গ, শাদামাটা বাংলা অব্যয়ের ব্যবহার নিয়ে আলোচনা। 'ও', রবীন্দ্রনাথ বলছেন, সমাজের সঙ্গে আমাকে-তোমাকে-তাকে-যে কেউকে সমাজের সঙ্গে যুক্ত করে, 'ই', অন্য পক্ষে, আমাকে-তোমাকে-তাকে-যে-কেউকে আলাদা করে দেয়, বিশেষ সংস্থানে তুলে ধরে। 'তোমাকেও চাই' এবং 'তোমাকেই চাই', পাশাপাশি বসানো দুটো অতি সাধারণ উক্তি, কিন্তু একটি অন্যের কাছে টেনে আনলো, অন্যটি একটু যেন পার্থক্যের ব্যূহ রচনা করলো।

রবীন্দ্রনাথ আমাদের চেতনায়-ধমনীতে, রবীন্দ্রনাথ আমাদের আলাপে-আচরণে-অভ্যাসে-সংস্কারে, রবীন্দ্রনাথ আমাদের কাছে স্বতঃসিদ্ধতা, তাই কবে কোথায় কী উপলক্ষে তিনি কোন্ মন্তব্য করেছেন, তা সঠিক পৃষ্ঠাপঙ্ক্তির উল্লেখসহ আমার পক্ষে বলা অসম্ভব। কিন্তু, তাঁরই বিভিন্ন গানের চরণের মতো, 'ও' এবং 'ই'-র উক্ত সমাজবিশ্লেষণ এই এতগুলি বছর ধরে আমাকে তাড়া করে দিয়েছে। ভাষাকে আমরা ব্যবহার করি সমাজের প্রয়োজনে, প্রতিটি শব্দের, প্রতিটি বিশেষ্য-বিশেষণের, প্রতিটি সর্বনামের, প্রতিটি অব্যয়ের এক কিংবা অনেক সামাজিক সংজ্ঞা আছে ; ভাষাকে জড়িয়ে সমাজ, কিন্তু, সমপরিমাণে, সমাজকে জড়িয়ে ভাষা। অতি সামান্য একটি উদাহরণ, কিন্তু হাজার কথা বলার আর দরকার হলো না, রবীন্দ্রনাথ ঐ যৎসামান্য উদাহরণেই আমাকে অন্তত প্রজ্ঞার প্রান্তে পৌঁছে দিলেন। এই এতগুলি বছর অতিক্রান্ত হবার পর ঠিক কোন্ প্রবন্ধে মন্তব্যটি করেছিলেন মনে আনতে পারি না। কিন্তু মন্তব্যের সারাৎসারটি, সংস্কার পেরিয়ে, বোধের শরীরে বিধৃত হয়ে আছে।

সুতরাং রবীন্দ্রনাথের সমাজচেতনার হ্রস্বতা বা অপরিপূর্ণতা নিয়ে কেউ বক্তৃতা ফেঁদে বসলে আমি একটু অসহিষ্ণু হয়ে উঠি। সমাজচেতনা তো ইতিহাসচেতনাকে বাদ দিয়ে নয়। দার্শনিক তত্ত্ব-তর্ক আছে, থাকবেও ; এমন-কি গোটা পৃথিবীর মানুষও যদি বিশেষ একটি দর্শনের আশ্রয়ে নিজেদের জীবনকে সমাজকে আদল দিতে চায়, তাহ'লেও অতীত তো লেপেমুছে যাবে না, অন্যতর আদর্শের-চিন্তার-ভাবনার স্মৃতি পড়ে থাকবে। প্রধানত দুই প্রতীপ জীবনাদর্শের মধ্যে যুদ্ধ চলছে, গেলো প্রায় দেড়শো-দুশো বছর ধরেই চলছে। একটি দর্শনের সারমর্ম ধনতন্ত্রের উন্মেষের সঙ্গে জড়িত কোনো অদৃশ্য হাত সমাজকে লালন করছে, সেই হাতের জাদুমন্ত্র অতি স্পষ্ট। মানুষকে স্ব-স্ব প্রবৃত্তি কিংবা প্রতিভা অনুযায়ী এগোতে দাও, বাধা দিও না, প্রত্যেকেই তাহ'লে নিজেকে সৃষ্টির-কর্মের মহত্তম পর্যায়ে তুলে নিয়ে যেতে পারবে, অণুর পরকাষ্ঠা থেকেই সমগ্রের উৎকর্ষ, প্রতিটি মানুষ তার স্বীয় কর্মবিন্দুতে শ্রেষ্ঠত্বে পৌঁছুলে সামাজিক শুভ ও তুঙ্গে উত্তীর্ণ হবে। অন্য পক্ষে, ইতিহাসের দ্বান্দ্বিক নিয়মকলায় যাঁরা বিশ্বাস রাখেন, তাঁরা বলবেন, অদৃশ্য হাতের কাহিনী আসলে যুগে-যুগে মানুষের অধ্যবসায় মারফৎ অপরকে সুযোগ করে দেওয়ার জন্য দোহাই, এই বিশ্বাসে মুক্তির হদিশ নেই, মানুষের ইতিহাস আসলে পরস্পরবিরোধী প্রবণতার দ্বান্দ্বিক বিবর্তনের ইতিহাস, এই ইতিবৃত্তের শরীরেও এক অঘোর নিয়ম আষ্টেপৃষ্ঠে জড়ানো, দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়েই শুভ থেকে শুভতরের দিকে মানবসমাজের যাত্রা। আমাদের ভারতীয় শাস্ত্রে প্রকৃতি ও পুরুষকারের সংঘাতের মধ্যে যে-দ্বান্দ্বিকতা বিধৃত, তা-ও খানিকটা ঐ একই কথা বলে। তা ছাড়া যে-জীবনদর্শনেরই

আশ্রয় গ্রহণ করি-না কেন, পুরুষকারের প্রসঙ্গে শেষ পর্যন্ত ফিরতেই হয়। অদৃশ্য হাত কাজ করছে ব'লেই যাঁরা সতত লাভের হিশেব কষেন, অথবা শোষণে বিশ্বাস করেন, তাঁরা হাত গুটিয়ে বসে থাকবেন না। অন্য দিকেও কিন্তু সমান সমস্যা। ইতিহাস তার নিয়ম মেনে এগোবেই, সেই নিয়ম দ্বান্দ্বিকতায় অনুশোষিত, অতএব অমোঘ, সুতরাং আমরা নিশ্চিন্ত মনে অবসর নিতে পারি, এই যুক্তিও সমান অগ্রাহ্য।

আমরা ক্রীড়নক নই, ইতিহাসকে আমরা, রক্তমাংসের মানুষরাই রচনা করি, আমাদের বিবেক-বুদ্ধি-জীবনাদর্শ অনুযায়ী করি, আমাদের প্রবণতা-সামর্থ্য অনুযায়ী করি। কিন্তু আদর্শ কিংবা প্রবণতা তো নিরালম্ব-বায়ুভূত ব্যাপার না, কোনো বিশেষ মুহূর্তে কী আমাদের করণীয় তা স্থির করতে হ'লে ইতিহাসের কোন্ স্তরে আমরা আছি সেটাও জেনে নিতে হয়। আমার সমাজচিন্তা তো আমার ইতিহাস-চেতনাকে উপেক্ষা করে টিকে থাকতে পারবে না। আমরা যেখানে অবস্থান করছি তা কোনো পড়ে-পাওয়া ব্যাপার নয়, তা ইতিহাসের প্রবহমানতার কোনো একটি মুহূর্ত, বিশেষ একটি মুহূর্ত, তাকে নিশ্চয়ই সম্মান জানাতে হবে, তার পটভূমিতে দাঁড়িয়ে যেহেতু আমরা আমাদের ইতিকর্তব্য নির্ধারণ করছি, মুহূর্তটির গুণাগুণ অবশ্যই তুচ্ছ করবার ব্যাপার নয়। কিন্তু, পাশাপাশি, অন্য তথ্যটিও তো সমান খাঁটি, এই মুহূর্তটি অনন্ত সত্য নয়, ইতিহাস এই মুহূর্তটিকে পেরিয়ে যাবে। মুহূর্তটি উপেক্ষণীয় নয়, কিন্তু মুহূর্তটির অন্তর্লীন আবেগ-আকৃতি-চিন্তার প্রক্রিয়াগুলিই একমাত্র ধ্রুব নয়, এই কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞান নিয়েই তো ইতিহাসচেতনা।

না, আমি ধান ভান্‌তে শিবের গীত গাইছি না। আমার আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ, সেইসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যে-ভাষায় আমাদের উপনীত ক'রে গেছেন, সেই ভাষা। সেই ভাষা, আমার বিবেচনায়, একটি মস্ত সামাজিক ইতিহাসের ধারক। এবং সেই প্রসঙ্গেই আমি ইতিহাসচেতনার কথা পাড়ছি। যদি পূর্ণতম স্বত্বে পৌঁছুতে চাই, আমাদের সমাজচিন্তার সঙ্গে ইতিহাসচেতনাকে মেলাতেই-হবে, নইলে কতগুলি আংশিক মন্তব্যের দায়ভার আমাদের উপর বর্তাবে। আমি কোন্ পরিপার্শ্বে আছি, কোন্ সমাজবিন্যাস আমাকে নিয়ন্ত্রণ করছে, কোন্ অর্থব্যবস্থা, সামাজিক সাংস্কৃতিক ভাষাগত কাঠামো দ্বারা অনুশাসিত হচ্ছি, এই তথ্যাদি বাদ দিয়ে আমার পক্ষে সামাজিক দিগ্‌নির্দেশ অসম্ভব। আমরা সেই মানুষকে অন্বিত মানুষ বলি যিনি তাঁর কর্তব্যনিরূপণে ইতিহাসচেতনার সঙ্গে সমাজবোধকে মেলাতে পারেন : যে-বিন্দুতে আছেন, তাকেও যিনি পুঙ্খানুপুঙ্খ জানেন, অথচ সেইসঙ্গে ইতিহাসের গম্ভীর-বিশাল প্রবহমানতার আবর্তে বিন্দুর অবিকল মূল্যনির্ধারণেও যিনি আদৌ পরাঙ্মুখ নন। একটি বাদ দিয়ে অন্যটি নয়, ইতিহাসচেতনায় উৎকীর্ণ প্রয়োজন, কিন্তু নিছক তা-ই যথেষ্ট নয়, আমি কোথায় কীভাবে বিরাজ করছি তা-ও আমার সমান উপলব্ধিগত হওয়া দরকার, অন্যথা কেউ-ই আমরা অন্বিত মানুষ হবো না। যে কোনো অন্বীক্ষার সাধনা এই অন্বয়ের সাধনা। রবীন্দ্রনাথ এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন, পরিপূর্ণমাত্রায় করেছিলেন এবং আমার কাছে অন্তত তার উজ্জ্বলতম প্রমাণ যে-ভাষায় তিনি আমাদের বাঙালিদের পৌঁছে দিয়ে গেছেন।

মনকে চোখ ঠেরে কী লাভ, আমাদের অহংবোধ যা-ই হোক না, আসলে বাংলা ভাষার ইতিবৃত্তে পৌঁছুতে হ'লে ছশো-সাতশো বছরের বেশি পিছিয়ে গিয়ে হাতড়ানো শুরু করা তো পণ্ডশ্রম হবে। বাঙালি সংকর জাতি, তার ভাষাও অপজাত। এই ভাষা তৎসম-তদ্ভব-দেশজ-যাবনিক অনেকগুলি সংশ্লেষণের-সংযোজনের-বিভাজনের অধ্যায় জুড়ে এগিয়েছে। সামাজিক মানুষের অবলম্বন ভাষা, তার তাই ইতিহাসগত প্রবাহ থাকবেই, একই জায়গায় স্থিত হয়ে থাকার প্রসঙ্গ, ভাষার সম্পর্কে অন্তত, আদৌ কল্পনা করা যায় না। বিগত ছ'-সাতশো বছরে বাঙালি জাতি বিভিন্ন দ্বন্দ্ব-সংঘাতের অভিজ্ঞতায় দীর্ণ হতে-হতে এগিয়েছে, জাতির প্রকৃতিগত পরিবর্তন ঘটেছে অহরহ এই ছ'-সাতশো বছর ধরে। অনুরূপ পরিবর্তন অবশ্যই ঘটেছে বাংলা ভাষাতেও। এখানেও কিন্তু ঘটনাক্রম উভপাক্ষিক। সামাজিক জঙ্গমতার ছায়া পড়েছে ভাষায়, রাজসভার ধ্রুপদী পরিবেশ ছেড়ে ভাষা বেরিয়ে পড়েছে সাধারণ মানুষের প্রব্রজ্যায়, লোকায়ত থেকে লোকায়ততর হবার অভিসারে, সংস্কৃতের অলিন্দ থেকে পালি, পালি থেকে প্রাকৃত, প্রাকৃত থেকে আরো অনেক-অনেক দেশজ, প্রান্তরে, ইতিমধ্যে অন্যান্য ছায়া পড়েছে ইতস্তত, তুর্কি-আরবি-ফার্সি, ওলন্দাজ-দিনেমার, সবশেষে সর্বশেষ শাসককুল ইংরেজের। কিন্তু অন্য সত্যটিই বা উপেক্ষা করি কী করে : কোনো-কোনো বিশেষ অবস্থায় ভাষার প্রভাব পড়েছে সমাজকলায়।

ভাষায় আমাদের বিনিময়-প্রতিবিনিময়ের উপকরণ, সেইসঙ্গে আমাদের চিন্তার বাহক। কোনো-কোনো মুহূর্তে, আমাদের ভাষা যেহেতু একটি জায়গায় থমকে দাঁড়ানো, আমাদের চিন্তাও তাই ব্যাহত হয়েছে। এ-ধরনের সংকট মুহূর্ত ইতিহাসে তো তেমন অপরিচিত নয় : ভাষা চিন্তার বোঝা বইতে অক্ষম, চিন্তা আকুলিবিকুলি করে মরছে, সমাজ তাড়নাগ্রস্ত, অথচ ভাষা সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি প্রকাশের নির্ঝরে নিজের মুক্তি রচনা করতে পারছে না। এরকম অবস্থায়, ইতিহাসের অমোঘ নিয়ম মেনেই, সমাজবোধের পীড়নে ভাষাকে অন্যতর হ'তে হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ যাকে একদা অভিহিত করেছিলেন 'বেগের আবেগ', তার তাগিদে ভাষার রূপান্তর ঘটেছে। যদি আকস্মিকতা অথবা দুর্ঘটনাহেতু, কোনো ভাষা এই পরিবর্তনের পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যেতে অপারগ হয়েছে, সেই ভাষার ভাগ্যে সমাজচ্যুতি ঘটেছে, সামাজিক মানুষ অপর এক ভাষার আতিথ্য গ্রহণ ক'রে ক্রান্তির পর্যায় উত্তীর্ণ হয়েছে।

একশো-একশো পঁচিশ বছর আগে, কী আকৃতি-প্রকৃতি ছিল বাংলা ভাষার ? রাজপুরুষদের ভাষা নয়, প্রধানত প্রজাকুলের ভাষা, গ্রাম্য গরিব মানুষের ভাষা। সেই ভাষাকে মিশনারিরা ইংরেজি ভাষার বাক্যগঠনপ্রণালীর নিগড়ে বেঁধে অদ্ভুত-কিম্ভুত একটি রূপ দেওয়ার জন্য ভয়ংকর ব্যগ্র, রামমোহন রায় তাঁর নিজের চেষ্টায় একটু মোড় ঘুরিয়ে দিলেন, কিন্তু তেমন বেশ-কিছু করতে পারলেন না। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, আত্মাভিমানযুক্ত অথচ সেইসঙ্গে আতঙ্কগ্রস্ত, দ্রুত সংস্কৃতের ছায়াশ্রয়ে ফিরে গেলেন, কিন্তু তাঁর কাছে আমাদের সহস্র ঋণ স্বীকার করে নিয়েও বলতে হয়, সাধারণ মানুষের কাছ থেকে তাঁর পরীক্ষা ভাষাকে একটু বেশি দূরবর্তীও যেন করলো। যে-ভাষাকে আমরা নিজেদের বলে চিনতে পারি তার শুরু বঙ্কিম থেকে। বঙ্কিম বিদ্যাসাগরের ভাষাকে গ্রহণ করলেন, ভাষার অন্তঃস্থিত ধ্রুপদী দ্যোতনাকে অনেকটাই গাহর্স্থ্যের অঙ্গনবর্তী করলেন। কিন্তু তাহ'লেও তা বড়ো বেশি গম্ভীর, অভিজাত, রাশভারি, এমন-কি কমলাকান্তের প্রলাপোক্তিও বিশুদ্ধ সাধুতার গণ্ডি অতিক্রম করে ঠিক এগোতে পারে না। তার পাশাপাশি, অন্য-একটি ভাষাও, লিখিত আকারে, কাছাকাছি সময়ে আত্মপ্রকাশ ঘটাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো, সেই 'ইতর' বাংলায় খিস্তিখেউড়ের প্রাবল্য, পাড়াগত গল্পকুটুনির ভাষা, ঈষৎ পরিমাণে ব্রত-পাঁচালীর ভাষাও। সমান্তরাল দু'টি আলাদা অভিযাত্রা, বিভক্ত সমাজের নিদর্শন নিশ্চয়ই, কিন্তু অন্য একটি সমস্যাও সঙ্গে-সঙ্গে প্রকট হলো। দেশজ তথা প্রাকৃত ভাষার মধ্যবর্তিতায় অমরাবতীতে পৌঁছনো অসম্ভব প্রস্তাব, কিন্তু বঙ্কিম-রাজনারায়ণ বসু-রমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ মহান পুরুষ দ্বারা প্রযোজিত ভাষা ও প্রায়-সমপরিমাণ ব্যবহার-অযোগ্য, আভরণ-অলংকারের প্রাচীর ভেদ করে চিন্তার প্রচ্ছায়ায় পৌঁছনো দুস্তর সমস্যা। সমুৎপন্ন সামাজিক সংকটের ঋতু অতএব সেটা : হাতে সময় নেই, সাত সমুদ্র-তেরো নদী পেরিয়ে ইওরোপের ভাবনার ঢেউ এসে বাঙালি মানসকে দ্বন্দ্বে ব্যাকুল করছে, সেই ব্যাকুলতার আধার হওয়া উচিত নিজেদের আত্মীয়তম ভাষা, অথচ সেই ভাষা তার অসম্পূর্ণতা-সীমাবদ্ধতার বাইরে এগোতে পারছে না।

যদি বলি, ইতিহাসের প্রয়োজনেই এই সংকটমুহূর্তে রবীন্দ্রনাথের প্রবেশ, তা' হলে সত্যিই অতিশয়োক্তি হবে ? রবীন্দ্রনাথ আশি বছর বেঁচে ছিলেন, সব মিলিয়ে পঁয়ষট্টি বছর সৃষ্টিকর্মে নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছিলেন, কিন্তু মাত্র এই সাড়ে ছয় দশকের অপরিসর গণ্ডির মধ্যেই বাংলা ভাষাকে আদ্যন্ত পাল্টে দিয়েছেন। পৃথিবীর অন্য যে-কোনো ভাষার ইতিহাসে এত দ্রুত এত ব্যাপক পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত চোখে পড়বে না। ভিক্‌টোরীয় ইংরেজির সঙ্গে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন ইংরেজি ভাষা প্রয়োগের তুলনা করুন, বাক্যগঠনে ঋজুতা এসেছে, ভারভারিক্কি কমেছে, কিন্তু ভাষার কোনো গুণগত পরিবর্তন ঘটেনি, একই ভাষা, শুধু সামাজিক পরিবেশ আলাদা, আমরা মাত্র এই অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরি। এবার মিলিয়ে নিন ১৮৭৫ কি ১৮৭৬ সালের কাছাকাছি সময়ে বঙ্কিম-সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত, রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্যায়ের প্রবন্ধের ভাষার সঙ্গে 'শেষের কবিতা' কিংবা 'ল্যাবরেটরি' গল্পের ভাষা, অথবা তুলনা করুন 'ভগ্নহৃদয়ে'র ভাষার সঙ্গে 'লিপিকা' বা 'শেষ সপ্তকে'র ভাষার। রেখে-ঢেকে বলার কোনো মানে হয় না, ভাষার গ্রহান্তর ঘটেছে, দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ শতাব্দীর ইংরেজির সঙ্গে বিংশ শতাব্দীর ইংরেজির যতটা দূরত্ব, রবীন্দ্রনাথ নিজের জীবদ্দশায়, নিজের প্রায় একক প্রয়াসে, বাংলা ভাষাকে

প্রায়-অনুরূপ দূরত্ব অতিক্রম করিয়ে দিলেন। হাজার বছরের মৃদুমন্দ স্থপতির জন্য যে-কীর্তি অপেক্ষমাণ ছিল, পঁয়ষট্টি বছরে তা সুসম্পন্ন হলো।

রুদ্ধশ্বাস ভাষাকে এগিয়ে নিয়ে গেলেন রবীন্দ্রনাথ, কিন্তু সেই সঙ্গে ইতিহাসকেও, সমাজব্যবস্থাকেও। যদি বাঙালিদের ভাষা রাজনারায়ণ বসু-রমেশচন্দ্র দত্তদের পর্যায়ে অবরুদ্ধ থাকতো, তা হ'লে সমাজচিন্তা অবগুণ্ঠিতা নববধূর মতো কোথায় স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো, তা স্বভাবউদ্ধত উত্তরপুরুষদের একটু ভেবে দেখতে অনুরোধ করি। উনবিংশ শতকের শেষের দিকে যে-মুক্তচিন্তা মধ্যবিত্ত তথা বিত্তবান বাঙালি সমাজকে প্লাবিত করেছিল, যার গুণ এখনো আমরা গেয়ে বেড়াই, তা আমাদের ভাষা হঠাৎ কল্লোলায়িত হয়ে ওঠার পরিণামেই এই ঢালাও মন্তব্য হয়তো বাগাড়ম্বর হবে, কিন্তু ভাষার বন্ধনমুক্তির সঙ্গে চিন্তার পক্ষিরাজবৃত্তির পারস্পরিক সম্পর্ক পুরোপুরি অস্বীকারই বা করবো কী করে? কোনো-কোনো ইতিহাসবেত্তা সম্ভবত আপত্তি জানাবেন, সত্তর-আশি-একশো বছরের ব্যবধানে একটি চলমান সমাজের ভাষা পাল্টাবেই, সমাজ পরিবর্তনের গতি যত ক্ষিপ্র হবে ভাষার প্রকৃতিগত পরিবর্তনও তত দ্রুত হ'তে বাধ্য। সুতরাং এখানে রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ উত্থাপন অবান্তর। হায়, আসল পৃথিবীর বাস্তব যদি সত্যিই এত সহজ হতো! সোভিয়েট দেশের সমাজব্যবস্থা ১৯০৫ সাল থেকে ১৯৩৫ সাল, এই মাত্র তিরিশ বছরের ব্যবধানে, আজবরকম বদলে গিয়েছিল। কিন্তু লেভ টলস্টয়ের ভাষার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কে নাতি আলেক্সি টলস্টয়ের ভাষার তেমন-কিছু আদলের তফাৎ চোখে পড়বে না, আসলে রুশ ভাষা উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধেরই পরিণতিতে পৌঁছে গিয়েছিল। এই শতাব্দীর সমাজবিপ্লবকে তাই ভাষাবিপ্লবের জন্য প্রহর গুণতে হয় নি। সুতরাং যাঁরা বলেন রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব না ঘটলেও বাংলা ভাষা সামাজিক প্রয়োজনে সংশোধিত পরিমার্জিত-পরিবর্ধিত রূপ পেত, অবলীলাক্রমেই পেত, স্বতঃপ্রণোদিত প্রক্রিয়াতেই পেত, তাঁদের সঙ্গে হাত মেলাতে আমি অসমর্থ। রবীন্দ্রনাথ আবির্ভূত না হলে বাংলা ভাষার কী হাল দাঁড়াতো, বাঙালির সমাজবিবর্তন কোন্ অন্ধ গলিতে মাথা খুঁড়ে মরতো, এ-ধরনের ভাবনা যদিও, আমি বলবো, নিরর্থক কালক্ষেপণ, রবীন্দ্রনাথের অসামান্য পুরাকীর্তির যথাযোগ্য স্বীকৃতি এড়িয়ে যাওয়া ইতিহাসচেতনা থেকে অবশ্যই ভয়ংকর বিচ্যুতি।

যেন ইতিহাসের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমেছিলেন তিনি, ইতিহাস তার প্রবাহে এগোবেই, তার জন্য সমস্ত নিয়মকলা প্রস্তুত, সমাজ তার অঙ্গুলিহেলনে নিজেকে গড়ছে-ধ্বসছে-রূপান্তরিত হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ একবার যেন ইতিহাসপ্রবাহের দিকে চোখ ঠারছেন, আরেকবার যে-সমাজে আকস্মিকতাহেতু জন্মগ্রহণ করেছেন, তার দিকে তাকাচ্ছেন, সঙ্গে সঙ্গে কর্তব্য নির্ধারণ করে নিচ্ছেন। এখানেই পুরুষকারের ভূমিকা, ইতিহাস তার নিয়ম মেনে এগোয় কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতো মহাপুরুষরা নিজেদের কীর্তি দিয়ে সেই ইতিহাসকল্পকে নন্দিত করেন। ইতিহাস সমাজকে কোন্ প্রত্যন্তে নিয়ে উপনীত করবে তা যেন নির্ভর করবে যে-ভাষার মধ্যবর্তিতায় সমাজ নিজে উন্মোচন ঘটাবে, সেই ভাষাকে কত মহত্তর, শাণিততর, সংবেদনগভীর ক'রে তোলা সম্ভব তার উপর। রবীন্দ্রনাথের স্বেচ্ছাবৃত্ত দায়িত্বের শেষ নেই, ভাষাকে, প্রতিটি দণ্ডে-পলে-মুহূর্তে, উপযুক্ত থেকে উপযুক্ততর করে তুলছেন, ভাষাগঠনের আদল পাল্টে দিচ্ছেন, ব্যাকরণে-বানানে বিপ্লব সংসাধন করছেন। পুরোনো শব্দের নতুন ব্যবহার শেখাচ্ছেন, নতুন-নতুন শব্দের সমাবেশ ঘটাচ্ছেন, বাক্যবিন্যাস ক্রমশ অন্যরকম রূপ পাচ্ছে; হাতে সময় কম, মানুষের আয়ু এত কম, যে-ভাষাকে ব্যবহারযোগ্য করে তুলতে এত পরিশ্রম-এত উদ্যম, সেই ভাষার অতঃপর প্রয়োগ ঘটাচ্ছেন কাব্যে, নাটকে, গল্পে, সংগীতে, প্রবন্ধে, মন্ত্রোচ্চারণে। মাত্র কয়েক দশকের অধ্যবসায়ে আমাদের বাঙালি সমাজকে রঘুপতি-জয়সিংহের পৃথিবী থেকে এক দমকে অন্তু-এলার পৃথিবীতে পৌঁছে দিয়ে গেলেন।

সবিনয়ে প্রাসঙ্গিক বিবেচনা করছি বলেই অন্য একটি মন্তব্য এখানে যোগ করবো। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর পঁয়তাল্লিশ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, স্বাধীনতাপ্রাপ্তি, দেশভাগ হওয়া, শরণার্থী সমস্যা, জমিদারি প্রথার বিলোপ, কেন্দ্ররাজ্য সম্পর্ক-অধ্যুষিত অজস্র আর্থিক সংকট, বামপন্থী আন্দোলনের সমাচ্ছন্ন প্রভাব, সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাভাষী নতুন-একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম, এই সাড়ে চার দশকে বাঙালি সমাজ নেহাৎ কম অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে

প্রস্থান করেনি, অথচ চুল-চেরা হিশেব ক'রে দেখুন, বাংলা ভাষা, রবীন্দ্রনাথ তাকে যেখানে হাতে ধরে এনে বসিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন তার থেকে এক রশিও এগোয়নি। এখানে-ওখানে, ভাষা ব্যবহারে কিছু-কিছু শিথিলতা ঢুকেছে, কিছু কিছু খিস্তির ভাষা সাহিত্যগত হবার প্রয়াসবদ্ধ, কিন্তু সব মিলিয়ে বাংলা ভাষা এখনো রবীন্দ্রনাথ যা সৃষ্টি করে গিয়েছিলেন তা-ই। এই শতকের প্রথম দশক থেকে শুরু ক'রে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি-চিত্তরঞ্জন দাশ-দ্বিজেন্দ্রলাল রায় অধ্যায় থেকে আজ পর্যন্ত, ক্ষেপে-ক্ষেপে রবীন্দ্রনাথবৈরিতার পর্ব এসেছে-গেছে। অথচ, প্রতিটি ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথ-সৃষ্ট ভাষা অতিক্রম ক'রে কেউ যেতে পারেননি। গত কয়েক দশক ধরে বাংলা ভাষা যে মোটামুটি একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে তা থেকে কিন্তু প্রমাণ হয় না বাঙালি সমাজ স্থবিরত্বে অথবা জড়ত্বে পৌঁছেছে। বাইরের লক্ষণগুলি সম্পূর্ণ বিপরীত, বহুধা আর্তিতে বাঙালি সমাজ ছিন্নভিন্ন হচ্ছে। কিন্তু একটি প্রায়প্রাগৈতিহাসিক ভাষাকে রবীন্দ্রনাথ, একা, এতটাই ইতিহাসপথে এগিয়ে দিয়ে গেছেন যে আরো অন্তত একশো বছর নতুন করে প্রসাধন-সাজসজ্জার প্রয়োজন তার উপস্থিত হবে না।

ঘুরিয়ে বললে বলতে হয়, রবীন্দ্রনাথের প্রসাদে, আমাদের ভাষা এখন পরিপূর্ণ পরিণত, তাঁর স্থৈর্য স্থবিরত্বের সাক্ষ্য বহন করছে না, তার আত্মবিশ্বাসের পরিচয় সামনে তুলে ধরছে মাত্র। এই ভাষাকে এখন আমরা যথেচ্ছ ব্যবহার করতে পারবো, যে-কোনো চিন্তাকে গভীরে বিস্তৃত করতে হ'লে এই ভাষা সাহায্যের সহকার শাখা মেলে ধরবে, আমাদের সাহস, আমাদের স্পর্ধা, আমাদের উদ্ধতি সব-কিছুই তার সাধ্যের মধ্যে। রবীন্দ্রনাথ-পরবর্তী কোনো কৃতী পুরুষের রচনা থেকে উদাহরণ উপস্থাপন অবশ্যই করা সম্ভব কিন্তু ইচ্ছে ক'রেই রবীন্দ্রনাথের প্রাঙ্গণেই নিজেকে আবদ্ধ রাখবো। রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ে রচিত একটি গানের দু'টি কলি আমি উদ্ধৃত করছি : 'কী ফুল ঝরিল বিপুল অন্ধকারে/গন্ধ ছড়াল ঘুমের প্রান্তপারে'। রবীন্দ্রনাথ, বিহারীলাল চক্রবর্তীতে বিভোর, প্রথম উন্মেষের মুহূর্তে যখন কাব্যরচনা শুরু করেছিলেন, কোনো বাঙালি কবির পক্ষে বিপুল অন্ধকার কল্পনা করা অসম্ভব ছিল, বাংলা ভাষার পক্ষে এই সাহসিকতার প্রসঙ্গ তখন অভাবনীয় ছিল ; ঘুমের প্রান্তপার (অথবা, রবীন্দ্রনাথেরই অন্য একটি গানে, 'ঘুমের চারিধারে') আবিষ্কারের লোভও ঐ পর্বে অকল্পনীয় ছিল। ভাষা যখন সুগঠিত হয়, তখন সে সাহস শেখে, কল্পনার ডালপালাকে উতলা করবার মন্ত্র তার করতলগত হয়, এবং এই কল্পনাক্ষমতা থেকেই সমাজও দুঃসাহসী হ'তে শেখে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর আশি বছরের জীবনে একক প্রয়াসে আমাদের ভাষাকে অসমসাহসী হ'তে শিখিয়ে আমাদের সমাজকেও যেন ব'লে গেলেন : 'ওরে ভীরু, তোমার হাতে নাই ভুবনের ভার'।

তবে পৃথিবীতে বৈয়াকরণের অভাব নেই। অনেক ক্ষেত্রেই তাঁদের সমাজবোধ ইতিহাসচেতনার দায়-দায়িত্ব এড়িয়ে। কিছুদিন আগে 'সহজ পাঠে'র এই দুই চরণ নিয়ে তো হুলস্থুল পড়ে গিয়েছিল : 'গঞ্জের জমিদার সঞ্জয় সেন/দু'মুঠো অন্ন তারে দুই বেলা দেন।' সমাজব্যবস্থা পরিবর্তনশীল, গ্রামে ভূম্যধিকারীদের ঋতু বহুকাল অপগত, দুঃস্থ-দরিদ্র মানুষ জমিদারের দাক্ষিণ্যের উপর আর নির্ভরশীল নয়। তাঁরা সংগ্রামশীল হয়ে নিজেদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে শিখেছে। রবীন্দ্রনাথ ছন্দের প্রয়োজনে যে-চরণ দু'টি রচনা করেছিলেন, আধুনিক বাস্তবের সঙ্গে তার সাযুজ্য নেই, অতএব উক্ত পঙ্‌ক্তিদ্বয় আর ব্যবহারযোগ্য নয় : এ-ধরনের এক উদ্ভট সমাজবোধের ফলিত প্রয়োগ ঘটিয়ে কয়েকজন ব্যাকরণবিদ আমাদের কৌতুকের খোরাক জুগিয়েছিলেন কয়েকটি সপ্তাহ ধরে। এঁরা এত বেশি নৈষ্ঠিক যে মার্কস-এঙ্গেলসের অনেক তথ্যভিত্তিক ইতিহাসবিশ্লেষণও হয়তো ছেঁটে বাদ দিতে চাইবেন। এঁদের স্বৈরাচারের পরাক্রম থেকে ভাষাসাহিত্যের বিশ্লেষণকে উদ্ধার করা, আমার বিবেচনায় অন্তত, যে-কোনো বিবেকবান সাম্যবাদীর মস্ত কর্তব্য। আমরা কি উপস্থিত মুহূর্তের সমাজবোধ দিয়ে সাহিত্যের কাব্যের গুণাগুণ বিচার করবো, নাকি সেই বিচারের সঙ্গে ইতিহাসচেতনাকে যুক্ত করবো ? এই প্রাথমিক কাণ্ডজ্ঞানের সমস্যার আরো ভূরি-ভূরি দৃষ্টান্তের সঙ্গে প্রতিনিয়ত আমাদের মুখোমুখি হতে হয়। এ-সব ক্ষেত্রে যুদ্ধক্ষেত্র লোক সরে আসা সামাজিক অপরাধ, আমাদের সমাজচেতনার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা। অথচ এমন নয় যে 'সহজ পাঠে'র ঐ চরণদ্বয় সম্পর্কে আপত্তি করবার কিচ্ছু নেই। 'সেন'-এর সঙ্গে 'দেন' মিলিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ, প্রায় জোর করেই মিলিয়েছেন, মিল হিশেবে অথচ এই মিল আদর্শস্থানীয় নয়, কানে ঠেকে, বিশেষত শিশুদের উদ্দেশ্যে

যে-রচনা নিবেদিত তাতে এবংবিধ খণ্ডমিল উপভোগ তথা উপলব্ধিতে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে। কিন্তু আক্ষরিক সমাজব্যাকরণ নিয়ে যাঁরা নিজেদের নিয়োগ করেছেন, তাঁদের কাছে মিল-অমিলের সমস্যা সম্পূর্ণ অন্য।

তবে কি, যেহেতু রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষাকে তার নিটোল পরিপূর্ণতায় পৌঁছে দিয়ে গেছেন, যে-পরিপূর্ণতার নির্ভরে আধুনিক পৃথিবীর সমস্ত রহস্যের অন্বেষণে দিগ্বিজয়ী বীরের মতো বেরিয়ে পড়তে পারি আমরা, এখন থেকে শুধু লেপ মুড়ি দিয়ে ঘুমোবার ভূমিকা, আমাদের ভাষা নিয়ে নতুন-কোনো অভিনিবেশের প্রসঙ্গ পুরোপুরি অবান্তর। এ-ধরনের দাবিও সমান ইতিহাস-অজ্ঞতা হবে। সমাজের গঠন-অভিগঠন অহরহ বদলাচ্ছে, যখন ঠিক বদলাচ্ছে না তখনও বিভিন্ন ঝোঁকের চাপ পড়েছে তাদের উপর। রবীন্দ্রনাথ-দত্ত ভাষা আমাদের গর্ব, এই ভাষার কুশলতা-দক্ষতা-সম্ভবপরতা সম্পর্কে আমাদের প্রগাঢ় আত্মবিশ্বাস যথাযথ যুক্তির উপর দাঁড়িয়ে, এই ভাষার সওয়ার হয়ে আমরা যে-কোনো অভিযানে জয়ী হয়ে ফেরার ভরসা রাখি। তাহ'লেও কিন্তু এই ভাষা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকবে না, সমাজের তাগিদে তা এখানে-ওখানে আদল বদলাবে, নতুন পোশাক পরবে, নতুন অনুষঙ্গ শিখবে, নতুন অর্থের দ্যোতনায় নিজেকে সংস্কৃত ক'রে নেবে। আধুনিক, প্রতিষ্ঠিত অথচ জীবন্ত, সুতরাং চলমান, চঞ্চল না হয়েও চলমান : সার্থক ভাষার এই সংজ্ঞাগুলি নিজের সাফল্য দিয়ে প্রমাণ করে যাবে অহরহ। রবীন্দ্রনাথ আমাদের ভাষা দিয়েছেন, কিন্তু ভাষা দিয়েছেন বলেই তাঁরই ভাষায় বলার সামাজিক প্রয়োজন উপস্থিত হবে : 'তোমারে ছাড়িয়ে যেতে হবে'। একটি ছোটো, অতি বিনীত উদাহরণ দিলে আমার বক্তব্য স্পষ্ট হবার সম্ভাবনা। যে-ভাষা আমাদের চিন্তাকে মুক্ত করবে, সচ্ছল প্রবাহে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে, কোনো বিশেষ সময়ের সমাজবোধে বাঁধা পড়লে তাই নিগড় হয়ে দাঁড়ায়। বাংলা ভাষায়, এমন-কি রবীন্দ্রনাথ যে-পর্যায়ে সেই ভাষাকে পৌঁছে দিয়েছেন সেখানেও আমরা অবলীলাক্রমে 'ছোটোলোক'-'বড়োলোক' কথা দু'টিকে ব্যবহার করি অত্যন্ত নির্দিষ্ট ব্যাখ্যাকে আলোকিত করার উদ্দেশ্যে। 'ছোটোলোক' ইতর জন, নোংরা চরিত্রের লোক, অভদ্র-অসভ্য ; 'বড়োলোক' শুধু টাকাওলা মানুষ নন, মহৎ মানুষ, উদার চরিত্র-মানসিকতার অধিকারী। এমন-কি রবীন্দ্রনাথও এই ব্যাখ্যান থেকে সরে আসতে পারেন নি। সমাজচেতনার বাইরে পা বাড়ানো তাঁর পক্ষেও সম্ভব ছিল না। অথচ শব্দদ্বয়ের সামাজিক ব্যুৎপত্তি বিশ্লেষণ করুন। ছোটো-বড়ো, ক্ষুদ্র-বড্র : ছোটোত্ব-বড়োত্ব কতগুলি সামাজিক প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতি। যিনি জমিদারগিরির মধ্যবর্তিতায়-ঋণের মধ্যবর্তিতায়-অসমান বিকিকিনির মধ্যবর্তিতায় শোষণ করে, কিংবা বাহুবিক্রমে অপরকে পরাভূত করে, অনেক জমির, অথবা অনেক অন্য ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়ে গেলেন, তিনি বড়ো ; যিনি শোষিত হলেন, অত্যাচারিত হলেন, বঞ্চিত হলেন, তিনি সামাজিক অনুজ্ঞায় ছোটো। এই সামাজিক অনুশাসন কিছু সময় বাদে চারিত্রিক গুণের উপরও বিস্তারিত হলো : বিত্তবান মানুষ মহানুভব, বিত্তবিহীন ব্যক্তি হীন-কুটিল-অসৎ।

সন্দেহ নেই, শ্রেণীচিন্তাসমাচ্ছন্ন ভাষাপ্রয়োগের অজস্র প্রমাণ দাখিল করা সম্ভব, এমন প্রয়োগ যা আমাদের দৈনন্দিন জীবন-কণায় স্বতঃসিদ্ধতার মতো ঢুকে গেছে। এটাও সন্দেহাতীত, সমাজবিন্যাস যতই অন্যরকম মোড় নেবে, বাংলা ভাষায় বিশেষ শ্রেণীসম্পর্ক-অনুপ্রাণিত শব্দব্যবহারের বিরুদ্ধে আন্দোলন, সোচ্চার হোক কি নিঃশব্দই হোক, শক্তিশালী হবে। ভাষা তখন, হয় দ্রুত নয় ঢিমে তালে, নতুন নতুন পরিভাষা রপ্ত করবে। এই বিবর্তন অপ্রতিরোধ্য। ভাষা যে প্রাণবন্ত, তার প্রমাণ এ-ধরনের মোড়-ঘোরা মোড়-ফেরা। ইতিহাসচেতনাকে সম্মান জানিয়েই, সক্রিয় সমাজবোধ রবীন্দ্রনাথের ভাষার জন্য নিত্য-নতুন জানালা খুলে দেবে।

কিন্তু তার অর্থ নিশ্চয়ই এই নয় যে রবীন্দ্রনাথের ভাষা অপাঙ্‌ক্তেয় হয়ে যাবে, অথবা রবীন্দ্রনাথকে আমরা বধ্যভূমিতে হাজির করাবো এই অভিযোগ তুলে যে তাঁর ভাষাসংস্কারে এখানে-ওখানে মস্ত অপূর্ণতা ছিল। আর একবার বলি, একটি মধ্যযুগীয় ভাষাকে, তাঁর প্রায় একার প্রয়াসে, এক হাজার বছরের মতো সময় অতিক্রম করে এনেছেন তিনি, এক হাজার বছরের সিদ্ধি-কীর্তি ষাট-পঁয়ষট্টি বছরের অতি অপরিসর সময়গুণ্ডির মধ্যে সম্পন্ন করিয়েছেন তিনি, একই সঙ্গে তিনি হোতা এবং পুরোহিত। বাঙালি তার শত স্খলন-বিচ্যুতি-উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তি সত্ত্বেও একটি আধুনিক জাতিতে পরিণত যা ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের অনেক অধিবাসীবৃন্দ সম্পর্কেই বলা সম্ভব নয়। বাঙালি সমাজের আধুনিকতা বাংলা ভাষার

আধুনিকতার কাছে পুরোপুরি ঋণী : রবীন্দ্রনাথ আমাদের ভাষা তৈরি ক'রে দিয়েছিলেন বলেই আমরা চিন্তা করতে শিখেছি। তাঁর মৃত্যুর পর বাঙালি চিন্তা যে-ভিন্নতর হয়তো দীপ্ততার প্রবাহে বইছে, রবীন্দ্রনাথ কেন আগে থেকে খেয়াল করে তার জন্যও উদ্যোগ-আয়োজন সম্পূর্ণ ক'রে যাননি, তা নিয়ে অভিযোগ উত্থাপন বাতুলের প্রস্তাব।

যা মজার ব্যাপার, শ্লাঘার ব্যাপারও সেইসঙ্গে, এমন-কি রবীন্দ্রনাথকে গাল পাড়তে হ'লেও আমাদের তাঁরই শরণাপন্ন হতে হবে যে-ভাষায় গাল পাড়বো, তাও তো তাঁরই দান। বছরের পর বছর গড়িয়ে যাবে আমাদের সমাজ নানা উথাল-পাথাল পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে সাঁতার কাটবে, আমাদের ভাষা সেই অস্থিরতার সঙ্গে তাল রেখে এখানে ঝালর পরবে-ওখানে খোলস ছাড়বে, আমরা রবীন্দ্রনাথের সময় থেকে অনেক, অনেক এগিয়ে যাবো, কিন্তু তাহ'লেও রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করতে পারবো না কখনোই। তিনি আমাদের নিত্যসঙ্গী হয়ে থাকবেন, কারণ যে-ভাষায় আমরা কথা বলি, চিন্তা করি, প্রেম-হিংসা-দ্বেষ-বিলাপ-ষড়যন্ত্র-প্রতিজ্ঞা-অঙ্গীকার ইত্যাকার আকৃতি প্রকাশ করি, তা আমাদের জ্ঞানে অথবা অজ্ঞানে তাঁর কাছ থেকে আমরা গ্রহণ করেছি। একটি প্রত্যয়ী উক্তি দিয়ে আমার মন্তব্যে দাঁড়ি টানছি : রবীন্দ্রনাথ যে-ভাষাকে হাজার বছর এগিয়ে দিয়ে গেছেন, আরো অন্তত হাজার বছর তা, তার গাঠনিক বৈশিষ্ট্যে, অবিকল থাকবে।

রবীন্দ্রনাথ : স্বাতন্ত্র্যের সম্পদে ও সংকটে

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

শিল্পী— মহৎ শিল্পী, দুরূহ জটিলতার প্রতিস্পর্ধী আহ্বান গ্রহণ করেন বারে বারে। কেননা, সত্য তাঁর অনুসন্ধেয়। এবং, সত্যকে যিনি খোঁজেন তাঁর যাত্রা কখনো একরৈখিক হতে পারে না। তাই সমগ্রকে জেনে নিতে গিয়ে নানা বিপরীতের মধ্যে তাঁকে অবগাঢ় হতে হয়। স্রোত এবং প্রতিস্রোত দুয়ের সঙ্গেই তাঁর বোঝাপড়া। সময়ছন্দিত সভ্যতার অন্তর্গত কাটাকুটি খেলার সাক্ষ্য তাঁকে গ্রহণ করতেই হয়। জগৎজীবনের এই দ্বন্দ্বময় তথা ডায়ালেকটিক্যাল প্রকৃতি আধুনিক কালেরই ব্যাপার নয়। মধ্যযুগের পাশ্চাত্য কবিতায় খৃস্টীয় মূল্যবোধের বিরোধাভাসিত প্রকৃতির জন্য বিরোধকল্পনার সম্যক ব্যবহার লক্ষ করা গেছে। মধ্যযুগীয় ভারতীয় কবিতার রাধাকল্পনায় বিরোধাভাসিত জীবনপ্রকৃতির প্রমূর্ত প্রতিচ্ছায়া আমরা ভুলতে পারি না। যা বিষ তাই অমৃত, যা দুঃখ তাই সুখ, রাত্রি দিবসের মতো কর্মময়, দিবস রাত্রির মতো বিজন— প্রভৃতি অসংখ্য বিরোধ কল্পনায় মধ্যযুগের ধর্মীয় ভারতীয় প্রেমকবিতা জীবনবেগে স্পন্দিত। এমন-কি শাক্ত কবিতাও এই জাতীয় বিরোধাভাসিত জীবনপ্রকৃতির প্রতিফলনে বিমুখ ছিল না। যেহেতু শাক্ত পদের সামাজিক ও বস্তুগত পটভূমি বৈষ্ণবপদের মতো অর্ধোচ্চারিত নয়, সেহেতু সে পদগুলিতে প্রতিফলিত বিরোধপ্রকৃতির স্বরূপ স্বতন্ত্র। সেখানেও আশাভঙ্গের বেদনা গুঞ্জরিত হয়েছে 'মিঠার লোভে সারাটা দিন তিতামুখে গেল।' কিন্তু তা বৈষ্ণব কবিতার 'অমিয় সাগরে সিনান করিতে সকলি গরল ভেল'—এই উক্তির মতো নিভৃত ব্যক্তিক বা প্রাইভেট নয়। বৈষ্ণব পদাবলীতে যা একান্ত, লক্ষণীয়, শাক্তপদাবলীতে তা সংসারগত। তবু বিরোধাভাসিত জীবন সম্বন্ধীয় চেতনা দুয়ের মধ্যে কারো কম নয়। আমরা যদি আরো পিছিয়ে গিয়ে খুঁজি তা হলে বৌদ্ধগানগুলির মধ্যেও আমরা নানা বিষম 'বিরোধের কল্পনার দেখা পাই। শাশুড়ী-বউয়ের রূপকে, শশবিষাণের বা আকাশনগরীর কল্পনায় চর্যার কবিরা সত্যকে খুঁজেছেন বিচিত্রপথে। আসলে যিনি যখনই সত্যকে খোঁজেন তিনি তখনই সত্যকে যথাপ্রাপ্ত বলে স্বীকার করে নেন না। সত্যের মূল্য যাচাই হয় বিরোধের পটে। ধর্মতত্ত্ব যতই এসোটেরিক হোক-না কেন তাকে বুঝে নিতে হয় বিরোধাকীর্ণ বস্তুজীবনের পটভূমিকায়।

এই বিরোধের প্রকৃতি ও আকৃতি আধুনিক কালে অন্যতর মাত্রা পেয়েছে রাজনৈতিক সামাজিক কারণে। উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে যে নাগরিক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হল তার মধ্যেই ছিল কতকগুলি বড়ো মাপের স্ববিরোধ। রাজনৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে— সে কারণেই সাংস্কৃতিক সত্তায় যারা ছিল আধিপত্যে প্রতিষ্ঠিত তাদের শক্তিকে স্বীকৃতি দিয়েই এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্ম। সেদিনের যা-কিছু মূল্যবোধ আমরা অর্জন করেছি তা সবই কোনো-না-কোনোপ্রকারের আত্তীকরণের ফল। কিন্তু এই আত্তীকরণ সম্পূর্ণ করতে গিয়ে বাঙালি মধ্যবিত্তের অগ্রণী অংশ একটা কথা অচিরেই বুঝেছিলেন যে, সাঙ্গীকরণের পথে বাধা প্রধানত দুটি— একটা ভিতর থেকে। একেই সমাজতাত্ত্বিক বলেন, 'emulation solidarity conflict।'[১] আর একটা বাইরে— সেটা হল রাজনৈতিক বাধা। ঠাকুর পরিবার তার বিচিত্র পারিবারিক ঐতিহ্যের শক্তিতে অবশ্যই বলিষ্ঠ ছিলেন। তবে এটুকুও বলার মতো যে, কলকাতা নগরসমাজের প্রধান এলিটগোষ্ঠীর নেতা হয়েও এই পিরালী সংসারকে পুরাতন বর্ণীয় হিন্দুসমাজকাঠামোর ছকে পীড়িত হতে হয় নি কেবল এই কারণে যে, কলকাতা শহরের আংশিক সেক্যুলার প্রকৃতিটি ইতিহাসের নিজ নিয়মেই সিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। তথাপি আত্মীকরণ ও অখণ্ডতারক্ষার দ্বন্দ্বে (emulation solidarity conflict) সমন্বয় বা সিন্থেসিসের নানামুখী চেষ্টা যে

হোঁচটের পর হোঁচট খেতে থাকে তার নিদর্শনও কিছু কম নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনজীবিকার বিরোধঘটিত বিড়ম্বনা; জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্টিমার কোম্পানি সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা এবং এরকম নানাজাতীয় ঘটনা এখানে আমাদের মনে পড়বেই। লক্ষণীয় যে, আমাদের ব্যবহৃত এই নিদর্শন দুটিতেই প্রতিবন্ধকতা এসেছে শাসকগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে রাজনৈতিক স্তরে (বঙ্কিমচন্দ্রের ক্ষেত্রে ভয়ের আকারে) এবং অর্থনৈতিক স্তরে (জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্টিমার কোম্পানির ক্ষেত্রে)। বাস্তব পরিস্থিতির অন্তর্গত স্ববিরোধ সচেতন স্রষ্টাদের মনে নিশ্চয় এই-সব ঘটনায় তীক্ষ্ণ হতে থেকেছে। য়ুরোপীয় উদারতাবাদ, বিজ্ঞানবাদ, প্রযুক্তি পারঙ্গম হবার বাসনা, স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা— যা-কিছু আমাদের উনবিংশ শতকীয় নাগরিক পূর্বপুরুষেরা ইংরেজদের মারফতে শিক্ষাসূত্রে পেলেন, তা কাজে প্রয়োগ করতে গিয়ে তাঁরা দেখলেন, কলোনির নেটিভ মধ্যবিত্তের করুণ অস্তিত্বে এ সবই শোনা কথা মাত্র। 'মানসী' (১৮৯০)-র "দুরন্ত আশা" কবিতার শেষ তিনটি স্তবক অবশ্যই উদ্‌ধৃতির যোগ্য। তার থেকেও বেশি উদ্‌ধৃতির যোগ্য এই অংশ[২]—

পরিতাপজর্জর পরানে
বৃথা ক্ষোভে নাহি চায় অতীতের পানে,
ভবিষ্যৎ নাহি হেরে মিথ্যা দুরাশায়—
বর্তমান তরঙ্গের চূড়ায় চূড়ায়
নৃত্য করে চলে যায় আবেগে উল্লাসি—
উচ্ছৃঙ্খল সে জীবন সেও ভালোবাসি।

যে conflict-এর কথা আমরা আগে বলেছি, যে সমন্বয় সাযুজ্যের অভাব এবং তাকে আয়ত্ত করার প্রয়াস নানাভাবে তখন প্রগাঢ় হয়ে উঠেছিল, তাদের সব-কিছুরই ছায়া পড়েছে কবিতাংশের পঙ্‌ক্তি কয়েকটিতে। রবীন্দ্রনাথই প্রথম উপলব্ধি করেছিলেন যে, চারিদিকের নানামুখী সিন্‌'থসিস প্রয়াসেই নানা স্ববিরোধ থেকে গেছে। এই প্রয়াসীরা কেউ ভেবেছিলেন যা-কিছু বিজাতীয় ঋণ তাঁরা গ্রহণ করেছেন, তার অনেকটাই নতুন নয়, জাতীয় ইতিহাসে পুরাণে তার হদিস মেলে। কেউ বা ভেবেছিলেন, যা-কিছু নবার্জিত তাকে দেশীয় জীবনধারা ও রীতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হবে। কেউ বা দেশীয় ও বিদেশীয় ভাবধারার সহযোগে দুয়েরই পরিবর্তন ঘটিয়ে একটা নতুন ধারা সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। কিন্তু যে যে-পথেই এই উত্তমর্ণ-অধমর্ণ অন্তর্বিরোধের মীমাংসা করতে চান-না কেন ইংরেজের কলোনিতে তা রাজনৈতিক রূপ নিতে বাধ্য। এবং উপনিবেশের রাজনৈতিক জাগরণের মূলে রয়েছে যে অনিবার্য স্বাদেশিকতা, সে স্বাদেশিকতার প্রথম আত্মমোচন ঘটেছে সাহিত্যে। তাই বাঙালির রাজনৈতিক জাগরণের ইতিহাসের প্রথম পাতা যেমন তার নব সাহিত্যের জাগরণের কথায় পূর্ণ, বাঙালির নবসাহিত্যের ইতিহাসের প্রথম পাতাতেও তেমনি তার স্বাতন্ত্র্যবোধের প্রথম গুঞ্জন শোনা যাবে। স্বাতন্ত্র্যের সম্পদ ও সংকটে রবীন্দ্রনাথ সে বোধকে মিলিয়ে নিয়েছেন কীভাবে সেটাই বর্তমান প্রবন্ধের প্রধান আলোচ্য বিষয়।

অবশ্যই স্বীকার্য— নৈতিক, রাষ্ট্রিক এবং সাংস্কৃতিক সেই উত্তমর্ণ অধমর্ণ সংঘর্ষে গত দুই শতাব্দীর ইতিহাসে সব থেকে সজাগ পুরুষ রবীন্দ্রনাথ। তিনি কীভাবে সে বিরোধের সম্মুখীন হয়েছেন, তা বুঝে নিতে গেলে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠাসংকট ও তা থেকে উত্তরণের সংগ্রামটিকে বুঝে নিতে হয়। মার্টিন লুথারের জীবন পরীক্ষা সম্বন্ধে এরিক এরিকসন এক আইডেন্‌টিটি ক্রাইসিস বা আত্মপরিচয়ের পরীক্ষাসংকটের কথা বলেছেন। রবীন্দ্রপ্রসঙ্গে এই তত্ত্বটির প্রথম প্রয়োগ ঘটে বিষ্ণু দে-র প্রবন্ধে।[৩] যে-সমস্ত বিরোধ এবং দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়ে রবীন্দ্রনাথকে অগ্রসর হতে হয়েছে তার প্রধান লক্ষণ হল আত্মসত্তার অবৈকল্য সন্ধান। রবীন্দ্রনাথ উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দুই দশকে তাঁর শ্রেণীর অগ্রণী মানুষদের মধ্যে যে উত্তমর্ণ-অধমর্ণ সংঘর্ষ প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তার আলোড়ন তাঁর নিজের মধ্যেও কিছু কম ছিল না। কিন্তু ব্যক্তিটি আদ্যোপান্ত শিল্পী বলেই সমস্ত অবস্থার ভিতর দিয়ে খুঁজে পেতে চেয়েছেন এক মননস্বচ্ছ শৃঙ্খলা— অপর কথায় তিনি

খুঁজে চলেছেন form বা রূপ। তাঁর স্বাতন্ত্র্যের মূল কথা— রূপে যতক্ষণ না তিনি স্থির হতে পারছেন ততক্ষণ তাঁর অধীরতার নানা যন্ত্রণার স্রোতে প্রতিস্রোতে তাঁকে দুলতে হয়েছে। আমরা একটু আগে তাঁর কৈশোরান্তিক আত্মাভিজ্ঞান সন্ধানের যে টেন্‌শনের কথা উল্লেখ করেছি, ১৮৭৫ থেকে ১৮৮০ পর্যন্ত সেই দুরন্ত সময়ে তাঁর বিচিত্র অস্থিরতার একটা প্রমাণ পাই প্রশান্তকুমার পাল মহাশয়ের 'রবিজীবনী' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ২৯৪ পৃষ্ঠায়। গ্রন্থকার ক্যাশবহির সাক্ষ্যে দেখাচ্ছেন কোনো এক অনির্দেশ্য পীড়ায় তখনকার রবীন্দ্রনাথকে অ্যালোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি ও কবিরাজী বিভিন্ন ওষুধ ব্যবহার করতে হয়েছে। ডজন ডজন বিয়ার ক্রয় তার একটা অঙ্গ। 'উদরসংক্রান্ত গোলযোগ' অপেক্ষা এই ঔষধ প্রণালী ইঙ্গিত করে তৎকালীন রবীন্দ্রনাথের ভিতর বাহিরের যন্ত্রণাময় অমীমাংসার উদ্‌বেগ ঘটিত আধির দিকে। এই অমীমাংসাজনিত আধির হাত থেকে মুক্তির জন্য আসল যে ঔষধের দরকার ছিল সেটা তিনি পেলেন বিলাত থেকে ফিরে এসে— 'বাল্মীকি প্রতিভা'-র রূপবন্ধনের অভিনবত্বে। 'বাল্মীকি প্রতিভা' (১৮৮১)-র প্রথম সংস্করণের প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ধারণাটি ছিল এই— 'ইহার সুরগুলি অধিকাংশই দিশি, কিন্তু এই গীতিনাট্যে তাহাকে তাহার বৈঠকী মর্যাদা হইতে অন্য ক্ষেত্রে বাহির করিয়া আনা হইয়াছে।' এ শুধু সংগীতেরই মুক্তি নয়, সমগ্র রবীন্দ্রনাথের মুক্তির নির্ভুল ঠিকানা বাৎলে দেয় 'বাল্মীকি প্রতিভা'। এ কতখানি অপেরা প্রশ্নটা সেখানে নয়, এর গানের সুর কতখানি দিশি, প্রশ্নটা সেখানেও নয়— আসল কথাটা হল— এ সম্পূর্ণ নতুন। 'বৈঠকী মর্যাদা' থেকে গানকেই শুধু নয়, সকল কৃত্রিম প্রথাবদ্ধ আভিজাতিকতা থেকে জীবনকে বার করে আনতে হবে— ঔপনিবেশিক বিকারের মধ্যে বন্দী থেকে গেলে অচরিতার্থতাই হবে নিয়তি। সেই নিয়তির সঙ্গে আমরণ সংগ্রামের নাম রবীন্দ্রনাথ। ভাবনাকে তিনি ভাবনামাত্র থাকতে দিতেন না। এখানেই তিনি রূপবাদী। অন্যার্থে ও গভীরার্থে স্বাতন্ত্র্যবাদী। আমাদের প্রধান রোমান্টিক কবি এই স্বাতন্ত্র্যের সম্পদ ও সংকটের দীপ্তিতে জীবনোজ্জ্বল। আমরা লক্ষ করি, যা কিছু রূপ বা 'ফর্ম্' থেকে বিবিক্ত তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কোনো সম্পর্ক এর পর থেকে কোনোদিন আর থাকবে না। কোনো কবি বা শিল্পীই রূপ বা ফর্মের সাধনাকে সমষ্টির সাধনা বলে অবশ্যই ভাবতে পারেন না। তাঁর সাধনা তাঁরই মুক্তির সাধনা। রবীন্দ্রনাথের মতো শিল্পীর পক্ষে এ কথা তো সত্য বটেই, এমন-কি তাঁর আমৃত্যু বৌদ্ধিক ও সামাজিক সমস্ত কার্যকলাপের প্রসঙ্গেই এ কথা সত্য। তাঁর রূপান্বেষার মূল প্রেরণা রয়েছে তাঁর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যন্ত্রণাময় অস্তিত্বের পাদপীঠে। তাঁর প্রতিটি অর্জন, প্রতিটি সিদ্ধির পিছনে আছে এক দ্বন্দ্বময় বিরোধাত্মক থিসিস-অ্যান্টিথিসিসের অভিঘাত। ব্রাহ্মসংগঠনের মানুষ হিসাবে তিনি একদা সুপরিচিত ছিলেন। মূর্তিপূজা, বলিদান ও আনুষ্ঠানিক পূজা প্রকরণে তাঁর বিশ্বাস থাকার কথা নয়। অথচ বলিদানের বীজঘটনা থেকে অসামান্য চিত্রকল্প তিনি রচনা করেন— 'তোমার খড়্গ আঁধারমহিষে দুখানা করিল কাটিয়া'[৪]। কবিতার চিত্রকল্পটি এখানে স্মরণযোগ্য। মূর্তিপূজায় তাঁর বিশ্বাস থাকার কথা নয়। অথচ দেবী দুর্গার আর্কেটাইপ হল তাঁর স্বদেশী যুগের বিখ্যাত গানের প্রধান আবেগের আলম্বন। 'আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে' গানটি স্মরণীয়। এ তাঁর স্ববিরোধের নিদর্শন নয়। এই তাঁর রূপান্বেষা। চতুর্দিগ্‌বর্তী নৈরাজ্যের মাঝখানে, অসংখ্য ভূয়া সিন্‌থেসিসের প্রচেষ্টার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ খুঁজেছিলেন রূপের স্বারাজ্য ; মনস্বী শৃঙ্খলা ও প্রগাঢ় নৈতিক সচেতনতা ছাড়া যে স্বারাজ্য গঠন করা যায় না। এজন্যই তাঁর ব্রহ্মচর্যাশ্রম, এজন্যই তাঁর স্বদেশী সমাজ পরিকল্পনা ও বাস্তব দেশপ্রেম, এজন্যই তাঁর সাহিত্য, সংগীত, চিত্রসাধনা। তাই যত সহজ আবেগে অরবিন্দ স্বদেশী আন্দোলনের অগ্নিগর্ভ দিনগুলিতে হয়তো রবীন্দ্রনাথের "স্বদেশী সমাজ" ভাষণের (১৩১১ বঙ্গাব্দ) প্রতিক্রিয়ায় বলে ফেলতে পারেন— The Mother asks us for no schemes, no plans, no methods. She herself will provide the schemes, the plans, the methods— (1908)[৫], রবীন্দ্রনাথ তা পারেন নি। এখান থেকেই তাঁর স্বাতন্ত্র্যের সংকট শুরু। "স্বদেশী সমাজ" ভাষণে তিনি যে গ্রামসমাজের পুনরুজ্জীবনের 'ব্লু প্রিন্ট্' উপস্থাপিত করেছিলেন সেও তাঁর রূপের মূর্ততার মধ্যে ভাবকে অধিবাসিত করার প্রয়াস। তা কর্মীর প্রয়াস, শিল্পীরও প্রয়াস।

"স্বদেশী সমাজ" (ভাদ্র/১৩১১) প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ যখন 'অতিবৃহৎ উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যেও ব্যবস্থা স্থাপনের প্রতিভা

ভারতবর্ষকে ত্যাগ করিল না'— এ কথা বলেন, অথবা যখন তিনি 'বিলাতি ধাঁচের সভা না বানাইয়া' দেশী ধরনের বৃহৎ মেলার রূপ-কে অগ্রাধিকার দেন, তখন আমরা একদিকে যেমন তাঁর সঠিক মাত্রার বাস্তব দেশপ্রেমকে প্রত্যক্ষ করি, অপরদিকে একইসঙ্গে ভাবের নিরবয়ব বাগ্মীয়তা ঘুচিয়ে তাকে মূর্তিতে গ্রাহ্য করে তোলার চেষ্টা লক্ষ করি। অবশ্য রাজনৈতিক ত্বরাবাদীরা যে অচিরেই তাঁর মতবাদের প্রতিকূল হয়ে উঠেছিলেন শ্রীঅরবিন্দের উদ্‌ধৃত উক্তিটি তার প্রমাণ। একদিকে লক্ষ করি রাজনৈতিক চরমপন্থা সম্বন্ধে যাঁর বিমুখতা বহুখ্যাত, তিনিই প্রায় একটা সমান্তরাল বিকল্প জনপ্রিয় সিভিল সোসাইটি গড়ার পরামর্শ দিচ্ছিলেন। এবং সে ভাবনাকে তিনি রূপে বাঁধতে চেয়েছেন হৃদয়ের রসে। এবার বলতে পারি বোধ হয় তাঁর সামগ্রিক সাধনাই সাকারের সাধনা, মূর্তির সাধনা। এখানেও— "স্বদেশী সমাজ" প্রবন্ধেও মূল বক্তব্যকে মূর্ত করে তোলার জন্য তিনি নানা ক্ষেত্রে প্রচ্ছন্ন চিত্রকল্প ব্যবহার করেছেন। একটির কথা উল্লেখ করি : 'আমাদের পুরানো বৈঠকখানায় কাগজ নেড়ে উচ্চস্বরে আমরা বিশুদ্ধ ইংরাজিতে পোলিটিক্যাল তর্ক করতাম। আমাদের মা তর্কশ্রান্ত ইংরাজি বুকনি বিশারদদের শ্রান্তি অপনোদন করার জন্য মাঝে মাঝে কিছু স্বহস্তনির্মিত খাদ্য নিয়ে দ্বারপ্রান্তে স্মিত হেসে দেখা দিতেন। তিনি বুঝতে পারতেন না আমরা কী বিষয়ে আলোচনা করছি, আমরাও তাঁর না-বোঝা নিয়ে মাথা ঘামাতাম না।' এই জীবনগত বাস্তব স্ববিরোধের ছবিটি 'স্বদেশী সমাজে'র উদ্‌গাতার রচনায় এইভাবে ছায়া ফেলেছে :

'...এমনি করিয়া কন্‌গ্রেস-কনফারেন্‌সের মাঝখানে খুব যখন বিলাতি বক্তৃতার ধুম ও চট্‌পটা করতালি,— সেখানেও, সে ঘোরতর সভাস্থলেও আমাদের যিনি মাতা তিনি স্মিতমুখে তাঁহার একটুখানি ঘরের সামগ্রী, তাঁহার স্বহস্তরচিত একটুখানি মিষ্টান্ন সকলকে ভাঙিয়া, বাঁটিয়া, খাওয়াইয়া চলিয়া যান,— আর যে কী করা হইতেছে তাহা তিনি ভালো বুঝিতেই পারেন না।'

আমাদের বৃহৎ ভূমিকাবিহীন প্রকাশঅক্ষম জীবনযাত্রায় যে-কোনো সামান্য ভালোবাসা লাঞ্ছিত হয়। কিন্তু ঘরের মা-টি আমাদের শেষ সান্ত্বনা। ছোটোগল্প 'মাস্টারমশায়' (১৯০৭)-এর শেষাংশটি এর উত্তম সাক্ষ্য। প্রাণহীন নাগরিক যান্ত্রিকতার নিষ্পেষণের মাঝখানে হরলালের যৎসামান্য নিজস্ব ছিল তার ভালোবাসা। তা যখন নিয়তি রূপে হরলালকে শেষ পরিণতির দিকে নিয়ে গেল, "তখন হরলাল আপনার বন্ধনমুক্ত হৃদয়ের চারি দিকে অনন্ত আকাশের মধ্যে অনুভব করিতে লাগিল, যেন তাহার সেই দরিদ্র মা দেখিতে দেখিতে, বাড়িতে বাড়িতে বিরাট রূপে সমগ্র অন্ধকার জুড়িয়া বসিতেছেন। তাঁহাকে কোথাও ধরিতেছে না।"

লক্ষণীয়, ছবির ভিক্‌ল্ বা বাহনটি যেমন বাস্তব, নিহিতার্থ ও 'টেনর'-টি ঠিক তেমনই বাস্তব। তিনি রূপতপস্বী বলেই বাস্তবকে বারে বারে বুঝে নিতে চেয়েছেন তার গভীরে গিয়ে। 'চতুরঙ্গ' (১৩২২ বঙ্গাব্দ)-এর শচীশ তার ঈশ্বর সম্বন্ধে বলেছিল, "তিনি মুক্ত তাই তাঁর লীলা বন্ধনে।" তাঁকে উদ্দেশ্য করে সে আরো বলেছিল, "বন্ধন আমার নয় বলিয়াই কোনো বন্ধনকে ধরিয়া রাখিতে পারি না আর বন্ধন তোমারই বলিয়াই অনন্তকালে তুমি সৃষ্টির বাঁধন ছাড়াইতে পারিলে না।" তাঁর সম্বন্ধে গানের উপমা ব্যবহার করে শচীশ আরো বলেছিল, "তিনি বাঁধিতে বাঁধিতে শোনান।" এখানে যতগুলি কথা তাঁর সম্বন্ধে শচীশ বলেছে, সবগুলি কথাই রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আমরা ব্যবহার করতে পারি। অন্য কোনো কারণে নয়, মুক্তি আর বন্ধনের বিরোধ এবং অন্বয় তিনি বুঝেছেন বলেই এ কথা বলা। অথচ এ পথে যিনি চলেন, তাঁর সংকটও কম নয়।

কেননা, এ কাজ যিনি করেন তিনি স্বভাবতই নিয়ত নিরীক্ষাশীল। তাঁর মধ্যে সাহস আর শৃঙ্খলা, চঞ্চলতা ও শান্তি, বিদ্রোহ ও বিনয় সহাবস্থিতই শুধু নয়, অন্বিতও বটে। এই-সমস্ত ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যগুলির বীজ রয়েছে মানুষ রবীন্দ্রনাথের মধ্যেই। তাঁর চরিত্রের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য সাহস। এ সাহসের উত্তরাধিকার তিনি লাভ করেছেন তাঁর সমাজচ্যুত পূর্বপুরুষদের একলা হাঁটার ক্ষমতা থেকে। যে-কোনো নতুন উদ্যমে, উদ্যোগে তাঁর পূর্বপুরুষদের মতোই তিনিও ছিলেন নির্ভয়। এ-ই তাঁর স্বাতন্ত্র্যের সম্পদ। এবং অবশ্যই, তাঁর এই নতুন পথে চলার সাহস ও ঝুঁকি নেবার ক্ষমতার মধ্যে সক্রিয়

ছিল তাঁর আত্মসত্তার অবৈকল্য সন্ধান। জীবনের সঠিক অভিজ্ঞান বুঝে নিতে গিয়ে তাঁকে স্বদেশ ও স্বসমাজের সার্বিক অসংগতিও চিনে নিতে হল। তখন তিনিও বুঝেছিলেন তাঁকেও উল্টোদিকে হাঁটতে হবে। মেদিনীপুর থেকে সেই কর্মিষ্ঠ মহাপ্রাণ কলকাতার দিকে হেঁটেছিলেন, কাঁটালপাড়া থেকে সে মনস্বী দ্রষ্টা কলকাতায় চলে গেলেন। এঁদের আগে সেই ১৮১৫ সালে এক যুগস্রষ্টা কলকাতায় এসে কর্মকেন্দ্র রচনা করলেন। এখানে এঁদের কারো কাজের তুলনা, বা সমালোচনা, আমাদের করার দরকার নেই। শুধু এইটুকু বোধহয় বলা যায়, রবীন্দ্রনাথই প্রথম এ কথা বুঝেছিলেন— এখানে নয়, আসন পাততে হবে এই প্রকট ঔপনিবেশিক জীবনচর্চার বাইরে গিয়ে। অস্পষ্টভাবে বিদ্যাসাগরের জীবনকাণ্ডের শেষের দিকে ও বিহারীলালের কাব্যকৃতিতে মাঝেমধ্যে যা আভাসিত হয়েছে, তা প্রথম রবীন্দ্রনাথের মধ্যেই একটা স্বতন্ত্র আকৃতি ধারণ করল। বিদ্যাসাগরে বা বিহারীলালে যা সাময়িক প্রতিক্রিয়া মাত্র, রবীন্দ্রনাথে তাই হল জীবনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একটা যুক্তিসিদ্ধ, প্রত্যয়দৃঢ় আত্মসত্তার চর্চা। শিলাইদহ, পতিসর, সাহাজাদপুরের নদীবহুল সমতলতা একদিকে, আর বীরভূমের রুক্ষ লাল বন্ধুরতা আর-এক দিকে— টোপোগ্রাফির এই দ্বৈতে কোনো অসংগতি নেই। মূলকথা হল একটাই জীবনের অকৃত্রিমতাকে জেনে নেওয়া। তখনই আমরা এই সূর্যসখ কবিপ্রাণ কেন যে একসময় অন্ধকারের বন্দনা করেছেন, তার মধ্যে কোন্ বিরোধাভাস বিদ্যমান, তার ব্যাখ্যা উপলব্ধি করতে পারি।

৩

'আলোকের যবনিকা' এই বিরোধাত্মক শব্দবন্ধটি রবীন্দ্রনাথ প্রথম ব্যবহার করেন "প্রাচীন ভারতের 'একঃ'" (১৩১১ বঙ্গাব্দ) প্রবন্ধে[৬]। ইংরেজি ১৯০১ থেকে ১৯০৭ পর্যন্ত রবীন্দ্রমানসের স্বাতন্ত্র্যের একটি বিশেষ পরিচয় এই গ্রন্থে লভ্য। এবং, তাঁর বিরোধাভাসিত দীপ্তির তাৎপর্য উপলব্ধির জন্য গ্রন্থটি গুরুত্বপূর্ণ। নাগরিক জীবনের উপকরণ-আলোকসজ্জা-কোলাহল থেকে দূরে অকৃত্রিম নির্জনতার মাঝখানে এই গ্রন্থের প্রবন্ধগুলি লিখিত। যে বিশেষ কালগত পটভূমিকায় প্রবন্ধগুলি লেখা হয়েছে, সেই পটভূমিকার দিকে দৃষ্টি রাখলে এই যুগের দুটি বিচিত্র রবীন্দ্রবাসনার ভিতরকার রহস্য আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়। একটা হল 'রাত্রি'-প্রশস্তি, আরেকটি হল 'বিশ্রাম'-প্রশস্তি। দুয়ের কোনোটাই ইংরেজ রোমান্টিক কবিদের অনুবর্তন অথবা টেনিসনীয় বিরামবিলাস নয়। ভারতীয় বাস্তবতার প্রেক্ষাপটেই এদের পূর্ণ ব্যাখ্যা সম্ভব। রাত্রিপ্রশস্তি আর বিশ্রামপ্রশস্তি একই প্রচ্ছন্নসূত্রে গাঁথা। 'আলোকের যবনিকা' এই শব্দবন্ধটি সেই সূত্রেই ব্যাখ্যেয়। তৎকালীন কলকাতা শহরের যে আলোকসজ্জা সে আলোক শুধু ঔপনিবেশিক উপকরণগুলিকে দৃষ্টিগ্রাহ্য করে তোলে, সে আলোকে শুধু আমাদের স্বার্থসন্ধ মধ্যবিত্ত বাসনার চেহারাই ধরা পড়ে— সেই আলোককেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন অলীক। এবং সে আলোকও ইংরাজের দান। সেই অলীক আলোয় শুধু যে আমাদের আত্মপ্রবঞ্চনাই ঘটে তাই নয়, আমাদের যা-কিছু প্রকৃত সম্পদ তাও ঢাকা পড়ে। তাকেই তিনি বলেছেন 'আলোকের যবনিকা'। এ যবনিকা অপসারিত হলে জগৎ-ব্যাপারের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতা ঘুচে যায়। খণ্ডিত অস্তিত্বের গ্লানি থেকে মুক্ত হয়ে আমাদের 'নিভৃত নির্জনতা'-র প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারি। এবং

'তাহা হইলে আর আমাদের অপমান নাই, অধীনতা নাই, দারিদ্র্য নাই। আমাদের বেশভূষা দীন হউক, আমাদের উপকরণসামগ্রী বিরল হউক, তাহাতে যেন লেশমাত্র লজ্জা না পাই— কিন্তু চিত্তে যেন ভয় না থাকে, ক্ষুদ্রতা না থাকে, আত্মার মর্যাদা সকল মর্যাদার উর্ধ্বে থাকে…।'

'ধর্ম' গ্রন্থে "দিন ও রাত্রি" প্রবন্ধে এক 'বিরাম বিভাবরী'-র ঈশ্বরী মাতার কাছে— তাকেই অন্ধকারের অধিদেবতা বলে কবি প্রার্থনা করেছেন :

'তোমার অন্ধকার আমাদের ক্লান্ত ইন্দ্রিয়কে আচ্ছন্ন রাখিয়া আমাদের হৃদয়কে উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিক, আমাদের শক্তিকে অভিভূত করিয়া আমাদের প্রেমকে উদ্‌বোধিত করিয়া তুলুক, আমাদের নিজের কর্তৃত্ব প্রয়োগের অহংকার সুখকে খর্ব করিয়া মাতার আলিঙ্গনপাশে নিঃশেষে আপনাকে বর্জন করিবার আনন্দকেই গরীয়ান করুক।'

তখনো কিন্তু তিনি সত্য সত্য 'ঈশ্বর' নন। তখনো তিনি মাত্র 'মহাতিমিরাবগুণ্ঠিতা রমণীয়া রজনী'; শহরের কৃত্রিম আলোকসজ্জায় যাঁকে উপলব্ধি করা যায় না, সেখানে উপনিবেশের বাবুদের নানা মোহাচ্ছন্ন প্রতিযোগিতায় নিজ নিজ অহমিকাকে বিলিতি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের নামে প্রতিষ্ঠা করার টানাহেঁচড়া। আর এখানে প্রকৃতির বুকে এক মাতৃকল্পনার ভিতর দিয়ে নবজাত হবার ইচ্ছা, নূতন জন্মের স্নানে শুদ্ধ হবার ইচ্ছা। সচেতন সেই ব্যক্তি— যে বেঙ্গল ভিক্টোরিয়ানদের আত্মসন্তুষ্ট স্থায়িত্ব বাসনার মাঝখানে নিজেকে অনন্বিত জ্ঞান করে। এরও অনেক আগে একুশ বছরের এই কবির গানে সেদিনের অনন্বয় থেকেই এক মাতৃচরণ-শরণ-বাসনা প্রবল হয়ে উঠেছিল : 'দীন হীনে কেহ চাহে না, তুমি তারে রাখিবে জানি গো'। সেদিনের কেরিয়ার-লুব্ধ, অভিমানস্ফীত, এলিটিজ্‌মের সোনার হরিণ-সন্ধানীদের ছোটাছুটি দেখে ক্লান্তচিত্ত ছেলেটি বলেছিল, 'আর আমি যে কিছু চাহি নে জননী বলে শুধু ডাকিব'।

কিন্তু সেদিনের একুশ বছরের ছেলেটির শিকড়হারা জীবনে মা-কে চাওয়া আর বিয়াল্লিশ বছর বয়সে এক 'মহাতিমিরাবগুণ্ঠিতা' রাত্রিকে 'বিরাম বিভাবরী'র ঈশ্বরীমাতা বলে সম্বোধন করা এক কথা নয়। একুশ বছরের ছেলেটি দেখেছিল চারি দিকে ঘোর অন্ধকার। সেটা হল ভূমিকাসংশয়ের অন্ধকার, কিছুর সঙ্গে মিলতে না-পারার জন্য নিজের অনির্দিষ্টতার অন্ধকার। যে-মায়ের কথা ঐ কবিতায় বলা হয়েছে তিনি দেশজননী যদি হনও বঙ্কিমের দেশজননী থেকে তিনি পৃথক। বঙ্কিম দুর্গা প্রতিমাকে দেশজননীতে রূপান্তরিত করে দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ ঘরের মা-কে করে তুললেন মহাজননী, তিনিই বঙ্গভঙ্গের প্রাক্‌কালে ও কালে হয়ে উঠলেন দেশজননী। দেশজননী ঈশ্বর হয়ে ওঠে নি। মহাজননী অনুভূতির অন্তর্বর্তী সত্য থেকে তিনি পৌঁছলেন তাঁর ঈশ্বরে। সে আরো পরের কথা। আপাতত দেখা যাক যিনি ঐ অন্ধকারের অবগুণ্ঠনে ঢাকা বিশাল রজনীকে 'জননী' বললেন, তাঁর নিজের ভূমিকাটি কী? ততদিনে ব্রহ্মবান্ধব-পিরিয়ড তাঁর জীবনে শুরু হয়েছে, ততদিনে তিনি জেনেছেন, 'মনুষ্যত্ব আমাদের পরম দুঃখের ধন, তাহা বীর্যের দ্বারাই লভ্য', ততদিনে স্থির বিশ্বাসে পৌঁচেছেন যে, কলকাতার এলিটিস্ট সাফল্য মৃগয়ার মধ্যে আছে শুধু 'খর্বতা', 'স্বল্পতা', ততদিনে তিনি আরো বুঝেছেন, আমাদের সৈন্য নেই, বাণিজ্য নেই, প্রাসাদ নেই, নেই শাসনযন্ত্রে অধিকার, নেই স্বাধীন শিক্ষা, নেই বাইরের পৃথিবীকে বলার মতো কোনো তাৎক্ষণিক পরিচয়। কিন্তু আছে আশ্চর্য নদী, বিশাল মেঘভারে মন্থর মৌসুমী; আছে অন্ধকার মহাকাশে তিমির সিন্ধুর কূলে জ্বালানো লক্ষ তারার দীপালি। জেগেছে তখন কর্মের জন্য আকুলতা। এ আর সেই একুশ বছরের ভূমিকাসংশয়ী যুবক নয়। এখানে কর্মীই চাইছে বিরাম ও প্রেরণা একসঙ্গে। এ কোন্ সংকটের দিকে ইঙ্গিত করছে তা বুঝে নিতে গেলে বলা দরকার মনে করি, 'ধর্ম' গ্রন্থের "বিশ্রাম" শব্দটি আভিধানিক অর্থে মাত্র গ্রাহ্য নয়। এখানে "বিশ্রাম" শব্দটির প্রকৃত তাৎপর্য বুঝতে হলে এই উদ্‌ধৃতিটি অপরিহার্য :

'জগতে আমাদের যথার্থ যে বিরাম, তাহা প্রেম— প্রেমহীন যে বিরাম তাহা জড়ত্বমাত্র।

'এই কারণে কর্মশালা প্রকৃত মিলনের স্থান নহে, স্বার্থে আমরা একত্র হইতে পারি, কিন্তু এক হইতে পারি না। প্রভুভৃত্যের মিলন সম্পূর্ণ মিলন নহে, বন্ধুত্বের মিলনই সম্পূর্ণ মিলন। বন্ধুত্বের মিলন বিশ্রামের মধ্যে বিকশিত হয়— তাহাতে কর্মের তাড়না নাই, তাহাতে প্রয়োজনের বাধ্যতা নাই। তাহা অহেতুক।'

সমস্ত প্রবন্ধটির প্রেক্ষাপটে এই অংশের বিশিষ্ট অর্থকে অস্বীকার করার কোনো প্রয়োজন নেই— কিন্তু সেই অর্থকে অতিক্রম করে আরো গভীরতর একটা ব্যঞ্জিত অর্থকেও এখানে ভুল করার উপায় নেই। 'কর্মশালা' 'প্রভুভৃত্যের মিলন' 'প্রয়োজনের বাধ্যতা'— এই শব্দ সেই গভীরতর অর্থে অন্তঃসত্ত্ব। এগুলি সবই তখনকার নাগরিক অস্তিত্বের সমালোচনা। ইংরাজের অফিসে, হৌসে, বাণিজ্যযন্ত্রে যে অনন্বিত অস্তিত্ব ছিল সে যুগের মধ্যবিত্ত জীবনের নিয়তি, এই শব্দগুলি তারই স্বরূপ উন্মোচন করছে।

৪

রবীন্দ্রভাবনার স্বাতন্ত্র্য ও তার সংকটকে ভালো করে বুঝতে হলে, তাঁর দ্বান্দ্বিক সমগ্রতা 'ছিন্নপত্রাবলী'র (পত্রগুলির লিখনকাল ১৮৮৭ সেপ্টেম্বর থেকে ১৮৯৫ ডিসেম্বর) চিঠিগুলি বিশেষ কাজে লাগে। আলোকের জন্য আকুলতা আর অন্ধকারকে অনুভব, ঔদাস্যের প্রতি পক্ষপাত ও আসক্তিকে স্বীকৃতি, কর্মবাসনা এবং আলস্যসঞ্চয়, বিশাল জীবনপ্রীতি অথচ ক্ষুদ্র গৃহাঙ্গন-কামনা— ব্যক্তিমানস-সম্পাতিত নানা বিপরীতের বিচিত্র কাটাকুটিতে চিঠিগুলি বিচিত্র। একটি অতিক্ষুদ্র চিঠির কথা উল্লেখ করি। ৭৬-সংখ্যক চিঠিতে তিনি লিখছেন— '...আত্মপীড়নও আমরা সহ্য করতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু তবু মনের জড়ত্ব চাই নে। এর থেকেই বোঝা যায় মানুষ সুখ চায় না, উন্নতি চায়— দুঃখ তার তেমন অপ্রিয় নয়, যেমন অবনতি।' এ কথা অবশ্যই উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালির কথা, বুর্জোয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে যে যুবক মাথা তুলতে চায় তার কথা। ঠিক এর উল্টো কথা আছে ২৪১-সংখ্যক চিঠিতে— 'বুঝতে পারি 'সুখ অতি সহজ সরল', যথার্থ পরিতৃপ্তি নিজের অন্তরাত্মার মধ্যে...'। এ দুটোর মধ্যে কোনো প্রতিঘাত নেই। দ্বান্দ্বিকতাও নেই। কিন্তু একে ব্যক্তিগত প্রাগ্‌ম্যাটিজ্‌মের সঙ্গে রোম্যান্টিকতার গরমিল বলে উড়িয়েও দেওয়া যাবে না। প্রথমোক্ত পত্রে উনবিংশ শতকে উদ্‌ভূত নাগরিক ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্ব-তন্ত্র উন্নতিকামনা চরিতার্থ করার অভিপ্রায় ধরা পড়ে। সেই উন্নতিকামনার পথে ইংরাজের ভারতবর্ষে যে জটিল প্রতিবন্ধকতা, দ্বিতীয়োক্ত পত্রে আছে তার কাছেই পরাভবস্বীকার। ৩৪-সংখ্যক চিঠিতে আছে— 'আমার বোধ হয় কলকাতা ছেড়ে বেরিয়ে এলেই মানুষের নিজের স্থায়িত্ব এবং মহত্ত্বের উপর বিশ্বাস অনেকটা হ্রাস হয়ে আসে'। এ কথার নিহিতার্থ যাই হোক, আপাত অর্থে এ কথার অর্থ কলকাতা ঐ নতুন শ্রেণীর ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠা-সাধনার অনুকূল। কিন্তু ১৮৯-সংখ্যক চিঠিতে বলছেন— 'কলকাতায় কবিতার মতো জিনিস বড়ো সংকুচিত হয়ে যায়— সেখানে তাকে বড়ো সামান্য মনে হয়।' কবিতার স্থায়িত্ব ও মহৎ সৌন্দর্যের পক্ষে কলকাতা যদি প্রতিকূল হয় তবে তো মানুষের নিজের সম্বন্ধে বিশ্বাসকে সে শিথিল করে দেয়। অথচ কলকাতায় যে সম্পূর্ণতা নেই, সেখানে যে স্বার্থপর উদ্‌ভ্রান্ত প্রতিযোগিতা ও সংঘর্ষ, সে কথা কবি **'ছিন্নপত্রাবলী'-র** একাধিক চিঠিতে বলেছেন। ২৪৩-সংখ্যক পত্রে এমন কথা বলেছেন :

'কলকাতায় যখন নানাপ্রকার সংঘাত-সংঘর্ষে উদ্‌ভ্রান্ত ক্লিষ্ট হয়ে পড়ি তখন মনে মনে কল্পনা করি, সুদূর নির্জনে আমার জন্য আমার ভাবলক্ষ্মী সুধাপাত্র নিয়ে বসে আছেন— যখন সেখানে এসে উপস্থিত হই তখন দেখি পাষাণী কলকাতাও আমার পিছনে পিছনে এসেছে এবং আমার ভাবলক্ষ্মী সুদূরতর নির্জনে গিয়ে লুকিয়েছেন।'

এ চিঠিতে এ আশাও ব্যক্ত করেছেন যে, ঐ নির্জন সুদূরে একদিন হয়তো তাঁর সমস্ত অসম্পূর্ণতার অবসান হবে। অথচ সেই নির্জন সুদূরের বাস্তব স্বরূপ তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি। ১৫৩-সংখ্যক চিঠিতে স্পষ্টই তিনি সেই গ্রামজীবনের একটি প্রতিচিত্র তুলে ধরে বলছেন :

'এত অবহেলা অস্বাস্থ্য অসৌন্দর্য দারিদ্র্য বর্বরতা মানুষের আবাসস্থলে কিছুতেই শোভা পায় না। সকলরকম ক্ষমতার কাছেই আমরা পরাভূত হয়ে আছি— প্রকৃতি যখন উপদ্রব করে তাও সয়ে থাকি, রাজা যখন উপদ্রব করে তাও সয়ে থাকি, এবং শাস্ত্র চিরকাল ধরে যে সমস্ত দুঃসহ উপদ্রব করে আসছে তার বিরুদ্ধেও কথাটি বলতে সাহস হয় না।'
থীসিস অ্যান্টিথীসিসের মতো সদ্যউদ্‌ধৃত এই দুটি অংশকে মিলিয়ে নিলে আমরা ১৯০৭ সালে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি অসামান্য গানের প্রথম চরণের বিরোধাভাসদীপিত উক্তির প্রস্তুতিরহস্যটি বুঝতে পারি। গানটি হল— 'তোমার সোনার থালায় সাজাব আজ দুখের অশ্রুধার'। এই বিরোধ অলংকারটির মূলে রয়েছে আমাদের অস্তিত্বের স্ববিরোধ। সে অস্তিত্বের বাস্তব স্তরে অশ্রুর ক্ষান্তি নেই। অথচ তার বাস্তব রিক্ততা যে পরিমণ্ডলে ধৃত তার সৌন্দর্যের সম্পদ অপরিমেয়। যে-কোনো বিরোধাভাস অলংকার— পাশ্চাত্য অলংকারশাস্ত্র অনুযায়ী যে-কোনো প্যারাডক্স বা অক্সিমোরোন-এর জন্ম হয় পরস্পরবিপরীত অভিজ্ঞতাগুলিকে অন্বিত করে নেবার তাগিদ থেকে (reveals a compulsion to fuse all experience into a unity). পূর্বোদ্‌ধৃত উদ্‌ধৃতির প্রথম ও দ্বিতীয়টির মধ্যে থীসিস অ্যান্টিথীসিস সম্পর্ক। কিন্তু এই

দুটি অভিজ্ঞতা যখন ঐকমূর্তি ধারণ করতে চেয়েছে তখন সৃষ্ট হয়েছে বিরোধাভাস— 'তোমার সোনার থালায় সাজাব আজ দুখের অশ্রুধার।'

২১১-সংখ্যক চিঠিতে তিনি বলছেন :

'ক্ষুদ্র এবং কৃত্রিম সমাজবন্ধনগুলি সমাজের পক্ষে বিশেষ উপযোগী, অথচ সঙ্গীত এবং উচ্চ অঙ্গের আর্ট মাত্রেই সেইগুলির অকিঞ্চিৎকরতা মুহূর্তের মধ্যে উপলব্ধি করিয়ে দেয়— সেইজন্যে আর্টমাত্রেরই ভিতর খানিকটা সমাজনাশকতা আছে।'

একটু পরেই তিনি আরো বলছেন— 'সৌন্দর্যমাত্রেই আমাদের মনে অনিত্যের সঙ্গে নিত্যের একটা বিরোধ বাধিয়ে দিয়ে অকারণ বেদনার সৃষ্টি করে।' এ কথার সঙ্গে তাঁর অপ্রয়োজনের আনন্দের তত্ত্বের যে বিরোধ তা একান্তই আপাতবিরোধ। বেদনা এবং আনন্দ এখানে শেষপর্যন্ত সমার্থক। তাঁর মতে দুই-ই ব্যক্তিকে বাইরে থেকে আরোপিত নানা বন্ধন থেকে মুক্তি দেয়— তার অশেষত্বের ঠিকানা বলে দেয়। এইজন্যই সে 'দুখজাগানিয়া'। 'সমাজনাশকতা' শব্দের মধ্যেও কোনো নিহিলিজ্‌ম্‌ লুকিয়ে নেই। ভেঙে-পড়া গ্রামসমাজের অন্ধ পল্বলমন্থন ও আমাদের তৎকালীন অর্ধগঠিত নাগরিক সমাজের অসম্পূর্ণ আত্মচর্চা যেখানে ব্যক্তির আত্মোপলব্ধির পথে বাধা, সেই বাধাকে ধ্বংস করা দরকার এটা রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন। কিন্তু তার কোনো প্রত্যক্ষ কর্মপন্থার তিনি খোঁজ পান নি। এটাই তাঁর প্রধান সংকট। অথচ পূর্বপুরুষদের যে রক্ত তাঁর শিরায় বইছে সেই রক্তের নির্দেশে তাঁর স্বাবলম্বী মুক্তিসাধনা 'নিষ্ফল সংগ্রাম' জেনেও তাঁকে সুস্থির থাকতে দেয় নি। শিল্পকেই তিনি অন্বিষ্ট বলে জেনেছেন— ব্যক্তিক মুক্তির এই মাত্রাটাই তাঁর কাছে বরণীয় বলে প্রতিভাত হয়েছে। ফলটা তাঁর শিল্পের পক্ষে ভালো এবং মন্দ দুই হল।

প্রথমেই লক্ষ করি তাঁর উপন্যাসের নায়কদের। এরা সকলেই রবীন্দ্রনাথের নিজের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের আদলে কল্পিত। এরা বড়োমাপের চিন্তার মানুষ। আচারে আচরণে, বাচনে, ভাবনায় এমন-কি পোশাকে পরিচ্ছদে (গোরা ও অমিত স্মরণীয়) এরা সকলেই অনন্যসাধারণ। নিরঙ্কুশ নাগরিকতায়— এমন-কি গ্রামীণ জমিদার নিখিলেশ-চরিত্রেও— এরা এদের স্রষ্টার মতোই সমুজ্জ্বল। সেটাও তাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে আরো প্রখরতা দিয়েছে। নারী অথবা পুরুষ— রবীন্দ্রোপন্যাসের প্রধান প্রোটাগনিস্টরা ব্যক্তিত্বের যে স্বোপার্জিত সংজ্ঞার্থকে রক্ষার জন্য, অথবা অর্জনের জন্য চঞ্চল তাও তাদের স্রষ্টার জীবনবোধেরই দান। কিন্তু এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যচর্চার একটা সংকটও আছে। একাকীত্বের বীর্যে প্রবল ব্যক্তি যেমন শান্তিনিকেতনের মতো একটা আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে পারেন কিন্তু ব্যাপক বাস্তবতার পরিবর্তনসাধন করতে পারেন না— রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের প্রধান পাত্রদের সংকটও সেখানেই। স্রষ্টারই হোক আর সৃষ্ট চরিত্রেরই হোক, মন্ময় স্বাধীনতাবোধে ও তার শক্তিতে রিয়্যালিটির সঙ্গে লড়াই চলতে পারে, কিন্তু প্রকৃত স্বাধীনতা রিয়্যালিটিকে পরিবর্তিত করতে পারার অভিপ্রায় ও ক্ষমতার মধ্যে নিহিত। আপন ব্যক্তিজীবনেও রবীন্দ্রনাথকে তা বুঝে নিতে হয়েছে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে। স্বদেশী আন্দোলনের সেই দিনগুলিতে (১৯০৭) যখন উপাধ্যায়, অরবিন্দ এবং বিপিন পাল রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মতানৈক্য ঘোষণা করেছেন, যখন রাজনৈতিক পদ্ধতি ও উদ্দেশ্য নিয়ে রবীন্দ্রনাথকে একলা হয়ে পড়তেই হবে— তখন তাঁর দৃঢ়তা ও আত্মসমালোচনা একই সঙ্গে লক্ষণীয়। গোরা (১৯১০) যখন গ্রামসমাজের পঙ্গু অসহায়তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এ কথা ভেবেছে যে এ গ্রামসমাজ এক অচল রথ, একে ঘিরে কোনো 'ভাবুকতার ইন্দ্রজাল' সৃষ্টি করার কোনো অর্থ হয় না, তখন তা রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী সমাজকল্পনার সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে তাঁর নিজেরই অঙ্গুলিসংকেত। এ সংকটের হাত থেকে মুক্তি পেতে গেলে শুধু রিয়্যালিটিকে বুঝলেই হবে না, তাকে বদলে দেবার সংগ্রামে নামতে হবে। গোরা ও নিখিলেশ দুজনেই সেদিক থেকে ব্যর্থ। গোরার উপলব্ধি তন্নিষ্ঠ কোনো বৃহৎ কর্মকাণ্ডের সন্ধান পায় নি। নিখিলেশের সকল মহৎ অভিপ্রায় শেষপর্যন্ত সকল দিক থেকে বিচ্ছিন্ন এক সিংহের নৈঃসঙ্গ্যে রূপান্তরিত। কিন্তু একটা বিষয় এইসঙ্গেই চোখে পড়ে। নিখিলেশের পর রবীন্দ্রোপন্যাসে আর ঐ মাপের নায়ক নেই। স্বাতন্ত্র্যের সংকট আছে একদিক থেকে অমিতে অন্য দিক থেকে অতীনে— কিন্তু স্বাতন্ত্র্যের সম্পদ যে মধ্যবিত্ত

নায়ক-কল্পনায় আর স্বয়ংপ্রভ হয়ে উঠবে না, তা যেন বোঝা যাচ্ছিল। এরা কেউ সার্বিক বাস্তবতার পরিবর্তনের দায় নিয়ে যন্ত্রণাচঞ্চল ছিল না। এরা একান্তভাবেই আত্মকেন্দ্রিক ভাবনাবৃত্তে বন্দী— এটাই সংকট। এদের শ্রেণীর সংকট।

মধ্যবিত্ত নায়কদের এই সংকটের সামনে রবীন্দ্রনাথ কিন্তু স্তব্ধ হয়ে যান নি। 'অচলায়তন' (১৯১২), 'মুক্তধারা' (১৯২২-২৩), 'রক্তকরবী' (১৯২৬), 'কালের যাত্রা' (১৯৩২) নাটকে পরপর তিনি এমন কয়েকটি চরিত্রকল্পনা করেছেন যারা মধ্যবিত্তসুলভ বিচ্ছিন্নতার যন্ত্রণাকে স্বীকৃতি দিল না। দাদাঠাকুর, ধনঞ্জয়, বিশু প্রভৃতি চরিত্রপাত্রেরা উদ্ভূত হয়েছে সরাসরি জনজীবন থেকে। নাটকীয় সাংকেতিকতার মধ্যেও এ ব্যাপারটি সব থেকে বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। যে জনতার তারা আত্মীয় সে জনতা শ্রমজীবী মানুষ। কোনো অনন্বয়ের দ্বারা তারা মানসিকভাবে বিপন্ন নয়। তাদের নেতা— দাদাঠাকুর বা ধনঞ্জয় এককভাবে বাস্তবতা পরিবর্তনের সাধক নয়। ফলে, বিচ্ছিন্নের নিষ্ফলতা তাদের পীড়িত করে নি। তারা তাদের সঙ্গীদের নিয়েই একটা সঠিক কার্যক্রম গ্রহণ করে— জনতাকে লড়াইয়ের কৌশলে দুরন্ত করে তোলে— যেমন, ধনঞ্জয়। 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে'— এ কথা তাদের কারো কথা নয়। একলা চলার সাধনা তাদের নয়— তারা চেয়েছে সকলকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে যেতে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করি, 'একলা চলো' গানটি 'একা' নামে প্রথম প্রকাশিত হয় 'ভাণ্ডার' পত্রিকায় ১৩১২ বঙ্গাব্দে। "স্বদেশীসমাজ" বক্তৃতার পরে গানটি লেখা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য রাজনৈতিক চরমবাদীদের কাছে গৃহীত হবে না এ কথা রবীন্দ্রনাথের না বোঝার কথা নয়। আসলে গানটি তাঁর নিজের ব্রতচারী একাকীত্বের উদ্দেশ্যেই রচিত অভিসংগীত। প্যারাডক্স্ এই যে, গানটি পরে গান্ধিজী ব্যবহার করেছেন, অগ্নিযুগের কর্মীরাও ব্যবহার করেছেন— যে যাঁর নিজের অর্থে। কিন্তু তার সঙ্গে রচয়িতার নিজ জীবনে অনুভূত মূল অর্থটির কখনো ভেদ ঘটে নি। 'একা' এই নামটির মধ্যে রয়েছে একাকীত্বের সেই বীর্য যা প্রত্যেক আদর্শবাদীর সম্পদ। কিন্তু সেই একাকীত্বের সংকটও তো উপেক্ষণীয় নয়। তারই পরিচয় পাওয়া গেল নিখিলেশে। পরিশেষে অতীনে। কিন্তু ধনঞ্জয়, দাদাঠাকুর বা বিশু এমন-কি নন্দিনী বা 'রথের রশি' নাটকের মূল চরিত্ররা তাদের স্বাধীনতাবোধকে সকল মানুষের ছন্দোময় বিকাশের সাধনায় কাজে লাগাতে চেয়েছে। জনতাকে সমষ্টিগত স্থূলতার কলঙ্ক থেকে মুক্ত করে তাদেরও স্বতন্ত্র ব্যক্তি হিসাবে সফল হবার পথ দেখিয়েছে। ধনঞ্জয়ের ভূমিকা স্মরণীয়। তারা কেউ সংকটের অধীন হয় নি।

হয় নি বটে, কিন্তু স্বাতন্ত্র্যের এই সম্পদের মধ্যেই শিল্পী রবীন্দ্রনাথ একটা সংকটের মধ্যে গিয়ে পড়েছেন। বিংশ শতাব্দের ভারতবর্ষীয় তৃতীয় দশকে ভারতীয় পটপরিবেশ যে-মাত্রায় গিয়ে পৌচেছিল আর রবীন্দ্রনাথের তৎকালীন আধুনিকতা যে-মাত্রাকে স্পর্শ করেছে তার মধ্যে পার্থক্যটা শুধু মাত্রাগতই নয়, গুণগতও বটে। তখনকার ভারতীয় নেতৃত্বের সঙ্গে তাঁর মতান্তর, রাজনৈতিক আন্দোলনের পদ্ধতি সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব, সাহিত্যসমালোচনায় সাহিত্যাতিরিক্ত বিষয়ের ক্রমবর্ধমান প্রভাব, শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে তাঁর একাকীত্ব, অথচ দেশের বাইরে দেখে এসেছেন বিশাল বিশ্বে আধুনিকতার নব নব বিকাশ— এ সব-কিছুই তাঁর নৈঃসঙ্গ্যকে বাড়িয়ে তুলছিল। তিনি যে ক্রমশই প্রতীক নাট্যের দিকে ঝুঁকছেন, নৃত্যনাট্যের ফর্মকে উজ্জ্বল করে তুলছেন এর শক্তি ও সার্থকতা সত্ত্বেও একটা কথা স্বীকার করতেই হয়— প্রত্যক্ষ ও একেবারে অব্যবহিত সম্মুখবর্তী জীবন থেকে তিনি কোনো উপাদান গ্রহণ করতে পারছেন না। পারলেও তা সার্থক হচ্ছে না। তার প্রমাণ 'চার অধ্যায়'। এটা রবীন্দ্রনাথের ট্র্যাজেডিও বটে, ভারতীয় মুক্তি আন্দোলনের ট্র্যাজেডিও বটে। এ অবস্থায় তাঁর 'একান্ত প্রয়োজন হয়েছিল এমন নিভৃতির, এমন কোনো গোপন ভাষার যেখানে নিজের নিরুদ্ধ অস্তিত্বকে মেলে দেওয়া যায়, যেখানে বাণীবিতরণের অথবা স্বনির্মিত মুখোশ পরার দায় নেই, যেখানে প্রকাশ স্বয়ংসিদ্ধ এবং ব্যাখ্যাতীত'।[৭]

এ কথা শ্রীশিবনারায়ণ রায় রবীন্দ্রনাথের ছবির জগৎ সম্বন্ধে ঠিকই বলেছেন। কিন্তু মনে হয় এ কথাটি তাঁর শেষ দিকের গানের প্রসঙ্গেও সমান প্রযোজ্য। তাঁর গানের জগৎও তাঁর ছবির জগতের মতো এমনই আত্মমোচনের একান্ত জগৎ। এ নিভৃতির দরকার ছিল তাঁর আত্মরক্ষার জন্য নয়। এ নয় তাঁর পলায়নের জগৎ। তিনি নিজে তা বললেও[৮] আমরা তা মানতে পারি না। এ দুই-ই তাঁর আত্মবিস্তারের বিচিত্র শেষ অধ্যায়। সংকটাপন্ন সে অধ্যায় বটে— কেননা তাঁর

শেষ দশকের সর্ব্বৈব জটিলতা সে অধ্যায়কে নানা দিক থেকে বাঁধতে চেয়েছে। এমন অনেককিছু ঘটছিল যার সবটাই তাকে নিক্ষেপ করতে চাইছিল একটা মনোমন্থের মধ্যে— কিন্তু সংকটকে স্বীকার করা রবীন্দ্রনাথের স্বভাব নয়। জীবনের প্রান্তিক আলোয় তিনি এঁকেছিলেন প্রায় ষোলোশো ছবি। গোধূলির পত্রমর্মরে তিনি রচেছিলেন প্রায় সাতশো গান। ছবি আর গানের প্রেরণায় মৌল প্রভেদ— তাদের লক্ষ্যে আর উপাদানেও পার্থক্য স্বতঃস্বীকার্য। প্রশ্ন এই সে গহনে কি প্রত্যক্ষের ঋজু প্রতিফলন তিনি চান নি ? তবু একদিকে সেই রেখা-রঙ, আর-এক দিকে কথা-সুরকে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ এক নিরভিপ্রায় গহন অনুভূতিকে মূর্তি দিতে চাইলেন। সে প্রত্যক্ষতার অভাবেই তখন বাক্যে গড়া 'চার অধ্যায়' (১৯৩৪) অস্থির, 'বাঁশরি' (১৯৩৩) পাংশু, 'নামঞ্জুর গল্প' (১৩৩২ বঙ্গাব্দ), 'সংস্কার' (১৩৩৫ বঙ্গাব্দ) প্রভৃতি গল্পগুলি ম্লান। সেই প্রত্যক্ষের জল ঝড় রৌদ্রকে ধারণ করার জন্য তাঁর এই কনিষ্ঠা কতটা কার্যক্ষম তা তিনি নিজেও জানতে চাইবেন না ? এ কথা ঠিক, আমাদের প্রত্যাশা সত্ত্বেও তিনি পিকাসোর মতো 'গের্নিকা' আঁকেন নি। এ কথা ঠিক তাঁর পিছনে ছিল জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনা। সামনেই ছিল দেউলী বন্দীশিবিরের ঘটনা। একটু আশ্চর্যই বোধ করি এ দুটো ঘটনার কোনোটাই না স্পর্শ করল তাঁর জ্যেষ্ঠা মানসকন্যা গানকে— না তাঁর কনিষ্ঠাকে— ছবিকে। অথচ বাক্যের সৃষ্টির উপর তাঁর বিমুখতা এসেছিল, যেমন তিনি অমিয় চক্রবর্তীকে বলেছিলেন,* সে কথাই কি সবটা মেনে নিতে পারি ? তিন মাস পরেই ১৯৩৯-এর ২৫ মে মংপুতে তিনিই বলছেন— 'সংগীতকলা বলো, চিত্রকলা বলো, মূর্তিকলা বলো, একান্ত স্বাতন্ত্র্যে আপন অবিমিশ্র বিশুদ্ধতা প্রকাশ করতেও পারে স্বীকার করি। সংগীতে যেমন যন্ত্রবাদন আলাপ বা আধুনিক কালে যেমন বিষয়নিরপেক্ষ ছবি বা মূর্তি। কিন্তু আদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত অধিকাংশ স্থলে ভাষায় প্রকাশযোগ্য বিষয়ের সঙ্গে যোগরক্ষা করেই তারা আপন গৌরব রক্ষা করেছে।'[১০]

তাঁর ছবির যে জগৎ তিনি সৃষ্টি করলেন সে জগৎ তাঁর সম্পূর্ণতা নির্মাণে কত বড়ো সম্পদ জোগাল তা আমরা একটু পরে দেখব। আপাতত, এ কথাটি বলতেই হবে, রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা তাঁর সৃজনী পর্যায়ের মূল অন্বেষার বাইরের ব্যাপার নয়। তিনি সারাজীবন খুঁজে চলেছেন সমগ্রকে। তিনি বার বার আনুরূপ্যের বাইরে চলে যেতে চেয়েছেন। এজন্যই নাটক লিখতে লিখতে তিনি রূপক সাংকেতিকের পালা চুকিয়ে রচনা করেন নৃত্যনাট্য। গল্প লিখতে লিখতে গল্পের ভারমুক্ত 'লিপিকা' তাঁর হাত থেকে বেরোয়। প্রত্যেকটি সাধনা স্বাতন্ত্র্য পেয়েছে, পেয়েছে ব্যক্তিমাত্রিকতা, তা রূপের সাধনা বলেই। চিত্রকলাও তাই। প্রায় দু হাজার ছবি কারো খেয়ালী নিরীক্ষা হতে পারে না। সাহিত্য ও সংগীতের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার বলে ছন্দ ও রূপের প্রয়োগে নিশ্চিত কবি রেখা ও রঙের দুঃসাহসে মেতেছেন শিল্পীলীলার টানে নয়— কঠিন সত্যের নির্মোহ দিগন্ত খুলে ফেলবেন বলে। বিষ্ণু দে ঠিকই বলেছেন[১১]— 'এ এক নির্ভীক বিশ্ব, এক প্রবল ব্যক্তিস্বরূপের নিবিড় ঐশ্বর্যে বিস্ময়কর ও বিস্মিত জগৎ।' এর আধুনিকতায় মূল মাত্রা রচিত হয়েছে বিংশ শতাব্দের চতুর্থ দশকের অন্তর্লীন জটিলতা সম্বন্ধীয় প্রাতিস্বিক চেতনায়। অঙ্কিত প্রতিকৃতিগুলি তার প্রমাণ। তাঁর আঁকা নারীরা— নারী, কিন্তু রমণী নয়। আত্মজিজ্ঞাসায় তারা ধীর। গতিবেগকে তারা বেঁধে রেখেছে আত্মস্থতার পাথুরে তটে। ভিতরে কোন্ রহস্য আছে, আমার কাছে তা দুর্ব্যাখ্যেয়। কিন্তু তারা বোধ হয় তার ঠিকানার আভাস পেয়েছে।

কিন্তু তা হলেও 'বাক্যের সৃষ্টি'-র এতদিনের পরম্পরা তো নেপথ্যে অপসারিত হতে পারে না। 'ভাষায় প্রকাশযোগ্য' বিষয়ের সঙ্গে যোগরক্ষার দুরূহ দায়িত্ব তাঁকে পালন করতেই হবে। এমন একটা রূপমাধ্যম আয়ত্ত করতে হবে যাতে কিছুই বর্জনীয় হবে না। সংযোগে সম্বন্ধে অন্বয়ে তারা সকলে মিলে হবে অবিশ্লেষ্য স্বতন্ত্র শিল্পকৃতি। রূপের সাধনা মানেই স্বতন্ত্র হবার সাধনা। স্বাতন্ত্র্যের সেই সাধনা ও তাঁর আত্মমোচনের সাধনায় তিনি সমগ্রকে ধরতে চেয়ে এগিয়ে গেছেন বারে বারে। তখনই দেখা দিয়েছে তাঁর স্বাতন্ত্র্যের সংকট। কিন্তু তিনি বারে বারেই সেই সংকটকে সম্পদে রূপান্তরিত করেছেন। আয়ুপ্রান্তিক কবি সে কাজটা আবার করলেন তাঁর নৃত্যনাট্যে। যে সাধনার চূড়ান্ত রূপময় অভিব্যক্তি 'চণ্ডালিকা' (১৯৩৯)। সেই পুরাতন ভারতীয় বাস্তব সমস্যা জল-চল-অচলের প্রশ্ন— 'গোরা' (১৯১০) উপন্যাসে যা ব্যবহার করেছিলেন, তাকে আবার তুলে নিলেন। প্রশ্নটিকে হরিজন সমস্যার পটভূমিতে আরো মানবিক করে তুললেন। ছবি ও

গানের দুই বাহুর সঙ্গে তিনি যুক্ত করলেন পরিণত নাট্যবুদ্ধি ও কবিজীবনের উপান্তে লব্ধ মুক্ত কবিতা। এমন ব্যাপারের আয়োজন যে তাঁর শৈল্পিক সম্বিতে সহসা ঘটে নি ১৪· ২· ৩৯-এ অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা চিঠিটি তার প্রমাণ। 'রেখানাট্যের নটী' 'রেখারূপের জাদুনর্তকী' 'পর্দা সরিয়ে বেরিয়ে এসেছে'— চিত্রকলা সম্বন্ধে তাঁর এ-সব উক্তি সেই বিচিত্র অন্বয়ের ইতিহাসের দিকে ইঙ্গিত করছে। কয়েকদিন আগেই অভিনীত হয়েছে 'চণ্ডালিকা'। তাঁর মনোগহনে সবই তখন একাকার। এখানেই আবার তাঁর মুক্তি। তখন আর অর্ধনিরুদ্ধ অবচেতন শুধু রেখার বন্ধনে স্থির থাকল না। তা হয়ে উঠল গতিময়, বাঙ্ময়। 'জীবধর্মের আদিমতা'কে সে অস্বীকার করল না। তাকে ছাপিয়ে উঠল আত্মিক প্রাণময়তা।

তিনটি নৃত্যনাট্যে নারীর জীবনের তিনটি সন্ধিসংকট ধ্বনিতে ও রেখায় ফুটে উঠেছে। 'চিত্রাঙ্গদা'-য় নারীর দেহ এবং ব্যক্তিত্বের সম্পর্ক ও দ্বন্দ্ব, 'চণ্ডালিকা'-য় নারীর জগতের সঙ্গে সম্পৃক্ত হবার বাসনা এবং 'শ্যামা'-য় প্রৌঢ়যৌবনা নারীর জগৎকে উপেক্ষা করার যন্ত্রণা— তিনবারই নারীকে প্রেমের রাজপথে নামিয়ে এই পরীক্ষাগুলির মধ্যে ফেলা হয়েছে। তিনবারই প্রাধান্য পেয়েছে নারীর কামনাকল্পিত অহং। সন্দেহ হয় সমকালীন ফ্রয়েডীয় মনোবিকলনের আতিশয্যের বিরুদ্ধে কথা বলতে বলতে কবি নিজেও কিছুটা এই মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের চাপকে মেনে ফেলেছিলেন। মনস্তত্ত্বের অঙ্গারকে আবার কোন্ চাপে হীরকে রূপান্তরিত করতে হয় তাও তাঁর জানা ছিল। 'চণ্ডালিকা' তার বড়ো প্রমাণ।

শিল্পকে মুক্ত করতে হবে বস্তুর বন্ধন থেকে— এইজাতীয় এক মনোভাবই সক্রিয় ছিল তাঁর ছবির মূলে, তাঁর গানেরও পিছনে। অথচ এও তিনি অভিজ্ঞতাবশতই জেনেছিলেন যে, বস্তু থেকে উধাও হয়ে গেলে শিল্পের অকৃত্রিমতা ও নিবিড়তা নষ্ট হয়ে যায়। তাঁর সাক্ষ্যই গ্রহণ করা যাক, 'গানে আমি রচনা করেছি শ্যামা, রচনা করেছি চণ্ডালিকা। তার বিষয়টা বিশুদ্ধ স্বপ্নবস্তু নয়। তীব্র তার সুখদুঃখ তার ভালোমন্দ। তার বাস্তবতা অকৃত্রিম এবং নিবিড়। কিন্তু এগুলোকে পুলিস-কেসের রিপোর্টরূপে বানানো হয় নি— গানে তার বাধা দিয়েছে— তার চার দিকে যে দূরত্ব বিস্তার করেছে তাকে পার হয়ে পৌঁছতে পারেনি যা-কিছু অবান্তর যা অসংলগ্ন, যা অনাহূত আকস্মিক।'

'চণ্ডালিকা'-কে নৃত্যনাট্যে রূপায়িত করার প্রসঙ্গটি অমিয় চক্রবর্তীর কাছে ব্যাখ্যার কালে রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন, 'আছি আমি অজন্তা গুহায়' তখন সেই রেখার জগতের প্রেরণাই যে তাঁর শৈল্পিক চেতনায় সক্রিয় ছিল তা বোঝা যায়। 'চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্য' শীর্ষক আলোচনায় প্রতিমা দেবী বিষয়টিকে ব্যাখ্যায় স্পষ্ট করেছেন— 'নৃত্যনাট্যে কলাকৌশল কথার ভাষা নিয়ে কারবার করে না তার ভাষা হল সুর ও তাল ; ভাব খেলে যায় তার দেহরেখায়। এই রেখায় খেলামাত্রেই ছবির বিষয় এসে পড়ে তাই তার জন্য পটভূমির দরকার হয় রঙ ও আলো।'[১২] 'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্যনাট্য রচিত হয়েছে যখন, তখন রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলার অভিজ্ঞতা প্রায় পূর্ণ। তাই এ নৃত্যনাট্যেও ছবির ছাপের কথা কেউ ভুলতে পারেন না। 'একাধিক অভিজ্ঞ ব্যক্তি চিত্রাঙ্গদা অভিনয়কে একটা চলন্ত ছবির সঙ্গে তুলনা করেছেন'[১৩] রসিক প্রবক্তার এই উক্তি উপভোগীমাত্রেরই মান্য।

এ কী দেখি!
এ কে এল মোর দেহে
পূর্ব-ইতিহাস-হারা।
আমি কোন্ গত জনমের স্বপ্ন,
বিশ্বের অপরিচিত আমি।

চিত্রাঙ্গদার নব রূপোপলব্ধি যেন কতকাংশে কবির চিত্রীসত্তারই আত্মোপলব্ধির প্রতিধ্বনি। চিত্রাঙ্গদার কঠিন পুরুষৌচিত্যকে নবীন নারীত্বের ছন্দবন্ধনে মিলিয়ে দিয়ে রেখার যে সচল ভঙ্গিমা কবি সৃষ্টি করেন তার সঙ্গে আত্মীয়তা আছে মুক্তিপ্রয়াসী রবীন্দ্রনাথের চিত্রসাধনার।

হেন বঙ্কিম ভুরুযুগ নাহি তার,
হেন উজ্জ্বল কজ্জল-আঁখিতারা।

সন্ধিতে পারে লক্ষ্য
কীণাঙ্কিত তার বাহু,
বিঁধিতে পারে না বীরবক্ষ
কুটিল কটাক্ষশরে।

এই ভাবপ্রতিমা কল্পনা তো তাঁর ছবিরই ছবি। যে চিত্রাঙ্গদা 'উদ্যত বজ্রের রুদ্ররসে' আঁকা সে অবনীন্দ্রনাথের আঁকা চিত্রাঙ্গদা নয়। সে কারণেই আজও নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদার নায়িকা যদি শুধু নারী-পেলবতার অধিকারিণী হন, তা হলে সমালোচনার ঝড় ওঠে— কোথায় গেল সে পুরুষ-পেলবতার মেশামেশি— সেই অপরূপ pictorial element? আবার 'চণ্ডালিকা' নৃত্যনাট্যে আনন্দের ছায়া-অভিনয়ের প্রাক্‌কালে প্রকৃতির বর্ণনামাধ্যমে যে মূর্তি ফুটে ওঠে সেও তো জমিয়ে তোলা রবীন্দ্র-চিত্রকলার সঙ্গে তুলনীয়। শ্যামার তাপদহন-লাঞ্ছিত মূর্তিতেও এক কঠিন সত্যচেতনা— যা তাঁর ছবিরই প্রসঙ্গ। ততদিনে সময় হয়ে এসেছে— ততদিনে, যবনিকা কম্পমান।

টীকা

১ Rachel. van M. Baumer -সম্পাদিত *Aspects of Bengali History and Society* (1976) গ্রন্থে John N Gray-র "Bengal and Britain" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।
২ "বসুন্ধরা", 'সোনার তরী' (১৮৯৪)।
৩ "রবীন্দ্রনাথ ও শিল্পসাহিত্যে আধুনিকতা," সাহিত্য পত্র (১৩৭২)।
৪ "সুপ্রভাত" (১৩১৪)।
৫ সুমিত সরকার, *Swadeshi Movement in Bengal—1903-1908,* (1973).
৬ 'ধর্ম', রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৩ (বিশ্বভারতী সংস্করণ)।
৭ শিবনারায়ণ রায়, "পটুয়া রবি ঠাকুর ও চিত্রবিপ্লব", দেশ ১০ মে, ১৯৮৬ দ্রষ্টব্য।
৮ চিঠিপত্র ১১, পৃ· ২৩৩।
৯ তদেব, ২· ২· ৩৯· তারিখের পত্র।
১০ 'সংগীত', রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১৪ (জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার), পৃ· ৯১৮।
১১ "চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথ", গোপাল হালদার -সম্পাদিত 'রবীন্দ্রনাথ' (১৩৬৮)।
১২ প্রতিমা দেবী, 'নৃত্য' (১৯৬৫)।
১৩ ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, "নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা", 'কথা ও সুর'।

'যুগলের নিঃসঙ্গতা'

অশ্রুকুমার সিকদার

শিল্পবিপ্লব সভ্যতার ইতিহাসে মৌলিক পরিবর্তন ঘটিয়েছে। যে-কৃৎকৌশলের দৌলতে মানুষ তার পরিবেশের রূপান্তর ঘটিয়েছে, সেই কৃৎকৌশলই আজ মানুষের পরিবেশকে টেনে এনেছে ধ্বংসের মুখে। আধুনিক শিল্পোন্নত সমাজগুলিতে মানুষ প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। যে জটিল সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি মানুষ গড়ে তুলেছিল মানুষেরই প্রয়োজনে, সেই-সব সামাজিক প্রতিষ্ঠানই হয়ে দাঁড়িয়েছে তার আত্মবিকাশের পথে বাধা। ম্যাক্স হেবরের সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে, কাফ্‌কার উপন্যাসে আমলাতন্ত্রের ব্যক্তিত্ববিনাশী যান্ত্রিকতাকে দেখানো হয়েছে, যখন 'human beings reduced to apparatus'।[১] শিল্পবিপ্লবের ফলে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থা কায়েম হওয়ার ফলে, মানুষ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে তার শ্রম থেকে, তার বিশ্রাম থেকে, নিজের গোষ্ঠী থেকে, এমন-কি শেষ পর্যন্ত নিজের প্রাতিস্বিক সত্তা থেকে, তার প্রেম আর অনুরাগের অনুভূতি থেকে। যন্ত্রকে নিজের সেবায় ব্যবহার করতে গিয়ে মানুষ হয়ে উঠেছে যন্ত্রের দাস, মানুষের জীবন হয়ে উঠেছে যান্ত্রিক। আধুনিক সভ্যতার এই যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য চমৎকারভাবে দেখিয়ে বলা হয়েছে, "The first characteristic of modern machine civilization is its temporal regularity. From the moment of waking, the rhythm of the day is punctuated by the clock."[২] রেনেসাঁসের সময় সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা ভেঙে পড়ার ফলে ঐতিহাসিকভাবে ঘটেছিল ব্যক্তির জাগরণ; ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের মধ্যেই নিহিত ছিল মানুষের উত্তরকালীন নিঃসঙ্গতার বীজ। পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায়, "Modern society consists of atoms (if we use the Greek equivalent of "individual"), little particles estranged from each other but held together by selfish interests and by the necessity to make use of each other."[৩] ভেঙে পড়েছে গোষ্ঠীগত সংগঠন; ভেঙে পড়েছে একান্নবর্তী বর্ধিত পরিবারের আত্মীয়বন্ধনের নিশ্চিন্ত নিরাপদ আশ্রয়।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থার দৌলতে নিজের শ্রম থেকে বিচ্ছিন্ন মানুষ ক্রমেই নিজের আত্মিক সত্তা থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।[৪] ব্যক্তিগত সম্পর্কগুলিও হয়ে দাঁড়ায় যেন পণ্যদ্রব্যের বিকল্প। অর্থনৈতিক দেনা-পাওনার সম্পর্কটাই এই ব্যবস্থায় সার্বভৌম হয়ে দাঁড়ানোয়, 'সকলেই আড়চোখে সকলকে দেখে।'[৫] জনসংখ্যা বাড়ছে; অতিকায় নগরগুলি যেন জনসংখ্যার চাপে বিস্ফোরণের মুখে দাঁড়িয়ে। ভিড় আর নিঃসঙ্গতা হয়ে উঠেছে সমার্থক। এই গড্ডলপ্রবাহের বিচ্ছিন্নতাবোধ ও নির্বেদকে চমৎকারভাবে বর্ণনা করেছেন কির্কেগার্ড, "Adam was bored alone, then Adam and Eve were bored together; then Adam and Eve and Cain and Abel were bored *en famille*, then the population of the world increased, and the people were bored *en masse*."[৬] নিঃসঙ্গতা আর নির্বেদ মানুষের সহজাত, কিন্তু যতই ভিড় বাড়ছে, মানুষের সংগঠনগুলি অতিকায় চেহারা নিচ্ছে ততই নির্বেদ আর নিঃসঙ্গতা হচ্ছে মানুষের সব সময়ের সঙ্গী— 'আমি চলি, সাথে-সাথে সেও চলে আসে।'[৭] মানুষের জীবন এখন দূরতম নিরাসক্ত ব্যক্তিত্ববর্জিত সংগঠন-সমিতিগুলির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আমাদের বিশ্রামও যথার্থ সৃজনশীল বিশ্রাম নয়। যন্ত্রের কৃপায় অবসর বেড়েছে আমাদের, কিন্তু অবসরভোগের মানসিকতা অর্জন করি নি আমরা। তাই আমরা অবসর-যাপন করি শূন্য মনে, অথবা বিবিধ নিরর্থ উত্তেজনায়। উৎকণ্ঠা আর হতাশা আমাদের আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। আধুনিক মানুষ শিকড়হীন, সংযোগহীন,

একলা। বিচ্ছিন্নতা আর নিরর্থকতাবোধে পীড়িত এই মানুষ আস্থা হারিয়ে ফেলেছে প্রত্যয়ে আর প্রমূল্যে। অপরিসীম শূন্যতাবোধের শিকার এই মানুষ যেন পঙ্গু,— যেন, ডস্টয়েভস্কির ভাষায়, 'মৃতজাত'।[৮] এই অন্তর্লীন নেতির সঙ্গে সামাজিক চাপ আর সংকট মানুষকে আত্মহত্যার পথে নিয়ে যায়। "Suicide has permeated Western culture like a dye that cannot be washed out."[৯] তাই আধুনিক সাহিত্যের ইতিহাসে এত বার বার আত্মহননের কথা পাই আমরা। এইভাবে দেখা যায় যেন এক প্রগাঢ় বিচ্ছিন্নতাবোধের কর্কটরোগে সমস্ত আধুনিক সমাজ আক্রান্ত হয়ে পড়েছে। "Alienation as we find it in modern society is almost total : it pervades the relationship of man to his work, to the things he consumes, to the state, to his fellow men, and to himself."[১০] আমরা যেন এক নজিরহীন অনস্তিত্বের খাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি, ফলে মানুষ এখন "shrinks back in alarm from the void he has made for himself."[১১]

মানুষ এখন এক বিরতিহীন নেতির মধ্যে বিচরণশীল। এই পরিস্থিতির অপ্রতিরোধ্য পরিণাম হিসেবে গত এক শতাব্দীর ইউরোপীয় সাহিত্যে আমরা গণনাতীত বার নিঃসঙ্গতা ও একাকীত্ব এবং বিচ্ছিন্নতাবোধের চেতনার সঙ্গে মুখোমুখি হই— ইয়েটস রিলকে পাউন্ড এলিয়টের কাব্যে, ডস্টয়েভস্কি কাফ্‌কা মান্‌ জিদ্‌ সার্ত্রে কাম্যু হেমিংওয়ের উপন্যাসে, বেকেট আওনেস্কোর নাটকে। শেষহীন এই তালিকা। মানুষের এই অসহায় একাকীত্বের চিত্রণ বাদ দিয়ে যেন আধুনিক সাহিত্য হতেই পারে না। আধুনিক সাহিত্যের চরিত্রগুলি 'strained, time-ridden faces'[১২] নিয়ে স্বপ্নের মধ্যেও যেন আমাদের মনের দিগন্তে হানা দেয়। নষ্ট হয়ে যাওয়া মানুষের সম্পর্কগুলি, মানুষের সম্পর্কহীনতার হাহাকার বারেবারে আমাদের সামনে উপস্থিত হয়। মানুষের মুখ দেখে, মানুষীর মুখ দেখে, শিশুদের মুখ দেখে যারা আহ্লাদ পায় না, সেই-সব একা আলাদা মানুষের জীবনের জটিলতা আধুনিক সাহিত্যের একটা বড়ো জায়গা জুড়ে আছে। নরনারীর মিলন যখন পরিপূর্ণ 'সে মুহূর্ত বাঁশির গানের মতো',[১৩] কিন্তু যেখানে দাম্পত্যবন্ধনে 'Nothing with nothing'[১৪]-কে যুক্ত করা হয়, তখন সে এক দুঃসহ দুর্বহ বোঝা। রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্যে সেই দাম্পত্য-একাকীত্বের চেহারা সর্বাংশে আধুনিক বিচ্ছিন্নতাবোধের সঙ্গে মেলে না বটে, কিন্তু দাম্পত্য-পঙ্গুতার সেই রূপায়ণের মধ্যে নিঃসঙ্গতাবোধের আধুনিক রুগ্‌ণতার জায়মান বীজটিকে যেন আমরা পেয়ে যাই।

'বীথিকা' কাব্যের "দুঃখী" কবিতায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, দক্ষিণপবনে নববসন্তের কুঞ্জবনে দুটি নরনারীকে কটাক্ষপাতে দেখে একাকী মানুষের মনে হয়, সে বড়ো নিঃসঙ্গ, ফলত সে বড়ো দুঃখী। তার মনে হয়, সমস্ত জগৎ যেন তার সঙ্গীহীনতাকে ধিক্‌কার দিচ্ছে। তার মনে হয়, 'ফাল্গুনের এই ছন্দ, এই গান/এই মাধুর্যের দান,/যুগে যুগান্তরে/শুধু মধুরের তরে/কমলার আশীর্বাদ করিছে সঞ্চয়,/সে তোমার নয়।' সেই একলা দুঃখী মানুষকে সান্ত্বনা দিয়ে কবি জানিয়েছেন, 'দুইজনে পাশাপাশি যবে/রহে একা, তার চেয়ে একা কিছু নাই এ ভুবনে।' যুগলের নিঃসঙ্গতার মতো দুর্বহ দারুণ নিষ্ঠুর বিচ্ছিন্নতা আর নেই। তাকে বিরহ বললে ভুল করা হবে। বিরহের শূন্যতা তো শূন্য নয়, কিন্তু যুগলের এই বিচ্ছিন্নতা পরম শূন্যতাময়। সম্পর্ক-প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই মানুষের পূর্ণতা, তাই নিঃসম্পর্কিত মানুষ খণ্ডিত। সম্পর্কহীনতা মানুষের পক্ষে শুধু বেদনার নয়, সে যেন এক অভিশাপ। দাম্পত্য-সম্পর্ক মানুষের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, কিন্তু সেই সম্পর্কের মধ্যে নানাভাবে নেমে আসে বিচ্ছিন্নতা, যোগসূত্রহীনতা। তখন নিকটতম দুটি মানুষের মধ্যে মানসিক চলাচলের সব সেতু দীর্ণ হয়ে যায়। যাদের হওয়া উচিত ছিল নিবিড়তম আত্মীয়, তারা কাছে থেকেও যখন দূরে সরে যায় তখন তাদের মধ্যে নেমে আসে যে নীরবতা, সে তো আদরণীয় মৌন নয়; নয় সেই নীরবতা, যে নীরবতায় মধু জমে ওঠে, স্মৃতিলোক উন্মথিত করে জাগরচেতনায় উঠে আসে শব্দ-চিত্র-সুর, যে শমতাময় নির্জনতায় আবেগপুঞ্জ সংহত হয়। সেই নীরবতা সৃজনশীল, কিন্তু যুগলের নিঃসঙ্গতা বন্ধ্যা।

এই বিযুক্তি, এই বি-যোগ, নরনারীর সম্পর্কহীনতা-জনিত নিঃসঙ্গ একাকীত্ব আমরা রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্যের মধ্যে বারেবারে পেয়ে যাই। দাম্পত্যসম্পর্কের মধ্যেও যে সম্পর্কহীনতার একাকীত্ব মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে,

জীবনানন্দের মাল্যবান-উৎপলার জুগুপ্সাময় জীবনে তারই পূর্বাভাস পেয়ে যাই আমরা রবীন্দ্ররচনায় যুগলের নিঃসঙ্গতার বর্ণনায়। বধূ শুয়ে থাকে পাশে, কিন্তু 'আরো-এক বিপন্ন বিস্ময়/আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে/খেলা করে ;/আমাদের ক্লান্ত করে...।'[১৫]—আমাদের একলা করে দেয়, বিচ্ছিন্ন করে দেয়। স্বামীস্ত্রীর একাকীত্ব রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্যে অনেক সময় সামাজিক-অর্থনৈতিক কারণের সূত্র ধরে আসে। ধনলিপ্সু ঈর্ষাপরায়ণ মোক্ষদাসুন্দরী নিস্পৃহ নিকর্মা স্বামী বৈদ্যনাথের খেলনা-বানানোর খেয়ালে মর্মান্তিক ক্ষিপ্ত হয়। সন্ন্যাসীকে দিয়ে সোনা বানানোর চেষ্টায় ঠকেও শিক্ষা হয় নি তার। কাশীতে এক পোড়ো বাড়ি কেনা হয় গুপ্তধনের আশায়। অনিদ্রায়, বৃথা আশায় বৈদ্যনাথের সন্তোষস্নিগ্ধ চোখে-মুখে 'মধ্যাহ্নের মরুবালুকার মতো একটা জ্বালা' প্রকাশ পেতে থাকল। ব্যর্থমনোরথ বৈদ্যনাথ বাড়ি ফিরে এলে 'রাত হইতে লাগিল কিন্তু দুজনের মুখে একটি কথা নাই। বাড়ির মধ্যে কী একটা যেন ছম্‌ছম্ করিতে লাগিল এবং মোক্ষদার ঠোঁট দুটি ক্রমশ বজ্রের মতো আঁটিয়া আসিল।' বৈদ্যনাথকে বাহিরে রেখে মোক্ষদা যখন দরজা বন্ধ করে দিল তখন 'আপন আত্মীয় হইতে আরম্ভ করিয়া অনন্ত আকাশের নক্ষত্র কেহই এই লাঞ্ছিত ভগ্ননিদ্র বৈদ্যনাথকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিল না।' আধুনিক মানুষ 'Consumption-hungry'।[১৬] পণ্যসামগ্রী, যাকে জীবনানন্দ বলেছেন 'সংকলিত জিনিসের ভিড় শুধু',[১৭] যা শুধু বেড়ে যায়, তার প্রতি প্রলোভনও বিচ্ছিন্নতাবোধের একটা কারণ। ফণিভূষণ সাহার স্ত্রী মণিমালিকা স্বামীকে ঢাকাই শাড়ি এবং বাজুবন্ধ জোগাবার যন্ত্রস্বরূপ জ্ঞান করত। স্ত্রীকে ফণিভূষণ অন্য পাঁচ জনের থেকে বিচ্ছিন্ন করে কর্মস্থলে নিজের কাছে রেখেছিল। সে জানত না, স্ত্রীকে একলা নিজের কাছে রাখলেই যে সব-সময় বেশি করে পাওয়া যায় তা নয়। গৃহস্থালিতে মণিমালিকার তৎপরতা ছিল, এবং ফলে ফণিভূষণের আরামের কোনো অভাব ছিল না। কিন্তু 'ফণিভূষণের হৃদয় কী-যেন-কী নামক একটা দুঃসাধ্য উৎপাত অনুভব করিত' এবং তার হৃদয় শূন্যই রয়ে গিয়েছিল। সুবর্ণমাণিক্যের প্রতি যে রূপগুণমুগ্ধ আকর্ষণ স্ত্রীর সঙ্গে স্বামীর ব্যবধান রচনা করেছিল, সেই অসুস্থ আকর্ষণের পরিণামেই মণিমালিকা প্রাণ হারিয়েছিল।

শারীরিক পঙ্গুতাও রচনা করে দুরতিক্রম্য ব্যবধান। ডাক্তার স্বামী অবিনাশের চিকিৎসার দোষে 'দৃষ্টিদান'-এর নায়িকা অন্ধ। স্ত্রী স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহ দিতে চাইলে অবিনাশ কঠিন শপথবাক্য উচ্চারণ করে। তার স্বামী 'ললাটে একটি নির্মল চুম্বন করিলেন ; সেই চুম্বনের দ্বারা আমার যেন তৃতীয় নেত্র উন্মীলিত হইল, সেইক্ষণে আমার দেবীত্বে অভিষেক হইয়া গেল।' যৌনতামুক্ত নির্মল চুম্বনে দেবীত্বে যেই প্রতিষ্ঠা হল, অমনি স্ত্রীত্ব যেন তার চলে গেল। স্বামীর সঙ্গে তার যে চোখে-দেখার বিচ্ছেদ ঘটেছে সে একটা কারণ, ইতিমধ্যে এসে গেছে মানসিক বিচ্ছিন্নতা অন্য কারণেও। আর্থিক অসচ্ছলতার দিনে যে-স্বামী ছিল রোগীসেবায় একনিষ্ঠ, আর্থিক সচ্ছলতার সঙ্গে-সঙ্গে ডাক্তারি যখন তার কাছে ব্যাবসা হয়ে ওঠে তখন অবিনাশের স্ত্রীর মুখে অন্ন রোচে না। 'আমরা দুজনে যেমনভাবে জীবন আরম্ভ করিয়াছিলাম আজ তাহা পৃথক হইয়া গেছে।' দূরত্বের আর এক কারণ হয়ে দাঁড়ালো হেমাঙ্গিনী, অবিনাশের পিসিমার ভাসুরঝি। হেমাঙ্গিনী পরিস্থিতি বুঝে চলে গেলেও গোপনে-গোপনে তারই সঙ্গে অবিনাশের দ্বিতীয় বিয়ের আয়োজন হয়। স্ত্রীর কাছে ধরা পড়ে গেলে অবিনাশ জানায় তার বিয়ের কারণ, 'তোমার অন্ধতা তোমাকে এক অনন্ত আবরণে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে, সেখানে আমার প্রবেশ করিবার জো নাই।' 'দৃষ্টিদান' গল্পটি অবশ্য পরিণামরমণীয়, কিন্তু মধুর সমাপ্তি তো সব সময় ঘটে না। ঘটে নি সুভার জীবনে। চণ্ডীপুরের বাণীকণ্ঠের মেয়ে সুভা বোবা। 'এইজন্য সাধারণ বালকবালিকারা তাহাকে এক প্রকার ভয় করিত, তাহার সহিত খেলা করিত না। সে নির্জন দ্বিপ্রহরের মতো শব্দহীন এবং সঙ্গীহীন।' গৃহপালিত পশুর সেবায় আর মাছ-ধরায় উৎসাহী গোস্বামীদের নিকর্মা ছেলে প্রতাপ বাদে প্রকৃতিই তার একমাত্র সঙ্গী। 'মহাকাশের তলে কেবল একটি বোবা প্রকৃতি ও একটি বোবা মেয়ে মুখামুখি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত।' সমাজ-সমালোচনায় বিব্রত বাবা-মা তাকে বিয়ে দেবার জন্য কলকাতা নিয়ে গেল, নীরব চোখের জলের ধারায় তার আপত্তি গ্রাহ্য হল না। সে যে বোবা, এ কথা গোপন করে সুভার বিয়ে দেওয়া হল। সে প্রতারণা করে নি, তবু শাস্তি পেল সে-ই। 'সে চারি দিকে চায়— ভাবা পায় না, যাহারা বোবার ভাষা বুঝিত সেই আজন্ম পরিচিত মুখগুলি দেখিতে পায় না— বালিকার চিরনীরব হৃদয়ের মধ্যে একটা

অসীম অব্যক্ত ক্রন্দন বাজিতে লাগিল— অন্তর্যামী ছাড়া আর-কেহ তাহা শুনিতে পাইল না।' এবারে তার স্বামী চোখ-কান দিয়ে পরীক্ষা করে এক 'ভাষাবিশিষ্ট কন্যা' বিয়ে করে আনল। অবিনাশের স্ত্রী এবং সুভা শরীরে পঙ্গু, কিন্তু যারা শরীরে পঙ্গু নয়, মনের দিক থেকে তারাই পঙ্গু। ব্যক্তিগত মনস্তত্ত্বের জটিলতা ও লিজার সঙ্গে সম্পর্কের মধ্য দিয়ে ডস্টয়েভস্কির নায়কের উপলব্ধি 'We are all cripples, every one of us, more or less,'[১৮] এই-সব মানুষ সম্বন্ধে খাটে। ঝড়জলে চিতা নিবে গেলে সহমরণের চিতা থেকে উঠে এসে মহামায়া গিয়েছিল প্রণয়াসক্ত সেই রাজীবের গৃহে, যে রাজীবের ভালোবাসাকে সে এতদিন গ্রাহ্য করে নি। রাজীবকে মহামায়া প্রতিজ্ঞা করিয়েছিল সে তার ঘোমটা খুলবে না, মুখ দেখবে না। তবেই সে তার ঘরে থাকবে। মহামায়া এখন রাজীবের ঘরে, কিন্তু রাজীবের মনে সুখ নেই। 'অধিক নহে, উভয়ের মধ্যে কেবল একখানি ঘোমটার ব্যবধান। কিন্তু সেই ঘোমটাটুকু মৃত্যুর মতো চিরস্থায়ী, অথচ মৃত্যুর মতো যন্ত্রণাদায়ক।' অহরহ পাশে থেকেও মহামায়া যেন এতদূরে চলে গেছে যে রাজীব তার নাগাল পায় না। এমনি করে 'এই দুই সঙ্গীহীন একক প্রাণী কতকাল একত্র যাপন করিল।' দুজনে একসঙ্গে থেকেও দুজনেই একক। বর্ষার এক রাত্রে যেন প্রকৃতির প্ররোচনায়, রাজীব এই দুঃসহ সান্নিধ্য, যার অন্য নাম চূড়ান্ত নিঃসঙ্গতা, তা সহ্য করতে না পেরে ঘোমটা খুলে দেখেছিল চিতার আগুন মহামায়ার বামগণ্ড লেহন করে ক্ষুধার চিহ্ন রেখে গেছে। প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গে মহামায়া চলে গেল, আর মহামায়ার ক্ষমাহীন চিরবিদায়ের নীরব ক্রোধানল চিরকালের জন্য রাজীবকে দগ্ধ করে দিয়ে গেল।

বনোয়ারী আবিষ্কার করে ছোটো ভাই বংশীই শুধু হালদারগোষ্ঠীর নয়, স্ত্রী কিরণ সেও সম্পূর্ণ তার নয়, সেও হালদারগোষ্ঠীর। বংশীর পুত্রের জন্মের পর নিঃসন্তান কিরণ তাকে নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়লে, স্ত্রীর সঙ্গে বনোয়ারীর মিলনে বিস্তর ফাঁক পড়তে লাগল। সম্পত্তি নিয়ে মৃত বংশীর পুত্র হরিদাসের প্রতি ঈর্ষা, পিতার উইল নিয়ে মনঃক্ষোভ, বনোয়ারীর পরবর্তী অনুতাপ, সমস্ত পার হয়ে একদিন সে যেন অনেক দিন পরে কিরণকে দেখল, 'সেই তন্বী এখন আর তন্বী নাই, কখন মোটা হইয়াছে সে তাহা লক্ষ করে নাই। হালদারগোষ্ঠীর বড়ো বউয়ের উপযুক্ত চেহারা তাহার ভরিয়া উঠিয়াছে। আর কেন, এখন অমরুশতকের কবিতাগুলাও বনোয়ারীর অন্য সমস্ত সম্পত্তির সঙ্গে বিসর্জন দেওয়াই ভালো।' বাপের শ্রাদ্ধ পর্যন্ত অপেক্ষা না করে নিঃসঙ্গ বনোয়ারী হালদারগোষ্ঠীর বাইরে চলে যায়। কখনো-কখনো যুগলের মাঝখানে এসে যায় তৃতীয় মানুষ, রচনা করে সেতুহীন ব্যবধান। অসুস্থ হরসুন্দরী জোর করে স্বামী নিবারণের দ্বিতীয়বার বিয়ে দিয়েছিল কিশোরী শৈলবালার সঙ্গে। প্রথমে অনাদরের ভান করত নিবারণ, কিন্তু পরে শৈলর প্রতি তার তীব্র আকর্ষণ লক্ষ করে 'হঠাৎ একটি জ্বলন্ত বজ্রশলাকা দিয়া কে যেন হরসুন্দরীর চোখ খুলিয়া দিল, সেই তীব্র তাপে চোখের জল বাষ্প হইয়া শুকাইয়া গেল।' আট বছর বয়সে যে বাসরকক্ষে প্রবেশ করেছিল সাতাশ বছর পরে তা ত্যাগ করে হরসুন্দরী 'নূতন বৈধব্যশয্যায়' স্থান নিল। তার মনে হল জীবনের সফলতা থেকে যেন চিরকাল কে তাকে বঞ্চিত করে এসেছে। এই প্রবঞ্চিতা নারী দাম্পত্য-সম্পর্কের মধ্যে থেকেও স্বামীর সঙ্গে পুরোপুরি বি-যুক্ত হয়ে গেল। পরে আত্মাদরে অন্ধ শৈলবালার মৃত্যু হলে নিবারণ শোকের মধ্যেও একটি মুক্তির আনন্দ পেয়েছিল, যেন একটা দুঃসহ বোঝা নেমে গেল। দীর্ঘ দিন পর হরসুন্দরীর শয়নকক্ষে চির-অধিকারীর মতো নয়, যেন চোরের মতো নিবারণ প্রবেশ করল। 'হরসুন্দরীও একটি কথা বলিল না, নিবারণও একটি কথা বলিল না। উহারা পূর্বে যেরূপ পাশাপাশি শয়ন করিত, এখনো সেইরূপ পাশাপাশি শুইল, কিন্তু ঠিক মাঝখানে একটি মৃত বালিকা শুইয়া রহিল, তাহাকে কেহ লঙ্ঘন করিতে পারিল না।' শারীরিক সান্নিধ্য সত্ত্বেও দুরতিক্রম্য হয়ে রইল তাদের মানসিক বিচ্ছিন্নতা। দক্ষিণাচরণবাবুর রুগ্‌ণ স্ত্রীও তাকে বাধ্য করেছিল দ্বিতীয় বিবাহে। কিন্তু দ্বিতীয়া পত্নী মনোরমার সঙ্গে দক্ষিণাচরণবাবুর যথার্থ সংযোগ গড়ে উঠল না মৃত প্রথমা মধ্যবর্তিনী হয়ে থাকায়। স্বামী-স্ত্রীর নৈকট্যের প্রতিটি মুহূর্তে মনে হয় সে যেন মনোরমার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলছে, 'ও কে, ও কে, ও কে গো!'

ধনীগৃহে চারুলতার কোনো কাজ ছিল না, কোনো অভাব ছিল না, আবার চারি দিকের সঙ্গে যেন তার কোনো যোগও ছিল না। বহির্জগতের ব্যাপারে ব্যস্ত স্বামী ভূপতির সঙ্গেও চারুলতার কোনো মানসিক যোগ ছিল না। ভূপতির পিসতুতো

তাই অমলের জন্য ছোটোখাটো শখের খাটুনিতে তার হৃদয়বৃত্তির চর্চা ঈষৎ চরিতার্থ হত। বাগান তৈরির প্ল্যান এবং সাহিত্যচর্চার মধ্য দিয়ে তাদের মধ্যে এক প্রচ্ছন্ন সম্পর্ক গড়ে ওঠে। অর্থ-সংকটে, বিশ্বাসঘাতকতায় বিব্রত ভূপতি চারুর কাছে ফিরে আসে, কিন্তু সংযোগ গড়ে ওঠে না। চারু তার কাছে লেখার খাতা গোপন করে, দুজনের মধ্যে কথা জোগায় না। অমল বিলেত চলে যায় ; মাঝখান থেকে সরে যায়। কিন্তু এই দম্পতির মধ্যে সংযোগের সূত্র আর গড়ে ওঠে না। দুঃখদুর্দশার সঙ্গে ভূপতির যুদ্ধে চারুলতা তার সঙ্গিনী হতে পারে না। ভূপতি সাহিত্য পড়ে শোনাতে গেলে চারু উৎসাহ পায় না। তাদের মধ্যে যে ছোটো-ছোটো বাক্যবিনিময় হয়, সে তাদের বিচ্ছিন্নতারই প্রমাণ। অমল চলে যাওয়ায় যে অগাধ শূন্যতা তার আবিষ্কারে চারুও হতবুদ্ধি হয়ে যায়। 'তাহার সমস্ত কর্তব্যের অন্তঃস্তরের তলদেশে সুড়ঙ্গ খনন করিয়া সেই নিরালোক নিস্তব্ধ অন্ধকারের মধ্যে অশ্রুমালা-সজ্জিত একটি গোপন শোকের মন্দির নির্মাণ করিয়া রাখিল। সেখানে তাহার স্বামী বা পৃথিবীর আর-কাহারও কোনো অধিকার রহিল না।' এক সময়ে অস্পষ্ট সন্দেহ ভূপতির কাছে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল, সে বুঝতে পেরেছিল চারু অমলের প্রতি অনুরক্ত। এই মর্মান্তিক আবিষ্কারে, চারুর মন পাবার জন্য ভূপতি যে সাহিত্যচর্চা শুরু করেছিল, সেই খাতাপত্র সে চারুর সামনেই পুড়িয়ে ফেলে। অথচ চারুর পরিস্থিতিতে সে সমবেদনাও বোধ করে— স্বামীর প্রতি তার প্রাণপণ কর্তব্যপালনের বঞ্চনার চেয়ে করুণ আর কী হতে পারে। অপ্রকাশ্য অপরিহার্য অপ্রতিবিধেয় দুঃখভার' নিয়ে তাকে নিত্য কাজ করতে হচ্ছে।' ডাক্তার যেমন সাংঘাতিক ব্যাধিগ্রস্ত রোগীকে দেখে, ভূপতি তেমনি করে নিঃসম্পর্ক লোকের মতো চারুকে দূর থেকে পর্যবেক্ষণ করে। শারীরিকভাবেও দূরে সরে যাবার জন্য সে মৈশুরে চলে যাচ্ছে। বিদায় কালে চারু সঙ্গে যেতে চাহিলে ভূপতি না করে ; তার অবস্থা দেখে ভূপতি যখন সম্মত হয় তখন চারু না করে। দুজনের হ্যাঁ-তে না-তে মেলে না।

মুগ্ধা আশারও চোখের সামনে পৃথিবী-সংসার সমস্ত বিস্বাদ হয়ে গিয়েছিল— স্বামী মহেন্দ্র যখন বিনোদিনীর প্রতি আকর্ষণের তীব্রতায় মাতাল। বিনোদিনীকে লেখা মহেন্দ্রের চিঠি পড়ে 'আশার সমস্ত অবলম্বন যেন খসিয়া পড়িয়া গেল, শরীরের সমস্ত স্নায়ু পেশী যেন একেবারেই হাল ছাড়িয়া দিল— নিশ্বাস লইবার যেন বাতাসটুকু পর্যন্ত রহিল না, সূর্য তাহার চোখের উপর হইতে সমস্ত আলো যেন তুলিয়া লইল।' সে কী করবে, কাকে ডাকবে, কোথায় যাবে— এই নিঃসঙ্গ রমণী। মহেন্দ্র বিনোদিনীকে গাঁ থেকে নিয়ে আসার পর মহেন্দ্রের সঙ্গে আশার দেখা হয় ছাদে— দেখা হয়, কিন্তু কেউ কোনো কথা খুঁজে পায় না। অনেক পরে, বিনোদিনী-কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়ে মহেন্দ্র ফিরে এলে আশার মস্তিষ্কের মধ্যে, রক্তস্রোতের মধ্যে যেন বিসর্জনের বাদ্য বাজতে থাকে এবং মহেন্দ্রকে তার পরপুরুষ, যেন পরপুরুষেরও অধিক অপরিচিত মনে হতে থাকে। সন্দীপের দেশাত্মবোধের মোহান্ধ উন্মাদনা, তার 'দুর্দান্ত ইচ্ছার প্রলয়মূর্তি' বিমলা-নিখিলেশের মধ্যে ব্যবধান রচনা করেছিল। 'প্রকৃতির ডাক্তারিতে ব্যথা অসাড় করবার অনেক ওষুধ আছে। যখন কোনো-একটা গভীর সম্বন্ধের নাড়ী কাটা পড়তে থাকে তখন ভিতরে-ভিতরে কখন যে সেই ওষুধের জোগান ঘটে তা কেউ জানতে পারে না ; অবশেষে একদিন জেগে উঠে দেখা যায় মস্ত একটা ব্যবচ্ছেদ ঘটে গিয়েছে।' ব্যবচ্ছেদ ঘটে গেল স্বামীস্ত্রীর মধ্যে। আগে সন্দীপ-বিমলার নানা পরামর্শের মধ্যে নিখিলেশেরও স্থান ছিল। এখন 'অনেক রাতে বিমলা খুব গভীর ঘুমে ঘুমিয়ে না পড়লে আমার পক্ষে শুতে যাওয়া ভারি কঠিন হয়। দিনের বেলা তার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হয়, কথাবার্তাও চলে, কিন্তু বিছানার মধ্যে একলা-রাতের নিস্তব্ধতায় তার সঙ্গে কী কথা বলব ?' তাদের শোবার ঘরে খাট, আলনা, আয়না, অনেক আসবাব ; কিন্তু নিখিলেশ অনুভব করে সেখানে আর সর্বব্যাপী হৃদয়টি নেই। পরে তাদের শোবার ঘরও আলাদা হয়েছে। মহেন্দ্র-আশা, বিমলা-নিখিলেশের পুনর্মিলন হয়েছিল, কিন্তু মধ্যবর্তী মানুষেরা দূরে সরে যাওয়া সত্ত্বেও কি স্থায়ী বিচ্ছিন্নতার রেখা এঁকে দিয়ে যায় নি ? ঊর্মিমালাকে নিয়ে যখন শশাঙ্কের 'লাগল চোখে ঘোর, মন উঠল আবিল হয়ে' তখন মিথ্যা মিথ্যা মিথ্যা হয়ে যায় শর্মিলার দাম্পত্যজীবন। ঊর্মিমালা ডাক্তারি শিখতে বিলেত চলে গিয়ে দাম্পত্যসম্পর্কে জোড়া দিয়ে যায় বটে, কিন্তু চিরকাল সেও কি স্বামী-স্ত্রীর মাঝখানে অদৃশ্য মধ্যবর্তিনী হয়ে থাকে না ?

একদিকে মধুসূদনের অধিকারবোধের হুকুমদারি, অন্য দিকে কুমুর স্পর্শকাতর আত্মনিবেদনের পরিশীলিত আয়োজন ;

মিলন হয় না তাই। স্বামীর আদেশে কুমু যখন শয়নকক্ষে আসে 'দেখে মনে হল, এ যেন বিধবার মূর্তি— ওর স্বামী আর ওর মাঝখানে যেন একটা নিস্তব্ধ মৃত্যুর সমুদ্র।' প্রণয়িনী মিলেনার সঙ্গে বিচ্ছিন্নতা বেড়ে গেলে কাফকা যেমন লিখেছিলেন, "What used to be a dividing thread is now a wall, or a mountain range, or rather a grave."[১৯] মধুসূদন প্রতিজ্ঞা করেছে কুমু ডাকলে তবেই সে শুতে আসবে, নইলে বসে থাকবে বৎসরের পর বৎসর। কিন্তু কুমুও ডাকতে পারে না— 'দুপারে দুজনে নীরবে বসে— রাত্রির শেষ নেই— মাঝখানে একটা অলঙ্ঘনীয় নিস্তব্ধতা।' অবশেষে এক সময় সমস্ত শক্তিকে সংহত করে কুমু মধুসূদনকে শুতে ডাকে। স্বামী-স্ত্রীর এই প্রেমহীন মিলন, কুমু অনুভব করে, অশুচিতা ও 'আন্তরিক অসতীত্ব' বলে। মধুসূদন কখনো কুমুকে পেতে আকুল হয়, কখনো দম্ভ তার আকুলতাকে বাধা দেয়। মাঝে-মাঝেই দুজনের মধ্যে সহজ কথাবার্তা অসাধ্য হয়ে ওঠে। গর্ভস্থ সন্তানের দায়ে শেষ পর্যন্ত কুমু স্বামীর ঘরে ফিরে এসেছিল বটে, কিন্তু যে অজাত সন্তানকে তার মনে হয় দৈবের অন্যায়, সে কি স্বামী-স্ত্রীর ব্যবধান ঘোচাতে পারে ? অসুস্থ নীরজা ও আদিত্যর মাঝখানে যখন সরলা এসে দাঁড়ায় তখন নীরজার জীবনে দিনে-দিনে ফাঁকি বাড়তে থাকে। বেদনার ঘূর্ণিবাতাস নীরজার অন্তরে বেগ পেয়ে উঠছিল, অর্কিডঘরের অধিকার নিয়ে ঝড় বয়ে যায়। পরে অনুতপ্ত নীরজা ভেবেছিল যে-সরলা যুগলের মাঝখানে নিঃসঙ্গতার ব্যবধান রচনা করেছে, তাকে বোনের মতো বুকে টেনে নেবে। কিন্তু পারে নি। মুমূর্ষু নারী আদিত্যকে হারানোর, সব-হারানোর শূন্যতাময় ঈর্ষায় প্রেতিনীর মতো দাঁড়িয়ে উঠল 'ঢিলে শেমিজ-পরা পাণ্ডুবর্ণ শীর্ণমূর্তি' ; সরলাকে ডাকল রাক্ষসী বলে ; বলল, 'শেল বিঁধব তোর বুকে, শুকিয়ে ফেলব তোর রক্ত।'

পনেরো বছরের বিবাহিত জীবন, কিন্তু স্বামী বা সংসারের সঙ্গে কোনো হৃদ্যসম্পর্ক গড়ে ওঠে নি মৃণালের। সে তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসত্তা নিয়ে জন্মেছে, 'মেয়েমানুষের পক্ষে এ এক বালাই।' বুদ্ধিমত্তাই তাকে স্বতন্ত্র করে দেয়। এতই সে একলা যে, সে যে কবিতা লেখে— 'সেখানেই আমার মুক্তি'— পনেরো বছরের মধ্যে সেই খবর কেউ জানতে পারে না। বাড়ির মানুষদের নয়, গাঁয়ের মেয়ে মৃণালের বরং গৃহপালিত পশুগুলিকে চিরপরিচিত আত্মীয় মনে হয়। মাতৃত্ব হয়তো সংসারের সঙ্গে তার এক ধরনের যোগসূত্র প্রতিষ্ঠা করতে পারত, কিন্তু মেয়ে তার জন্মেই মারা গেল। সম্পর্কহীনতার সংকট চূড়ান্ত হল বড়োজায়ের বোন দুর্ভাগিনী বিন্দুকে সে হৃদয়ের আশ্রয় দেওয়ায়। আপদ বিদায় করতে তাকে বিয়ে দেওয়া হয় এক পাগলের সঙ্গে। বিন্দু পালিয়ে আসে, কিন্তু পরে মৃণালের সমস্যা দেখে ফিরে যায় শ্বশুরবাড়িতে। বিন্দুকে নিয়ে পুরী চলে যাবার পরিকল্পনা করেছিল মৃণাল, কিন্তু বিন্দু সব সংকটের নিরসন করে যায় আত্মহননের পথে। কুষ্ঠরোগী-স্বামীকে কোলে করে বেশ্যালয়ে পৌঁছে দিচ্ছে পত্নী, স্ত্রী এই পাতিব্রত্যের আদর্শ, ব্যক্তিত্বময়ী, আর সেইকারণেই নিঃসঙ্গ, মৃণালের কাছে গ্রাহ্য নয়। তাই বিন্দুর মৃত্যুতে তার মেজোবৌয়ের খোলস ছিন্ন হয়ে যায়। বড়ো হয়ে ওঠে তার প্রাতিস্বিক মনষ্যত্ব। 'মেয়েটাই তার আপন মৃত্যু দিয়ে আমার আবরণখানা আগাগোড়া ছিন্ন করে দিয়ে গেল।' বনোয়ারি হালদারগোষ্ঠীর বেষ্টন ভেঙে চাকরির অছিলায় আত্মপরিচয় খুঁজতে বেরিয়েছিল, মৃণালও সাতাশ নম্বর মাখন বড়ালের গলি থেকে বেরিয়ে পড়ল তীর্থযাত্রার নাম করে, আসলে 'লেগে থাকাই তো বেঁচে থাকা', সেই অস্তিত্বের অর্থ খোঁজার জন্যে। মাতৃহারা হৈমন্তী ঋষিকল্প বাবার কাছে পশ্চিমে মানুষ হয়েছিল। মৃণালের মতো হৈমন্তীও স্বামীর সংসারে নিজেকে মানাতে পারে নি। পড়াশুনো ভালোবাসে, শাশুড়ির কথা মতো নিজের সতেরো বছর বয়সকে অন্যদের কাছে এগারো বানিয়ে বলতে পারে না ; পূজার্চনাপদ্ধতি জানে না বলে তাকে বলা হয় 'নাস্তিক মেয়ে'। বাবাকে নিয়ে সর্বদা তাকে বিদ্রূপ করা হয়, যেহেতু সবাই বুঝে গেছে বাবার জন্যেই তার মনের কোমলতম স্থানটি সুরক্ষিত। একদিন তার স্বামী দেখে, 'একটি জানলায় হৈম চুপ করিয়া বসিয়া পশ্চিমের দিকে চাহিয়া। সেদিকে মল্লিকদের বাগানের কাঞ্চনগাছ গোলাপি ফুলে আচ্ছন্ন। আমার বুকে ধক্‌ করিয়া একটা ধাক্কা দিল। মনের মধ্যে একটা অনবধানতার আবরণ ছিঁড়িয়া পড়িয়া গেল। এই গভীর নিঃশব্দ বেদনার রূপটি আমি এতদিন এমন স্পষ্ট করিয়া দেখি নাই।...আমার বুকের ভিতরটা হু হু করিয়া উঠিল।...আজ হঠাৎ আমার অত্যন্ত নিকটে অতি বৃহৎ একটা নৈরাশ্যের গহ্বর দেখিতে পাইলাম।' সেই নৈরাশ্যময় নিঃসঙ্গতার গহ্বর হৈমন্তীর স্বামী

পূরণ করতে পারে নি। হৈমন্তীর মৃত্যুর ইশারায় গল্প শেষ হয়েছে। মৃণাল মার্কণ্ডেয় পুরাণের কুশিকবংশীয় ব্রাহ্মণের পত্নীর পাতিব্রত্যের আদর্শকে অস্বীকার করেছিল, হৈমন্তীর স্বামী আত্মধিক্কার দিলেও পৌরাণিক আদর্শকে কাপুরুষের মতো মেনে নিয়েছে। 'যেদিন অযোধ্যার লোকেরা সীতাকে বিসর্জন দিবার দাবি করিয়াছিল তাহার মধ্যে আমিও যে ছিলাম। আর সেই বিসর্জনের গৌরবের কথা যুগে যুগে যাহারা গান করিয়া আসিয়াছে আমিও যে তাহাদের মধ্যে একজন।' তাই বুকের রক্ত দিয়ে তাকে দ্বিতীয় সীতা-বিসর্জনের কাহিনী লিখতে হয়। কিন্তু পরিস্থিতি ঘটতে পারে একেবারে বিপরীত ধরনের। দাম্পত্য-সম্পর্কের প্রত্যাশিত নিবিড়তার মধ্যে মানসিক চলাচলের অনুপস্থিতি মর্মান্তিক হয়ে উঠেছে ইঙ্গিতময় 'গৃহপ্রবেশ' গল্পে। যতীন মৃত্যুশয্যায়, কিন্তু ছোটো বোনের অন্নপ্রাশনে বাপের বাড়ি যাওয়াটাই তার স্ত্রী মণির কাছে বড়ো। মণির হৃদয়ের জাগরণ ঘটে নি ; মাসি যতই গোপন করুক যতীনের প্রতি মণির কোনো আকর্ষণ নেই। দুই যন্ত্র দুই সুরে বাঁধা, একসঙ্গে আলাপ চলা বড়ো কঠিন। তাদের মধ্যে 'দুটো-চারটে টানাবোনা কথার পরেই কথার সূত্র একেবারে ছিঁড়িয়া ফাঁক হইয়া গেছে ; তাহার পরে সন্ধ্যার নীরবতা যেন লজ্জায় মরিতে চাহিয়াছে।' ধূসর সত্য যখন মাসির সহৃদয় গোপনতার ছলনা ভেদ করে প্রকাশ হয়ে গেছে তখন যতীন চোখে অন্ধকার দেখেছে। সে স্বপ্ন দেখছিল, মণি দরজা ঠেলে ঘরে আসতে চাইছে, কিন্তু দরজা ফাঁক হল না। 'মণি চিরকাল আমার ঘরের বাইরেই দাঁড়িয়ে রইল।'

নিঃসঙ্গতা সম্পর্কহীনতার বেদনা রবীন্দ্রনাথ আশৈশব জেনেছিলেন। বৃহৎ পরিবারের মধ্যে ছিল এক নিঃসঙ্গ বালক ; পরিবারেও একা, ইস্কুলেও একা। খ্যাতিময় প্রৌঢ়তা ও বার্ধক্যের দিনগুলিতেও তিনি একা। প্রমথ চৌধুরীকে তিনি লিখেছেন, "আমি বন্ধুবান্ধব থেকে ক্রমশই বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছি।'[২০] রোম্যাঁ রোলাঁ তাঁর 'ভারতবর্ষ' দিনপঞ্জীতে লিখেছেন, "রবীন্দ্রনাথ নিজের দেশে বিচ্ছিন্ন।"[২১] পুরুষ যেখানে অসাধারণ সেখানে সে নিরতিশয় একলা, নিদারুণ তার নিঃসঙ্গতা— রবীন্দ্রনাথের নিজের সম্বন্ধে সত্য এই কথাটা শুধু পুরুষ সম্বন্ধে সত্য নয়। 'অনধিকার প্রবেশ' গল্পের নায়িকা জয়কালী সম্বন্ধে লেখক রবীন্দ্রনাথই মন্তব্য করেছেন, কর্মদক্ষ, পল্লীর সব ক্রিয়াকর্মের বিপদে-সম্পদে নিরলস 'এই দীর্ঘাকার কঠিন বিধবাটি বিধাতার কঠোর নিয়মদণ্ডের ন্যায় পল্লীর মস্তকের উপর উদ্যত ছিলেন··· অথচ তাঁহার মতো অত্যন্ত একাকিনী কেহ ছিলেন না।' যতই জীবনের শেষপ্রান্তে এসে পৌঁছোন রবীন্দ্রনাথ, ততই সামাজিক সাহিত্যিক আন্তর্জাতিক নানা পরিস্থিতির কারণে মগ্ন হয়ে যান নিঃসঙ্গতার গভীরতায়। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কহীনতা জনিত নিঃসঙ্গতার সঙ্গেও রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ পরিচয়ের অভিজ্ঞতা ছিল। কাদম্বরী দেবী আত্মহত্যা করেছিলেন ; রবীন্দ্রজীবনীকার অনুমান করেছেন নানা কারণে সম্ভবত "এক ধরনের একাকীত্বের বোধ তাঁকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল।"[২২] বড়োমেয়ে মাধুরীলতার দাম্পত্যজীবনের ব্যর্থতা তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। কনিষ্ঠা কন্যা মীরার দাম্পত্যজীবনের জটিলতাও রবীন্দ্রনাথকে কম বিব্রত করে নি। স্বামী-স্ত্রী যখন মানসিক বিচ্ছিন্নতার ফলে পরস্পর নিঃসম্পর্কিত মানুষ হয়ে যায় তখন যে মর্মান্তিক বেদনা তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ পরিচিত হয়েছিলেন। আর-যে চূড়ান্ত সত্তাগত নিঃসঙ্গতা জড়িয়ে আছে অস্তিত্বের শিকড়ে, তা কবির নির্বাক ছবিগুলিতে, চিত্রিত নরনারীর স্তব্ধ নাটকীয়তায়, ভাষাহীনতায় ভাষা পায়। এই-সব ছবির ভাব কেমন যেন বিষাদমাখা ; নারীদের মুখে আছে বেদনাঘন স্তম্ভিত বিষণ্ণ গম্ভীর সুদূরতা। তাঁর কথাসাহিত্যেও, দাম্পত্যসম্পর্কের মধ্যে মানুষের একাকীত্বের রূপায়ণে পেয়ে যাই কবির আর্ষ প্রশান্তির অন্তরালে দ্বিধাদীর্ণ মথিত সংশয়কে। বিশেষ করে দাম্পত্যসম্পর্কের রূপায়ণে, কারণ সেখানেই ভিন্ন নারী ভিন্ন নর স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে এক সত্তায় অভিন্ন হয়ে যেতে পারে।[২৩] কিন্তু সেই চূড়ান্ত সম্পর্কে যখন ভাঙন ধরে, তখন যুগলের যে নিঃসঙ্গতা তেমন নিঃসঙ্গতা আর কোথায়ও নেই। তাই বিশেষ করে এই গল্পগুলিতে, এই-সব উপন্যাসে, বিচ্ছিন্ন মানুষ ও তার সত্তাকে যাচাই করা হয়ে যায়, যাচাই করা হয়ে যায় তার সঙ্গহীনতার ভয়ংকর ব্যথাকে ; যোগসূত্রের অভাবে মানুষের যে অসম্পূর্ণ অস্তিত্ব, সেই খণ্ডিত অস্তিত্বকে। এইভাবে, একটি সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে যেন ফুটে ওঠে আধুনিক মানুষের শূন্যতা ও একাকীত্বের ব্যাপ্ত অভিজ্ঞতার পূর্বাভাস।

উল্লেখযোগ্য সূত্র ॥

১ Karl Jaspers, *Man in the Modern Age,* 1966, p. 53.
২ Lewis Mumford. *Technics and Civilization,* 1962, p. 269.
৩ Erich Fromm, *The Sane Society,* 1968, pp. 139-40.
৪ "Estranged Labour turns thus : Man's species-being, both nature and his spiritual species-property, into a being *alien* to him, into a *means* for his *individual existence.* It estranges from man his own body, as well as external nature and his spiritual aspect, his *human* aspect."— Karl Marx, Economic and Philosophical Manuscripts of 1844, *Collected Works of Marx and Engels,* Vol III, Moscow, 1975, p. 277.
৫ জীবনানন্দ দাশ, "১৯৪৬-৪৭", 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'।
৬ *Either/Or (The Rotation Method),* 1946, p. 22.
৭ জীবনানন্দ দাশ, "বোধ", 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'।
৮ ইংরেজি অনুবাদে 'We are stillborn...', "Notes from Underground", B. G. Guerney (ed), *A Treasury of Russian Literature,* 1948, p. 537.
৯ A Alvarez, *The Savage God,* 1975, p. 118.
১০ Fromm, তদেব, p. 124.
১১ Jaspers, তদেব, p. 27.
১২ T. S. Eliot, Burnt Norton, *Four Quartets.*
১৩ রবীন্দ্রনাথ, "দুজন", 'বীথিকা'।
১৪ Eliot, *The Waste Land.*
১৫ জীবনানন্দ দাশ, "আট বছর আগের একদিন", 'মহাপৃথিবী'।
১৬ Fromm, তদেব, p. 135.
১৭ জীবনানন্দ দাশ, "১৯৪৬-৪৭"।
১৮ "Notes from Underground", তদেব, p. 536.
১৯ Diaries, 1964, p. 409.
২০ 'চিঠিপত্র' ৫, ১৩৫২, পৃ· ১৬৭।
২১ (অনুবাদ) অবন্তীকুমার সান্যাল, ১৯৭৬, পৃ· ২৭১।
২২ প্রশান্তকুমার পাল, 'রবিজীবনী', দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩৯১, পৃ· ২৭০।
২৩ বিষ্ণু দে, "রাত্রি হয় দিন", 'স্মৃতি-সত্তা-ভবিষ্যত'।

প্রবন্ধটির একটি প্রাথমিক রূপ 'শিলাদিত্য' পত্রিকার শারদীয় ১৩৯০ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

নিসর্গদৃশ্য

চিত্রকর রবীন্দ্রনাথ

সত্যজিৎ চৌধুরী

চিত্রকর রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির ভুবনে একান্তভাবে নিবিষ্ট হয়ে যেতে মন বাধা পায়। বাধা হয়ে দাঁড়ায় তাঁরই সাহিত্যিক-সাংগীতিক কীর্তির স্মৃতি এবং স্বাদ। গদ্যে কবিতায় গানে তাঁর প্রতিভার উদ্ভাস কত বার নান্দনিক অভিজ্ঞতার চূড়ায় নিয়ে গেছে। সে স্মৃতি ছবি দেখার সময়ের অভিনিবেশ অনেকটাই অধিকার করে নিতে পারে। এমন হত না, যদি রবীন্দ্রনাথ শুধুই চিত্রকর হতেন। এই কারণে তাঁর ছবি নিয়ে যাঁরা ভেবেছেন সকলেরই ভাবনায় জড়িয়ে গেছে সাহিত্যের প্রসঙ্গ, কখনো-বা গানেরও প্রসঙ্গ। এমন করে জড়িয়ে ভাবা, তাঁর ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভার নানা আয়তন মিলিয়ে দেখাকে রবীন্দ্র-চর্চার এক বিচক্ষণ পদ্ধতিই মনে করা হয়। তল্লাশ করে দেখলে, বিশেষভাবে শেষ বয়সের গদ্য লেখায় বা কবিতায় অথবা গানেও, এমন চিত্রকল্প, এমন প্রবণতা পাওয়া সম্ভব, যার সাদৃশ্য মিলবে তাঁরই আঁকা কোনো ছবিতে। রবীন্দ্রনাথের ছবির আলোচনায় এইভাবে দেখার ধারাই চলে এসেছে। মূল্য আছে এ-সব লেখার। তবুও নান্দনিক শৃঙ্খলা এবং আমাদের ছবির ইতিহাসের দিক থেকে অন্য-কীর্তি-নিরপেক্ষ ভাবে চিত্রকর রবীন্দ্রনাথের কাজের তাৎপর্য বিবেচনার দায়িত্ব রয়ে যায়। চিত্রকলায় ভারতীয় আধুনিকতার বিকাশে তাঁর ভূমিকা বোঝার দায়িত্ব।

তাঁর যাবতীয় সৃষ্টির পরিমণ্ডল থেকে ছবিকে আলাদা করে নেওয়া, সাহিত্যিক-সাংগীতিক অনুষঙ্গ ছাড়িয়ে শুদ্ধ চিত্র-গুণের বিচার কিছু খামখেয়ালি ঝোঁক নয়। শিল্প-প্রজাতিগুলির অনন্যতা মানব কি মানব না— নন্দনভাবনায় এ একটি মূল প্রশ্ন। পদ-সমবায় তার ধ্বনি ও অর্থ নিয়ে যখন উপলব্ধিতে কবিতার রূপে ঘনিয়ে আসে, সে উপলব্ধি কবিতারই শরীর পায়। যদি আসে বিশিষ্ট সুরের রূপে, তবে তাকে গানেরই রূপ দিতে হয়। তেমনি ছবির উপলব্ধি ছবিরই রূপ পায়, রেখায়-রঙে-ছায়াতপের বিন্যাসে। স্রষ্টা মানসের গতিবিধির দিক থেকেও তাই শিল্প-প্রজাতির স্বাতন্ত্র্য মানতে হয়। চিত্রকর তাঁর চৈতন্যে দৃশ্যতা-গুণ সমেত উপলব্ধিটিকে পান। বিশিষ্ট সেই উপলব্ধিকে তাই চোখে দেখানোর ভাষায় প্রতিষ্ঠার উপায় নিয়ে পরীক্ষায় নিবিষ্ট হতে হয়। বাচনের বা সুরের পরীক্ষায় নয়। উপলব্ধি এবং প্রকাশ-রূপের স্বাতন্ত্র্য নিয়ে এক-একটি শিল্প-প্রজাতির আলাদা ইতিহাস তৈরি হয়ে উঠেছে। মূল এই ইতিহাসগত সত্য না মানলে শিল্পবিচারের শৃঙ্খলা ভেঙে যায়। যে সময় জুড়ে রবীন্দ্রনাথ ছবি এঁকেছেন, সেই সময়ের সাহিত্যিক রচনা বা গানও পাচ্ছি বলেই ওই ভিন্ন প্রজাতির সৃষ্টির ভেতর ছবির মর্ম সন্ধানের দায় বইতে হবে এমন কোনো কথা নেই। তাতে ছবির মূল্যায়ন স্খলিত হয়ে যেতে পারে। আর তুলনার জের যে বেশি দূর টানাও যায় না, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের লেখায় তার নজির আছে। বিনোদবিহারীর উপলব্ধি, প্রকৃতি ও মানুষ সম্বন্ধে ঘনিষ্ঠ প্রত্যয়ের দিক থেকে "কবি রবীন্দ্রনাথ ও চিত্রকর রবীন্দ্রনাথে মূলত কোনো প্রভেদ নেই।" ("রবীন্দ্রনাথের ছবি", 'চিত্রকথা', ১৯৮৪, পৃ· ২৯৮-৯৯)। তাই ১৯২০-র পর যখন রবীন্দ্রনাথ রীতিমতো ছবি আঁকার দিকে ক্রমেই ঝুঁকেছেন তখন থেকে তাঁর সাহিত্যিক প্রকাশ-রূপেও কেমন গুরুতর পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে— বিশ্লেষণ করেছেন। 'রক্তকরবী'তে, 'যোগাযোগে' ভাষার চরিত্র বদলের তাৎপর্য উন্মোচন পর্যন্ত ছবির সঙ্গে সমান্তরাল অবলোকন কাজে আসে। তার পরেই বিনোদবিহারী এক বৈপরীত্যের মুখোমুখি হয়ে বলেন, "১৯৩০-এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের চিত্রের বিবর্তন একটা সীমায় এসে পৌঁচেছে আর তাঁর কাব্য চলেছে নতুন বিবর্তনের পথে।... সাহিত্য যখন চলেছে বস্তুর ইঙ্গিত অনুসরণ করে, ছবি তখন চলেছে স্মৃতির জগতে, অতীতের দিকে।... প্রথম

জীবনের কাব্যে যেমন বাক্যালংকার সকল অভাব পূরণ করেছে এবং সকল দুর্বলতা ঢেকেছে, শেষ জীবনের ছবিতে বর্ণের স্থান সেই রকম।" ("রবীন্দ্রনাথের ছবি ও সাহিত্য", 'চিত্রকথা', পৃ· ৩১২-১৩)।

এই হল বিপত্তি ! রবীন্দ্রনাথের কোনো পর্বের কোনো জাতের সৃষ্টিকেই ছকের মধ্যে আনা যায় না, এত তার বৈচিত্র্য, এত বৈপরীত্য। সাহিত্যিক রচনা আর ছবিতে মিল দেখাতে গিয়ে বিনোদবিহারী তাই এমন থমকে গেছেন। এবং এই-যে মন্তব্য করেছেন, রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্বের ছবিতে রঙ হয়ে উঠেছে দুর্বলতা ঢাকবার উপায়— ১৯৩০-এর পরে রঙে আঁকা সমস্ত ছবি সম্পর্কে কি এ কথাও মানা যায় ? এই সময়ে রঙে করা অনেক ল্যান্ডস্কেপ এবং পোর্ট্রেটই কি সমকালীন অধিকাংশ ভারতীয় শিল্পীর বোধ -বর্জিত পান্‌সে রঙ প্রয়োগের মামুলি ধরনের পাশে বিস্ময়কর ব্যতিক্রম নয় ? পরের আর-একটি লেখায় অবশ্য বিনোদবিহারী ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। বলেছেন, "রবীন্দ্রনাথের অঙ্কিত অবচ্ছিন্ন আকার বা রূপগুলিতে অভিব্যক্তির প্রচণ্ডতা নেই, পরিবর্তে একটি মার্জিত সূক্ষ্ম তীক্ষ্ণ মনের পরিচয় পাই। তুলনায় রবীন্দ্রনাথের বর্ণের রুচি উগ্র। এই উগ্রতার কারণ যে শিল্পীর অপটুতা তা সব সময় বলা চলে না, কারণ রবীন্দ্রনাথ চিত্রের অসম্পূর্ণতাকে বা অপটুতাকে প্রায় সকল সময় পূর্ণ পরিণতিতে পৌঁছে দিতে পেরেছেন" ("রবীন্দ্র-চিত্রের ভিত্তি", 'চিত্রকথা', পৃ· ২৯৪)।

বিচার-বিবেচনায় এমন গুরুতর হেরফেরের নজির রয়েছে বলেই ছবির মূল্য যাচাই ছবির এলাকার মধ্যেই হওয়া সংগত।

২

নিজের সৃষ্টি নিয়ে, নিজের সৃজনী-শক্তি নিয়ে বিস্ময়বোধ বরাবরই ছিল রবীন্দ্রনাথের। ছবি নিয়েও তাঁর অপার বিস্ময় প্রকাশ পেয়েছে চিঠিপত্রে, ছোটোবড়ো নানা লেখায়। নতুন একটা মাধ্যমে কাজ করতে চেষ্টা করছেন এবং কাজটা ক্রমে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। দাঁড়িয়ে যে যাচ্ছে এটা উপলব্ধি না করলে তাঁর স্বভাবগত মাত্রাবোধের শাসনে নিজে থেকেই থেমে যেতেন। থামেন নি, কারণ, নিজের মধ্যে প্রতিভার আর-এক সামর্থ্যের স্বাদ পাচ্ছিলেন। লেখা যেমন ঝেঁপে আসত, যেমন গান আসত, তেমনি ঝেঁপে আসছে অজস্র ছবি। সৃষ্টির শ্রম আর নিবিষ্টতায় বহুদিন অভ্যস্ত শরীর-মন এ তাগিদে সাড়া দিচ্ছে নিরলসভাবে, আর জমে উঠছে বিপুল পরিমাণ কাজ। তার দিকে চেয়ে নিজেই পরম বিস্মিত। ভাবেন, কী আশ্চর্য এই "মাতন" যার পাকের মধ্যে পড়ে ভুলে যাচ্ছেন পৃথিবীতে এর চেয়ে গুরুতর আর-কি কিছু আছে ? (হেমন্তবালা দেবীকে চিঠি)। "রেখানাট্যের নটী"-দের নিয়ে এই যে "আলোছায়ার নাট" এ এমন অনিঃশেষ কেন ! মুগ্ধ বিস্ময়ে বলেন, "ওগুলো স্বপ্নের ঝাঁক, ওদের ঝোঁক রঙিন নৃত্যে।" (সরসীলাল সরকারেকে চিঠি)। বলেন, "আমি ছবি আঁকি দৈববশে— এতে আমার পুরুষকার কিছুই নেই।" (দিলীপকুমার রায়কে চিঠি)। সৃজনী-ব্যক্তিত্বের এই আত্মরতিতে প্রকাশ পায় নিজের কাজের মূল্যগৌরব সম্পর্কে নিশ্চয়তা বোধ। শক্তি নিহিত ছিল তাই এমন উৎসারণ সম্ভব হল এ যেমন ঠিক, তেমনি আজ যা-কিছু দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে রয়েছে তার নজিরে বলতে হবে, চরিতার্থতা হঠাৎ আসে নি। খুবই সন্তর্পণে, দীর্ঘ একাগ্র পরীক্ষায় যে শিল্পের নতুন এই ভাষায় রবীন্দ্রনাথ অধিকার উপার্জন করেছিলেন পাণ্ডুলিপিতে তার ধারাবাহিক প্রমাণ রয়েছে।

আরো একটি কথা ওঠে। স্বদেশের শিল্পকলার প্রতিহত ঐতিহ্যকে আধুনিক পর্বে উত্তীর্ণ করে নেবার আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ গোড়া থেকে যুক্ত ছিলেন। স্মরণ হবে— হ্যাভেলের, ওকাকুরা তেন্‌শিনের পরামর্শ কার্যকর করার উপায় নিয়ে তিনি গভীর বিচার-বিবেচনা করেছেন। অবনীন্দ্রনাথ-গগনেন্দ্রনাথদের প্রতিভা বিকাশে তাঁর অভিভাবকত্ব আমাদের ছবির আধুনিক ইতিহাসের দিকে থেকে অপরিসীম মূল্যবান্‌। অবনীন্দ্রনাথের ছাত্রদের কাজকর্মের, শক্তি ও দুর্বলতার পুরো খবর তিনি রাখতেন। ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট প্রতিষ্ঠানটির (স্থাপনা : ১৯০৭) কাজকর্ম সম্পর্কে খবর তো রাখতেনই, ওই অভিজাত আমীর সাহেবদের শিল্পচর্চার আখড়ায় বিশেষ-কিছু হয়ে উঠবে বিশ্বাস করতেন না। তাই জোড়াসাঁকোয় লালবাড়িতে বিচিত্রা সভা (স্থাপনা : ১৯১৫) প্রতিষ্ঠা করে দেশের শিল্পচর্চায় গতি সঞ্চারের দায় নিজের

উপরে তুলে নিয়েছিলেন। "আমার আশা নিজের জন্য নয়— দেশের জন্যে, তোমাদেরও জন্যে। এই আশাতেই আমি আর্থিক অসামর্থ্য সত্ত্বেও বিচিত্রায় অকৃপণভাবে টাকা খরচ করেছিলুম। তোমরা দেশে যে বীজ বপন করেছ সেটাই যাতে অঙ্কুরিত এবং স্থায়ী হয়ে সমস্ত দেশের চিরন্তন জিনিস হয় এই আমার কামনা ছিল।" অবনীন্দ্রনাথকে লেখা এই চিঠিতে রবীন্দ্রনাথের দায়িত্বচেতনার প্রমাণ রয়েছে। কলকাতায় এ কাজের শিকড় ভালো করে লাগল না। অনুভব করছিলেন, শিল্পকলার জন্যে কলকাতায় কেউ "নিজেকে সত্যভাবে নিবেদন করতে পারলে না।" (মীরা দেবীকে চিঠি)। বিচিত্রা তুলে দিয়ে একান্তভাবে নিজের সংকল্পনা এবং অভিপ্রায় মতো একটি কাজের জায়গা গড়ে তোলার আয়োজন করলেন শান্তিনিকেতনে। কলাভবনের (স্থাপনা : ১৯১৯) সংগঠন এবং বিবর্তনের সমস্ত তথ্য কখনো কি একত্র পাওয়া যাবে? পেলে দেখা যাবে এখানকার নানামুখী চর্চার মধ্যে বাঁধুনি বজায় রাখার সঙ্গেই একেবারে ভিন্নমুখী শিল্পাদর্শের সংঘাতও চলে এসেছে। এবং সব চেয়ে গুরুত্ব পাবে এই তথ্য যে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই সংঘাতের উপাদান জুগিয়ে বাঁধা ছক ভেঙে দিতে চেয়েছেন। কেবলই তাঁর মনে হচ্ছিল একটা আধুনিক জাগরণ ঘটল আমাদের শিল্পে, কিন্তু সে বিরাট ব্যাপক পটে উত্তীর্ণ হবার সাহস পেল না। অবনীন্দ্রনাথদের হাতে ভারতশিল্পের নতুন সৃষ্টিতে অভিভাবকের ভূমিকায় ছিলেন তিনি। অচিরে মিইয়ে গেল সেই আন্দোলন। অসিতকুমার হালদার বলে দেন, অবনীবাবু যা করেছেন ইন্ডিয়ান আর্টে তার পরে আর-কিছু করার নেই। অসিতবাবুরাই আধুনিক পর্বের দ্বিতীয় প্রজন্মের সামনের সারির শিল্পী। এক মারাত্মক চোরাবালিতে গিয়ে যে দাঁড়িয়েছেন সে বোধও ছিল না এঁদের অনেকের। এই যে এক সর্বনাশা বিকলতায় অসাড় হয়ে আসছিল তখনকার শিল্পকলা, তার বিরুদ্ধে তীব্রতম প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পেল রবীন্দ্রনাথেরই কাছে থেকে। 'আর্ট অ্যান্ড ট্র্যাডিশন' (১৯২৬) বক্তৃতায় অত্যন্ত ঝাঁঝালো ভাষায়, আক্রমণের ভঙ্গিতে জাতীয় শিল্পের ছাঁচ তৈরির অর্থহীনতা দেখিয়ে শিল্পীসমাজের উদ্দেশে বললেন, পুরানো আমলের কোনো রীতি অনুযায়ী ভারতশিল্পের মার্কা দেওয়া যাবে এমন কিছু উৎপাদনের দায় প্রবলভাবে অস্বীকার করুন। দাগানো পশুর পালের মতো একই খোঁয়াড়ে ঢোকানোর চেষ্টার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করুন। স্মরণ করিয়ে দিলেন, ব্যাপক সংবেদনশীলতাই মানব আত্মার গর্ব। সপ্রাণ সজাগ মানব আত্মা সর্বত্রগামিতার অধিকার দাবি করে। শিল্পের স্বধর্ম সম্পর্কে বললেন, শিল্প একলা যাত্রী ; শ্রেণীভাগ করা যায় না, তালিকায় সাজানো যায় না, এমন বিচিত্র অভিজ্ঞতা নিজের মধ্যে সামঞ্জস্যে মিলিয়ে নিতে নিতে সে বহুর মাঝ দিয়ে একলা হেঁটে যায়। শিল্প লুপ্ত কালের বিজন অনন্তে অবিচল চমকপ্রদ কোনো কবর নয়। জীবনের শোভাযাত্রার মধ্যেই তার জায়গা—। প্রখর এই ভাষণটিতে ঝিমিয়ে পড়া মানসিকতায় আঘাতের উদ্দেশ্য যেমন ছিল, তেমনি ছিল "শিল্পের বড়ো রাস্তায়" বেরিয়ে আসার আহ্বান।

নিজের ভেতরে এই তাপ এবং প্রথা ভাঙার ব্যাকুলতা বোধ করছিলেন অত্যন্ত তাৎপর্যময় এক সময়ে। সেটি দুই বিশ্বমহাযুদ্ধের মাঝখানের সময়।

প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধের ভয়ংকর অভিজ্ঞতা রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস-দৃষ্টিতে ছিল সমগ্র মানব সভ্যতার আত্মশুদ্ধির আয়োজন। একান্ত আশা করেছিলেন, জাতিতে জাতিতে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার ভেতর দিয়ে পৃথিবীতে সভ্যতার সমুজ্জ্বল এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হবে। সাম্রাজ্যজীবী য়ুরোপীয় রাষ্ট্রগুলির ধনতান্ত্রিক কাঠামোয় শোষণের, শ্রেণীদ্বন্দ্বের চেহারা তখনো তাঁর ধারণায় স্পষ্ট হয় নি। কিন্তু বাস্তব ভিত্তি -বর্জিত সে মানবমৈত্রীর স্বপ্ন অচিরেই ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। ক্রমে এই ঐতিহাসিক কালান্তরের বাস্তব তাৎপর্য তাঁর চেতনায় তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। খোদ পাশ্চাত্যেই সমস্ত মানুষকে আশ্রয় দিতে পারার মতো কোনো বিশ্বাস, কোনো আদর্শের ভিত্তি আর অটুট থাকছে না। ধনতান্ত্রিক কাঠামোর রাষ্ট্রের ভেতরে খেটে খাওয়া মানুষের বঞ্চনা, ক্ষোভ ক্রমেই ভূমিকম্প ঘটানোর সম্ভাবনা সৃষ্টি করছে। সে চাপ এড়াতে জাগিয়ে তোলা হচ্ছে জাতীয়তাবাদের অন্ধ রোখ্। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার ঠাট বজায় রাখার জন্যে, ভেতরের সংকট এড়ানোর উপায় হিসেবে সাম্রাজ্য থেকে শোষণের মাত্রা তীব্র করতে বাধ্য হচ্ছে য়ুরোপের রাষ্ট্রগুলি। অন্য দিকে এশিয়ার আফ্রিকার দেশে দেশে আত্মমর্যাদাবোধের অভ্যুদয়ে পরাধীন দেশগুলিতেও সংঘাত অনিবার্য হয়ে উঠছে। জটিল এই পরিস্থিতির মধ্যে অনেক ভাবুক-মনীষী-শিল্পীর মতো রবীন্দ্রনাথেরও দৃষ্টি যাচ্ছিল এক উজ্জ্বল বিকল্প, মানব-সম্পর্কের নতুন আদর্শের পীঠস্থান

সোভিয়েত রাশিয়ার দিকে। প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধের পরে, তৃতীয় দশকের (১৯২১-৩০) মধ্যে রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিকতা বোধে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রূপান্তর ঘটে যায়। সমকালীন ইতিহাসের দ্বন্দ্বময় বাস্তবতা যথাযথ ধরেছেন এই সময়ে। উপলব্ধি করেছেন ভারতবর্ষে অর্থনৈতিক-সামাজিক-রাষ্ট্রিক-সাংস্কৃতিক বিবর্তন-উত্তরণ বিশ্ব-ইতিহাসের মূল ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। আগের তুলনায় তাঁর স্বদেশ ভাবনা এবং আন্তর্জাতিক ভাবনা অনেক বেশি পরস্পর সাপেক্ষ, অন্যোন্য-সম্পর্কিত হয়ে উঠল। ভারতীয় আধুনিকতার দিক থেকে য়ুরোপীয় আধুনিকতার সঙ্গে নতুন করে বোঝাপড়ার দায়িত্ব-চেতনা তাঁর এ সময়ের সমস্ত ভাবনা, সমস্ত কাজে প্রতিফলিত হয়েছে।

এবং এই দায়িত্ববোধেই স্বদেশের শিল্পমুক্তির বিঘ্ন-বিপত্তি নিয়ে তিনি নতুন করে উদ্‌বেজিত হচ্ছিলেন। মনে হচ্ছিল, শিল্পকলার এলাকায় দেশীয়তার গণ্ডি অবিচল রাখার আর কোনো অর্থ নেই। য়ুরোপীয় আধুনিক শিল্পে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যকাল থেকে প্রকাশের ভাষা দ্রুত বদলের পরিচয় তিনি সাক্ষাৎ ছবি দেখার অভিজ্ঞতায়ই জানতেন। জানতেন জাপানি-চীনা শিল্পের আকস্মিক সংস্রবে অকাদেমিক নিয়মকানুনে আবদ্ধ য়ুরোপীয় শিল্পে মুক্তি আসে, যার উত্তরণ ঘটেছিল ইম্‌প্রেশনিস্ট এবং পোস্ট-ইমপ্রেশনিস্ট আন্দোলনে। কোনো শ্রেয়ত্ব অহমিকা এদ্‌গার দেগা (Edgar Degas, ১৮৩৪-১৯১৭) থেকে পাবলো পিকাসো (Pablo Picasso, ১৮৮১-১৯৭২) পর্যন্ত মহান চিত্রকরদের প্রাচ্য শিল্পের শিক্ষা আত্মস্থ করে নিতে তো কুণ্ঠিত করে নি। রবীন্দ্রনাথ ঘনিষ্ঠভাবেই জানতেন, বিংশ শতাব্দীর বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অব্যবস্থিত সামাজিক, রাষ্ট্রিক পরিস্থিতির চাপে, যান্ত্রিকতার চাপে ক্লিষ্ট য়ুরোপের শিল্পীরা মুক্তির উপায় সন্ধান করেছেন আদিম মানুষের শিল্পকলায়, শিশুদের আঁকা ছবির রাজ্যে।

১৯২৫-এ রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, "য়ুরোপে আজকাল চিত্রকলার ইতিহাসে একটা বিপ্লব এসেছে··· । আধুনিক কলারসজ্ঞ বলছেন, আদিকালের মানুষ তার অশিক্ষিত পটুত্বে বিরলরেখায় যে-রকম সাদাসিধে ছবি আঁকত, ছবির সেই গোড়াকার ছাঁদের মধ্যে ফিরে না গেলে এই অবান্তরভারপীড়িত আর্টের উদ্ধার নেই। মানুষ বার বার শিশু হয়ে জন্মায় বলেই সত্যের সংস্কারবর্জিত সরলরূপের আদর্শ চিরন্তন হয়ে আছে, আর্টকেও তেমনি শিশুজন্ম নিয়ে অতি অলংকারের বন্ধনপাশ থেকে বারে বারে মুক্তি পেতে হবে।" ('পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি', ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯২৫)। নিশ্চয়ই জর্মানির ব্রুক্ Brücke এবং ব্লাওয়ে রাইটার Blaue Reiter গোষ্ঠীর অভিব্যক্তিবাদী, এক্সপ্রেশনিস্ট শিল্পীদের কথা এসেছে এই মন্তব্যে। ব্রুক্ গোষ্ঠীর স্থাপনা ১৯০৫ সালে, ব্লাওয়ে রাইটার ১৯১১-য়। খোদ পারিতেই অবশ্য এক বিদ্রোহী ঝোঁকের সূত্রপাত হয়েছিল যার অধিনায়ক ছিলেন অঁ্যরী মাতিস (Henri Matisse, ১৮৬৯-১৯৫৪)। ১৯০৫-এ পাঁচ শিল্পীর প্রদর্শনী দেখে সমালোচক মন্তব্য করেছিলেন, এরা সব বুনো জানোয়ার, ফোভস্ Fauves। রীতি-বিরুদ্ধ রূপ সংগঠনে, রঙ প্রয়োগের উগ্রতায় মাতিসের কাজে, ঝর্ঝ রুয়োর Georges Rouault (১৮৭১-১৯৫৮) কাজে সৌন্দর্য সম্পর্কে অকাদেমিক ধারণা ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল। বুনো জানোয়ার আখ্যা মেনে নিয়ে মাতিস বলেছিলেন, বস্তুর খাঁটি চরিত্র-সত্তা ও অন্তঃসার ধরার জন্য তিনি মনোহারিতা গুণ বিসর্জন দিতে রাজি *(Notes of the Painter)*। ক্যানভাসে বস্তুর আকারগত মানপরিমাণের, বর্ণসৌষম্যের নীতি মাতিসদের হাতে ভেঙে গেল। এঁদের ছবি প্রথম দৃষ্টিতে চোখে, মনে ধাক্কা দেয়। চারুতায় মুগ্ধ করার কোনো আয়োজন নেই। নাড়া খেয়ে আচ্ছন্নতা থেকে মন বরং জেগে উঠতে বাধ্য হয়। বুদ্ধির দৃষ্টি যোগে উন্মোচিত হয় রূপ-বিন্যাসের অন্তর্গত গূঢ়তর একতার নীতি। রুয়োর কথা বিশেষ করে মনে আসে, কারণ, তাঁর ছবির অনেক বৈশিষ্ট্য রবীন্দ্রনাথে দেখতে পাওয়া যায়। রুয়োর ক্যানভাসে মানুষজনের মুখ অনেক সময়ে শুধু বাইরের রেখায় নির্দিষ্ট করে ছেড়ে দেওয়া, পুরো আঁকা নয়। রেখার ঘেরটিই জোরালো অভিব্যক্তিময়। মাত্র দেহভঙ্গিতেই তিনি নির্দিষ্ট অভিব্যক্তি এনে ছেড়ে দেন। অতিকৃত অবয়ব করেন প্রায়ই। ক্যারিকেচারের ধার ঘেঁষে গিয়েও কিন্তু আশ্চর্যভাবে সৌষম্য বজায় রাখেন; শিল্পের গূঢ় সুমিতি অক্ষুণ্ণ থাকে। রবীন্দ্রনাথের অনেক কাজে এই-সব বিশিষ্ট রীতির ব্যবহার আছে। যান্ত্রিকতায় অভিভূত এ সভ্যতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথেরই মতো আর্তস্বরে রুয়ো বলেন, যন্ত্রের পরাক্রম ধরণীর আকাশ-সমুদ্র-মরুভূমি অধিকার করে নিল, অপবিত্র করে তুলল বিহান বেলার শান্তি। ফাঁসিতে ঝুলন্ত মানুষ এঁকেছেন রুয়ো, ছবির নাম "ম্যান ইজ উল্‌ফ অব ম্যান।" রুয়োর কাজ রবীন্দ্রনাথ ভালো করে দেখে থাকবেন।

ঘনিষ্ঠভাবেই তিনি জানতেন জর্মানির অভিব্যক্তিবাদী ধারায় শুদ্ধ রূপের অনুসন্ধান এবং অনুভূত সংবেদন সরাসরি ক্যানভাসে অভিক্ষেপের উপায় সন্ধানে এড্‌ভার্ট মোঙ্ক (Edvard Munch,১৮৬৩-১৯৪৪), এমিল নোল্‌ড (Emil Nolde ১৮৬৭-১৯৫৬), ফ্রান্‌ৎজ মার্ক (Franz Marc, ১৮৬০-১৯১৬) বা পাউল ক্লে-র (Paul Klee,১৮৭৯-১৯৪০) মতো শক্তিমান শিল্পীরা অনুপুঙ্খ সাদৃশ্য ফোটাবার দায়, বর্ণের উদ্দীপনা সম্পর্কে যাবতীয় সংস্কার সম্পূর্ণ উপেক্ষা করছেন। এঁদের আঙ্গিকের পরীক্ষায় ইম্‌প্রেশনিস্ট, পোস্টইম্‌প্রেশনিস্ট রীতিও বাতিল হয়ে যাচ্ছে। মোঙ্ক যেমন "পীড়িত শিশু" বা "আলিঙ্গন"-এর মতো থীম বার বার আঁকেন এবং ক্রমেই অবান্তরভার বর্জন করতে করতে বিমূর্ততায় পৌছন। অকস্মাৎ অভিভূত করে দেওয়া উপলব্ধি আসে তাঁর চেতনায়, শহরের মাথার উপরের আকাশে যেন মেঘে আগুন লেগেছে, যেন ঝুলে রয়েছে রক্তমাখা তলোয়ার। সব স্বাভাবিকতার নিয়ম ভেঙে এই উপলব্ধি প্রকাশের নতুন বর্ণবিধি তাঁকে তৈরি করতে হয়। মোঙ্ক বা নোল্‌ড—যে প্রবল অভিব্যক্তি মূর্ত করেন তার মূলে নিশ্চয়ই আছে সমকালীন পরিস্থিতির অসম্ভব, প্রায় অমানবিক চাপ। অমানবিক পরিস্থিতির চাপেই যেন পটস্থ অবয়বের, বস্তুর স্বাভাবিকতা দুমড়ে ভেঙে যায়। এঁরা তো মানবিক সংকটেরই চিত্রকর ছিলেন, যে সংকটে রবীন্দ্রনাথও তখন তাড়িত, উৎকণ্ঠিত। বাস্তবের খাঁটি রূপ কী, মানবিক সংবেদনের শুদ্ধতম স্বরূপ কী, কী ভাবে তাকে অব্যবহিত শিল্পরূপ দেওয়া যাবে—এই প্রশ্ন যে এঁদের মধ্যে এত তীব্র হয়ে উঠছিল তার কারণ জীবন তখন ভয়ংকর জটিলতায় আচ্ছন্ন। সেই জটিলতা ভেদ যাঁরা করতে চেয়েছেন, শুদ্ধ বাস্তবের, শুদ্ধ সংবেদনের শিল্পরূপ যাঁরা সৃষ্টি করতে চেয়েছেন তাঁদের পক্ষে আদিম শিল্পে, শিশুর শিল্পকর্মে প্রবল অব্যবহিত প্রকাশরূপের আদর্শ পাওয়া খুব স্বাভাবিক। নোল্‌ড, ক্লে— এঁরা সভ্যমানুষের যাবতীয় শিল্প-উদ্‌ভাবনা অতিক্রম করে যেন আদি উৎসেই পৌছতে চেয়েছিলেন।

জর্মানির অভিব্যক্তিবাদী শিল্পীরা সবাই এক রীতিতে কাজ করেন নি, কিন্তু চেতনার একতা ছিল। ইতিহাসের সেই জটিল সংকট-পর্ব থেকে দূরকালের মানুষ আমরা অনেকটা যথার্থ পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের কাজ দেখতে পারি আজ। এবং দেখে মনে হয় যে এই শিল্পীরা নিজেদের কাজে মনুষ্যত্বের দুর্যোগের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন, প্রতিবাদের ভাষা তৈরি করেছিলেন। খুবই স্বাভাবিক, অভিব্যক্তিবাদী শিল্পীরা হিটলারের কোপদৃষ্টিতে পড়েন। জর্মানি থেকে বিতাড়িত হন। এঁদের ছবি গ্যালারি থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয়।

শিল্পের ধ্যানধারণায় এই-সব বাঁক ফেরার তাৎপর্য রবীন্দ্রনাথ জানতেন। তাই আশ্চর্য নয় যে ভাসিলি্য কান্‌ডেন্‌স্কির (Vasily Kandinsky,১৮৬৬-১৯৪৪) মতো, ক্লের মতো রবীন্দ্রনাথও মৌল বাস্তবের চেতনা উজ্জ্বল করে তোলার কথা বলেন, শিল্পে বাস্তবের অব্যবহিত রূপ সৃষ্টিকেই পরম বলেন। বলেন, "নানা পদার্থের মধ্যে বাস্তব ছড়িয়ে আছে, তাকে অব্যবহিত বিশুদ্ধরূপে সমগ্র করে দেখতে পাই না... রসসৃষ্টির মধ্যে বাস্তব অব্যবহিতভাবে চেতনার সম্মুখে এসে দাঁড়ায়, তার রূপ দেখতে পাই।" ("রূপকার" কলাভবনে বক্তৃতার অনুলিখন, ১২ এপ্রিল ১৯৩১, 'প্রবাসী', জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮)।

স্মরণ হবে, কলাভবনে ১৯২১ সালে স্তেলা ক্রামরিশকে (Stella Kramrisch) দিয়ে ইম্‌প্রেশনিজম থেকে কিউবিজ্‌ম পর্যন্ত আধুনিক শিল্পের বিবর্তন সম্পর্কে তিনি আলোচনার ব্যবস্থা করেন। হাতে-কলমে য়ুরোপীয় রীতির কাজ শেখানোর ব্যবস্থার জন্য আঁদ্রে কার্পেলেকে (Andree Karpeles) নিযুক্ত করেন। এমিল আন্তোয়ান্ বুর্দেল (Emile Antoine Bourdelle,১৮৬১-১৯২৯)-এর ছাত্রী শ্রীমতী মিলওয়ার্ড (Milward) এখানে আশ্রয় পেয়েছিলেন এবং তাঁর মাধ্যমে অগ্যুস্ত রোদ্যাঁ (Auguste Rodin,১৮৪০-১৯১৭)-র আধুনিক ভাস্কর্যরীতির প্রভাব কলাভবনে এল। বুর্দেল ছিলেন রোদ্যাঁ-র ছাত্র। রবীন্দ্রনাথের প্রশ্রয়ে দুর্দান্ত ক্ষমতাবান্ রামকিংকর শ্রীমতী মিলওয়ার্ডের সামান্য সাহায্য পেয়ে ভারতীয় ভাস্কর্যে বিপ্লব ঘটিয়ে দিলেন।

চিত্রকর-প্রতিভা ভেতরে না থাকলে অবিরল উৎসারণে রবীন্দ্রনাথ এমনভাবে আমাদের বিস্ময় জাগাতে নিশ্চয়ই পারতেন না। কিন্তু এও বিবেচনার বিষয় যে আমাদের আধুনিক সংস্কৃতির এ বিশেষ দিকটি সম্পর্কে তিনি দীর্ঘ দায়িত্ব যাপন করে এসেছেন। মানব চৈতন্যের দেশগত-জাতিগত সীমা মুছে যাওয়াই যখন কালধর্ম হয়ে উঠল তখন শুধু শিল্পের

এলাকায় একান্ত সংকীর্ণ গণ্ডি টেনে জাত বাঁচাবার নিরর্থকতা তিনি স্পষ্ট উপলব্ধি করলেন। তাঁর উদ্‌বেগ এবং গরজের ধাক্কায় একদিকে যেমন স্থিতাবস্থা ভাঙছিল, বিনোদবিহারীর মতো, রামকিংকরের মতো যুবক শিল্পীরা নতুন আলোয় উন্মুখ হয়ে উঠছিলেন, তেমনি তাঁর নিজের ভেতরেও আর-এক নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের আয়োজন সম্পূর্ণ হয়ে উঠছিল। বিচিত্রায় তেমন কাজ জমাতে না পারার ক্ষোভে ১৩২৩ বঙ্গাব্দে মীরা দেবীকে লিখেছিলেন, "চিত্রবিদ্যা ত আমার বিদ্যা নয়, যদি তা হত তাহলে একবার দেখাতুম আমি কি করতে পারতুম।" এর সাত-আট বছরের মধ্যে ভেতরে ভেতরে ক্রমেই করে দেখিয়ে দেবার রোখ্ শানিয়ে তুলেছেন। প্রস্তুত হয়েছেন। আকস্মিক উৎসারণ বা অবনীন্দ্রনাথ যেমন বলেন ভল্‌কানিক ইরাপ্‌শনের মতো এই একটা জিনিস হয়ে গেছে— এ কথা ঠিক মনে হয় না আদৌ। রবীন্দ্রনাথের গোটা জীবনের সমস্ত সৃষ্টিতে কোথাও আকস্মিকতার চমক নেই। ছবিতে আকস্মিকতার কথা তিনি নিজেই বেশ ফলিয়ে বলেছেন, আর সেটা আমাদের মনে গেঁথেও গেছে। সম্প্রতি খোঁজ পাওয়া গেল, বিলেত থেকে ফিরে নিজের মনের বিজন স্বপ্নে বিভোর দিনগুলিতে 'সন্ধ্যাসংগীতে'র কবিতা রচনার পাশাপাশি খুব নিষ্ঠায় কিছু স্কেচ করেছিলেন। ১৯৮০-৮৬-র মধ্যে করা এমন ৭টি স্কেচ রয়েছে ইন্দ্রকিশোর কেজরিওয়ালের সংগ্রহে (দ্র· অশোককুমার মুখোপাধ্যায়, "রবির 'সর্ব্ব প্রথমোদ্যম," 'দেশ', ৫ আগস্ট ১৯৮৯)। এই চর্চা ধারাবাহিক এগোয় নি ঠিকই, কিন্তু রেখায় রেখায় রূপকল্প ফোটানোর কৃতিত্বটুকুর রেশ স্মৃতির অবতলে রয়ে যাবার কথা। আরো পরে, ভিন্ন ভাবে রেখার খেলা যে তাঁকে ক্রমাগত টেনেছে পাণ্ডুলিপিতে তার নজির অবিরল। যে-পরিমাণ মুদ্রিত পাণ্ডুলিপি দেখার সুযোগ এখন পাওয়া যাচ্ছে তা থেকেই জিজ্ঞাসু মন বুঝতে পারে, এক বিশিষ্ট পদ্ধতিতে তিনি অতি সন্তর্পণ পরীক্ষায় ছবির জগতে প্রতিষ্ঠার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন। সংকল্পবদ্ধ, নিশ্চিত অভিযান। "আমি ছবি আঁকি দৈববশে— এতে আমার পুরুষকার কিছুই নেই" (দিলীপ রায়কে চিঠি, ২· ৬· ১৯৩১)। যথার্থ বিবৃতি হওয়া উচিত, "আমি ছবি আঁকি পুরুষকারের জোরে, দৈব বলে কিছুই নেই।" চৈতন্যের সৃজনী উদ্দীপনা বহন করতে সদাপ্রস্তুত স্নায়ুতন্ত্রের অসীম সামর্থ্য ভিন্ন, পুরুষকার ভিন্ন কোন্ সৃষ্টিই-বা সম্ভব ?

কত যত্নের হাতের লেখা রবীন্দ্রনাথের। রেখার ছন্দোময় ধারা যেন বয়ে চলেছে অবিচ্ছিন্ন টানে। বলা হয়, এই ছন্দোময় নয়নাভিরাম ক্যালিগ্রাফি (calligraphy)-তেই তাঁর ছবির আঙ্গিকের উৎস। কেউ-বা বলেন ক্যালিগ্রাফিক রেখাই তাঁর ছবির ভিত্তি। এও আর-এক ঢালাও মন্তব্য যা সবরকমের ছবিতে খাটানো যাবে না। তবুও বোঝা দরকার ক্যালিগ্রাফি সত্যি সত্যি কী বস্তু ? সৃজনের কলাবিধিতে কী তার ভূমিকা ?

লেখা এবং আঁকা কাজ দুটির মধ্যে মিল আছে। শিল্পীর সংবেদনময় দেহ-সত্তা চৈতন্যের আধার। হাতের আঙুলের ডগা অবধি সেই প্রাণিত দেহ-সত্তার সীমা। কব্জি শক্ত করে মুঠিতে বা আঙুলের ডগা দিয়ে কলম বা তুলি চেপে ধরার মুহূর্তে চৈতন্য-প্রবাহ বা চৈতন্যধৃত কোনো রূপ বা দৃশ্য আকার পাবার সম্ভাবনায় কলমের বা তুলির মুখে ভর করে। স্রষ্টার হাতের স্পন্দন, গতিভঙ্গি, চলন মুহূর্তে মুহূর্তে কাগজ বা পটের উপরে সুনিরূপিত অথচ গতিশীল আকার সৃষ্টি করে চলে। হাতের নিয়ন্ত্রিত গতিভঙ্গিতে যে ছবির মতোই সুছাঁদের লেখাঙ্কন সৃষ্টি হয়ে ওঠে— মানুষের এ চেতনা বহু প্রাচীন। চীনে জাপানে যেমন, তেমনি য়ুরোপে এবং পারসিক ঐতিহ্যে লেখাঙ্কন শিল্পেরই মর্যাদা পেয়ে এসেছে। ভারতেও পুথি লেখা একটি মাননাময় বৃত্তি ছিল। হেলাফেলা করে অক্ষর সাজিয়েও লেখা যায় অবশ্য। কিন্তু চৈতন্যসম্ভূতি অক্ষরগুলির বিন্যাসে দৃষ্টির নন্দনও কেন গোটা সৃজনব্যাপারটির মধ্যে মর্যাদা পাবে না, অনেক লেখক এমন ভেবেছেন। তাই, শুধু দক্ষ পুথি-লেখকদের হাতে নয়, কবি-সাহিত্যিকদের নিজেদের হাতেও পাণ্ডুলিপি হয়ে ওঠে শিল্পসামগ্রী। এই চেতনা, পাণ্ডুলিপিতে লেখাঙ্কনের সচেতন পরিশীলন ক্রমে রবীন্দ্রনাথেরও স্বভাবগত হয়ে উঠেছিল।

আমাদের হল খাগ বা লোহার কলমে লেখার রীতি, তুলিতে কখনো নয়। চীন-জাপানের ঐতিহ্যের সঙ্গে লেখার প্রকরণে কিছু মিলবে না আমাদের সঙ্গে, বরং মিলবে য়ুরোপের সঙ্গে, পারসিক ঐতিহ্যের সঙ্গে। রবীন্দ্রনাথের লেখাও

বরাবর ধাতুর নিবে লেখা। যে সময়ের পাণ্ডুলিপি ছবির ইতিহাসের দিক থেকে আমাদের বার বার দেখতে হয় তা সবই ফাউন্টেন পেনে লেখা। কালির গাঢ়তা তাই আগাগোড়া সমান দেখা যায়। পাণ্ডুলিপিতে তাঁর হাতের অক্ষর কৌণিক নয়, গোল আকৃতির দিকে ঝোঁক। ডান দিকে হেলানো এবং যতটা সম্ভব পাশাপাশি অক্ষরগুলি কলম না তুলে অবিচ্ছেদে টানা লিখে যাওয়া। বাংলা লেখার এই ছাঁদটি এল কোথা থেকে?

এগারো-বারো শতাব্দী থেকে যত পুথি পাওয়া গেছে তার কোথাও জড়িয়ে টানা লেখা নেই। প্রত্যেক অক্ষর মাত্রা টেনে টেনে আলাদা করে লেখা। অক্ষরের ছাঁদ হেলানো নয়, খাড়া। জীবিকা হিসেবে যাঁরা পুথি লেখার কাজ করতেন তাঁরা লেখার এই স্টাইল যত্নে অনুসরণ করে এসেছেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর "বাংলার পুরানো অক্ষর" প্রবন্ধে বাংলা অক্ষরের কালানুক্রমিক নমুনা দেখলে এই স্টাইলটি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা হয় ('হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ', দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৬৮৭)। বাংলায় cursive বা টানা লেখার চল ছিল না। ধরে ধরে লেখা এবং টানা লেখা, uncial এবং cursive—য়ুরোপীয় লেখাঙ্কনের এই দুটি ধরনের মধ্যে cursive ধরনের প্রভাব আমাদের বাংলা হাতের লেখাতে এসেছে নিশ্চয়ই ইংরেজির প্রভাবে। রামমোহন রায়ের বাংলা সই টানা লেখার নমুনা:

ঠাকুরবাড়ির জ্যেষ্ঠ পুরুষদের মধ্যে অনেকের লেখার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের লেখার ছাঁদের মিল পাওয়া যায় যেমন দেবেন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথের লেখা:

দেবেন্দ্রনাথ:

দ্বিজেন্দ্রনাথ:

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ:

রবীন্দ্রনাথের হাতে এই ছাঁদটি ক্রমে একটি বিশিষ্ট শিল্পশ্রী পেয়েছিল। তাঁর লেখার ক্রমিক বিকাশ ঘটেছে, তবে 'মালতী পুথি' থেকেই পরের বিকাশের ধাঁচটি ধরা যায়। আর একটু নজর করে দেখলে ধরা যাবে, রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি এবং বাংলা হাতের লেখায় রেখার গতিভঙ্গি হুবহু এক। 'লেখন'-এর ভূমিকা থেকে তোলা নীচের অংশ দুটিতে চোখ রাখলেই বোঝা যায় ইংরেজি cursive লেখার গতিভঙ্গিই বাংলাতেও এসেছে তাঁর হাতে :

ভূমিকা

এই লেখাগুলি শুরু হয়েছিল চীনে জাপানে। পাখায় কাগজে রুমালে কিছু লিখে দেবার জন্যে লোকের অনুরোধে এর উৎপত্তি। তারপরে স্বদেশে ও অন্য দেশেও তাগিদ পেয়েছি। এমনি করে এই টুকরো লেখাগুলি জমে উঠল। এর প্রধান মূল্য হাতের অক্ষরে ব্যক্তিগত পরিচয়ে। সে পরিচয় কেবল অক্ষরে নয়, দ্রুতলিখিত ভাবের মধ্যেও বটে। ছাপার অক্ষরে সেই ব্যক্তিগত সংস্পর্শ নষ্ট হয়— সে অবস্থায় এই সব লেখা বাতি-নেবা দীপসলতের মতো শ্রীহীন ও অর্থহীন হতে পারে। সেই আশঙ্কাতে হাতের অক্ষর ছাপাবার উপায় আছে বলে লেখাগুলি ভাসিয়ে দেওয়া গেল। অনেক লেখায় কাটাকুটি ভুলচুক আছে। সে সব মুছিলে ব্যক্তিগত পরিচয়েরই অপলাপ হয়ে যেত॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

The lines in the following pages had their origin in China and Japan where the author was asked for his writings on fans or pieces of silk.

Rabindranath Tagore

Nov. 7. 1926
Balatonfüred. Hungary.

লিপি-রেখায় এই যে প্রবল ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যময় গতি-ছন্দ চোখে পড়ছে, এই রেখাই রবীন্দ্রনাথের ক্যালিগ্রাফির ভিত্তি। যখন অক্ষর না লিখে পাণ্ডুলিপিতে আঁকিবুকি কাটেন বা নিছক অলংকরণের জন্য কলম চালান, তখনো রেখার ওই একই গতিভঙ্গি ফোটে এবং এটাই স্বাভাবিক। কোনো শব্দ লিখতে গিয়ে ভুল হওয়ায় কেটে দিতে হল। অক্ষরের যে রেখা এসে গিয়েছিল সেটি বর্জিত হল। মারতে হল রেখাটিকে। যেন একটি ফুল নুইয়ে আনতে গিয়ে বোঁটাটি ছিড়ে গেল। অপমৃত্যুর প্রেতলোক থেকে এই মৃত শব্দদের উদ্ধারের করুণ দায়ের কথা কবি অ্যঁরী বিদু (Henry Bidu)-কে বলেছিলেন। ("Rabindranath Tagore's Drawings", *Visva-Bharati Quarterly*, Tagore Centenary Number, pp. 151-55)। যা হোক, একটা রূপের গড়ন দিয়ে বর্জিত অংশগুলিকে চাক্ষুষ তাৎপর্য দেবার মমতায় পাণ্ডুলিপির মধ্যে রেখার যে অজস্র কারুকাজ করেছেন— তাকে অলংকরণই বলা চলে। লিপি-রেখা এবং এই অলংকরণের রেখার গতিভঙ্গি এক হওয়ায় এক-একটি পৃষ্ঠা লেখায়– কারুকাজে মিলিয়ে এক-একটি পূর্ণাঙ্গ অলংকরণের নমুনা হয়ে ওঠে। এই-সব অলংকৃত পাণ্ডুলিপি কখনো কারো দেখার, উপভোগের সামগ্রী হবে ভাবার কোনো কারণ ছিল না। একে ঠিক শিল্পরচনা বলা চলে না। তবু রেখার এবং কাগজের ফাঁকা জমির বিচিত্র সব সম্পর্ক তৈরি করায় যে দিনের পর দিন এতটা সময় দিয়েছেন, অতি সচেতনভাবে ছন্দিত নক্‌শা আর তারই আধারে নির্দিষ্ট আকৃতি গড়ে তুলেছেন, তার একটিই উদ্দেশ্য। কাগজের জমির সাদার সঙ্গে কালির কালো রঙের সংঘাতে, বুনানিতে কত রকম গড়ন ফোটানো সম্ভব, তার সচেতন পরীক্ষা চালানো। দ্বিমাত্রিক এই-সব অলংকরণের কাজে রেখার সামর্থ্য এবং রেখার উপরে নিজের কর্তৃত্বের মাত্রা যাচাই করে নিচ্ছিলেন। কলম চালাতে চালাতে অদ্ভুত সব আকৃতি ফুটে উঠেছে বলেই একে অবচেতনের লীলা বলা ঠিক নয়। সব শিল্পকর্মেই কাজের শুরু এবং চূড়ান্তে অনেক ফারাক হয়ে যায়। সংকল্প এবং রূপায়ণের পদ্ধতির মধ্যে দ্বন্দ্বময় সম্পর্ক কোথায় কীভাবে চরিতার্থতা খুঁজে পাবে— আগে থেকে তা নির্দিষ্ট করা যাবে কী করে। এই হালকা চালের অলংকরণের কাজে তো হাতকে খানিকটা স্বাধীনতা দেওয়াই যায়। কিন্তু অ্যঁরী বিদু যেভাবে বলেন, এ হল মনের নিয়ন্ত্রণহীন হাতেরই কাজ, যে হাত itself animated by its own elemental spirit,... in which rhythm is already inherent, which, without consulting the poet— এই নকশা সৃষ্টি করে তুলেছিল— এ কথা মানা যায় কী করে। কাগজের সাদাকে কালির কালোর রেখাজালের মধ্যে প্রবল অভিব্যক্তিময় করে তোলার দৃষ্টান্ত পাণ্ডুলিপিতে রয়েছে, অবচেতনের হাতে ছেড়ে দেওয়া শিথিল স্নায়ু থেকে রেখায় সেই জোর পৌঁছবে না কখনো। একটি উড়ন্ত ডানার প্রচণ্ড গতি বা দীর্ঘ চঞ্চুর ব্যাকুলতা বা আদিম প্রাণীর মুখের ভয়ানক শ্রী ফোটানোয় সাদা-কালোর উপাদান নিয়ে একটা বোঝাপড়া চালিয়েছেন। এরই ভেতর দিয়ে ছবির সৃষ্টিলোকে যাবার নিশানা পাচ্ছিলেন। নতুন যাত্রায় আত্মবিশ্বাসের জমি পাচ্ছিলেন পায়ের নীচে।

এবং এই বাঁকেই আমরা পাচ্ছি 'রক্তকরবী'র (রচনাকাল ১৯২৬) বিভিন্ন পাণ্ডুলিপির কয়েকটি পৃষ্ঠার কাজ। তার পরই তৈরি হয় 'পূরবী'র পাণ্ডুলিপি (১৯২৪ -২৫) যা সৃষ্টিকালেই কবির নিজের ছাড়া আরো একজন শিক্ষিত-দৃষ্টি দর্শকের রূপানুভূতিতে প্রবলভাবে নাড়া দিচ্ছিল। এই কাজটির রূপগত মূল্য প্রাত্যহিক যাচাই হয়ে যাচ্ছিল। কেন ভিক্‌তোরিয়া ওকাম্পো কাটাকুটি আঁকিবুকি খেলা দেখতে দেখতে চমকে উঠতেন? সেই খেলার মধ্যে সহসা কোনো রেখা ঝাঁপিয়ে উঠত প্রাণময়তায়৭। গড়ে উঠছিল এমন এক রূপলোক— বিজয়ার মনে হত— যার আবেদন গূঢ়তায় টেনে নেয়, বিহ্বল করে তোলে। পরম সৌভাগ্য বিজয়ার, চোখের সামনে তিনি এক প্রবল চিত্রকর প্রতিভার উত্তরণ দেখেছিলেন। আমাদেরও এই শিল্পীর কাজের গতি-পরিণতির মর্ম বোঝার জন্য পাণ্ডুলিপিটি বার বার দেখতে হয়।

এখানেই প্রথম ক্যালিগ্রাফিক অলংকরণের দ্বিমাত্রিক রেখাবিন্যাসের পাশাপাশি ত্রিমাত্রিক গড়নের রূপ নির্মাণের দিকে প্রবল ঝোঁক দেখা দিয়েছে। যেমন ৯ পৃষ্ঠার শেষে উর্ধ্বমুখী একটি পশুর পুরো অবয়ব, ১৭ পৃষ্ঠায় কাগজের ডান দিক ঘেঁষে সুস্পষ্ট একটি মুখ, ২৫ পৃষ্ঠায় গণ্ডারের আকৃতি— আকৃতির মাঝখানে জালি কাজ, ২৯, ৪১ এবং ৪৯ পৃষ্ঠায় পাই খুব দৃঢ় গড়নের মুখ, ৬৩ পৃষ্ঠায় লেখার অংশ ছেড়ে ডান দিকে লম্বা চুল-দাড়ি নিয়ে একটি মুখের রূপবন্ধ। ৪১ পৃষ্ঠায় মুখটিতে
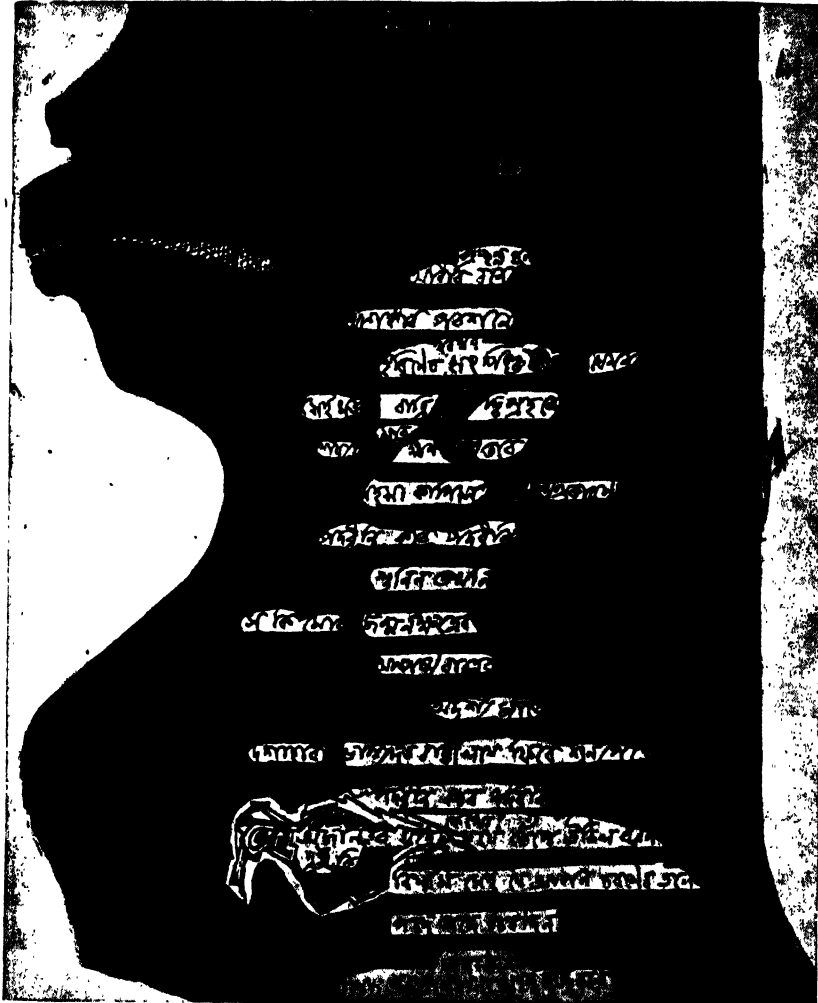
'পূরবী'র "পদধ্বনি" কবিতার পাণ্ডুলিপিচিত্র

আদিবাসী ধাঁচ স্পষ্ট। দেখবার বিষয় হল কাটাকুটি থেকে একেবারেই পৃথকভাবে রূপবন্ধ তৈরি করছেন। এর কোনোটিই দৃষ্টান্ত চিত্র নয়। একই পৃষ্ঠায় ধৃত কবিতার সঙ্গে ছবির ভাবগত মিল নেই কোনো। শুদ্ধ চিত্রগত মূল্যেই এ-সব কাজের মূল্য। এগুলি চলে আসছে পুরোপুরি ছবির এলাকায়। অনেক পৃষ্ঠায় অবশ্য বাতিল শব্দ ঢেকে দিয়ে অলংকরণের দৃষ্টান্তও রয়েছে, যার মধ্যে খুব তাৎপর্যপূর্ণ ২১ পৃষ্ঠার কাজটি। পাতা জুড়ে উপরের ভাঙা ইমারতের ধরনে ভারি গড়ন থেকে ধাপে ধাপে নীচে নেমেছে অপেক্ষাকৃত সরু গড়ন। লেখার মাঝ দিয়ে নামিয়ে আনা গোটা অলংকরণটিতে ভারসাম্য অবিচল রাখার নিপুণতা চোখ টেনে রাখে। ক্যালিগ্রাফিক অলংকরণ এবং ক্যালিগ্রাফির সঙ্গে সম্পর্কহীন ত্রিমাত্রিক রূপ— এই দুটি পৃথক আঙ্গিক পূরবীর পাণ্ডুলিপিতে একই সঙ্গে পাওয়া যাচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের সব ছবিই ক্যালিগ্রাফিক রেখা-ভিত্তিক— এমন ঢালাও মন্তব্য ঠিক নয়। একেবারে ভিন্ন আঙ্গিকে কালিতে, রঙে বহু কাজ তিনি করেছেন। আবার পাশাপাশি ক্যালিগ্রাফিক রেখা-নির্ভর ছবিও করেছেন। তীব্র দেহভঙ্গির বহু ছবি আছে যা তীক্ষ্ণ কৌণিক রেখাবিন্যাসে গড়া। যেমন রবীন্দ্রভবন সংগ্রহের 00.1997.16, 00.1999.16, 00.2000.16, এবং 00.1994.16-সংখ্যক ছবি। এ-সব এবং এই ধরনের আরো বহু কাজে আদৌ ক্যালিগ্রাফিক ছন্দিত রেখার ব্যবহার নেই।

'পূরবী'র পাণ্ডুলিপি থেকে রবীন্দ্রনাথের ছবির আঙ্গিকের আর-একটি বড়ো বৈশিষ্ট্য বুঝে নেওয়া সম্ভব। বর্জিত শব্দ কালি দিয়ে ঢাকতে গিয়ে প্রায়ই তিনি কাগজের সাদা জমি ছেড়ে রেখে নক্‌শা তৈরি করেন। ওই সাদা কখনো চোখের ফাঁদ কখনো কোনো প্রাণীর ধারালো দাঁতের সারি, কখনো বা শুধু জাফ্‌রির মতো হয়ে ওঠে। কালি চাপানো অংশ ভেদ করে আলো বেরিয়ে আসছে— কাগজের জমি এইভাবে সর্বদাই ব্যবহার করেছেন। আলো কখনো বাইরে থেকে পড়ছে না যেন, চাপা পড়া আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে তীক্ষ্ণভাবে। এই পদ্ধতিতে আলোর ব্যবহার তাঁর অনেক প্রসিদ্ধ ছবিতে দেখা যাবে। য়ুরোপীয় শিল্পীরা ছায়াতপের কলাকৌশল নিয়ে অজস্র পরীক্ষা চালিয়েছিলেন— ঘনিষ্ঠভাবে জানা সত্ত্বেও সেই কিয়ারস্‌ক্যুরো (Chiaroscuro)-নির্ভর গড়নের উপরে রবীন্দ্রনাথ কদাচিৎ নির্ভর করেছেন। ছবির মধ্যে আলো ব্যবহারে এই স্বাতন্ত্র্য তাঁর ল্যান্ডস্কেপ বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট হবে। রঙ ব্যবহারে যেমন, তেমনি আলো ব্যবহারেও রবীন্দ্রনাথের ছবির সঙ্গে সমকালীন দেশীয় বা য়ুরোপীয় শিল্পীদের কাজ বিশেষ মেলে না।

১৯২৫-৩০ সালের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ছবির ভাষায় আত্মপ্রকাশে অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছিলেন। এই সময়ে অবনীন্দ্রনাথ আরব্যরজনী সিরিজের ছবি করছেন— যা চিত্রগুণে বিশিষ্ট সৃষ্টি হলেও নির্দিষ্ট বিষয় আশ্রিত কাজ। দৃষ্টান্তচিত্রের স্তরেই এর জায়গা। তখন অধ্যক্ষ পার্সি ব্রাউন (Percy Brown, কাজ করেন ১৯০৯-২৭ অবধি) এবং উপাধ্যক্ষ যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় গবর্নমেন্ট আর্ট স্কুলে য়ুরোপীয় অকাদেমিক বাস্তববাদী আঙ্গিকের চর্চাই আবার ফিরিয়ে এনেছিলেন, সমকালীন য়ুরোপীয় শিল্প-আন্দোলনের খবর ছাত্ররা এখানে পেত না। অন্য দিকে ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্টে মূলত ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদারের তত্ত্বাবধানে দৃষ্টান্তচিত্রের চর্চাই চলছিল। তিনি নিজে বৈষ্ণবীয় বিষয়ের রসে আবিষ্ট ছিলেন। ১৯৩৩-এ গোবর্ধন আশ, অবনী সেন, কালীকিঙ্কর ঘোষদস্তিদার— এঁরা য়ুরোপীয় আঙ্গিক চর্চার উদ্দেশ্যে "রিবেল আর্ট সেন্টার" পত্তন করলেন। য়ুরোপীয় শিল্পে একের পর এক আন্দোলনের ওঠা-পড়ার তাৎপর্য সম্পর্কে এঁদেরও খুব স্পষ্ট ধারণা ছিল মনে হয় না। টেকেও নি এই সংগঠন। শুধু গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবিতে প্রচলিত রীতির বাইরে যাবার আগ্রহ এবং নতুন আঙ্গিকে কাজ করার সাহস দেখা দিয়েছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে একমাত্র শান্তিনিকেতন কলাভবনেই সংগঠিত ভাবে কিছু তাৎপর্যপূর্ণ পরীক্ষা চলছিল বলা চলে। তবু সব মিলিয়ে তখনকার শিল্পকলার যে পরিবেশ ধারণায় আসে— তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কাজের কোনোই মিল বা যোগ ছিল না। রবীন্দ্রনাথের অনুসন্ধিৎসা একেবারেই স্বতন্ত্র পথ নিল। তাঁর প্রথম দিকের কাজেই আমাদের ছবির ধারার সঙ্গে অমিল, ব্যতিক্রম তীব্রভাবে অনুভূত হয়েছিল। অভিযোগ উঠেছিল

দুর্বোধ্যতার। শান্তিনিকেতন কলাভবনে অবশ্য তখন কাজের পরিবেশ উদ্দীপনায় ভরপুর এবং নানা আঙ্গিকের পরীক্ষাও চলেছিল। কিন্তু সেই সময়ে রাস্তার ওপারেই উত্তরায়ণে রবীন্দ্রনাথের হাতে ভারতীয় চিত্রকলায় বিপ্লব ঘটে যাচ্ছিল। জানতে কৌতূহল হয়, কলাভবনে কি রবীন্দ্রনাথের ছবি শিক্ষার্থীদের সামনে ধরা হত ? বিচার-বিশ্লেষণমূলক চর্চার কি কোনো আয়োজন হত ? প্রমাণ নেই তেমন।

অবশ্য অনেক বিরূপ সমালোচনা এবং উদাসীনতার মধ্যেও দৃষ্টিমান্ কোনো কোনো শিল্পী আন্তরিক উপলব্ধি প্রকাশ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ খুশি হয়েছিলেন তরুণ যামিনী রায়ের এইরকম সমালোচনায়, বলেছিলেন, "এর চেয়ে পুরস্কার এই আবৃত দৃষ্টির দেশে আর কিছু হতে পারে না।" (চিঠি, ২৫·১·৪১)। যামিনী রায়ের লেখাটি ("রবীন্দ্রনাথের ছবি") পড়তে গেলেও অবশ্য কিছু অসুবিধে হয়।

"রবীন্দ্রনাথ ছবি আঁকেন খাঁটি য়ুরোপীয় আঙ্গিকে"— এই বাক্যে লেখাটির শুরু। য়ুরোপীয় ছবির আসল সমস্যা, যামিনী রায়ের বিশ্লেষণে, রিয়লিজমের চাপ এড়ানো। রিয়লিজমের বিরুদ্ধেই আধুনিকদের অভিযান। সত্যিসত্যিই আধুনিকতর য়ুরোপীয় শিল্পআন্দোলনে সাদৃশ্যের দায়মুক্ত হতে চাওয়ার প্রবল চেষ্টা আমরা দেখতে পাই। কথাটা ছবির পথে কিছুদূর এগোতেই রবীন্দ্রনাথের চেতনাতেও ধরা দিয়েছিল। আমাদের আধুনিক ছবির বিকাশের একটা গুরুত্বপূর্ণ বাঁকে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন, কথার সংস্রব-মুক্ত সুরের যেমন শুদ্ধতর, মহত্তর স্তরে বিকাশ ঘটেছে, তেমনি প্রাকৃত তথ্য বা ঘটনার উপরে একান্ত নির্ভরতা থেকে মুক্তি পাবে বলে শিল্পকলা শুদ্ধতর বিকাশের দিকে চলেছে("...evolution of pictorial and plastic art develops on this line, aiming to be freed from an absolute alliance with natural facts or incidents."— "My Pictures", *Chitralipi-2)* শিল্পকলায় শুদ্ধ প্রকাশরূপের তাৎপর্য সম্পর্কে এই ইঙ্গিত তখনকার ভারতীয় শিল্পের পরিপ্রেক্ষিতে একেবারেই নতুন এবং অভাবিত। আর কথাটা কোনো তত্ত্বের বিবৃতি হিসাবে আসে নি, এসেছে হাতে কলমে কাজ করার অভিজ্ঞতা থেকে।

চিত্রকর জীবনের প্রথম পর্যায়ের সৃষ্টি আশ্চর্য সব abstract form, অবচ্ছিন্ন রূপ থেকে এই যে আধুনিকতর নন্দনের বোধ তাঁর মধ্যে জেগে উঠেছিল— এ কি খাঁটি য়ুরোপীয় আঙ্গিকের কাজ ? খাঁটি য়ুরোপীয় আঙ্গিক বলতেই বা কী বুঝব ? তিনি তো কখনো য়ুরোপীয় আঙ্গিকের ভিত্তিস্বরূপ ড্রয়িং, অ্যানাটমি, ছায়াতপের কলাকৌশল, বিভিন্ন রঙের গুণগত তারতম্য, পরিপ্রেক্ষিতের ব্যবহার— কিছুই শেখেন নি। য়ুরোপে রিয়লিজমের বিরুদ্ধে অভিযানের যাঁরা অগ্রণী শিল্পী, তাঁরা আঙ্গিকের প্রতিষ্ঠিত বিধি আয়ত্ত করে তার পরে তাকে ভেঙেছেন। রবীন্দ্রনাথের কাজের সঙ্গে সেই বিদ্রোহীদের কাজের চরিত্রগত মিল দেখাতে গেলে তাই পদে পদে ঠেকতে হয়। যামিনী রায় মশায়ও ঠেকেছেন কিছুদূর এগিয়ে। কথা ঘুরিয়ে বলেছেন য়ুরোপীয় আধুনিকেরা যতই চেষ্টা করুন রিয়লিজমের ছোঁয়াচ কেউই কাটাতে পারেন নি। "ব্যতিক্রম শুধু ভারতীয় শিল্পে। রিয়লিজম্-এর ছোঁয়া এভাবে আর-কেউ কাটাতে পারে নি।" এর পরের ধাপে পৌঁছে বুঝিয়েছেন, আঁকার বিষয় দৃষ্টির সামনে না রেখেও বিষয়ের সম্পূর্ণ উপলব্ধিকে আঁকাই ভারতীয় ছবির বিশেষত্ব এবং "রবীন্দ্রনাথের ছবিতে সেই বিশেষত্বই ফুটেছে।" যামিনী রায়ের লেখাটির শুরু এবং শেষে বক্তব্য স্ববিরোধী হয়ে পড়েছে— বোধ হয় চিত্রকর রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব বিকাশের পদ্ধতি নজরে না রাখায়।

রবীন্দ্রনাথ য়ুরোপীয় বা ভারতীয়— কোনো আঙ্গিক অনুসরণের কথাই ভাবেন নি। আঙ্গিকের জটিলতায় জড়িয়ে পড়ার এবং বিচার-বিবেচনায় কোনো প্রতিষ্ঠিত রীতি ধরে এগোবার মতো প্রস্তুতি, শিক্ষাগত বনিয়াদ তাঁর ছিল না। তাই য়ুরোপীয় আধুনিকদের পথে তাঁর বিকাশ সম্ভাবিতও ছিল না। এটাই ঠিক মনে হয় যে, চিত্রকলায় বাঁধাধরা শিক্ষা না থাকায় আঁকা শুরু করে তিনি আদৌ সাদৃশ্য-নির্ভর, বাস্তবঘেঁষা রূপ সৃষ্টির দিকেই যান নি। হাতের লেখার ক্যালিগ্রাফিক ছন্দনির্ভর করে বিমূর্ত, অবচ্ছিন্ন রূপকলার পরীক্ষায় ঝুঁকেছিলেন। বস্তু থেকে তার ফর্মটি, গড়নের ধারণাটি বিশ্লিষ্ট করে নিয়ে রূপ দেওয়া কঠিন। তবুও শিল্পের প্রচলিত পথ অভ্যস্ত না হওয়ায় শুরুতেই রবীন্দ্রনাথ এই দুরূহের মোকাবিলায় কোনো পিছুটানে, দ্বিধায় বাধা পান নি। নিশ্চয়ই য়ুরোপীয় আধুনিক ছবি দেখার অভিজ্ঞতা থেকে খানিকটা সাহায্য পেয়েছেন। স্বদেশের

'শেষ যাত্রা'

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর - অঙ্কিত

সমকালীন শিল্পের আবদ্ধ দশা ভেঙে বেরোবার গরজ নিশ্চয়ই সাহস জুগিয়েছে। এবং আশ্চর্য এই যে, ছন্দোময় বিমূর্ত রূপ সৃষ্টির এক একান্ত স্বকীয় কলাবিধি তিনি উদ্ভাবন করতে পারলেন। একান্ত স্বকীয় কলাবিধি বলছি, কারণ, রবীন্দ্রনাথের হাতের ক্যালিগ্রাফিক রেখাগতির ছন্দের সঙ্গে য়ুরোপীয় কোনো শিল্পীর হাতের রেখার মিল পাওয়া যায় না। অন্য দিকে ভারতীয় প্রথায় প্রাকৃতিক বা জীবদেহের প্রাণছন্দ প্রকাশের যে রেখাগতি— তার সঙ্গেও রবীন্দ্রনাথের হাতের কাজ মেলে না। যে-কোনো ধারার ছবির পাশে তাই তাঁর পূর্ণাঙ্গ ছবি শুধু নয়, সামান্য অলংকরণের কাজও মুহূর্তে অব্যর্থভাবে চিনে নেওয়া যায়।

ক্রমে নিজস্ব আঙ্গিকে কর্তৃত্ব নিশ্চিত হল এবং নিজের শিল্পের ভুবনটিকে রূপবৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ করে তোলার প্রবণতা এল। বিষয়ভাবনার বৈচিত্র্যে রূপায়ণের পদ্ধতিতেও বৈচিত্র্য আসাই স্বাভাবিক তখন। বিশ্বপ্রকৃতি এবং মানবজীবনের যাবতীয় প্রকাশরূপ তাঁকে দুর্নিবার টেনেছে এবং সৃষ্টির "মাতন"-এ মাতিয়ে তুলেছে। বিশ্বময় অভিব্যক্তির অন্তহীন মুদ্রা কেবলই সু-নিরূপিতভাবে চোখের সামনে জেগে উঠছে। শিল্পী রবীন্দ্রনাথ তার কোনোটিকেই ব্যর্থ হতে দেবেন না যেন। প্রবল পুরুষকারে এই শিল্পী রেখা নাট্যের নটীদের, রঙে রঙে অভিব্যক্ত আলোর উদ্দীপনায় জাগা ভঙ্গিদের নিজের উদ্‌ভাবিত চিত্রভাষায় ধরে রেখেছেন। পরে সাদৃশ্যমূলক কাজ করতেও দ্বিধা করেন নি। তার মধ্যে মাঝে মাঝে আবার ফিরে এসেছে সেই প্রথম যুগের বিমূর্ত রূপ। শেষ পর্যায়ের ছবিতেও অনেক বিমূর্ত কাজ পাওয়া যাবে। সময়ের দিক থেকে এবং আঙ্গিকের দিক থেকে তাঁর ছবির স্তরভাগ করা সহজ নয় এবং কোনো এক জাতের ছবি সম্পর্কে চূড়ান্ত মত দেওয়াও কঠিন।

দৃষ্টি, মেজাজ এবং আঙ্গিকে আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলায় রবীন্দ্রনাথ কোথায় কতটা আলাদা হয়ে যাচ্ছেন বুঝবার জন্য দুটি ছবি পাশাপাশি রাখছি।

অবনীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ একটি কাজ, 'শেষযাত্রা'। ভার বয়ে বয়ে এসে বালিতে মুখ থুবড়ে পড়া একটি উট। তার আধখোলা চোখ, আধখোলা মুখ, বিবশ দেহভঙ্গি দর্শককে বিষাদে আচ্ছন্ন করে। দিনান্তের আরক্তিম আকাশ এই ব্যথিত দৃশ্যটিকে গাঢ় করে আনে। তাকিয়ে তাকিয়ে একে একে চোখে পড়ে সতর্ক ড্রইংয়ের দৃঢ় বনিয়াদ, তার উপরে সূক্ষ্ম তুলিতে বস্তুর বাস্তবতাগুণ ফুটিয়েছেন। রঙের পর্দা কোথাও বিপরীত ব্যঞ্জনায় সংঘাত তৈরি করছে না। চোখ ধাক্কা পায় না। মন থেকে বিষাদের রোমান্টিক অনুভূতি খুব স্বাভাবিক ক্ষরণে ছবিটিতে চারিয়ে যায়।

চোখ ফিরিয়ে রবীন্দ্রনাথের আঁকা উটটির দিকে দৃষ্টিপাতের সঙ্গে সঙ্গে চোখে ধাক্কা লাগে। ড্রইংয়ের অনুপুঙ্খ মানপরিমাণ ঠিক নেই এ ছবিতে। জন্তুটির শরীরে কোনো পেলবতা নেই। সামনের পা দুটি অতিকৃত, মাটিতে জোর দিয়ে আকাশে গলা তোলার প্রয়োজনে। 'চিত্রলিপি' সংকলনে ছবিটির সঙ্গে জুড়ে দেওয়া কবিতায় বলা হচ্ছে "মূঢ় মূক জন্তুর ক্রন্দন।" ('চিত্রলিপি'তে আরোপিত এই কবিতাগুলি ছবি দেখার পক্ষে বিষম বাধা। যাঁরা কবিকে দিয়ে এগুলি লিখিয়েছিলেন— ছবির নিজস্ব মূল্যে তাঁদের আস্থা দৃঢ় ছিল না। রবীন্দ্রনাথও কুণ্ঠিত ছিলেন, তাই ভূমিকার পদ্যটিতে লিখতে হয়েছিল, "সসঙ্কোচে যে কয়টি শ্লোক এনেছি সম্মুখে তব, তার পরে নাই দিলে চোখ")। শুধুই কি জন্তুর ক্রন্দন? আর্ততার এই প্রতিচ্ছবি রোম্যান্টিক বিষাদের আবেশ ছিন্নভিন্ন করে দেয়, আলোড়িত করে দর্শকের চৈতন্য। বিরূপ বিশ্বের আঘাতের মুখে আর্ততায় বা আর্ত প্রতিবাদে শক্ত জমি আঁকড়ে দাঁড়ানো উটটির আকৃতি এক ক্রূর বাস্তবের মুখে দাঁড় করিয়ে দেয় আমাদের। রবীন্দ্রনাথ এখানে বাস্তবের উদ্দীপনা নিয়ে সুচারু কোনো কাজ করতে বসেন নি। প্রবল অভিঘাত ঘটানোর মতো একটি ফর্ম আমাদের সামনে ধরে দিয়েছেন।

অবনীন্দ্রনাথের পেলব মেজাজের কাজটির পাশে তীক্ষ্ণ রেখার বাঁধুনির মধ্যে বর্ণের সংঘাতময় এই ছবির দিকে তাকালে উপলব্ধি করা যায় রবীন্দ্রনাথ কেমন কব্জির জোরে নব্যভারতীয় চিত্রকলার সৌকুমার্য ছিন্নভিন্ন করছিলেন। এই ধরনের

অভিযানের কৃতিত্বে উল্লাস করে নিজেই লেখেন, "With ruthless freedom of an invader, I have been playing havoc in the complacent and stagnant world of Indian art and my people are puzzled for they do not know what judgement to pronounce upon my pictures." (রোটেনস্টাইনকে চিঠি, ১১ জুন, ১৯৩৭)।

এই প্রবলতা প্রসঙ্গেই তাঁর বহু জীবজন্তুর ছবির কথা মনে আসে। পাখি-পশু-সরীসৃপ— অধিকাংশই ভয়ানক-শ্রীধারী, অতি বিশিষ্ট চেহারার প্রাণী সব। আমাদের চেনা পশুপাখির আদলে সব সময়ে চিহ্নিত করাও যায় না। কী এদের পরিচয়, মনের কোন্ অবচেতন থেকে ক্রমাগত উঠে এসে পাতার পর পাতা জুড়ে বসেছে— এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে অনেক জল্পনা হয়েছে। ভব্য, সুকুমার, গীতিময় ব্যক্তিত্বের মানুষ রবীন্দ্রনাথের চেতনার কোনো অতলে এক আদিম অভিজ্ঞতার স্তর আবিষ্কারের উত্তেজনা থাকে এ-সব জল্পনায়। এও আর-এক রকমের তদন্ত। আমাদের রবীন্দ্রচর্চার প্রথা অনুযায়ী খোঁজা হয়েছে— সাহিত্যে কোথায় কোথায় তাঁর মনের আদিস্তর হঠাৎ প্রতিফলিত হয়েছে। অবচেতন শুধুই ভয়াল আদিমতার, অবদমিত যৌনতার আকর কেন হবে বোঝা অবশ্য মুশকিল। অনেক বেদনাময় স্মৃতি, আশ্চর্য চকিত অভিজ্ঞতা, পুরো স্বাদ নেওয়া সম্ভব হয় নি এমন সৌন্দর্যের চিত্রকল্পও তো আশ্রয় পায় অবচেতনে। সে যেমনই হোক, আমাদের আধুনিক ছবির পরিমণ্ডলে রবীন্দ্রনাথের এই কাজগুলি এক বিস্ময়কর ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই। রূপের এই বিশিষ্ট সৃষ্টিরও উৎস পাই পাণ্ডুলিপি সংশোধনে। ছোটো বড়ো লাইন কেটে, কাটা অংশ জুড়ে এমন এক-একটি ফর্ম দাঁড়িয়ে যেত যাতে একটা প্রাণীদেহের আকার ফুটে উঠত। প্রাণী-দেহ, কিন্তু নিশ্চিতভাবে চিহ্নিত করা যায় না। তাতে আর একটু রেখা সংযোজন করে, কালির পর্দা গাঢ় করে একটা পুরো চেহারা দিয়েছেন তবুও। সে হয়তো দাঁড়িয়েছে ভারী শরীর গণ্ডার জাতীয় কোনো প্রাণীতে, হয়তো কোনো দীর্ঘচঞ্চু মহাকায় পাখির রূপাভাসে কিংবা প্রবল গতিময় অনির্দিষ্ট আকার মাত্রে। গাঢ় কালির প্রলেপের মাঝে মাঝে যে ফাঁক রয়ে যায় তারই ফলে গড়নগুলিতে বেধের সংবেদন আসে এবং অলংকরণের স্তর পেরিয়ে এগুলি পূর্ণাঙ্গ ছবির মর্যাদায় উত্তীর্ণ হয়। আধুনিক ভাস্কর্যে বেধের সংবেদন সঞ্চারের জন্য যেমন ছিদ্র রাখা হয়— রবীন্দ্রনাথের ছবিতে কালি বা রঙের প্রলেপের মাঝে মাঝে ছেড়ে যাওয়া জমির ফাঁকগুলির কাজ ঠিক একই। বেধের ধারণা দেওয়া।

প্রাণযাত্রার এই দিক, কত রকমের দেহ ধারণ করতে পারে প্রাণসত্তা, এই পরীক্ষা রবীন্দ্রনাথকে পেয়ে বসেছিল। ক্রমে রঙ চাপিয়েও এ ধরনের কাজ প্রচুর করেছেন, শুধু রেখাতেও করেছেন— যেমন 'সে' বইয়ের ছবি। যে আঙ্গিকেই হোক, প্রতিটি প্রাণী অনন্যসদৃশ, একই ফর্ম বার বার আসে নি। প্রতিটি প্রাণীরই চোখের দৃষ্টি নির্দিষ্ট আবেদন বহন করে। কেউ অসহায়, কেউ হিংস্র, কেউ-বা সকরুণ। আরো দেখার হল, প্রতিটি শরীরের গড়নে ভারসাম্য বজায় রাখার নিপুণতা। ভয়ানক প্রাণীও নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ভারসাম্যে এক ধরনের শ্রী-যুক্ত। প্রাণীর ছবিতে চোখের দৃষ্টির তাৎপর্য ধারণা করার জন্য ললিতকলা অকাদেমি থেকে প্রকাশিত অ্যালবামের ১৯ সংখ্যক (জোড়া সরীসৃপ) ও ২৫ সংখ্যক (পারাবত জাতীয়) ছবি এবং গড়নের বেধ ও ভারসাম্যের ধারণা পাবার জন্য ৪ সংখ্যক (পাখি), ১১ সংখ্যক (পাখি) ও ২০ সংখ্যক (শ্বাপদ) ছবি স্মরণ করা যায়।

ভুল করে বলা হয় এ হল চাপা পড়া আদিম মনোবৃত্তির অভিব্যক্তি। আধুনিক সচেতন একজন শিল্পী কী করে আদিম শিল্পীরই মতো আবেগ অনুভব করবেন। আদিম চিত্রকলা সৃষ্টি এবং চিত্রকলায় আদিম রূপবন্ধের ব্যবহার এক কথা নয়। আদিম শিল্পী আর আজকের সভ্য দুনিয়ার শিল্পীর মধ্যে রয়েছে মানুষেরই তৈরি দীর্ঘ শিল্পবিধির এক জটিল ইতিহাস। আদিম যুগে গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের অভিজ্ঞতার জগৎ আর তার অসচেতন শিল্পবোধ যে আবেগের একতায় মিলত, আজ আর তেমন সম্ভব নয়। তবু, একালের শিল্পী নিজের পরিবেশের শিল্পগত সমস্যার চাপে ফিরে তাকান আদিম কালে। কেউ আরো মৌল ভাবনাও ভাবতে পারেন, যেমন ফ্রান্‌ৎজ মার্ক ভাবতেন পশুর চোখে বিশ্বদৃশ্য যেমন দেখায় তেমনি করে দেখতে হবে শিল্পীকে। মার্কের কথা, পশুর সত্তার মধ্যে ডুবে গিয়ে তার দেখার দৃষ্টি উপলব্ধি না করে আমাদেরই চোখে প্রতিভাত দৃশ্যের মধ্যে পশুদের রেখে দেখার এ কী জঘন্য প্রথা আমাদের। নিজের সময়ের জটিলতায় তিতিবিরক্ত শিল্পীর এ হল চরম প্রতিক্রিয়া। আদিম শিল্পের দৃষ্টান্ত থেকে অবশ্য আধুনিক শিল্পী অভিব্যক্তির, রেখাপাতের, বর্ণপ্রয়োগের

উটাকৃতি প্রাণী

সাবলীলতার আদর্শ পেতে পারেন। যেমন পিকাসো য়ুরোপীয় শিল্পের ইতিহাসে জমে ওঠা আঙ্গিকের জটিলতা পেরিয়ে যাবার তাগিদে আফ্রিকার ভাস্কর্য অনুশীলন করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের এই পর্যায়ের কাজের মধ্যে কিন্তু সর্বত্র আঙ্গিকের সরলতা নেই। সরল হবার চেষ্টাও নেই। জটিল রেখার বুনানিতে, সাদা-কালোর বা বর্ণের সংঘাতেই তীব্র অভিব্যক্তি এনেছেন। আদিম চিত্রকলার সঙ্গে এ কাজের মিল যতটা থিমেটিক, বিষয়গত— ততটা আঙ্গিকগত নয়। হবার কথাও নয়। আধুনিক মনের ছাপ এবং নিয়ন্ত্রণ আসাই স্বাভাবিক। শ্রীরতন পারিমু তাঁর *The Paintings of the Three Tagores* বইয়ে আদিম চিত্রকলার নানান্ নমুনা রবীন্দ্রনাথের কাজের পাশে রেখে যেভাবে মিল দেখিয়েছেন— তা মনে হয় অনেকটাই টেনেবুনে মেলানো।

আমাদের সমকালীন চিত্রকলার পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথ আদিম শিল্পের তীব্রতাময় বিচিত্র এই-সব ফর্ম সৃষ্টি করে প্রমাণ করেছিলেন, পেলবতার জন্য, লালিত্যের জন্য কসরত ছাড়াও শিল্প হয়। দেখিয়েছিলেন, মোহিত করে দেবার দায় নেই শিল্পের, দায়িত্ব হল সৃষ্টিকে সত্তাবান, চরিত্রবান করে তোলা। আধুনিক নন্দনের এই ভিত্তিতত্ত্ব রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত করে দিলেন। "অস্তিত্বগৌরবের টিকা" নিয়ে আবির্ভূত আর্টের সৃষ্টিকে তিনিই বলেছেন "চরিত্ররূপ"। সুন্দর হতে হবে এমন কোনো কথা নেই, হওয়া চাই বিশেষ রূপে গোচর। যা উদাসীন থাকতে দেয় না। প্রবল যার উপস্থিতি। "আর্টের এলেকায় সাহেব-পাড়ার সরকারি বাগানের স্থান নেই, আছে চিৎপুর রোডের।··· চিৎপুর রোডের পঙক্তি আর্টের অভিজাতবর্গের কোঠায়। কুলীনের মেয়ের মতোই চিৎপুর রোড আর্টিস্টের তুলিতে আপন পর্যায় পাবার জন্যে আজ পর্যন্ত অপেক্ষা করে আছে।" ('পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি', ১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯২৫)। ছবিতে ভালো করে হাত দেবার মুখেই নিশ্চরিত্র, সাজানো সুন্দরের বদলে আর্টের এই ভিন্ন আদর্শের কথা রবীন্দ্রনাথ বলছিলেন।

৬

ঋতুতে ঋতুতে বিচিত্র রূপের ঐশ্বর্যে ভরপুর, সূর্যের অপরিমিত আলোয় সমুজ্জ্বল এই স্বদেশের চিরচেনা প্রকৃতির সঙ্গে ছবির আঙ্গিকে নতুন করে বোঝাপড়ায়ও সেই চরিত্ররূপের, ক্যারেকটারের কথাই বড়ো হয়ে ওঠে। গদ্যে, কবিতায় বিশ্বপ্রকৃতিকে রবীন্দ্রনাথ মানবিক অনুভূতির অপরিহার্য আধার করে তুলেছেন। তিনি এই মানসিকতা বোঝাতে "বিশ্বাত্মবোধ" শব্দটি বার বার ব্যবহার করেছেন এবং মানবজীবনে প্রকৃতির ভূমিকা নির্ণয় তাঁর যাবতীয় দার্শনিক লেখার একটি মূল প্রসঙ্গ। শিল্পের নতুন এলাকায় প্রকৃতিকে বর্ণনীয় বিষয় হিসেবে নয়, সাক্ষাৎ দৃশ্যবস্তু রূপে উপস্থাপনে তাঁকে নির্দিষ্ট সমস্যার মুখে পড়তে হল। প্রকৃতি এখানে উপমান নয়, প্রকৃতি কোনো কিছুর পরিপ্রেক্ষিত বা পটভূমিও নয়, নিসর্গচিত্রের এলাকায় প্রকৃতিই চরিত্রবান্ সত্তা। এবং সেই চরিত্র-সত্তাকে ধরে দিতে হচ্ছে নির্দিষ্ট মাপের পটের সীমার মধ্যে। সে সীমার বাইরে কোনো ব্যঞ্জনার, সংকেতের রেশ পৌঁছবে কি পৌঁছবে না— সে-সব প্রশ্ন একজন চিত্রকরের পক্ষে গৌণ, অপ্রাসঙ্গিক।

বাংলার প্রকৃতির বাধাহীন বিস্তারে দৃষ্টি মেলে রবীন্দ্রনাথ উতল হয়ে উঠতেন। সুদূরের ব্যাকুল বাঁশি শুনতে পেতেন। আমাদের ছবিতে প্রকৃতির এই উদার রূপ পাব অবনীন্দ্রনাথের, নন্দলালের কাজে। আশ্চর্য, রবীন্দ্রনাথ উদাস করে দেওয়া, ব্যাকুল করে তোলা প্রকৃতির রূপ কিন্তু তাঁর নিজের নিসর্গচিত্রে ধরার চেষ্টা করেন নি। তাঁর ল্যান্ডস্কেপে আলোর ব্যবহার এত আলাদা যে দেশী বা বিদেশী প্রসিদ্ধ কোনো শিল্পী বা শিল্প-ঘরানার প্রভাবের প্রশ্ন ওঠে না। আলো তিনি রাখেন ছবির জমির ভেতরে, পেছন দিকে। দর্শকের চোখ প্রথমেই প্রহৃত হয় দৃঢ় এবং ঘনত্বময় একক বা দলবদ্ধ গাছপালায়। ভালো কাজগুলির সর্বত্রই জমির সামনেটায় এই রকম গড়ন দেখা যাবে। তার মধ্যে অবকাশ যতটা, তারই ভেতর দিয়ে দৃষ্টি স্তরে স্তরে বাধা পেয়ে পেয়ে এগোতে থাকে। আলোর বিকিরণে বাধা দিয়ে এক-একটি ধাপ, স্তর— দাঁড় করান ছবির মধ্যে। বস্তু যা রাখেন, গাছ বা উঁচু-নিচু জমি— যাই হোক, সমস্ত বস্তু সুস্পষ্ট ভর-সম্পন্ন ঘনত্বময়। এই ঘন ফর্মটি ধরাই তাঁর উদ্দেশ্য। বস্তুর বস্তুত্ব রূপের সীমার মধ্যে আনতে না পারা পর্যন্ত যে রঙের উপরে রঙ চাপিয়েছেন— ছবি নজর করে

দেখলে তা ধরতে পারা যায়। সমস্ত ছবিটিতে আলো ছড়িয়ে পড়ে বস্তুর বর্ণগত গুণ প্রকাশ করতে— এ রীতি একেবারেই এড়িয়ে গেছেন। এইজন্যই তাঁর কাজ য়ুরোপীয় ইম্প্রেশনিস্টদের কাজের সঙ্গে মেলে না। মুকুলচন্দ্রকে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, তরুণ বয়সে প্রথমবার বিলাত প্রবাসে থাকার সময়ে টার্নারের (J.M.W. Turner, ১৭৭৫-১৮৫১) ল্যান্ডস্কেপে নানা প্রহরের আলোর ব্যবহার দেখে মুগ্ধ হতেন। কিন্তু টার্নার নির্দিষ্ট চেনা জায়গার বাস্তবতা নিখুঁতভাবে দেখাবার জন্য যেমন আলো এবং রঙের ব্যবহার করতেন— রবীন্দ্রনাথে সে পদ্ধতি দেখি না। চিত্রগত দৃশ্যের নির্দিষ্ট স্থান-পরিচয় সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কোনোই আগ্রহ নেই। এমন-কি তাঁর ছবিতে গাছপালাও অনেক সময়ে নির্দিষ্ট নামে চিহ্নিত করা যায় না। পটের জমি জুড়ে থাকে ত্রিমাত্রিক গড়নের বিন্যাস। আর ফাঁকা অংশগুলিতে তীব্র আলো যেন জমে কঠিন হয়ে থাকে। কোনো কোনো ছবির জমি বিভাজনে টেন্‌শন (tension) এত তীক্ষ্ণ যে গ্রাফিক্‌সের কাজ মনে হয়। মনোহারিতা নয়, লালিত্য নয়, প্রকৃতিরও চরিত্ররূপ ধরাই ল্যান্ডস্কেপে রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য। এটা আরো ভালো বোঝা যাবে রঙে করা ফুল, ফুলের স্তবকের ছবি দেখলে। পাপড়িগুলিকেও বহু অধ্যবসায়ে ঘনত্বময়, ভরযুক্ত করেছেন। এর পরে আর-এক ধাপ এগোলে বস্তুর মৌল আকারকে ভেঙে বিশ্লেষণ করতে হত, পৌঁছুতে হত কিউবিস্ট রীতিতে।

এই শিল্পীর পক্ষেই তো মানুষের অবয়বের ভঙ্গি, চালচলনের ছন্দ, মুখমণ্ডলের অভিব্যক্তি সম্পর্কে তীব্র আকর্ষণ বোধ করা স্বাভাবিক। মুড্ বা মেজাজ নয়, ব্যক্তিত্বের চরিত্ররূপ ধরা লক্ষ্য তাঁর। এই যদি ঠিক হয় যে, "The Universe has its only language of gesture"— ("My Pictures". *Chitralipi-1)* তা হলে সে মুদ্রার সূক্ষ্মতম, গভীর তাৎপর্যময় প্রকাশ মানব অবয়বেই পাওয়া সম্ভব। প্রাণবান্ জীবমাত্রেরই স্নায়বিক প্রতিক্রিয়া প্রকাশের ভঙ্গি আছে। ভয়ে গুটিয়ে যাওয়ার, রাগে ফুঁসে ওঠার, আক্রমণের বা বশ্যতার ভঙ্গি নানা স্তরের প্রাণীর মধ্যেই কমবেশি দেখতে পাওয়া যায়। দেখা যায় যৌন আবেগ প্রকাশের বা অপত্য স্নেহ প্রকাশেরও ভঙ্গি। পশুপাখির ছবিতে রবীন্দ্রনাথ এই-সব ভঙ্গির ভাষাকে রূপ দিয়েছেন। মানুষের অবয়বগত ভঙ্গির ভাষা অন্য প্রাণীর তুলনায় অনেক বেশি বৈচিত্র্যময় এবং পরিশীলিত এবং জটিল। কারণ, মানবদেহের স্নায়বিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্তির চৈতন্য-নিয়ন্ত্রিত, শুধুই আবেগ-চালিত নয়। একই প্রতিক্রিয়া প্রকাশের ভঙ্গি ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে আলাদা হয়ে যেতে পারে। ব্যক্তির চারিত্রিক প্রাতিস্বিকতায় শারীরিক মুদ্রাগুলি অনন্য হয়ে ওঠে। আর্টে "অনির্দিষ্ট সাধারণ থেকে সুনির্দিষ্ট বিশেষ" মূল্যবান এবং এই বিশেষের "চরিত্ররূপ" রবীন্দ্রনাথ ছবিতে "ব্যক্ত" করতে চান। তাই মানবশরীরের ভঙ্গিবৈচিত্র্যে তাঁর আকর্ষণ এত প্রবল। দুটো বড়ো ভাগে ভাগ করা যায় এই কাজগুলি। শুধু মুখের অভিব্যক্তি ধরে করা কাজ এবং পূর্ণ অবয়ব ধরে করা কাজ। নারী পুরুষ— সব মুখই প্রাপ্তবয়স্ক, ব্যক্তিত্বের পূর্ণতায় উপনীত মানুষের। চেনা মানুষের মুখ কখনো কখনো এসে যাওয়াই স্বাভাবিক। রবীন্দ্রনাথ নিজে স্বীকার করেছেন— তাঁর আঁকা বহু নারীমুখে বৌঠান কাদম্বরী দেবীর চোখের আদল এসে গেছে। শ্রীকেতকী কুশারী ডাইসন খবর দিচ্ছেন, ডার্টিংটন হল-এ এল্‌ম্‌হার্স্ট রেকর্ড্‌স্ অফিসে রাখা নারীমুখের ছবিতে রয়েছে একেবারেই ভিক্‌তোরিয়া ওকাম্পোর মুখের আদল ('রবীন্দ্রনাথ ও ভিক্‌তোরিয়া ওকাম্পোর সন্ধানে', পৃ· ১৩৪)। দ্বিতীয়বার ভাবতে গিয়ে শ্রীমতী ডাইসন আবার বলেন কাদম্বরী দেবীর ভাবমূর্তির সঙ্গে ভিক্‌তোরিয়াকে মিলিয়ে নিয়ে আঁকা এই নারীমুখ (পৃ· ৩৩৩)। কোনো মুখকেই অবশ্য এভাবে প্রামাণিক প্রতিকৃতি বলে মেনে নেবার দায় নেই দর্শকের। প্রামাণিকতার প্রশ্ন বাদ দিয়েই এর চিত্রগত গৌরবের বিচার সংগত। দ্রুত ঘন রেখা সম্পাতে বা রঙের পর্দা জমাট করে আঁকা মুখগুলিতে একটি দুটি ব্যতিক্রম ছাড়া কমনীয়তা ফোটানোর চেষ্টা প্রায় চোখেই পড়ে না। পাণ্ডুলিপি সংশোধনে যেমন কাগজের সাদা বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে তাকেই আলো হিসেবে ব্যবহার করেছেন, সেই পদ্ধতিতেই মুখের ছবিতেও আলোর প্রয়োজন মেটান। আলোর মাত্রা ভেদে কপালের, চোয়ালের শক্ত হাড়ের আভাস জাগে। চাপা ঠোঁট, অশিথিল চিবুকের গড়ন যেন বাণীর পুঞ্জ

অবরুদ্ধ রাখে। কখনো সেই অব্যক্ত বাণীর আভা, কখনো বা রুদ্ধ কোনো যন্ত্রণার অভিব্যক্তি আনেন আয়ত চোখে। কোনো কোনো ছবিতে চোখের মণি একটু উপরে তোলা, নীচে সাদা অংশ অনেকটা ছেড়ে রাখা। এই দৃষ্টির দিকে সরাসরি তাকাতে অস্বস্তি হয়। সে দৃষ্টিতে থাকে পুঞ্জিত অভিযোগ, প্রতিবাদের তীব্রতা। আত্মতৃপ্ত, উচ্ছল, সুখী মানুষের কোনো মুখ পাই না এই পর্যায়ের কাজে। এরা সব যেন ব্যথিত মানবতার প্রতিনিধ। গভীর মর্মভেদী দৃষ্টি এদের। যেমন রবীন্দ্রভবন সংগ্রহে 00.1931.16 -সংখ্যক ছবির দৃষ্টি।

এই সূত্রেই ললিতকলা অকাদেমির সংকলনে অনেকেরই দেখা ৩৫-সংখ্যক ছবিটি মনে পড়া অবধারিত। অমসৃণ, পোড়া-বাদামি রঙের পর্দা ভেদে গড়ে তোলা আবক্ষ এই যুবতী-প্রতিকৃতিটির চোখে চোখ পড়া মাত্র এক মরিয়া ব্যক্তিত্বের ঝাপট লাগে। দর্শকের দৃষ্টি ভিন্ন কোনো বস্তু বা রঙে সামান্য স্বস্তি পাবে এমন সুযোগ রাখেন নি। পটভূমি একেবারে অলাঞ্ছিত, ফাঁকা। শিল্পী দর্শকের দৃষ্টি অবয়বটির সীমার মধ্যে টেনে রাখেন। আকাশে মাথা তোলা মেয়েটির কপালে, নাকের খাড়াইতে, ঠোটের উপরে-নীচে, স্তনে আলোর সামান্য আভাস। তার চেয়ে অনেক তীব্র আলো সংহত রয়েছে চোখে। আমাদের বিদ্ধ করে এই দৃষ্টি এবং অনুভব করি— প্রহৃত হতে হতে মানুষ যখন একেবারে দেওয়ালে পিঠ দিয়ে রুখে দাঁড়ায় তখনই দৃষ্টিতে, দেহভঙ্গিতে বিচ্ছুরিত হয় এমন মরিয়া ব্যক্তিত্ব। ললিতকলার সংকলনেই ছাপা আছে আরো একটি আতঙ্ক জাগানো ছবি (২৭-সংখ্যক)। ঊর্ধ্বমুখী আগুনের শিখার মধ্যে দুহাত তোলা আকাশমুখী এক নারী। লাল রেখায় হাত-মুখ-বুকের আদলটির আভাস দিয়ে ধোঁয়ার আগুনের মাতামাতিতে গোটা পট ভরাট করে তুলেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধের আগে রবীন্দ্রনাথের হাতে একের পর এক এই-সব দাহ এবং যন্ত্রণার আলেখ্য তৈরি হয়ে উঠছিল। সভ্যতার ইতিহাসের এক বিপন্নতার যুগের মানুষজনকে রবীন্দ্রনাথ নিজের অনেক ছবিতে তুলে এনেছেন। এই বাস্তব সংকটের পীড়নে মূক, স্তম্ভিত, আর্ত, কাতর, প্রশ্নাকুল এবং কখনো কখনো তীব্র বিদ্রোহের দ্যোতনাময় মানুষ গড়ে তুলতে তিনি প্রতিকৃতিতে রঙের ব্যবহার সম্পর্কে আমাদের যাবতীয় সংস্কারে আঘাত করেন। নির্বিকারভাবে পোড়া-বাদামি, গোলাপি, সবুজ, উজ্জ্বল হলুদ একাদিক্রমে ব্যবহার করে চলেন। তুলনায় মনে আসে অবনীন্দ্রনাথের হাতের প্রতিকৃতিগুলির কথা। মানুষের ত্বকের বাস্তবিক বর্ণ এবং তাপ তিনি কত ধৈর্যে প্যাস্টেলের পর্দায় পর্দায় মিলিয়ে লীন করা পদ্ধতিতে ধরতেন। তার পাশে রবীন্দ্রনাথের কাজ দেখলে মনে হবে পটের জমিকে তিনি বেপরোয়াভাবে আঘাত করছেন, আক্রমণ করছেন কলমে, তুলিতে। বিভিন্ন রঙের পর্দা বা পোচ মিলিয়ে দেবার প্রয়োজন বোধ করেন নি। এক রঙ থেকে ভিন্ন রঙে যাবার বেলায় মিড়ের কাজ থাকে না, তিনি নির্ভর করেন রঙগুলির স্বতন্ত্র গমকের উপরে। মিশ্র রঙে প্রতিফলিত আলোয় চোখে ধাঁধা লাগে অনেক সময়ে। মনে হয় বুঝি-বা ধাতুর মূর্তি দেখছি। আধুনিক ভারতীয় ছবিতে এ জিনিস একেবারেই নতুন। ভারতীয় ছবিতে তাঁর হাতে নতুন বর্ণ-রুচির ভিত্তি তৈরি হয়েছিল। ঠিকই, "রবীন্দ্রনাথের বর্ণের রুচি উগ্র" (বিনোদবিহারী)। আমাদের ছবির আঙ্গিকের ইতিহাসের দিক থেকে বিষয়টি বিবেচনা করা সংগত। অবনীন্দ্রনাথের ওয়াশ পদ্ধতির অনুকরণ ক্রমে পট-জোড়া এক ঘোলাটে রঙের প্রলেপে দাঁড়িয়েছিল। এই বোধহীন বর্ণপ্রয়োগ রীতিকে রবীন্দ্রনাথ নিজের কাজের দৃষ্টান্তে আঘাত করলেন। রবীন্দ্রনাথের কাজের ইঙ্গিত ভিন্ন রামকিঙ্করের ছবির তীব্র বর্ণরাগ বা বিনোদবিহারীর ছবির স্পষ্ট আলোক-বিন্যাস কি সম্ভব হত। এ সূত্রে পরের আরো অনেক শিল্পীর কাজে রঙ ব্যবহারের সাহসিকতার দৃষ্টান্ত মনে পড়বে।

এখানেই বলবার কথা, তাঁর আত্মপ্রতিকৃতিগুলিও কোথাও বাস্তবিকতার ধারে কাছে আসে না। রূপবান্ এবং রূপ-সচেতন মানুষ ছিলেন, সাজে সজ্জায় কোনো শিথিলতা প্রশ্রয় পেত না কখনো। কিন্তু চিত্রকর রবীন্দ্রনাথের "স্বৈরাচার" সেই অভ্যস্ত রুচিকে পর্যুদস্ত করে। নিজেরই মুখশ্রী আক্রান্ত হয় এই শিল্পীর স্বৈরাচারে। আত্মপ্রতিকৃতিতে কোথাও কৌতুকপ্রফুল্লতা, আনন্দবোধের উজ্জ্বলতা বা সন্তসুলভ ধ্যানী প্রকৃতি দেখতে পাই না। চলতি অর্থে তিনি সুন্দরও নন আত্মপ্রতিকৃতিতে। নিজের মুখের মূল আদলটির আভাস-মাত্র বজায় রেখে ভাঙচুর করেছেন নানাভাবে। যেন-বা একখানা পাথরকেই কেটে কুঁদে নানা ফর্ম বের করেছেন। পুনরাবৃত্তি নেই। প্রতিবারই নতুন করে গড়েছেন নিজেকে।

মিল পাওয়া যায় শুধু চোখের দৃষ্টিতে। গড়নের ভঙ্গিমা বদলেছে, মাধ্যম বদল হয়েছে। কখনো প্যাস্টেলে, কখনো রঙে, কখনো-বা শুধু রেখায় এঁকেছেন। কিন্তু প্রায় সব-কটি আত্মপ্রতিকৃতিতে চাহনি তীব্র ব্যথাহত। এই একই দৃষ্টি তাঁর শেষবয়সের কয়েকটি ফোটোতেও দেখতে পাওয়া যায়। চাহনি এমন ব্যথাহত কেন? দেহ-নিয়তির বিভীষিকায়? বার্ধক্যের মানসিক চাপ যে রবীন্দ্রনাথ এড়াতে পারতেন না, তার বহু প্রমাণ কবিতা থেকে জড়ো করে দেওয়া যায়। কিন্তু শেষ বয়সের এই আত্মপ্রতিকৃতিতে কোথাও শারীরিক কাতরতার ছায়া দেখি না। জীর্ণ, ক্লান্ত বা ফ্যাকাশে মুখ একটিও নয়। শারীরিক দুর্গতি বা দুর্গত শরীরটিকে কখনো ছবির বিষয় করেন নি। দৃঢ় গড়নের গুণে মুখগুলি বরং স্নায়ুর অশিথিল সংবেদনে, সজাগ চৈতন্যে দীপ্তিমান্। তাই মনে হয়, এ ব্যথাহত দৃষ্টিতে সমকালীন ঐতিহাসিক দুর্যোগের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পায়, মানুষের সকল সুকৃতি ধ্বস্ত হয়ে যেতে দেখছিলেন। মানুষের বিবেকের অভিভাবক, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক-শিল্পী-সাহিত্যিকদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথও ঘনায়মান্ সেই সাংঘাতিক সংকট প্রতিরোধের আহ্বান জানাচ্ছিলেন। তাঁর আত্মপ্রতিকৃতিতে কোনো ব্যক্তিগত সংকট নয়, সেদিনের বাস্তব বিভীষিকারই ছাপ রয়ে গেছে। ২৪· ৪· ৩৬ তারিখে আঁকা ছবিটি এ পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ কাজ। যেন মানুষের বয়সী এক প্রাচীন মানুষের মুখ। অভিজ্ঞতাভারাক্রান্ত। মর্যাদাময়। ব্রোন্‌জ মূর্তির উপরে জমা পাতিনার (patina) মতো সবুজ আভায় দুপাশ থেকে আচ্ছন্ন করে এনে জাগিয়ে রেখেছেন বিপর্যয়ের বোধে বেদনাময় মুখ। ব্যথাহত অবলোকন। অবিস্মরণীয়।

শিল্পীর শক্তি পরীক্ষার একটি বড়ো এলাকা মুখোশ-চিত্র। ১৯২৯-৩০ থেকে ১৯৪১ অবধি ধারাবাহিক মুখোশ এঁকেছেন রবীন্দ্রনাথ। মুখ আঁকা মানে একটি সজীব সত্তা সৃষ্টি করে তোলা। মুখ— সে পটের বুকে চির-স্থির হয়েও অভিব্যক্তির দিক থেকে নানা অনুভূতি দ্যোতনা করতে পারে। মুখোশে সেই দ্যোতনার বৈচিত্র্য থাকে না। বৈচিত্র্যহীন একটি, মাত্র একটি ভঙ্গিকে ধরা হয় মুখোশে। এই তফাতটা হয় কী করে? প্রাণিত রেখায় এবং রঙে যে মুখ আঁকা হয় তার মধ্যে সঞ্চারিত থাকে গতিশীলতা। চোখে গতির আবেগ ধরা দেয় মুহূর্তে। মুখোশ চিত্রে রেখার রঙের সেই গতিশীলতা অসাড় করে দেন শিল্পী। তাতেই তৈরি হয় চলনহীন রেখার স্থির ভঙ্গি। রঙে যে আলোর গতি স্বভাবতই ফোটে— তাকেও যেন স্থকিত করে দেওয়া হয়। ফলে ফর্মটাই আলাদা হয়ে যায়। প্রাণময় প্রতিকৃতিগুলির পাশে নিশ্চল মুখভঙ্গির নিদর্শন মুখোশগুলি রেখা ও রঙের ব্যবহারে রবীন্দ্রনাথের নিশ্চিত কর্তৃত্বের প্রমাণ।

পূর্ণ অবয়বের ছবিগুলিতেই ল্যাঙ্গুয়েজ অব জেস্চ্যর মানবিক জীবননাট্যের অশেষ বৈচিত্র্যে রূপবদ্ধ হয়েছে। কিছু ছবিতে আছে বহু মানুষের সমাবেশ। কোথাও মনে হয় যেন এক যাত্রীদল এসে পৌঁছল। কোথাও যেন মঞ্চে অভিনয়ের বিশেষ মুহূর্তের কুশীলবদের ধরেছেন। কিংবা ধরেছেন কোনো আড্ডার আসরের মেয়েদের। কোথাও পাই ইমারতের গড়নে বিভিন্ন মানুষের অবয়ব; যেন প্রাচীন কোনো স্থাপত্যের স্টাডি। কোথাও তীক্ষ্ণ রেখায় বৈপরীত্যময় অভিব্যক্তির সমাবেশ দেখি ভিন্ন ভিন্ন তলে প্রতিষ্ঠিত অবয়বে। এ-সব কাজে কম্পোজিশনের সাহস লক্ষ করার মতো। বহু ছবিতে দুটি চরিত্রকে সন্নিহিত করেছেন। আলিঙ্গনের আবেগে, আশীর্বাদের মুদ্রায় বা প্রেমের তুরীয় উপলব্ধিতে পরস্পর সন্নিহিত চরিত্রগুলি মানবিক সম্পর্কের উত্তাপ বিকিরণ করে। একক মানব-মানবীর ছবিতেও চরিত্রগুলি জীবনযাত্রার নৈমিত্তিকতায় সংলগ্ন। এরা চেনা সংসারেরই মানুষ, অলৌকিক নয়। মাটিতে শরীরের ভর রেখে দাঁড়ায় বা চলাচল করে।

এত কাজের মধ্যে ভালোমন্দ আছেই। অনেক কাজেই আছে আঙ্গিকের পরীক্ষার ছাপ, অসম্পূর্ণতার ছাপ। যে-কোনো শিল্পীর স্টুডিয়োতেই বর্জিত বহু খসড়া পড়ে থাকে। নির্বিচারে কেউ সব-কিছু তুলে এনে প্রদর্শনী সাজায় না। ইদানীং রবীন্দ্রনাথের হাতের কাজ উপস্থাপনায় এই অবিবেচনা চলছে। যামিনী রায় মশায় বলেছিলেন, "রবীন্দ্রনাথের আঁকা মানুষ যখন দেখি তখন মনে হয় না সেটা এখনই নেতিয়ে পড়বে, মনে হয় না হাওয়ায় দুলছে যেন। স্পষ্ট দেখি মানুষটার ওজন আছে, সতেজ শিরদাঁড়া আছে।... ছবির জন্য খোঁজেন সতেজ শিরদাঁড়া।" আবার এও ঠিক যে এই মানব অবয়বের

অনেক ছবিতেই রবীন্দ্রনাথের যাবতীয় বিচ্যুতিও ধরা পড়ে। অবয়ব-সংস্থানের প্রবল অসংগতি ছন্দ-পতন ঘটায়— ড্রয়িংয়ের দুর্বলতাই এর কারণ। শিল্পগত প্রয়োজনে বিশেষ প্রত্যঙ্গের অতিকৃতি ঘটাতে হতে পারে। বিশিষ্ট কোনো ব্যঞ্জনা আনার উদ্দেশ্যে এমন অতিকৃতির বা সামঞ্জস্য ভেঙে দেবার অনেক দৃষ্টান্ত লোকশিল্পে এবং আধুনিক শিল্পে দেখা যাবে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সব ছবি সম্পর্কে এ যুক্তি খাটে না। শ্রীকেতকী কুশারী ডাইসন তাঁর বইয়ে যে প্রতিকৃতিটি দিয়েছেন তার হাতখানি ড্রয়িংয়ের দুর্বলতার দৃষ্টান্ত ("বিশেষত ঐ ঊর্ধ্বোত্থিত হাতটা"-কে শ্রী ডাইসন কেন যে বলেন ইম্প্রেশনিস্টিক !)। শরীরের তুলনায় এখানে হাতখানি যেমন ছোটো, তেমনি অনেক ছবিতে বাড়িয়ে দেওয়া হাত সামঞ্জস্যহীনভাবে অনেক বড়ো। কোথাও কোথাও চলন্ত মানুষের পা ফেলার ভঙ্গি ঠিক ফোটে নি। এ-সব ত্রুটির উপরে কল্পিত ব্যাখ্যায় গৌরব চাপানোয় চিত্রকর রবীন্দ্রনাথের মর্যাদা বাড়বে না। রবীন্দ্রনাথ নিজের দুর্বলতা সম্পর্কে যে খুবই সচেতন ছিলেন তাও ছবির বিশ্লেষণে প্রমাণ করা যায়। সে দুর্বলতা যেখানে আড়াল করতে পেরেছেন সেখানে তাঁর কাজ সমকালীন ভারতীয় চিত্রকলার গণ্ডি ভেঙে বেরিয়ে গেছে। সেই অসামান্য কাজগুলি সামনে আনার, উপযুক্ত নির্বাচনে তাঁর ছবির ঐতিহাসিক এবং শিল্পগত মূল্য যথার্থত তুলে ধরার দায় আছে আমাদের :

৫০/৬০ বছর পরের এই দিনে তেমন একটি নির্বাচিত প্রদর্শনীর ভিতরে হেঁটে যেতে যেতে আমরা অনুভব করব, ১৯৩০-এর আগের সীমাবদ্ধতা থেকে আজকের ভারতীয় শিল্প যে একেবারেই ভিন্ন পর্বে উত্তীর্ণ হতে পারল, রবীন্দ্রনাথের এই কাজগুলিতে সে উত্তরণের সূত্রপাত। মনে পড়বে, ৭০তম জন্মদিনের উৎসবে কলকাতায় টাউন হলে ১৯৩১-এর ২৫ ডিসেম্বর যে শিল্পপ্রদর্শনীর উদ্‌বোধন করা হয়েছিল সেখানে প্রথম রবীন্দ্রনাথের ছবি দেশের সাধারণ মানুষের সামনে রাখা হয়। অধ্যক্ষ মুকুল দে ১৯৩২-এ ফেব্রুয়ারি মাসে গভর্নমেন্ট স্কুল অব আর্ট-এ আর-একটি প্রদর্শনী করেছিলেন। য়ুরোপে ১৯৩০-এ অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীগুলির আলোড়ন মিলিয়ে না যেতেই দেশেও চিত্রকর রবীন্দ্রনাথের পরিচয় পাবার কিছু সুযোগ অন্তত হয়েছিল। খুব সাড়া পড়ে নি হয়তো, আজই-বা ছবি কতটুকু সাড়া জাগায় আমাদের মধ্যে ! শিল্পীরা, শিল্প বিষয়ে আগ্রহী মানুষেরা এই যে একেবারেই প্রচলিত রীতি-বিরোধী অনেক কাজ একসঙ্গে দেখবার সুযোগ পেলেন— শিল্পরুচি এবং শিল্পশিক্ষার উপরে এ অভিজ্ঞতার প্রভাব কীভাবে কতটা কাজ করেছিল এই ভাবনাও মনে আসবে। আমাদের ছবির প্রচলিত যাবতীয় ধ্যানধারণা যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে বড়ো রকম নাড়া খেল তাতে সন্দেহ নেই। অবনীন্দ্রনাথ ভাবতেন, রবীন্দ্রনাথের ছবি থেকে "আর্টের পণ্ডিতেরা কোনো আইন বের করে যে কাজে লাগাতে পারবে··· মনে হয় না।" (আর্টপ্রসঙ্গ", 'বিশ্বভারতী পত্রিকা', শ্রাবণ ১৩৪৯)। তবুও ১৯৩০ থেকে অবনীন্দ্রনাথ ছবি আঁকা ছেড়ে দিয়ে যে চুপচাপ বসে থাকেন এবং ১৯৩৮/৩৯-এ কবিকঙ্কণ চণ্ডী ও কৃষ্ণমঙ্গল সিরিজের ছবিতে য়ুরোপীয় রিয়লিজমে তাঁর মৌলিক শিক্ষার ভিত্তি থেকে সরে এসে মূর্তিধর্মী, প্রবল অভিব্যক্তিময় সব চরিত্ররূপ সৃষ্টির জন্য বর্ণপ্রয়োগের প্রতিষ্ঠিত রীতি যে লঙ্ঘন করেন— তার মূলে কি রবীন্দ্রনাথের রীতিভাঙা কাজের কোনোই প্রভাব ছিল না ? কিংবা ১৯৩০/৩১ থেকে স্থিতধী শিল্পী নন্দলালের কাজেও যে নতুন পরীক্ষার উত্তেজনা দেখা দেয়, 'মধ্যাহ্নের স্বপ্ন', 'পলাশ', বা 'বোলপুরের পথে'-র মতো ছবিতে যে বিষয়ের অনুপুঙ্খ ছাপিয়ে বর্ণের উদ্দীপনা ও গতি ধরবার আগ্রহ প্রকাশ পায়— তাঁর কলাবিধির এই-সব পরিবর্তনে কি রবীন্দ্রনাথের কাছে কিছু ঋণ নেই ? শান্তিনিকেতনে কলাভবনের দৈনন্দিন শেখানোর পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথের ছবির প্রসঙ্গ আনা হত না। ১৯৪৩-এর আগে এখানে তাঁর ছবির কোনো প্রদর্শনীও হয় নি। কিন্তু তরুণ শিল্পী-অধ্যাপকদের কারো কারো চেতনার রূপান্তরে যে রবীন্দ্রনাথের ছবির সাক্ষাৎ প্রভাব ছিল তার প্রমাণ আছে। বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় ছাত্রদের সরাসরি বলতেন, "আমাদের দেশে মডার্ন যে এক্সপেরিমেন্ট হচ্ছে সেটা গুরুদেবই করছেন। একটা লোকের ভেতরে যদি চরম সেন্স অব রিজন্‌, মিউজিক, কালার থাকে তার অ্যাকাডেমিক ট্রেনিং দরকার হয় না" (শ্রীপ্রভাস সেনের স্মৃতি)। অন্যদিকে কলকাতায় গভর্নমেন্ট স্কুল অব আর্ট-এও এই সময়ে মুকুল দে-র অধ্যক্ষতায় পঠনপাঠন ব্যবস্থায় যে পরিবর্তন এসেছিল, তামাদি হয়ে যাওয়া য়ুরোপীয় পদ্ধতির পরিবর্তে আধুনিকতর কলাবিধির সঙ্গে ছাত্রদের পরিচিত করিয়ে দেবার যে আয়োজন করা হচ্ছিল, রবীন্দ্রনাথের নতুন নন্দনভাবনার আনুকূল্য ভিন্ন বোধ হয় তা

সম্ভব হত না। রুচির হাওয়াবদল এইভাবেই ভারতীয় শিল্পকে আবদ্ধ দশা থেকে মুক্ত করেছে।

অনেকবার রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছবির অভারতীয় চরিত্রের কথা বলেছেন। এতে "বিশেষ প্রদেশের পরিচয়" নেই। "আমি যে শতকরা একশো হারে বাঙালি নই, আমি যে সমান পরিমাণে য়ুরোপেরও, এই কথাটারই প্রমাণ হোক আমার ছবি দিয়ে" (নির্মলকুমারী মহলানবিশকে চিঠি, ১৮·৮·১৯৩০)। "আমার ছবি ও গান সমুদ্রের দুই তীরে দুই নীড়ে ভিন্ন বাসায় থাকবে" (দিলীপকুমার রায়কে চিঠি, ১৭· ৬· ১৯৩১)। সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে লেখেন, ছবি আর য়ুরোপ থেকে "জন্মভূমিতে" ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন না। (১· ৪· ১৯৩০)। দেশে "অযোগ্য অভাজনদের" সমালোচনায় উত্ত্যক্ত হয়ে এমন অভিমান প্রকাশ করেছেন বোঝা যায়। কিন্তু সে-সব উত্তাপ থেকে অনেক দূরের মানুষ আমরা সত্যিই কি তাঁর ছবির ভুবনে এই চেনা স্বদেশের বাতাবরণ আদৌ পাই না? ৫০ বছর আগের দর্শক বাধা পেতেন অনভ্যস্ত আঙ্গিকে। বিষয়ের অনুষঙ্গ বাদ দিয়ে ছবি দেখার অভ্যাস ছিল না। অন্তর্বর্তী সময়ে ভারতীয় ছবিতে যে বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেছে— সেই অভিজ্ঞতা নিয়েই এখন আমরা রবীন্দ্রনাথের কাজ দেখতে যাই। তাঁর আঙ্গিক আমাদের দৃষ্টি প্রতিহত করে না, অব্যবহিত সংবেদনে কোনো বাধা থাকে না। প্রদর্শনীর ভেতরে চলতে চলতে পটধৃত যে-সব মানুষজন দেখতে পাই— তাদের দৃষ্টিতে, মুখের, অবয়বের গড়নে, হাঁটাচলার, আবেগ প্রকাশের কিংবা নাচের ভঙ্গিতে, মুদ্রায় যে নৃতাত্ত্বিক জাতি-পরিচয় ফোটে— তাকে একান্তই ভারতীয় বলতে হবে। নিসর্গ-দৃশ্যাবলিতেও রয়েছে এ দেশেরই আলো-হাওয়া। বিমূর্ত ছবির মধ্যে তাঁর বিশিষ্ট ক্যালিগ্রাফিক কাজের ছন্দোময় রেখার গতির সঙ্গেও কোথাও একটা নাড়ির যোগ অনুভব করি। শুধু যে-সব বিমূর্ত ছবিতে ঐ ছন্দোময় রেখা নেই, ঋজু বা কৌণিক তীক্ষ্ণ রেখার ব্যবহার রয়েছে— তারই সামনে আমাদের কিছুটা চকিত হতে হয়। চোখ সইয়ে নিতে হয়। এ রকম কিছু ছবি ভিন্ন ভারতীয় মেজাজ এবং বাতাবরণ পাই সর্বত্রই। "ভারত শিল্পের মার্কা দেওয়া" কাজ নয় আদৌ, কিন্তু এই ভারতীয় মাটিতে দাঁড়িয়েই তিনি কাজ করেছেন। চিত্রকলায় ভারতীয়ের আত্মপরিচয় বিশ্বের আধুনিক শিল্প-ভাষায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

রীমূর্তি
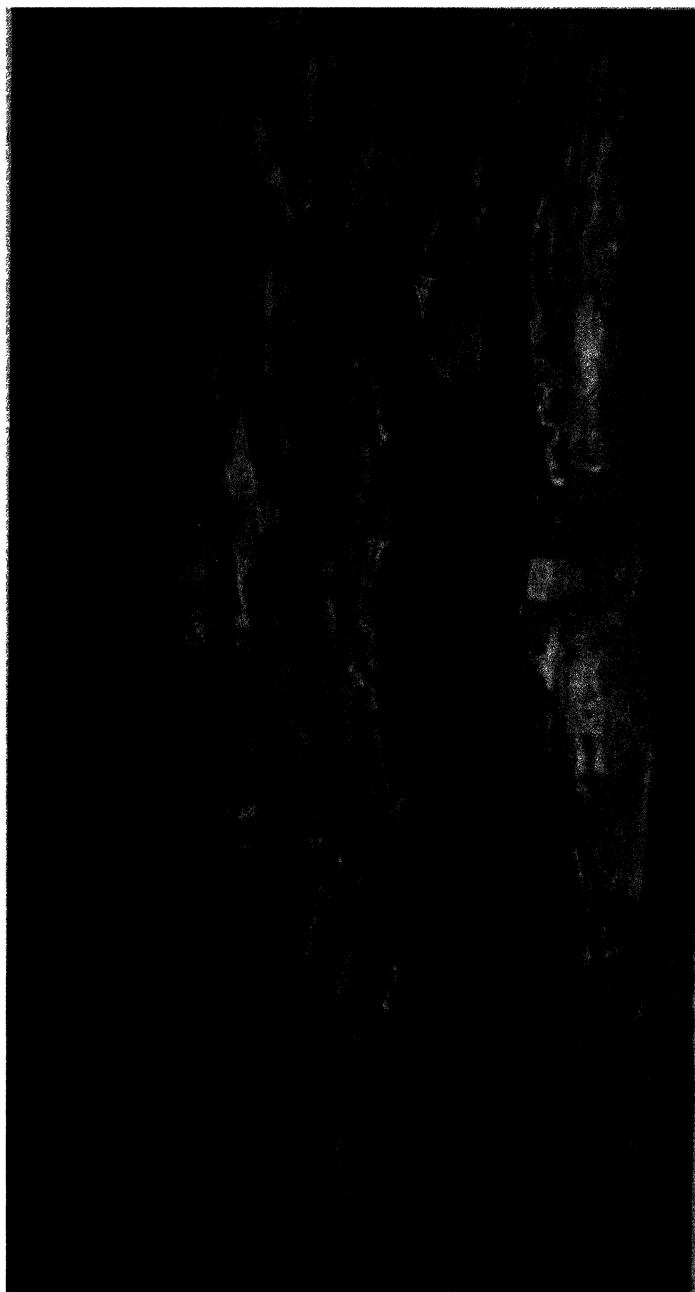
নির্জন এককের গান

সুধীর চক্রবর্তী

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে থাকতেন চুঁচুড়ায়। তাঁর দৌহিত্রী সরলা সেই সময়ে বোটের মাঝিদের কাছ থেকে শিখে নিতেন অনেক লৌকিক বাংলা গান। পরে সেই-সব গান শোনাতেন যুবক রবীন্দ্রনাথকে। তাঁর ভাষায়— 'যা কিছু শিখতুম তাই রবিমামাকে শোনাবার জন্যে প্রাণ ব্যস্ত থাকত— তাঁর মতো সমজদার আর কেউ ছিল না। যেমন যেমন আমি শোনাতুম— অমনি অমনি তিনি সেই সুর ভেঙে, কখনো কখনো তার কথাগুলিরও কাছাকাছি দিয়ে গিয়ে এক একখানি নিজের গান রচনা করতেন।'

এখানে অসতর্কতাবশত একটা অনুল্লেখ থেকে যায় যে, গানগুলি শোনানো আর সেই সুর ভেঙে নতুন গান বাঁধার মধ্যে অনেকসময় থাকত কয়েক বছরের ব্যবধান। এইরকম একটা গান ছিল ঢপকীর্তনের ধাঁচে বাঁধা প্রয়োগে গ্রাম্য গান :

হরিনাম দিয়ে জগৎ মাতালে আমার একলা নিতাই।
আমার একলা নিতাই একলা নিতাই একলা নিতাই ॥

আশ্চর্য যে, এই গান সরলা দেবীচৌধুরানীর কাছে শোনার বেশ ক'বছর পরে, ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে দেশোদ্দীপনার গান লেখার সময় রবীন্দ্রনাথ লিখলেন :

যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে।
একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে ॥

দুটো গানের সুরের চলন আর গানের নির্মিতি একই রকম অথচ একটু গভীর বিবেচনায় বোঝা যাবে, একটা গান থেকে আরেকটা গান যখন সাধিত হয়েছে তখন শুধু সুর-কাঠামোটুকু গৃহীত হয় নি। নতুন গানকে জাগিয়ে দিয়েছে পুরানো গানেরই এক অমোঘ শব্দ। 'একলা নিতাই' কথাটাই মূল গানে ঘুরে ঘুরে বাজে, রবীন্দ্রনাথের গানে কথাটা রূপান্তরিত হয়ে যায় 'একলা চলো' এই অনুজ্ঞায়। 'এক্‌লা' শব্দটি রবীন্দ্রনাথকে এতটাই প্রেরণা দেয় যে তিনি বঙ্গভঙ্গজনিত উত্তাল দেশকালের অন্তর্বিক্ষোভে জাগরণীমন্ত্র দেন এই উচ্চারণে, 'একলা চলো রে'। এই একলা চলার গহনসংকল্প অন্তরাতে দাঁড়ায় 'একলা বলো', সঞ্চারীতে 'একলা দলো', এবং গানের অন্ত্য-উচ্চারণে তা পূর্ণতা পায় 'একলা জ্বলো' এমন নিঃসঙ্গ প্রতিজ্ঞায়। এই গান তাই বঙ্গভঙ্গের তৎসাময়িক উত্তেজনা পার হয়েও বেঁচে থাকে আমাদের জীবনে। আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের সঙ্গবিহীন বহুধিক্কৃত পথে এই গান আলো ধরে। স্বয়ং গান্ধীজি তাঁর অহিংসার একক বিপ্লবে এই গানটিকেই বেছে নেন।

এখানে ভাবনার বিষয় দুরকম। 'একলা নিতাই' শব্দধ্বনি কেমন ক'রে 'একলা চলো' এই গূঢ় প্রবর্তনায় স্রষ্টাকে টেনে নিয়ে যায়, কী ক'রে সম্ভব করে একটি নতুন ভাবের গান বুনতে। আরো ভাবতে হয়, একলা শব্দে এতখানি ব্যঞ্জনা এতটা অন্তঃসঞ্চারী শক্তি যিনি ভ'রে দেন তাঁর একলার সাধনা না জানি কতখানি আন্তরিক। এইসূত্রে রবীন্দ্রভাবুকদের মনে পড়বে যে, তিনি বরাবরই একলা। জোড়াসাঁকোয় সেই বিরাট পরিবারে তাঁর শৈশব-কৈশোরে তিনি যেমন একলা ছিলেন, ততটাই একলা ছিলেন শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপনের সময়। বাংলার ত্রাসবাদী আন্দোলনে, গান্ধীজির অসহযোগ বিপ্লব ও চরকাপ্রয়াসে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সঞ্চারিত হননযজ্ঞে, জালিয়ানওয়ালাবাগের বর্বর হত্যাকাণ্ডে— সর্বক্ষেত্রেই

ধ্বনিত হয়েছে তাঁর একক আর্তকণ্ঠ। জীবনে ও সমাজে তিনি মূলত ছিলেন একা। শিক্ষা নিয়ে নিরীক্ষা, সমাজ-রাজনীতি নিয়ে তাঁর ভাবনা, তাঁর গান গাওয়ার ধরন, তাঁর ছবি আঁকার বিষয়, তাঁর নাটকের সংলাপ কোনো কিছুই কি এদেশে স্বতই গৃহীত হয়েছে? সব ক্ষেত্রেই কি আমরা দেখি না তাঁর একক অবস্থান? তাঁর ভালো-লাগা মন্দ-লাগা, তাঁর মনুষ্যধর্মের অভিনব ধারণা, তাঁর রাগমিশ্রণের রীতি, তাঁর জীবনদেবতার বোধ, তাঁর সাহিত্যাদর্শ— এতসব বিচিত্র বিষয় বোঝাতে কেবলই কি তাঁকে করতে হয় নি তর্ক আর পত্রযুদ্ধ?

এইসঙ্গে অবশ্য আরেকটা কথা বিবেচনাযোগ্য মনে হয়। আশি বছরের সুদীর্ঘজীবনের রবিপথরেখা অনুধাবন করলে দেখা যায়, মানুষটি তাঁর কাজের প্রবর্তনায় ছিলেন নিঃসঙ্গ একক, কিন্তু তাঁর কাজের আবেগে ও প্রাণনে উদ্‌বুদ্ধ করেছেন অনেককে। সেই সংগঠনের সাফল্যে ছিল তাঁর একক প্রত্যয়ের শক্তি। 'মুক্তধারা'র ধনঞ্জয় বৈরাগীর মতো একলা পথে তিনি জাগাতে চেয়েছিলেন প্রত্যেকের আত্মতাকে। এই যে আত্মজাগরণ ও সর্বময় জাগরণের উদ্দীপনা জাগানো তার উৎসভূমিতে ছিল এক সানন্দ স্রষ্টা। যিনি একা অথচ সেই একাকিত্বই যাঁর সৃজনের সূচনা। একলা পথে চলাকেও যিনি রমণীয় করতে উৎসুক। যাঁর বিশ্বাসী উচ্চারণ: 'একলা পথে চলব সোজা'।

তা হলে কি এককতাই তাঁর শক্তি? নিঃসঙ্গ সাধনা যেমন সাধকদের অন্তরে জাগায় সাহস, তেমনই কোনো সাহস কি তাঁকে কেবলই নতুন নতুন পথে টেনেছে? নিঃসঙ্গতা আসলে তাঁকে সমৃদ্ধ করেছে, ভেতরের মানুষটিকে জাগিয়েছে। তার ফলে, তাঁর একলা চলার পথ কখনো ক্লান্তিতে বিধুর হয় না হতাশার উপলখণ্ডে বাধা সৃষ্টি করে না। এ পথেই তাঁর ক্রমমুক্তি, তাঁর ক্রমোন্মোচন। কেননা তাঁর নিঃসঙ্গতায় ভরা থাকে নন্দনের আহ্বান, চিরসুন্দরের অভিবন্দনা।

মানুষের জীবনদর্শনে এ এক আশ্চর্য বৈপরীত্য যে, জন্মাবধি অন্তঃশীলভাবে নিঃসঙ্গ এই মানুষ বৃহৎ জনসংসর্গে পান নি স্বস্তি বা সান্ত্বনা, বরং 'দেওয়া হল না যে আপনারে' এই ব্যথাই বড়ো হয়ে বেজেছে। এও একধরনের জীবনসাধনা। মগ্নতার, অন্তর্লগ্নতার মধ্যে আত্মবেদনাকে গভীরভাবে উপলব্ধি করা। তার থেকেই উৎসারিত হয়েছে গান। যেমন ১৮৯৩ সালের ১০ জুলাই সাজাদপুর থেকে একটা চিঠিতে লিখেছেন 'বড়ো বেদনার মতো বেজেছ তুমি হে আমার প্রাণে' গানটি প্রসঙ্গে, 'এ-সব গান যেন একটু নিরালায় গাবার মতো।' আরেকটি গানের উল্লেখ আছে 'জীবনস্মৃতি'-তে,

> বেলা বাড়িয়া চলিতেছে, বাড়ির ঘণ্টায় দুপুর বাজিয়া গেল, একটা মধ্যাহ্নের গানের আবেশে সমস্ত মনটা মাতিয়া আছে, কাজকর্মের কোনো দাবিতে কিছুমাত্র কান দিতেছি না, সেও শরতের দিনে।—
>
> হেলাফেলা সারাবেলা
> এ কী খেলা আপন-মনে।

এই যে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত অন্তহীনভাবে গান গেয়ে চলা 'আপন-মনে' সেকি এক বিরাট চালিকাশক্তি থেকেই আসে নি?

এই আপন-মনে থাকতে চাওয়ার আর্তি তাঁর কত গানে শুনেছি আমরা। 'ছিন্নপত্রাবলী'-র ৫৪-সংখ্যক চিঠিতে তিনি লেখেন,

> মানুষের ঘনিষ্ঠতা আমার পক্ষে নিতান্ত দুঃসহ। অনেকখানি ফাঁকা চতুর্দিকে না পেলে আমি আমার মনটিকে সম্পূর্ণ unpack ক'রে বেশ হাত পা ছড়িয়ে গুছিয়ে নিতে পারিনে।

৭৫-সংখ্যক চিঠিতে লেখেন,

> এই লোকনিলয় শস্যক্ষেত্র থেকে ঐ নির্জন নক্ষত্রলোক পর্যন্ত একটা স্তম্ভিত হৃদয়রাশিতে আকাশ কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে, আমি তার মধ্যে অবগাহন করে অসীম মানসলোকে একলা বসে থাকি।

দুটি উৎকলন থেকে সঙ্গহীন অথচ পরিপূর্ণ মানুষটিকে চিনতে অসুবিধা হয় না। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে 'আমায় থাকতে দে না আপনমনে' কিংবা 'কেন তোমরা আমায় ডাকো' এই গানদুটির মর্ম বেশ বোঝা যায়।

কিন্তু কিছু গান দ্বৈধ জাগায়। যেমন একটা গানে রবীন্দ্রনাথ যখন নিঃসংশয়ে বলেন,

একতারাতে একটি যে তার আপন-মনে সেইটি বাজা।

তখন অন্য এক গানে প্রকাশ করেন এমন খণ্ডতা যে,

একতারাটির একটি তারে গানের বেদন বইতে নারে।

এখানে এই যে দুই গানে বিপরীত দুই বাণী ও উপলব্ধি তা কি বিরোধী ? আসলে সাধকের দ্বিস্তর বোধহয় ফুটে উঠেছে দুই গানে। প্রথম গানে স্পষ্টত রয়েছে আত্মস্থ হয়ে একাগ্র হ'তে বলা কিন্তু দ্বিতীয় গানে গানের বেদন কথাটি নতুন। জীবন যেখানে প্রকাশমান, আত্ম অবগুণ্ঠন খুলে যা মিলতে চায় বিশ্ব-বেদনায় সেই সৃজনের সংবেদে ভাঙতে হয় নিজেকেই। এই কথাটাই হয়তো স্পষ্ট হয় তাঁর একটি উক্তিতে, যেখানে তিনি বলেন, 'আমাদের সংগীত একের গান, একলার গান— কিন্তু তাহা কোণের এক নহে, তাহা বিশ্বব্যাপী এক।'

এই অনুভবের ভরকেন্দ্র থেকে রবীন্দ্রসংগীতের জন্ম। নিজের একের সঙ্গে বিশ্বব্যাপী একককে মেলানো। বরং বলা চলে মেলাতে চাওয়ার আততি, মেলাতে না-পারার বেদনা, মেলানোর নিবিড় গভীরগোপন আনন্দ— এই-সব অনুসূক্ষ্ম বোধ রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে ধরেছেন। বিরস-দিন বিরল কাজের অবকাশে সহসা প্রেম মহাসমারোহে এসে দরোজা ভাঙে। একেলা থাকার অলস মনকে বিধ্বস্ত ক'রে প্রেম সংযোগ সাধন করে বিশ্বৈক্য বোধের সঙ্গে।

এ যদি হয় ক্ষুদ্রের বিস্তার বৃহতের অভিমুখে ও সংসর্গে, যদি বা তাকে রূপক দিয়ে বলি একতারায় সাতটি তার সংযোজন, তবে বিপরীতটাও সত্য হয়ে ওঠে রবীন্দ্রনাথের গানে। বাহির পথে যে-হৃদয় বিবাগী হয়ে ঘুরে ঘুরে শুধুই ভ্রষ্টসঞ্চয়ের বোঝা বাড়ায়, জীবনের প্রবল তাপে যা কেবলই লবণ সমুদ্রের অতৃপ্তি জাগায়, তাকে কুড়িয়ে এনে জড়ো করা চাই আত্মস্থতায়, আপন মৌনে। কেননা 'না যদি রয় সাথি' কিংবা 'না যদি জ্বলে বাতি' তবু,

তবু তো আছে আঁধার কোণে ধ্যানের ধনগুলি—
একেলা বসি আপন-মনে মুছিবি তার ধূলি

রবীন্দ্রনাথের গানের অন্তঃপুর এমন দ্বৈধপরিকীর্ণ এক আধোচেনা জগতের সমীপবর্তী করে আমাদের। বাইরের দিক থেকে সংবরণ আর ভিতর থেকে ক্রমপ্রসারণ রবীন্দ্রগীতির নিভৃত মর্মে এমন এক দোলাচল আমাদের আপ্লুত করে। তাঁর গানের ভিতরে যে-এক ও একাকিত্ব তাকে জানলে রবীন্দ্রনাথকেও অনেকটা জানা হয়ে যায়।

তাই ব'লে রবীন্দ্রনাথের গানের মধ্যে ফুটে-ওঠা একাকিত্বের ধারণাকে অ্যালিয়েনেশন বলা যাবে না। যদিও কোনো এক অভীপ্সিত প্রাপ্তির রাজ্য থেকে তিনি ভ্রষ্ট হয়েছেন এমন বোধ তাঁর এক-একটা গানে শুনি আমরা ('ঠাঁই হল না তোমার সোনার নায় গো') কিন্তু তাঁর গানে সমাজ-বিচ্ছিন্নতা বা ব্যক্তিসংসর্গের বিষয়ে বিরাগ দেখা যায় না। 'আমি আপনাকে আজ মেলব যে বাইরে' এই আকাঙ্ক্ষা যাঁর, তিনি কি আত্মপ্রচ্ছন্ন থাকতে পারেন ? তাঁর গানে তাই যদি একলা থাকার অহংকার থাকে, থাকে একা জাগার প্রস্তুতি তবে তার কোনো স্পষ্ট কারণ খুঁজে দেখতে হবে আমাদের।

তার আগে বিবেচনা করা উচিত সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি চমৎকার অনুচিন্তা। তিনি লক্ষ করেছেন :

> ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতায় ডিসোলেটেড্ প্রান্তরে যেমন নিঃসঙ্গ কৃষকের দুঃস্থ ছবি পাওয়া যায়, রবীন্দ্রনাথের গানে সে রকম কোনো নির্দিষ্ট সামাজিক মানুষের দেখা নেই। তাঁর গানের কবিতায় ব্যক্তি মানুষ নেই নয়— আছে— কিন্তু তারা ভূমিসম্পর্কে গ্রথিত সমাজ-জীবনের কেউ নয়। মাঝি, রাখাল, সাপুড়িয়া, পথিক তাঁর গানে কমবেশি দেখা দিয়েছে। এদের বৈশিষ্ট্য এদের একাকিত্বে।

এমনতর মৌলিক আবিষ্কারের পিঠোপিঠি তিনি অধিকতর যে কথা বলেন নি সেটুকু আমরা সংযোজন ক'রে বলতে পারি : রবীন্দ্রসংগীতে মাঝি রাখাল পথিক এরা তো পরমের প্রতীক। মধ্যদিনের গানবদ্ধ পরিবেশে যে-রাখাল একাকী বেণু বাজায়, কিংবা হালের কাছে যে-মাঝি আছে তরী পারাপারে ব্রতী কিংবা যাকে সম্বোধন ক'রে বলা হয় 'একেলা কোন্ পথিক তুমি পথিকহীন পথের 'পরে' তারা কি সমাজের মানুষ ?

এই প্রশ্ন থেকে প্রকৃতপক্ষে একটি সিদ্ধান্তের দিকেই এগোতে পারি : রবীন্দ্রনাথের গানের ভুবনের সঙ্গে সমাজের

সম্পর্ক অব্যবহিত নয়। এ-গান একজন নির্জন ব্যক্তির আত্ম উৎসার। শাহীবাগে প্রথম কৈশোরক গান রচনার ('নীরব রজনী দেখ মগ্ন জ্যোছনায়') সঙ্গে শিরোধার্য যে-নিঃসঙ্গতা তা শেষজীবনের গানেও ছায়াসঞ্চার করে। মেঘের পরে মেঘ জমে-ওঠা ক্ষণে সেই সঙ্গহীনতার আকৃতি শুধু দ্বিগুণিত হয়। 'গান পরে গাই গান' তবু 'রই ব'সে একা'। একমাত্র গানের ভিতর দিয়ে রবীন্দ্রনাথের একাকিত্বের অন্তঃকরণ আমরা বুঝে নিতে পারি। বুঝতে পারি এই অত্যাধুনিক উচ্চারণের মর্ম :

'হাজার লোকের মাঝে রয়েছি একেলা যে'।

হাজার লোকের মাঝে রয়েছি একেলা যে— এই উপলব্ধি প্রায় জীবনানন্দের কাব্যজগতের সংলগ্ন। কিন্তু তাঁর এ-উপলব্ধির মধ্যে বিশ্বযুদ্ধজনিত অবক্ষয় ও হতাশার স্পর্শ নেই। নেই, কেননা তাঁর এই এককতার উপলব্ধি আসলে অন্যতর কোনো পরমপ্রাপ্তির প্রাক্‌মুহূর্তের। তা বোঝা যাবে গানের অন্তরা-অংশের সম্পূর্ণ উৎকলনে। বলা হচ্ছে :

হাজার লোকের মাঝে রয়েছি একেলা যে—
এসো আমার হঠাৎ-আলো, পরান চমকি তোলো॥

প্রেম-পর্যায়ের এই গানে যার আবির্ভাবের প্রার্থনা রয়েছে সে প্রেমিক না পূজ্য তা নিয়ে সংশয় ঘোচে না। তবে অতুলপ্রসাদ যখন বলেন : 'এসো গো একা ঘরে একার সাথী' সেই প্রার্থিতের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের হঠাৎ-আলো-র স্বরূপগত তফাত আছে। অন্য এক গানে রবীন্দ্রনাথ তাঁকেই বলেন ঘুম-ভাঙানিয়া আর দুখজাগানিয়া। অন্তর শান্ত জীবনের চমক লাগানো তাঁরও কাজ। সেইজন্যই বলা হয় : বুকে চমক দিয়ে তাই তো ডাক।

এইখানে আমাদের বুঝে নিতে হয়, রবীন্দ্রনাথের গানে নানা ধরনের নিঃসঙ্গতার স্তর আছে। সব নিঃসঙ্গতাই তাঁর শূন্যতাময় নয়। অনেক ক্ষণ-শূন্যতা আসলে বৃহৎ প্রাপ্তির পটভূমি। চারপাশের মানুষ, সঙ্গী সাথী, পরিজন যখন কাজের আহ্বানে বাইরে চলে যায় তখন গীতপুরুষ সঙ্গীবিহীনতায় আক্রান্ত হন। কিন্তু সেই নিঃসঙ্গ শূন্যতা অচিরে জাগিয়ে তোলে দোসর জনের জন্য প্রকৃত আর্তি। এমন এক গান :

আজি এ জগতমাঝে কত সুখে কত কাজে
চলে গেল সবে আগে ;
সাথি নাই পাই
তোমায় চাই
সেও মনে ভালো লাগে।

নানান সুখের সন্ধানে নানান কাজে যারা আগে চলে যায় প্রকৃতপক্ষে তারা শূন্যতা জাগিয়ে দেয় না বরং যথার্থ দোসরজনের জন্য আকৃতি-জাগার প্রেক্ষিত তৈরি ক'রে দেয়। তখন সঙ্গীবিহীন হয়ে 'তোমায় চাই' এই আততি সত্য হয়ে ওঠে। সেও ভালো লাগে। ভালো লাগে চাওয়ার গূঢ় তীব্রতাকে আস্বাদন করতে। তখন চারি দিকে সুধাভরা এই পৃথিবীর ব্যাকুলতাও তাঁর উপলব্ধিতে আসে এবং তাঁকে 'কাঁদায় রে অনুরাগে'।

সঙ্গীদের এই সুখের সন্ধানে আর কাজের আহ্বানে চলে যাওয়া ছাড়াও অন্য এক গানে আছে বিনোদনেরও ডাক। জ্যোৎস্নারাতে বসন্তের মাতাল সমীরণের স্পর্শ নিতে যখন সবাই গেছে বনে তখন নিরালা মানুষটির সংকল্প সম্পূর্ণ বিপরীত :

যাব না গো যাব না যে, রইনু পড়ে ঘরের মাঝে—
এই নিরালায় রব আপন কোণে।
যাব না এই মাতাল সমীরণে॥

সবাই যেখানে গেছে সেখানে আমি যাব না এই প্রতিজ্ঞার কারণ কী? প্রকৃতির তীব্র মত্ত আকর্ষণের চেয়েও বড়ো কোনো আকর্ষণ আছে বোধহয়। তাই ভালো লাগে সজনের সঙ্গের চেয়ে নিরালার নিঃসঙ্গতা। সঞ্চারীতে কারণটি ব্যক্ত হয় :

আমার এ ঘর বহু যতন ক'রে
ধুতে হবে মুছতে হবে মোরে।
আমারে যে জাগতে হবে, কী জানি সে আসবে কবে
যদি আমার পড়ে তাহার মনে
বসন্তের এই মাতাল সমীরণে॥

নিরালায় আসে আত্মসাধনার ক্ষণ, জাগরণের লগ্ন, অতলের আহ্বান। আর আশ্চর্য, যে-বসন্তের মত্ত বাতাস সবাইকে ঘর থেকে বাইরে টানে সেই বাতাস একজনের জন্য সম্পূর্ণ অন্য বার্তা আনে। তা প্ররোচিত করে স্তব্ধতার অপেক্ষায়, ধ্যানে ও সংকল্পে। নিরালা থাকার একা হবার এও এক ধরন। এর কোনোখানে কোনো শূন্যতাবোধ নেই। এখানে প্রসঙ্গক্রমে আমাদের মনে পড়ে ১৯১২ সালে "সংগীত" নামে রবীন্দ্রনাথ যে-রচনাটি লেখেন তাতে চমৎকার এক উক্তি আছে :

> চিরধাবমান বিচিত্রের সঙ্গে যোগ দিয়া তাল রাখিয়া চলা, ইহাই য়ুরোপীয় প্রকৃতি ; আর চিরনিস্তব্ধ একের দিকে কান পাতিয়া, মন রাখিয়া, আপনাকে শান্ত করা, ইহাই আমাদের স্বভাব।...

রবীন্দ্রনাথের গান এই দিক থেকে অন্তর্গূঢ়ভাবে ভারতীয়। গানের বিষয়ে, সামগ্রিক থিমে কেবল নয়, একটি দুটি শব্দ ব্যবহারেও সেই সমতা তাঁর গানে শনাক্ত করা যাবে না। রবীন্দ্রসংগীতের সমগ্র নির্মাণে, তার প্রস্তাবনা থেকেই ভারতীয় অন্তঃস্বভাবী একক সাধনার নানা লক্ষণ সম্পৃক্ত হয়ে আছে। তাঁর সংগীত সাধনার ও গান রচনার মূল কথাটা বিশ্লেষণ করলে সেই সত্য পরিস্ফুট হবে।

২

উনিশ শতকের বাংলাদেশের যে-সমাজ পটভূমি থেকে অভিজ্ঞতা ও রস আহরণ ক'রে রবীন্দ্রনাথ বাংলা গানের ক্ষেত্রে নবস্রষ্টার ভূমিকা নেন সেখানে তাঁকে ভাঙতে হয় অনেক পূর্বাগত সংগীত-সংস্কার। প্রথা ও প্রচলকে ভাঙতে যেমন লাগে আলাদা সাহস তেমনই ভাঙনের পর সৃজনের মৌলিকতা প্রোথিত করতে লাগে এক আলাদা প্রত্যয়ভূমি। এমন নয় যে শুধু গানের ক্ষেত্রেই তিনি ভাঙা ও গড়ার কাজে লেগেছিলেন। শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত যথার্থ বলেছেন : 'শিক্ষাকে যেমন পুঁথির গণ্ডী থেকে, ধর্মকে শাস্ত্রের গণ্ডী থেকে, রাজনীতিকে বক্তৃতামঞ্চ থেকে উদ্ধার করেছিলেন, তেমনি সংগীতকেও ওস্তাদি এবং কালোয়াতি থেকে মুক্ত ক'রে দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছিলেন।' বাংলা গানে এ তাঁর একক কৃতিত্ব। ধর্মনিরপেক্ষ আধুনিক মানুষ তাঁর গানে খুঁজে পেয়েছে নানা অস্তিত্বের স্বাদ। রুচিমান বাঙালির সূক্ষ্ম আত্মানুসন্ধানের ব্যক্ত ও অনুক্ত সব উচ্চারণই রয়ে গেছে রবীন্দ্রসংগীতে। এই যে পূর্ণতার ফসল তাঁর গানে আমরা পাই তার পিছনে তাঁর একক সংগ্রামের বিগ্রহটি তেমন ক'রে কেউ দেখেন না।

সব অর্থেই প্রাণহীন এদেশের গানহীন পরিবেশে তাঁর পিপাসিত চিত্ত যথার্থ গীতসুধা সন্ধান করেছে। সেই রিক্ত সময়ে তাঁর মনে হয়েছিল :

> আমাদের শিল্প সংগীতের প্রতি শ্রদ্ধা আমরা হারাইয়াছি। আমাদের জীবনের সঙ্গে তাহার যোগ নিতান্তই ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে।... আমাদের ঘরে ঘরে গ্রামোফোনে যে-সকল সুর বাজিতেছে, থিয়েটার হইতে যে-সকল গান শিখিতেছি, তাহা শুনিলেই বুঝিতে পারিব আমাদের চিত্তের দারিদ্র্যে কদর্যতা যে কেবল প্রকাশমান হইয়া পড়িয়াছে তাহা নহে, সেই কদর্যতাকেই আমরা অঙ্গের ভূষণ বলিয়া ধারণ করিতেছি। সস্তা খেলো জিনিসকে কেহ একেবারে পৃথিবী হইতে বিদায় করিতে পারে না ; একদল লোক সকল সমাজেই আছে, তাহাদের সংগতি তাহার ঊর্ধ্বে উঠিতে পারে না— কিন্তু, যখন সেই-সকল লোকেই দেশ ছাইয়া ফেলে তখনই সরস্বতী সস্তা দামের কলের পুতুল হইয়া পড়েন।... দুঃখের বিষয় সংগীত আমাদের শিক্ষিত লোকের শিক্ষার অঙ্গ নহে... এইজন্য সংগীত আজপর্যন্ত সে-সকল অশিক্ষিত লোকের মধ্যেই বদ্ধ যাহাদের সম্মুখে বিশ্বের প্রকাশ নাই। ("সংগীত", 'সংগীতচিন্তা', পৃ. ৩৬-৩৮)

এখানে শুধু বাংলা গান সম্পর্কে উদ্‌বেগ নয়, সেইসঙ্গে আছে শ্রদ্ধাবোধের শর্ত এবং আত্ম ও বিশ্বের মধ্যে সমন্বয়ের আকাঙক্ষা।

রবীন্দ্রনাথের গানে আত্ম ও বিশ্বের সম্বন্ধ সবচেয়ে গভীরভাবে ফুটে উঠেছে। আকাশ-ভরা সূর্যতারা সমন্বিত এই বিরাট বিশ্বে স্থানলাভের গৌরবজনিত যে আনন্দ-বিস্ময়, রবীন্দ্রনাথের গান সেই অনুভবের রসনিবিড় অভিজ্ঞান। তাই বনের পথে যেতে গিয়ে যে তৃণস্পর্শের শিহরন, ফুলের গন্ধের যে চকিত চমক তারই আনন্দ ও আবেগ তাঁর গানের অভিভব জাগায়। কিন্তু তাঁর গান তো কেবল বাণীময় নয়। ফুলের গন্ধে চমক লাগার যে-অনুভূতি তাকে প্রকাশ করতে হয়েছে যথার্থ সুরের বয়নে। চমকটা তাই ভাষাতেই আটকে থাকে না, সুরে ছড়িয়ে পড়ে। এ-কাজ কঠিন। বাণী আর সুরে সমানুপাতে মিশিয়ে গানের সিদ্ধি আনা। রবীন্দ্রনাথ এই কঠিনের সাধনসিদ্ধ, তার সংগীতের রসপ্রস্থানে।

তাঁর একার গান একলার গানের বাণী যেমন তিনি অসামান্য দক্ষতায় খুঁজে নিয়েছেন তেমনই সেই বাণীর এককতার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ সুরও তাঁকে বুনতে হয়েছে। ধ্রুপদাঙ্গ চারতুকের নির্মিতি মেনে তিনি বাংলা গানে এনে দিয়েছেন এক অভিনব 'বন্দেশ'। বাণী ও সুরের সেই রসায়ন এমনই সুন্দর যে ভি· ভি· ওয়াঝলওয়ারের মতো মার্গসংগীতের সাধকের মনে হয়েছে : 'রবীন্দ্রসংগীত শুনলে উচ্চাঙ্গ সংগীতের ক্ষেত্রে প্রবেশ করছি এইরূপ অনুভব হয়।' অনুভবের কারণটি অবশ্য তিনি ব্যাখ্যা ক'রে দিয়েছেন। মনে হয়েছে, তাঁর 'রচনাগুলিতে সুরের সঞ্চরণ চিরাচরিত রাগনিয়মের বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করেছে। উচ্চাঙ্গ রাগসংগীতের ক্ষেত্রে মিশ্র রাগে প্রায়শ যা ঘটেছে, অর্থাৎ বিভিন্ন রাগ মিশ্রিত হয়েও মিশ্রিত রাগগুলি নিজের স্বতন্ত্র সত্তাকে অবগুণ্ঠিত রেখে একটি সুন্দর নতুন রূপ গড়তে সহায়তা করেছে, সেরকম প্রক্রিয়া গুরুদেবের গানেও ঘটেছে। রাগসংগীতকে ভিত্তি করেও রাগগুলিকে এমনভাবে খেলানো হয়েছে যে রাগগুলির প্রচলিত বিচরণ পদ্ধতি থেকে পৃথক একটি স্বতন্ত্র অন্তর্মার্গ সৃষ্ট হয়েছে।'

এখানে ওয়াঝলওয়ারের বিশ্লেষণে 'অন্তর্মার্গ' বলে একটি নতুন শব্দ পাই আমরা। বাংলা তথা ভারতীয় গানের দীর্ঘবাহিত মার্গে এই অন্তর্মার্গ সৃষ্টিই রবীন্দ্রনাথের একক কৃতি। এই কৃতি তো একদিনে হয় নি। প্রাথমিক সংগীতজীবনের গানচর্চা, প্রথম যৌবনের হিন্দি গান-ভাঙা, বাংলা কীর্তনের অন্তঃপ্রকৃতির অনুসরণ এই-সব স্তর পার হয়ে গীতাঞ্জলির যুগের ঈষৎ আগে তিনি এই অন্তর্মার্গ পেয়ে যান। তাঁর একলা পথে চলা এরপরই রমণীয় হয়ে ওঠে। সেই একলা চলার আনন্দ এমন-কি আমাদেরও গ্রস্ত করে। খুব ধীরে, ক্রমশ আমরা অনুসরণ করতে শিখি তাঁর গানের ধরনকে। একলা পথে সাধিত তাঁর একার গান হয়ে ওঠে আমাদেরও গান।

বহুদিনের নিভৃত পরিচর্যায় একা-একা রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানের যে রূপবন্ধ তৈরি করেছেন তা বাংলা গানের ইতিহাসে একেবারে নতুন রকম। এই নতুনত্ব তিনদিক থেকে ধরা পড়ে। এক, বাণী ও সুরের মাত্রাগত সমানুপাতে। দুই, গানের কাঠামোয় চারতুকের ব্যবহার ও সঞ্চারী-র অভিনব প্রয়োগে। তিন, গায়নরীতিতে তানের খর্বতায়। এমন অভিনব গান রচনায় রবীন্দ্রনাথের যে-সফলতা তার পিছনে যতটা ইতিহাসের শিক্ষা তার চেয়ে বড়ো ভূমিকা নিশ্চয়ই একক স্রষ্টা মানুষের। এখানে মনে পড়বে ১৯৪১ সালের ৫ জুলাই রবীন্দ্রনাথ রানী চন্দকে বলেছিলেন তাঁর কবিতাপ্রসঙ্গে :

> এই কবির এই কবিত্ব— এইখানেই তার মূল কথা। কোনো ইতিহাস তাকে বানায় নি— সকল ইতিহাসের মূলে সেই সৃষ্টিকর্তা ব'সে আছেন। কবি একলা, তাই হওয়া উচিত।

তাঁর গানের ক্ষেত্রেও স্বচ্ছন্দে উপরের কথাগুলি প্রযোজ্য।

গান রচনার সকল পর্বে তাঁর গানের ধরন এবং সুর রচনার অভিনবত্ব বিষয়ে তাঁকে খুব সচেতন দেখি। ভৈরবী রাগে বাঁধা গানের সংখ্যা যে তাঁর সর্বাধিক এই তথ্য মনে রেখে বুঝতে হবে সচেতনভাবেই এই বিশেষ রাগ প্রযুক্ত হয়েছে তাঁর গানে। রবীন্দ্রসংগীতের মূলভাবের সঙ্গে ভৈরবীর কোনো আবেদনগত ও স্বভাবগত মিল থাকা সম্ভব। প্রসঙ্গক্রমে এখানে ভৈরবী সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য আলাদাভাবে উদ্ধারযোগ্য :

> ক) ভৈরবী যেন সঙ্গবিহীন অসীমের চিরবিরহবেদনা।

খ) ভৈরবী সুরের মোচড়গুলো কানে এলে জগতের প্রতি একরকম বিচিত্রভাবের উদয় হয়... মনে হয়... সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মর্মস্থল হতে একটা গম্ভীর কাতর করুণ রাগিণী উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে।

এইবারে ভৈরবী সুরে ধৃত রবীন্দ্রনাথের নানা বয়সে লেখা কয়েকটি গানের দিকে চোখ রাখলে বোঝা যাবে নিঃসঙ্গ উদাস একাকিত্বের অন্তর্বাণী কেমন ক'রে অমোঘ সুরের স্পন্দে মনোরম হয়ে উঠেছে। গানগুলি :

আমার একটি কথা বাঁশি জানে/১৯১৫
আমার মনের মাঝে যে গান বাজে/১৯২১
আমি যে আর সইতে পারি নে/১৯১৪
আমি যে গান গাই/১৯৩৯
ওগো কাঙাল আমারে কাঙাল করেছ/১৮৯৭
কেন নয়ন আপনি ভেসে যায়/১৮৯২
দিন পরে যায় দিন/১৯২৬
সকরুণ বেণু বাজায়ে কে যায়/১৯২৭

১৮৯২ থেকে ১৯৩৯ সাল এই সুদীর্ঘ সময় ধ'রে তাঁর গানের ভাবোন্মোচনে ভৈরবীর এমন ব্যাপক ব্যবহার আমাদের বুঝিয়ে দেয় গানের ভাবপ্রস্ফুটনের তীব্র আবেগ থেকেই তাঁর ভৈরবী আশ্রয়। রসিক জনের মনে পড়বে বিদেশের সংরাগ-মাখা 'সকরুণ বেণু বাজায়ে কে যায়' গানের সেই অত্যাশ্চর্য শব্দপ্রয়োগের অনুষঙ্গ : 'শরৎ শিশিরে ভিজে ভৈরবী নীরবে বাজে'।

নিজের গানের নিঃসঙ্গ বাণীর বেদনাকে এমনভাবে বুঝে নেওয়া আর তার সঙ্গে সঙ্গবিহীন অসীমের দ্যোতনাভরা সুরের প্রয়োগ তাকে যেন কেউ আকস্মিক সমাপতন না ভাবেন। বুঝতে হবে আরো যে, রবীন্দ্রনাথ-নামক অসামান্য সংগীতকারকে তাঁর জীবনে গ্রহণবর্জন করতে হয়েছে নানা গীতিরীতি। তা কখনো মার্গসংগীতের ঐতিহ্যজাত, কখনো দেশীয় লোকজীবনের মর্মকেন্দ্রের উৎসার, কখনো বিদেশী গানের সুরবহুল বৈচিত্র্যসম্ভূত। বিশেষত বিদেশী গানের সঙ্গে ভারতীয় গানের স্বভাব-স্বতন্ত্রতা তিনি বুঝেছিলেন গভীরভাবে। তাই লিখেছেন :

আমাদের নির্জন এককের গান, য়ুরোপের সজন লোকালয়ের গান।

কথাটি বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট হবে কেন আমাদের গানে যন্ত্রানুষঙ্গ ও তালবাদ্যের আয়োজন থাকে যৎসামান্য আর য়ুরোপের গানে কেন থাকে বিপুল যন্ত্রসম্ভার।

আরেক মন্তব্যে আছে :

য়ুরোপের সংগীত একলার আনন্দের কিংবা বেদনার জিনিস নয়, বিজনের সামগ্রী একেবারেই হ'তে পারে না, সে individual নয়, সে human।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানকে বিজনের সামগ্রী ব'লেই মনে করেন। তাতে ধরা থাকে একলার আনন্দ, একলার বেদনা। তার মধ্যে সামূহিক মানবস্বভাবের সবরকম আলোছায়া ধরার চেষ্টা নেই। বরং প্রয়াস আছে কবির আত্মতা, তার individual সত্তাকে ফোটানোর। একমনে তাঁর একতারাতে এই একাকিত্বের মগ্নতার সুর তিনি আজীবন বাজাতে চেয়েছেন। সেইজন্যই তাঁর গান সেই একক সৌরভের নিজস্বতায় সত্য হয়ে উঠেছে আমাদের জীবনে। তাঁর গানে কোনো ছল নেই, আয়োজনের বিপুলতা নেই, তানবাজি নেই। আছে আত্মসুরের ঘনিষ্ঠ আবেশ, অমল উৎসারণ।

বাংলার গান সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ মনে করেন : 'বাংলাদেশ আপনার গান আপনি গেয়েছে।' নিজের গান সম্পর্কে বলেছেন : 'আমার গান আপন মনের গান'। দুটো মন্তব্যই তো আসলে এক। বলতে চেয়েছেন, কী তাঁর গান কী বাংলা গান কেউই কোনোদিন রাগসংগীতের দাসত্ব করে নি। কীর্তন-বাউল-ভাটিয়ালি থেকে রবীন্দ্রসংগীত পর্যন্ত বাংলা গানের গতিরেখা এক স্বয়ম্বশ এককত্বে গৌরবান্বিত। বাংলা গানে কথা ও সুর যে গলাগলি ক'রে এসে আত্মপ্রকাশ করেছে

এ-অহংকার তাঁর বরাবরের। সারা উত্তরভারতে রাগদারী গানের বিপুল পরাক্রমের মধ্যেও বাঙালী যে আত্মভাব প্রকাশের জন্য তৈরি ক'রে নিয়েছে কীর্তনের রূপবন্ধ, পাখোয়াজের বদলে বানিয়েছে মৃদঙ্গ এ-গর্ব তিনি বারে বারে ব্যক্ত করেছেন। নিজের গান সম্পর্কে স্থায়িত্বের আশা ছিল তাঁর মনে। মনে হয়েছিল সবচেয়ে নিবিড়ভাবে তাঁর আত্মতাকে ধ'রে রেখেছে তাঁর গান আর ছবি।

একেক বার মনে হয় সমগ্র ভারতের উদাসী ভাবনা আর বৈরাগ্যের দর্শন যেন গহন ছায়াসঞ্চার ক'রে আছে রবীন্দ্রসংগীতে। যদি-বা তাঁর শারদোৎসবের উপনন্দের মতো একবার মনে হয়,

ছুটির বাঁশি বাজল যে ওই নীলগগনে
আমি কেন একলা ব'সে এই বিজনে॥

একদিকে ছুটির আহ্বান আরেকদিকে বিজন বাসের বৈপরীত্য এখানে প্রশ্ন জাগায় হয়তো। কিন্তু বর্ষার ঘনঘোরে আরেক গানে প্রশ্নটা ঘুরে যায় অন্য দিকে:

মেঘের পরে মেঘ জমেছে, আঁধার ক'রে আসে
আমায় কেন বসিয়ে রাখ একা দ্বারের পাশে।

'আমি কেন একলা ব'সে' আর 'আমায় কেন বসিয়ে রাখ একা' প্রশ্নের ধরন দুটি আলাদা। প্রথম প্রশ্নের উত্তরে ধূসরতা থাকা স্বাভাবিক কিন্তু দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাব তো স্পষ্ট:

কাজের দিনে নানা কাজে থাকি নানা লোকের মাঝে,
আজ আমি যে বসে আছি তোমারি আশ্বাসে॥

আস্থায়ী-র ভাষা পাল্‌টে যায় অন্তরা-য় এসে। 'বসিয়ে রাখ' হয়ে যায় 'বসে আছি'। ফুটে ওঠে আন্তর আগ্রহ প্রত্যাশীর দিক থেকে। বোঝা যায় প্রীতিঅনুষঙ্গী 'নাই রস নাই' গানে যে বলা হয়েছিল 'তুমি একা আর আমি একা কঠোর মিলনমেলা' এবারে তার অবসান ঘটবে। বর্ষার সজল প্রতিশ্রুতি দুই একা-র মাঝখানের দেয়াল ভেঙে দেবে। সেই আশ্বাসেই এমন একলা ব'সে থাকা।

এখানে আমরা স্মরণ করতে পারি 'ছিন্নপত্রাবলী'-র ৪৩-সংখ্যক চিঠির কিছু অংশ, যেখানে রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছে:

> অসীমতা এবং একটি মানুষ উভয়ে পরস্পরের সমকক্ষ— আপন আপন সিংহাসনে পরস্পর মুখোমুখি বসে থাকবার যোগ্য।

এরই পিঠোপিঠি একটা মন্তব্য পাই:

> পৃথিবীর যে ভাবটা নির্জন, বিরল, অসীম, সেই আমাদের উদাসীন করে দিয়েছে।

গীতকার রবীন্দ্রনাথ অবশ্য অসীমতার প্রতিস্পর্ধী একলা মানুষকে সম্পূর্ণ ব'লে মানতে পারেন না সবক্ষেত্রে। একেকটি গানে তাই অন্য সুর শোনা যায়। যেমন:

দুখ দিয়েছ, দিয়েছ ক্ষতি নাই, কেন গো একেলা ফেলে রাখ?

এখানে দেখা গেল দুঃখসন্তাপের চেয়ে বৃহত্তর অভিশাপ হ'ল একলা থাকা। এই একলা বলতে কী বুঝব? সম্প্রসারণে তা বোঝা যায় অন্যতম অন্তরা-য় পৌঁছে:

শুষ্ক নির্ঝরের ধারে রই, পিপাসিত প্রাণ কাঁদে ওই—
অসীম প্রেমের উৎস কই, আমারে তৃষিত রেখো নাকো॥

এই অসীম প্রেমের উৎসসন্ধান ঘটে না ব'লেই একাকিত্ব হয়ে ওঠে অবহ। সেই রিক্ত একাকিত্ব তো অসীমের প্রতিস্পর্ধী হতে পারে না কোনোভাবেই। তখন বড় হয়ে ওঠে 'বিশাল জগতের অন্তরের হাহাধ্বনি'। অকূল অসীমের প্রান্তবর্তী এই নিঃসঙ্গ বিশ্বজগতের মধ্যে আপন অস্তিত্বের ক্ষুদ্রতা তখন গ্রাস ক'রে নেয় সব সম্ভাবনাকে।

এ-সব গানের উদাহরণ থেকে আমরা ধরতে পারি রবীন্দ্রনাথের গানে একধরনের দুর্বহ একাকিত্বও আছে। তা না

থাকলেই অস্বাভাবিক হত। যে-ধ্যানদৃষ্টি বসন্তের ফোটা ফুলের অন্তরালে দেখতে পায় শুকনো-পাতা ঝরা-ফুলের খেলা সেই দৃষ্টিই তো একা, একেলা, একাকিত্বের এক-একটি স্বতন্ত্র স্তর ফুটিয়ে তুলবে একেক গানে। গীতবিতানের গানগুলি শুধু এই নিঃসীম বিজনতার তাৎপর্যেও দ্যোতক হয়ে ওঠে। এমন একক নির্জনতার গান আধুনিক কোনো ভাষায় আমরা শুনি নি।

৩

একক নির্জনতার নানারকম গান আমরা একমাত্র রবীন্দ্রনাথের রচনাতেই পাই সেও আরেক রকম বিস্ময়। তাঁর সমকালীন বা ঈষৎ পরবর্তী গীতকার দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত বা অতুলপ্রসাদের গানে একাকিত্বের অনুভূতি প্রায় অনুপস্থিত। যদি-বা থাকে তবে তারও দ্যোতনার সীমা খুবই ব্যক্তিকেন্দ্রিক কিংবা বিরহ-বেদনার সংলগ্ন। বড়ো ধরনের বোধের জগৎ তাঁদের গানে নেই, অন্তত বিজনতার উপলব্ধিতে। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে নায়িকা যখন গায় : 'এ জীবনে আমি বড়ই একা বড়ই দীনা' তখন তা সার্বিক একাকিত্ব ফোটাতে পারে না। কেননা এ-বেদনার উৎস তো নায়কের বিরহ। তার আবির্ভাবেই মোচন হয় নিঃসঙ্গতার দৈন্য। অতুলপ্রসাদের গানে অনিদ্র নায়িকার বিখ্যাত গান : আমিও একাকী 'তুমিও একাকী আজি এ বাদল-রাতে' উৎকৃষ্ট বিরহের গান, মাঝখানে বাদলরাতের অনিবার্য উপস্থিতি প্রথাবদ্ধতাকেই স্পষ্ট করে।

অথচ আশ্চর্য যে, অতুলপ্রসাদের নিঃসঙ্গ জীবনের অভিজ্ঞতা একা বা একেলার অনেক গূঢ় অনুভূতি-পরম্পরার গান হয়তো আমাদের উপহার দিতে পারত। একাকিত্বের বাস্তব বেদনা তো তাঁর পক্ষে মর্মান্তিকভাবে সত্য ছিল। সেই একাকিত্বের বেদনায় তিনি দোসর করেছিলেন গানকে। অথচ গানের বাণীতে সেই নৈঃসঙ্গ্য নেই, নেই বিজনতার তাপ। যিনি স্পষ্ট বলেছিলেন, 'ওগো দুঃখ সুখের সাথি, সঙ্গী দিনরাতি, সংগীত মোর' তাঁর আর্তি ফুটেছে সুরে। এক অভিজাত সংবরণ তাঁর গানের বাণীকে একাকিত্বের ক্ষয়ে ভারাতুর করে না। কেবল সুরের কারুণ্য (ভৈরবী, বেহাগ, খাম্বাজ, পরজ) তাঁর একক সত্তাকে মূর্ত ক'রে তোলে। তাঁর গানে একটি নৈরাশ্যের ব্যথা আছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গানে আছে প্রত্যাশা আর বলিষ্ঠতা, অপেক্ষা আর আশা। এই-সব পঙ্‌ক্তি প্রসঙ্গত মনে আসে :

১. বহিব একাকী বিরহের ভার।

২. একলা ঘরে চুপে চুপে এসো কেবল সুরের রূপে
দিয়ো গো, দিয়ো গো,
আমার চোখের জলে দিয়ো সাড়া॥

৩. দিন পরে যায় দিন, নাই তব দেখা
গান পরে গাই গান, রই বসে একা।

তিনটি এককতার গানে আমরা কোনো নিরাশার মুখোমুখি হই না। কিছু অভিমান বড়োজোর, কিংবা প্রত্যাশা ছুঁয়ে যায় হয়তো।

অতুলপ্রসাদ তাঁর গানে 'বিধি', 'হরি' এই নিরবয়ব বিশ্বাসগুলিতে বেশি আস্থা রাখেন। শূন্যতাবোধের অনেক সূক্ষ্ম চেতনা তাঁর গানে পাওয়া যায়। কিন্তু মৌনই তাঁর সাধনীয়, কান্নাকে প্রকাশ্য করতে তাঁর আত্মবোধে আটকায়। তিনি নিজেকে এই ব'লে সংবৃত করেন,

ভুলে যাই সবাই আমার,
নই তো আমি ভিন্ন সবার ;
দশের মুখে হাসি রেখে কাঁদব আমি কোন্ দুখে ?

এ কি সান্ত্বনা না আত্মপ্রতারণা তাঁর ? দশের হাসি দিয়ে নিজের কান্না কি ঢাকা যায় ? তিনিই কি ঢাকতে পেরেছেন ? মনে পড়ে, একটা গানে তাঁকে বলতে হয়েছিল :

এত হাসি আছে জগতে তোমার, বঞ্চিলে শুধু মোরে।
বলিহারি বিধি, বলিহারি যাই তোরে !

এমন নিঃসঙ্গ উপলব্ধির উৎসমূলেই ছিল বিজনতার চমৎকার বাণী-সম্ভাবনা। অতুলপ্রসাদ তা ধরেন নি। বরং তিনি সন্ধান করতে চেয়েছেন নিসর্গের বিজনে সংগোপনে কোন্ উদাসী থাকে ? কেন সে একা ? বলেছেন,

কেউ তারে পায় নাকো ডাকি,
থাকে সে সদাই একাকী ;
কোন্ একাকী করল তারে এমন একাকী ?

এখানকার অনুসন্ধেয় আসলে তো ঈশ্বর।

অতুলপ্রসাদের গানে আছে আত্মদুঃখী মানুষের অতলস্পর্শী সন্তাপ। তার থেকে মুক্ত হবার দুটি পথ আছে : গানের তরী আর প্রেমের হরি। সেইজন্য তিনি একবার আত্মপ্রবোধ দেন : 'পাগ্‌লা, মনটারে তুই বাঁধ্', আরেকবার পরামর্শ দেন : 'তুই গান গেয়ে যা, আজীবন'। গান তাঁর শাস্ত্র, গান তাঁর সান্ত্বনা। রসিকজনের মনে পড়বে রবীন্দ্রনাথের সেই অসামান্য গানের বাণী :

একেলা কেমন ক'রে বহিব গানের ভার।

আসলে রবীন্দ্রগীতির জগতে বিরহেরও একধরনের পূর্ণতা থাকে। তাতে সন্তাপের চেয়ে প্রাপ্তি বেশি। তাই সেখানে পরম বিশ্বাসে বলা যায় :

তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম
নিবিড় নিভৃত পূর্ণিমানিশীথিনী-সম ॥

এ-গানে নিঃসঙ্গ বিরহীসত্তা যে তার সঙ্গিনীর অস্তিত্বকে পূর্ণিমা রজনীর পূর্ণতার প্রতিমায় রাখবার অঙ্গীকার করছে তার কারণ সে জানে :

জাগিবে একাকী তব করুণ আঁখি,
তব অঞ্চলছায়া মোরে রহিবে ঢাকি।

এইভাবে অতুলপ্রসাদের সঙ্গে প্রতিতুলনায় রবীন্দ্রনাথের গানের ভাবনায় নৈঃসঙ্গ্যের স্বরূপ মহিমান্বিত হয়ে ওঠে। তিনি ছাড়িয়ে যান তাঁর সমকালীনদের। তাঁর গান যতই বুঝতে চাই ততই ধরা পড়ে সে-গানের অন্তঃপুরে এক আস্তিক্যবোধের আয়োজন। খুব নীরবে কিন্তু সুনিশ্চিত বিশ্বাসে তাঁর গানের অন্তরে একজন একাকী মরমীর আসন পাতা হয়। প্রথমে বলা হয়,

মোর হৃদয়ের গোপন বিজন ঘরে
একেলা রয়েছ নীরব শয়ন-'পরে—

এরপরই ফুটে ওঠে সেই বিনতি,

প্রিয়তম হে, জাগো জাগো জাগো ॥

এই জাগরণের আহ্বান আসলে আপনসত্তার। এককত্বের এবং একাকিত্বের অবসান তো দ্বৈততার বোধে। 'তোমায় আমায় মিলন হবে ব'লে আলোয় আকাশ ভরা' গানে সেই দুই একাকীর জাগরণ ঘটে। যুগে যুগে এমনই চলছে মনে হয়। আপন একাকিত্ব মোচন করবার জন্য চলতে হয় আরেকজনের অভিমুখে।

তোমায় আমায় মিলন হবে ব'লে
যুগে যুগে বিশ্বভুবনতলে
পরান আমার বধূর বেশে চলে চিরস্বয়ম্বরা ॥

প্রাণের এই অভিমান তো বাইরে কোথাও নয়। নিজেরই মধ্যে সেই মিলন। সেইজন্যই রবীন্দ্রনাথের গানে নিঃসঙ্গতার মধ্যে একাকিত্বের মধ্যে একটি স্বতন্ত্র দৃপ্ততা থাকে। সে-গান নিঃসংশয়ে বলতে পারে : 'সহায় মোর না যদি জুটে নিজের বল না যেন টুটে'। তার অমলিন প্রত্যয়,

সারাদিন আঁখি মেলে দুয়ারে রব একা,
শুভখন হঠাৎ এলে তখনি পাব দেখা ॥

তাই রবীন্দ্রনাথ যদিও মনে করেন ভারতীয় গান 'নিখিলের মূলে যে-একটি সঙ্গীহীন বৈরাগ্যের দেশ আছে সেখানে নিয়ে যায়', যেখানে 'বিশাল জগতের অন্তরের হাহাধ্বনি', তাঁর গানে তার উল্টোটাই পাই আমরা। সেখানে সঙ্গীহীনতা মূলত ভাবী মিলনের সংকেত।

রবীন্দ্রসংগীতের অন্যতর এমন কিছু উদাহরণ মেলে যেখানে একা বা একাকিত্বের কোনো স্পষ্ট উচ্চারণ নেই অথচ নিঃসঙ্গতার তীব্রতা সেখানে স্পষ্ট। 'তুমি কিছু দিয়ে যাও' আর 'তুমি কিছু নিয়ে যাও' এই বিভাজন একটি গানেই পাওয়া যায়। দিয়ে যাও এই বিনতি যার, নিয়ে যাও এই কামনা তারই। দেওয়া-নেওয়ার যে-আর্তি তার মূলে প্রকৃতপক্ষে অপূর্ণতার একাকিত্ব। 'তোমায় কিছু দেব ব'লে চায় যে আমার মন' এই ইচ্ছা যার, তার মধ্যে কেমন যেন রিক্ততা আছে। দিতে পারলে তবেই সে রিক্ততা ঘোচে। দেওয়ার সামর্থ্যে, গৃহীত হবার ভাগ্যে আসে পূর্ণতা ও সঙ্গ।

কথাটি বোঝার জন্য রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' নাটকের দুটি সংলাপের সাহায্য নেওয়া চলে। ঐ নাটকের তৃতীয় দৃশ্যে জয়সিংহ অপর্ণাকে জিজ্ঞাসা করে :

জান কি একেলা কারে
বলে?

জানি। যবে বসে আছি ভরা মনে—
দিতে চাই, নিতে কেহ নাই!

দিতে না-পারার এমন একাকিত্ব রবীন্দ্রনাথেরই অসামান্য কল্পনা থেকে জেগে উঠেছে। এই দিতে না-পারার আর্তি অন্য একটি গানেও পেয়ে যাই আমরা। সেখানে বলা হয়,

দেবার ব্যথা বাজে আমার বুকের তলে,
নেবার মানুষ জানি নে তো কোথায় চলে—
এই দেওয়া-নেওয়ার মিলন আমার ঘটাবে কে?

যার জীবনে দেওয়া-নেওয়ার মিলন ঘটে নি তার একাকিত্বের মর্মবেদনার সীমা নেই।

এই চিন্তাসূত্র থেকে আরেক গান মনে আসে :

যদি প্রেম দিলে না প্রাণে
কেন ভোরের আকাশ ভ'রে দিলে এমন গানে গানে?

এই গান যে-একাকিত্ববোধ জাগায় তা রবীন্দ্রনাথের অন্য কোনো গানে শুনি নি। এ-নিঃসঙ্গতা অপ্রেমজনিত। প্রেমহীন মানুষের সামনে যদি আসে স্বচ্ছ ভোরের আবাহনী, রাতের তারা ভরা আহ্বান, তা কি গ্রহণ করতে পারে সে? একদিকে নিসর্গের পূর্ণ সম্ভার, আরেকদিকে অপ্রেমের রিক্ততা। রবীন্দ্রনাথের গানে একবারই মাত্র সেই ভয়ংকর আশঙ্কিত শূন্যতার নৈঃসঙ্গ্য আমরা জেনেছি।

৪

একজন পাগলের কথা রবীন্দ্রনাথের কোনো-কোনো গানে এসেছে। পাগল তো প্রথা প্রচলন মানে না। তার জীবনে শুধুই ছক-ভাঙার ছন্দ। আঁধার রাতে একলা তার ঘোরাফেরা। সে কেবলই বলে 'বুঝিয়ে দে, বুঝিয়ে দে'। তার প্রশ্নাতুরতা আমাদের মতো শিষ্ট প্রশ্নহীন মানুষকে টলিয়ে দেবার জন্যই না কি? সুদূর দেশের বাণী নিয়ে তাঁর গানে আরেক পাগল আমাদেরই সামনের প্রসারিত দিনযাপনের পথ দিয়ে চলে যায় একলা রাতে। 'তারে ডাকিস নে ডাকিস নে তোর আঙিনাতে' এই সতর্কবাণীরই বা কারণ কী?

উত্তরে প্রথমে উদ্ধার করা চলে শ্রীশঙ্খ ঘোষের দিকনির্দেশী বিশ্লেষণ। 'আঁধার রাতে একলা পাগল যায় কেঁদে' গান বিষয়ে তাঁর মন্তব্য :

> রবীন্দ্রনাথের গান নিজেকে রচনা করে তুলবার গান। এ এক বিরামহীন আত্মজাগরণের আত্মদীক্ষার গান : অন্তত সেইখানে সে আমার কাছে ভালো। দীক্ষার এই বেদি থেকে প্রতিদিনের আত্মচরিতের দিকে তাকিয়ে দেখি। দেখি, এমন কোনো পদ্ম গড়ে ওঠে নি আমার স্বভাবের মাঝখানে যেখানে এসে পা রাখবে শ্রী, সৌন্দর্য। এই বোধ থেকে শুরু হলো কান্না, অপচয়ের অক্ষমতার, অপূর্ণতার কান্না। হঠাৎ এক মস্ত গহ্বরের সামনে এসে পড়ি আমরা, উত্তরহীন সমাধানহীন এক প্রশ্নব্যাকুলতার তীব্র স্বাদ তাঁর গানে এসে লাগে কখনো। অন্ধকার পথে একলা পাগলের মুখে আর্তনাদ শুনি তখন : 'বুঝিয়ে দে, বুঝিয়ে দে'। 'আঁধার রাতে একলা পাগল যায় কেঁদে' : এই পাগলটিই শুধু আমাদের মতো একজন, যে জানে না কোনো শেষকথা,যে বোঝে না কোনো শেষকথা, বুঝতে চায় কেবল।... এই পাগলটির উচ্চারণের সঙ্গে-সঙ্গে তাই মথিত হয়ে ওঠে আমাদের সমস্ত আধুনিক কাতরতা।

এই আধুনিক কাতরতার মূলে রয়েছে না-বোঝার অসহায়তা। সেই পাগল, অন্য অর্থে যে আমাদেরই আরেক সত্তা, বলে,

> অন্ধকারে অস্তরবির লিপি লেখা,
> আমারে তার অর্থ শেখা।

এই অর্থ না-জানতে-পারার বিপন্নতা থেকে নিঃসঙ্গতার জন্ম। আমরা নিজেদের ভাবছি যূথবদ্ধ, তাকে ভাবছি একলা পাগল। আসলে আমাদের মধ্যেই কি সেই প্রশ্নাতুর অথচ মীমাংসাহীন মানুষটি একাকী ককিয়ে উঠছে না?

নিজের ভুবন গ'ড়ে নিয়ে নিশ্চিন্ত বিজনতা কেউ কেউ পেয়ে যায়। তার মধ্যেই শান্ত অস্খলিত থাকাও এক নিবিড় সাধনা। একটি গানে এমন আভাস রয়েছে :

> গোপন প্রাণের একলা মানুষ যে
> তারে কাজের পাকে জড়িয়ে রাখিস নে॥
> তার একলা ঘরের ধেয়ান হতে উঠুক-না গান নানা স্রোতে,
> তার আপন সুরের ভুবন-মাঝে তারে থাকতে দে॥

প্রাণের গভীর গোপন মহা আপন যে-একক সত্তা তার নিভৃতি সবচেয়ে বাঞ্ছনীয়। অথচ প্রায়ই তো আমরা তাকে কাজের পথে দশের ভিড়ে ঠেলে দিই, ভেঙে ফেলি তার নিভৃতির ধ্যান। একদিক থেকে ভাবলে একক সাধনার জীবন কলকোলাহলের মধ্যে থেকেও হয়ে থাকে নিঃসঙ্গ। রক্তকরবী নাটকে অধ্যাপক বলেছিলেন নন্দিনী সম্বন্ধে : 'চার দিকে হাটের চেঁচামেচি, ও হল সুরবাঁধা তম্বুরা।' বেশির ভাগ রবীন্দ্রসংগীতেই কি আমরা পাই না সেই সুরঋদ্ধ নিভৃতি? সহস্রবিধ বাংলা গানের কোলাহলে তার নিজস্বতা ও আত্মলাবণ্যের শেষ পাই না আমরা।

তাই 'সে কোন্ পাগল যায় পথে তোর যায় চলে ওই একলা রাতে' গানে যেমন বলা হয় তেমনই রবীন্দ্রনাথ বাংলা গানের আবহমান বাতাবরণে আনেন নিজস্ব একতারাতে 'সুদূর দেশের বাণী'। এ-গানের শেষ অংশে বলা হয় :

বাঁধন ছেঁড়ার মহোৎসবে
গান যে ওরে গাইতে হবে
নবীন আলোর বন্দনাতে ॥

রবীন্দ্রনাথের গান একান্তভাবেই একলার গান, নির্জন এককের। কিন্তু নাটকে সেই-সব একক চরিত্রের কণ্ঠেই কেবল তিনি গান ভ'রে দেন যাঁরা বাঁধন ছেঁড়ার সাধনে মগ্ন, যাঁরা নবীন জীবনের বন্দনা গান গাইতে উৎসুক। তাঁদের নাম পঞ্চক, ধনঞ্জয়, বিশু পাগল, দাদাঠাকুর এ-সব আশ্চর্য একলা পথিক, প্রেমিক ও পাগল পৃথিবীতে প্রাণের আলো জ্বেলে তিমিরবিনাশী গান গাইতে আসেন যুগে যুগে। এঁদের সকলের কণ্ঠধ্বনির অন্তরালে আমি শুনতে পাই রবীন্দ্রনাথেরই নিঃসঙ্গ মৌলিক আত্মকণ্ঠ।

স্বীকৃতি
রবীন্দ্রনাথের সংগীতবিষয়ক মন্তব্যগুলি নেওয়া হয়েছে বিশ্বভারতী-প্রকাশিত 'সংগীতচিন্তা' বই থেকে।
সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুচিন্তাটি নেওয়া হয়েছে তাঁর 'আলো-আঁধারের সেতু : রবীন্দ্র চিত্রকল্প' বইয়ের ৯৪-৯৫ পৃষ্ঠা থেকে।
ভি. ভি. ওয়াঝলওয়ারের মন্তব্য নেওয়া হয়েছে তাঁর 'রবীন্দ্রসংগীতে রাগ-নির্ণয়' নিবন্ধ থেকে। নিবন্ধটি আছে ইন্দিরা সংগীত-শিক্ষায়তন প্রকাশিত 'রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গান' সংকলনে।
শঙ্খ ঘোষের মন্তব্য নেওয়া হয়েছে তাঁর 'এ আমির আবরণ' বইয়ের ২১-২২ পৃষ্ঠা থেকে।

রবীন্দ্রনাথের 'বিশ্বপরিচয়'

দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়

ছিয়াত্তর বছর বয়সে কবি রবীন্দ্রনাথ যে 'বিশ্বপরিচয়' নাম দিয়ে বিজ্ঞানের একটি বই লিখেছিলেন, সে-ঘটনা অন্তত শিক্ষিত বাঙালি সমাজে সুবিদিত। প্রতি বাঙালি মানুষের মনে যে নানা বিষয়ে আগ্রহ থাকে, এটা তারই উজ্জ্বল উদাহরণ। এই প্রবন্ধে আমরা 'বিশ্বপরিচয়' রচনার ইতিহাস সম্বন্ধে কিছু কথা বলে নিয়ে বিশেষ করে বইটিকে নিয়েই আলোচনা করব। সেই আলোচনার দুটো প্রধান অঙ্গ থাকবে : ১· লোকবিজ্ঞানের বই হিসেবে 'বিশ্বপরিচয়'-এর বৈশিষ্ট্য, আর ২· বিজ্ঞানের দর্শন এবং তার ঐতিহাসিক ভূমিকা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাভাবনা, যা 'বিশ্বপরিচয়ে' প্রকাশ পেয়েছে।

'বিশ্বপরিচয়' বইয়ের উৎসর্গপত্রের শেষের দিকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, বইখানি লেখবার ভার প্রথমে তিনি প্রমথনাথ সেনগুপ্তের উপরে দিয়েছিলেন। ১৯৩৩ খৃস্টাব্দের জুলাই মাসে প্রমথনাথ পদার্থবিদ্যার অধ্যাপকের কাজ নিয়ে বিশ্বভারতীতে যোগ দেন। এর কিছুদিন পরেই রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বিজ্ঞানবিষয়ে 'লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা'র প্রথম বইটি লিখতে বলেন। সেই গ্রন্থমালার উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষণীয় নানা বিষয়কে বাংলাদেশের সর্বসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া। সুতরাং রচনার ভাষাকে হতে হবে সহজ সরল এবং যথাসম্ভব পরিভাষা বর্জিত। অথচ তার মধ্যে বিষয়বস্তুর দৈন্য থাকবে না। বইলেখার কাজ কিভাবে চলছিল, তার বিশদ বিবরণ প্রমথনাথ নিজে দিয়েছেন তাঁর স্মৃতিচারণধর্মী বই 'আনন্দরূপম্'-এ। প্রথমেই রবীন্দ্রনাথ তাঁকে ব্রিটিশ পদার্থবিদ জেম্‌স জীনস্-এর সদ্য-প্রকাশিত বই 'থ্রু স্পেস অ্যান্ড টাইম' পড়তে দেন। সাহিত্যরসে সমৃদ্ধ এই বই থেকে প্রমথনাথ সাহায্য পাবেন, এটাই ছিল রবীন্দ্রনাথের আশা। ঠিক হল, একটি করে অধ্যায় রচনা করে প্রমথনাথ কবিকে দেবেন। প্রয়োজনমত রবীন্দ্রনাথ নিজে তার অদলবদল করবেন এবং দেখিয়ে দেবেন, কিভাবে সাহিত্যের সাহায্য নিয়ে বিজ্ঞানের বক্তব্যকে লোকশিক্ষার উপযোগী করে তোলা যায়।

কাজ শুরু করতে গিয়ে কিন্তু প্রমথনাথ বুঝতে পারলেন, সুসংবদ্ধ আকারে বাংলাভাষায় আধুনিক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তুকে প্রকাশ করাটা কতখানি দুরূহ। মনে রাখতে হবে, সেই তিনের দশকের মাঝামাঝি সময়ে পদার্থবিদ্যার জগতে অনেক যুগান্তকারী বদল আসছিল এবং সেগুলো সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মনে প্রবল আগ্রহ ছিল। অর্থাৎ তিনি চাইছিলেন, নতুন যুগের বিজ্ঞানের নতুন নতুন উন্মেষের সঙ্গে এ দেশের সাধারণ মানুষের পরিচয় হোক। বাংলাভাষায় যে কালে ধ্রুপদী পদার্থবিদ্যা সম্বন্ধেই প্রামাণ্য বইয়ের অভাব ছিল, সেই কালে একেবারে বিগত বছর দশেকের নতুন চিন্তাভাবনা সম্বন্ধে সহজবোধ্য এবং সুখপাঠ্য বই লেখা কতখানি শক্ত ছিল তা বলাই বাহুল্য।

যাই হোক, প্রমথনাথ যখন তাঁর বইয়ের প্রথম অধ্যায়ের খসড়া নিয়ে এসে রবীন্দ্রনাথকে দেখালেন, তখন রচনার ভাষা এবং শৈলী সম্বন্ধে কবি তাঁকে কিছু পরামর্শ দিয়েছিলেন। সেই পরামর্শের মূল কথাগুলি শেষ পর্যন্ত 'বিশ্বপরিচয়'-এর উৎসর্গপত্রেও স্থান পায়। প্রমথনাথ তাঁর 'আনন্দরূপম' বইটিতে কবির জবানিতে কথাগুলি এইভাবে বলেছেন :

'আসল কথা হচ্ছে, তথ্যবিন্যাসের নিপুণতা— আর এমন একটা নতুন ধরনের সহজ সরল ভাষায় লিখতে হবে— যার গতি হবে স্বচ্ছন্দ ও যার ছন্দে শিক্ষার্থীর মনে দোলা লাগবে। বিজ্ঞানের রচনায় একটা জিনিস বিশেষ করে লক্ষ্য রাখতে হবে, এর নৌকোটা অর্থাৎ এর ভাষাটা যাতে সহজে চলে। সম্পূর্ণ শিক্ষার জন্য পারিভাষিকের প্রয়োজন আছে বটে, তবে সেটা চর্ব্যজাতের জিনিস, দাঁত ওঠার পরে সেটা পথ্য। সেই কথা মনে রেখে বিজ্ঞানের প্রথম পরিচয় ঘটিয়ে দেবার কাজে

পরিভাষাকে যথাসম্ভব এড়িয়ে সহজ ভাষায় কী করে রচনা সুসংবদ্ধ করা যায় তার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। এই দিক থেকে ভাষার ট্রেনিংটা হয়ে গেলে তখন দেখবে স্বচ্ছন্দ গতিতে ভাষা কেমন সহজে এগিয়ে চলে। জেনে রেখো, সহজ কথায় লেখাটাই সবচেয়ে কঠিন। আরো একটা কথা। বৈজ্ঞানিক রচনা লিখে প্রথমে দেখাতে হবে এমন দুয়েকজনকে, বিজ্ঞানের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় নেই। তাঁরা পড়ে যদি বুঝতে পারেন তা হলে নিঃসন্দেহে ধরে নেবে লেখার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে।'

'বিশ্বপরিচয়' লেখার পিছনে কতটা চিন্তাভাবনা ছিল, এই একটি অনুচ্ছেদ থেকেই সেটা বোঝা যায়। লোকপ্রিয় বিজ্ঞানের বই যাঁরা লিখবেন, তাঁদের পক্ষে এর চেয়ে ভালো পরামর্শ আর কী হতে পারে? যে-কোনো বই— বিশেষ করে গভীর মনোযোগ দাবি করে এমন বিষয়ের বই— প্রকাশের আগে উপযুক্ত পাঠককে দিয়ে যাচাই করিয়ে নেওয়ার রেওয়াজ ইয়োরোপ-আমেরিকায় দেখতে পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ যে এ বিষয়ে কত সজাগ ছিলেন, সেটা লক্ষণীয়।

প্রমথনাথের প্রাথমিক খসড়া এবং রবীন্দ্রনাথের আনুপূর্বিক সংশোধনের ভিতর দিয়ে বই লেখার কাজ কিভাবে অগ্রসর হচ্ছিল, তার কিছু কিছু নমুনা প্রমথনাথ তাঁর ওই স্মৃতিকথা 'আনন্দরূপম্'-এ তুলে দিয়েছেন। প্রমথনাথের লেখা এক-একটি অনুচ্ছেদ রবীন্দ্রনাথের হাতে পড়ে কিভাবে আমূল বদলে গেছে, একই তথ্যকে রবীন্দ্রনাথ কিভাবে আরো অনেক বেশি গুছিয়ে সহজ সুন্দর ভাষায় পরিবেশন করেছেন, প্রমথনাথের দেওয়া পরপর উদ্‌ধৃতিগুলি পড়লেই সেটা বোঝা যায়। ভাষার সৌকর্য ছাড়াও নিছক বৈজ্ঞানিক তথ্যের উপস্থাপন আর ব্যাখ্যার ব্যাপারেও রবীন্দ্রনাথের মুনশিয়ানা রীতিমত অনুকরণীয়। একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। প্রমথনাথের লেখা প্রথম অধ্যায় 'পরমাণুলোক'-এর খসড়ার একেবারে গোড়ার দিকটা ছিল এইরকম :

'অনেক আশ্চর্য ও অসম্ভব কথা তোমরা পড়ে ও শুনে থাক। তোমাদের কল্পনা করার শক্তি যদি তাকে না মেনে নেয় তা হলেই মনে হবে যে,এ কথা অসম্ভব, এ হতে পারে না। সকলের চিন্তা করার ক্ষমতা এক নয়, তাই তোমার আমার কাছে যা অসম্ভব ও আশ্চর্য বলে মনে হয় আর একজন হয়ত তা খুবই স্বাভাবিক বলে মেনে নেয়। সত্য যে কল্পনাকে কতদূর ছাড়িয়ে যায় তা আজকাল বিজ্ঞানের যুগে প্রতি পদেই আমরা [দেখতে] পাই। Aeroplane সৃষ্টি হওয়ার আগে "মানুষ আকাশে উড়ে বেড়াবে" এর কল্পনাও ছিল আমাদের কাছে অত্যন্ত অসম্ভব। কিন্তু বৈজ্ঞানিক যখন তাঁর যন্ত্রের সব বুঝিয়ে গিয়ে আমাদের বলেন যে, এভাবে আকাশে ওড়া তো খুবই সহজ ও স্বাভাবিক, তখনই আমাদের মন তাতে সাড়া দেয়—"হ্যাঁ সত্যিই, এ তো এমন কিছু আশ্চর্য নয়, এ যে খুবই সোজা।" আজ যখন বৈজ্ঞানিক পৃথিবী থেকে চন্দ্র ও মঙ্গল গ্রহে যাওয়ার জন্য "Rocket" নামে এক আশ্চর্য যন্ত্রের সৃষ্টি করতে ব্যস্ত, তখন আমরা ঘরের কোণে বসে হেসে বলছি "একি কখনও সম্ভব হয় ? এ শুধু পাগলামী !" কিন্তু যেদিন এ সম্ভব হবে, চোখের সামনে আমরা যেদিন দেখব মানুষ এক গ্রহ থেকে অন্য গ্রহে যাতায়াত করছে, সেদিন আমরাই আবার মাথা নেড়ে বলব যে, এ তো এমন কিছু শক্ত কাজ নয়। সত্য বুঝতে হলে আমাদের কোনো জিনিসই অসম্ভব বলে উড়িয়ে দিলে চলবে না। স্থির হয়ে আমাদের ভাবতে হবে, বুঝতে হবে। তোমাদের কাছে আজ গ্রহ, নক্ষত্র, সূর্য, চন্দ্র, পৃথিবী, জীব, জন্তু এদের সম্বন্ধে আমার.....'

স্পষ্টতই প্রমথনাথ এখানে চেষ্টা করেছেন পাঠকের মনকে আধুনিক বিজ্ঞানের আশ্চর্য ক্রিয়াকলাপের প্রতি আগ্রহী এবং অনুকূল করে তুলতে। কিন্তু সেই দরকারী কাজটা করতে গিয়ে তিনি তাঁর মূল বিষয়বস্তু থেকে একটু দূরে সরে গেছেন। উপরের পঙ্‌ক্তিগুলো পড়লে মনে হতে পারে যে আধুনিক বিজ্ঞানের প্রয়োগের দিকটাই হবে বইয়ের আলোচ্য বিষয়। কিন্তু তা তো নয়। আসলে তো রবীন্দ্রনাথ চেয়েছেন বস্তুজগতের গড়ন সম্বন্ধে আধুনিক বিজ্ঞানের বিস্ময়কর চিন্তাভাবনার সঙ্গে পাঠকের পরিচয় করিয়ে দিতে। আজকাল যাকে মৌল গবেষণা বলা হয়, 'বিশ্বপরিচয়'কে তো তিনি তারই লোকপ্রিয় বিবরণ করে তুলতে চেয়েছিলেন। সেই বিবরণের প্রথমেই থাকবে পরমাণুলোক সম্বন্ধে একটি অধ্যায়। কিন্তু পরমাণুর কথা বলতে হলেও আগে বস্তুজগতের মোট আয়তন সম্বন্ধে একটা ধারণা দেওয়া দরকার। যাকে আমরা বিশ্ব বলি, সেই বিশাল অস্তিত্বের বৃহত্তম স্তরে আছে অসংখ্য গ্রহনক্ষত্র আর নীহারিকা, আর একেবারে ক্ষুদ্রতম স্তরে আছে অণুপরমাণু এবং

তাদের নানা উপাদান। এই দুটো প্রান্তীয় স্তরের কথা একসঙ্গে মনে রাখলে তবেই বিশ্ব সম্বন্ধে একটা আন্দাজ পাওয়া যায়। সেই কারণেই বোধহয় রবীন্দ্রনাথ 'পরমাণুলোক' সংক্রান্ত অধ্যায়টিও শুরু করেছেন নক্ষত্রলোকের প্রসঙ্গ দিয়ে। আর নক্ষত্র বলতে যেটিকে আমরা সবচেয়ে বেশি জানি, তার নাম হল সূর্য। সুতরাং প্রমথনাথ সেনগুপ্তের ঐ প্রথম অনুচ্ছেদের জায়গায় রবীন্দ্রনাথ কী লিখলেন, দেখা যাক।—

'সূর্য আমাদের জগতের চারি দিকে একটা আলোর পর্দা খাটিয়ে দিয়েছে। পৃথিবী ছাড়িয়ে আর যে কিছু আছে মানুষকে তা দেখতে দিচ্ছে না। ভাগ্যক্রমে দিন শেষ হয়, সূর্য অস্ত যায়, আলোর আবরণ সরে যায়, তখন অন্ধকার ছেয়ে প্রকাশ পায় নক্ষত্রলোক। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কী যে চেহারা তা আমাদের চোখে তখন ধরা পড়ে। এই বিশ্ব যতই প্রকাণ্ড বড়ো ততই অত্যন্ত ছোটো হয়ে আমাদের কাছে দেখা দিয়েছে। নইলে সমস্তটার মোটামুটি পরিচয় পেতুম কী করে। হিমালয় পর্বতটা কীরকম তা জানাবার জন্যে তার যে ছবি আঁকা হয়, একটা বইয়ের পাতার মধ্যেই তা ধরে। কিন্তু হিমালয়কে যদি একেবারে সামনে এনে দেখতে চাই তাহলে সমস্ত বাংলাদেশটা চাপা পড়বে এবং হিমালয়ের সামান্য এক অংশের বেশি দেখতে পাব না।

'তেমনি বিশ্বের আয়তনকে কতই ছোটো করে প্রত্যেক রাত্রে আমাদের গোচর করা হয়েছে কিছু পরিমাণে তার আভাস পেতে হলে সূর্যের দৃষ্টান্তটা মনে আনা চাই। ভোরবেলায় সূর্য পূর্ব দিক্‌সীমানার ধারে যখন প্রকাশ পায় তখন তাকে একটি সোনার থালার মতো দেখতে হয়। তার থেকে আর কিছু না হোক বুঝতে পারি সূর্য গোলাকার। অথচ প্রায় চোদ্দ লক্ষ পৃথিবী একত্র করলে তবে সূর্যের আয়তনের সমান হতে পারে। সমস্ত সূর্য যদি আমাদের কাছে থাকত তা হলে সমস্ত সূর্যের রূপ আমরা চিনতেই পারতুম না। যা আমাদের চেয়ে অত্যন্ত বড়ো তাকে আমরা যতটুকু চিনতে পারি সে দূরের থেকে।'

প্রথমত এখানে আর বিজ্ঞানের ক্রিয়াকলাপের চমৎকারিত্ব সম্বন্ধে কোনো আলোচনা নেই, সরাসরি প্রসঙ্গে চলে আসা হয়েছে। দ্বিতীয়ত সূর্যের কথা বলা হয়েছে মানুষের ইন্দ্রিয়গত উপলব্ধির সীমানা সম্বন্ধে একটা ধারণা গড়ে তোলবার জন্যে। আমাদের দৃষ্টিশক্তি কিংবা শ্রবণশক্তির একটা পাল্লা আছে। খুব বড়ো মাপের ঘটনাকে আমরা ইন্দ্রিয় দিয়ে ধরতে পারি না, খুব ছোটো মাপের ঘটনাকেও অনুভব করি না। এই পাল্লার ব্যাপারটা বোঝাতে গিয়েই রবীন্দ্রনাথ খুব স্বাভাবিকভাবে সূর্যকে দৃষ্টান্ত হিসেবে ব্যবহার করেছেন। পদার্থবিদ্যার আলোচনা সূর্যের প্রসঙ্গ দিয়ে শুরু করবার সপক্ষে অবশ্য আরো যুক্তি আছে— আলোর কথা বলতে গেলেও তো সূর্যের কথাই সবচেয়ে সহজে আসে। অর্থাৎ বেশ ভেবেচিন্তেই রবীন্দ্রনাথ সূর্যকে তাঁর আলোচনার মূলবিন্দু হিসেবে নিয়েছেন। এখানে বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না যদি বলি যে এর ছাব্বিশ বছর পরে বিখ্যাত পদার্থবিদ জর্জ গ্যামো তাঁর পাঠ্যবইটিও লিখতে শুরু করেছিলেন "বিশ্বে আমাদের স্থান" শীর্ষক একটি অধ্যায় দিয়ে, আর সেখানেও কিয়ৎপরিমাণে সূর্যের প্রসঙ্গ এসে গেছে। গ্যামোর সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথের তুলনা বিশেষ করে মনে আসে, কারণ পদার্থবিদ্যা সম্বন্ধে খুব সরস করে লেখার ক্ষমতা তাঁরও ছিল। এ-বিষয়ে পরে দুয়েকটা কথা বলা যাবে।

এইভাবেই একটু একটু করে বইলেখার কাজ এগিয়ে চলল। প্রথমে বইটির নাম ভাবা হয়েছিল 'বিশ্বরচনা'। 'পরমাণুলোক'-এর পর 'নক্ষত্রলোক' আর 'গ্রহলোক' এই দুটি অধ্যায় লেখা হল। এর মধ্যে 'গ্রহলোক' অধ্যায়ে পৃথিবীর জন্ম এবং বিবর্তনের ইতিহাস বেশ খানিকটা জায়গা নিয়ে নিল। ফলে পুঁথি বেড়ে গেল। শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ ঠিক করলেন, দুটো আলাদা বই লেখা হবে। একটায় থাকবে শুধু 'পৃথিবী সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা— বিভিন্ন মতবাদসহ তার জন্মবৃত্তান্ত, ক্রমবিকাশ, প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে ভূপৃষ্ঠের পরিবর্তন, বায়ুমণ্ডল, প্রাণের প্রকাশ, প্রাক্‌কালীন প্রাণিবৃত্তান্ত, মানুষের আবির্ভাব ও তার বর্তমান পরিণতি ইত্যাদি'। এই বইটির নাম হবে 'পৃথ্বী-পরিচয়'। আর অন্য বইটির অধ্যায়গুলির বিষয়বস্তু হবে পরমাণুলোক, নক্ষত্রলোক, সৌরলোক, খুব সংক্ষেপে গ্রহলোক আর ভূলোক। এটির নাম দেওয়া হল 'বিশ্ব-পরিচয়'। বিষয়গুলির পুনর্বিন্যাস করে নিয়ে প্রমথনাথকে কবি বললেন লেখার কাজ চালিয়ে যেতে। আর প্রমথনাথের তৈরি খসড়াকে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করে রবীন্দ্রনাথের হাতে তার পুনর্নির্মাণের কাজও যথারীতি চলতে থাকল।

শেষ পর্যন্ত 'বিশ্ব-পরিচয়'-এর যে চেহারা দাঁড়াল, তাকে কবির একেবারে নিজস্ব রচনা ছাড়া কিছুই বলা যায় না। এই বইয়ের মূল প্রেরণা যেমন তাঁর, এর রচনাদর্শও তেমনি তাঁর। আর তাঁর ভাষার কথা তো বলাই বাহুল্য। এই ধরনের একটি সর্বজনপাঠ্য বইয়ের ক্ষেত্রে ভাষা যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সব মিলিয়ে 'বিশ্ব-পরিচয়ে' শুধু বক্তব্যই নেই, বক্তাও আছেন পুরোমাত্রায়। গোটা বইটিতে একটি বোদ্ধা এবং সুরসিক ব্যক্তিত্বকে পাই ; সে-ব্যক্তিত্ব রবীন্দ্রনাথের। বইখানি যদি নৈর্ব্যক্তিক গবেষণার বিবরণ হত, তা হলে এমনটা হতে পারত না। সে ক্ষেত্রে হয়তো রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রমথবাবুর নাম যুক্ত করাটাই স্বাভাবিক হত। বইয়ের সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি দেখে বিশ্বভারতীর শিক্ষাভবনের তৎকালীন অধ্যক্ষ ধীরেন্দ্রমোহন সেন অবশ্য সেইরকম প্রস্তাবই করেছিলেন। কিন্তু এই সংশোধিত পাণ্ডুলিপিটিকেও রবীন্দ্রনাথ ঢেলে সাজান আলমোড়ায় গিয়ে, ১৯৩৭ খৃস্টাব্দের গ্রীষ্মের ছুটিতে। তার পরের ঘটনার কথা প্রমথনাথের নিজের জবানিতেই শোনা যাক।

'গ্রীষ্মের ছুটির পর গুরুদেব আলমোড়া থেকে ফিরে একদিন সন্ধ্যের সময় ডেকে পাঠালেন। উত্তরায়ণে গিয়ে দেখি ক্ষিতিমোহনবাবু ও শাস্ত্রীমশায়ের সঙ্গে তিনি কথা বলছেন, আমাকে ডেকে সস্নেহে পাশে বসালেন, কুশল প্রশ্ন করলেন। তারপর বললেন, "দেখো 'বিশ্ব-পরিচয়' লিখতে লিখতে দেখলুম এর ভাষাটা আমারই হয়ে গেছে, তাই এর মধ্যে তোমাকে কোথাও স্থান দিতে পারলুম না।" একটু থেমে বললেন, "অবশ্য তুমি শুরু না করলে আমি সমাধা করতে পারতুম না, আর তা ছাড়া বিজ্ঞানের অনভ্যস্ত পথে চলতে শেষ পর্যন্ত এই অব্যবসায়ীর সাহসে কুলত না। তুমি ক্ষুণ্ণ হোয়ো না।" গুরুদেব থামলেন, আমার দিকে তাকাতেই সহাস্যে বললাম, "বইখানা লেখার ভার আমার উপর দিয়েছিলেন, কাজ সম্পূর্ণ করে আপনার হাতে তুলে দিয়েছি, পরবর্তী ব্যবস্থার ভার আপনার, আপনি যে-ব্যবস্থা করবেন তাতেই আমি তুষ্ট, ক্ষুণ্ণ হব কেন।" এই তো গেল 'বিশ্ব-পরিচয়' রচনার ইতিবৃত্ত।'

এখানে রবীন্দ্রনাথের ওই যে উক্তিটুকু পাই, 'এর মধ্যে তোমাকে কোথাও স্থান দিতে পারলুম না', প্রশ্ন হচ্ছে, সত্যি কি অন্য কিছু করা যেত ? আর কোনো বিকল্প কি ছিল রবীন্দ্রনাথের সামনে ? যাঁরা 'বিশ্ব-পরিচয়' খুঁটিয়ে পড়েছেন, তাঁরা অক্লেশে বলবেন, না, ছিল না। প্রমথনাথ সেনগুপ্ত তাঁর 'আনন্দরূপম্' বইয়ে নিজের খসড়া থেকে যে-কটি উদ্ধৃতি দিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথের রচনার পাশাপাশি রেখে সেগুলো পড়লে তো আর কোনো সন্দেহই থাকে না। বলতেই হয়, অন্য কিছু করলে সত্যের অপলাপ হত। শেষ পর্যন্ত 'বিশ্ব-পরিচয়' যে স্তরে উঠে এসেছে, সেটা একান্তভাবেই রবীন্দ্রনাথের নিজের সৃষ্টি।

এর আগে আলমোড়া থেকেই অবশ্য রবীন্দ্রনাথ প্রমথবাবুকে চিঠিতে বলেছিলেন 'পৃথ্বী-পরিচয়' লেখা শুরু করে দিতে। সেই বই লোকশিক্ষা গ্রন্থমালার অঙ্গ হিসেবেই বিশ্বভারতী প্রকাশ করেন প্রমথনাথের স্বাক্ষরে। অন্যদিকে 'বিশ্ব-পরিচয়'-এর উৎসর্গপত্রে তাঁর কাছে কবি ঋণস্বীকার করলেন এই বলে, 'তিনি না শুরু করলে আমি সমাধা করতে পারতুম না, তা ছাড়া অনভ্যস্ত পথে শেষ পর্যন্ত অব্যবসায়ীর সাহসে কুলোত না। তাঁর কাছ থেকে ভরসাও পেয়েছি সাহায্যও পেয়েছি।'

'বিশ্ব-পরিচয়' লিখতে গিয়ে কী ধরনের আকর গ্রন্থ রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছিলেন, সে-বিষয়ে অবশ্যই আমাদের কৌতূহল হয়। বইয়ের উৎসর্গ পত্রে সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে তিনি বলছেন, 'কয়েকটি প্রামাণ্য গ্রন্থ সামনে রেখে সাধ্যমত নিড়ানি চালিয়েছি।' এর মধ্যে খানিকটা বিনয় নিশ্চয়ই আছে— সত্যেন্দ্রনাথকে তিনি যে কী চোখে দেখতেন তা সুবিদিত। কিন্তু এটাও তো ঠিক যে এই ধরনের বই লিখতে হলে অন্য বইয়ের সাহায্য অল্পবিস্তর নিতেই হয়।

প্রমথনাথ সেনগুপ্ত তাঁর স্মৃতিকথায় জানাচ্ছেন, জেমস জীনসের 'থ্রু স্পেস অ্যান্ড টাইম' ছাড়াও আরো দুটি বই রবীন্দ্রনাথ নিজে আনিয়ে তাঁকে পড়তে দিয়েছিলেন। তার মধ্যে একটি আর্থার এডিংটনের লেখা জ্যোতির্বিজ্ঞান সংক্রান্ত বই, আর অন্যটি জীনসেরই লেখা। এ ছাড়া রবীন্দ্রনাথ নিজেও যে বেশ যত্ন করে পড়াশোনা করতেন, তার প্রমাণ আছে। বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রভবনে তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহের মধ্যে জর্জ গ্রে'র একটি বই পাচ্ছি, 'নিউ ওয়র্লড পিকচার'। প্রকাশের

JANUARY, 1938 15

Fuslee.—Paus, 1345. Mus.—Zil-Kaideh. 1356.
Samvat.—Paus. (Sudee), 1994. Beng.—Paus. 1344.

7 Friday [7—358]

Fus.—21 Paus. *Sam.*—6 Paus (Sudee). *Mus.*—4 Zil-Kaideh.
Beng.—23 Paus, *Sasthi*. 5-6 *n.*

[illegible] — 311

পৃথিবীর [illegible] radio active [illegible] 513

Earth's internal rigidity 514

mountain building 515

Eight elements in Earth's crust 520

[illegible] second এ ১২ 578

Earth's speed round the sun 18.5 miles per second 588

No radiant energy are rematerialized 593

[illegible] transmutation 599

Other galaxies 602

[illegible] — 602

Milky way 626

Sun average star "

Narayan's Diary (১৯৩৮)-র একটি পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথ-কৃত নোট।

তারিখ ১৯৩৬ খৃস্টাব্দ। অর্থাৎ 'বিশ্ব-পরিচয়' প্রকাশের ঠিক আগের বছর। বিশ শতকের গোড়া থেকে শুরু করে 'বিশ্ব-পরিচয়' রচনার অল্পদিন আগে পর্যন্ত যে বিপুল পরিমাণ গবেষণার ভিতর দিয়ে পদার্থবিদ্যার চিন্তাভাবনায় বৈপ্লবিক বদল এসেছিল, গ্রে'র বইয়ে তার বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। আপেক্ষিকতা থেকে পরমাণুকেন্দ্রের তত্ত্ব পর্যন্ত অনেক কিছুই এর অন্তর্গত। দৃষ্টিভঙ্গিটা অবশ্যই তিনের দশকের উপযোগী। মনে হয় এই বই থেকে রবীন্দ্রনাথ একটু সাহায্য পেয়েছিলেন। বইটির তিনটি পর্বের মধ্যে দ্বিতীয়টির বিষয় হচ্ছে নক্ষত্রলোক আর তৃতীয়টির পরমাণুলোক। 'বিশ্ব-পরিচয়'-এর বিষয়বস্তুর বিন্যাসের সামান্য ইঙ্গিত যেন এর মধ্যে পাই। অবশ্য কবির বইয়ের গড়ন আরো অনেক সংহত এবং পরিচ্ছন্ন।

প্রমথনাথ সেনগুপ্তের 'আনন্দরূপম্' বইটি থেকে একটা কথা স্পষ্ট বেরিয়ে আসে। 'বিশ্বপরিচয়' প্রকাশের বছর চারেক আগে থেকেই রবীন্দ্রনাথ আধুনিক বিজ্ঞান সম্বন্ধে বিশেষভাবে চিন্তাভাবনা করছিলেন। বইটির প্রথম প্রকাশ হয় ১৩৪৪ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে। দ্বিতীয় সংস্করণ বেরোয় সেই বছরই পৌষ মাসে। তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম সংস্করণ হয় শ্রাবণ ১৩৪৫, পৌষ ১৩৪৫ এবং পৌষ ১৩৪৬ বঙ্গাব্দে। অর্থাৎ অন্তত বছর ছয়েক ধরে রবীন্দ্রনাথ এই কাজের সঙ্গে জড়িয়ে ছিলেন। বস্তুত এর পরেও আধুনিক বিজ্ঞান তাঁর মনকে অধিকার করে রেখেছিল— একেবারে শেষ দিকের গল্পগ্রন্থ 'তিন সঙ্গী' তার প্রমাণ। যাই হোক, 'বিশ্ব-পরিচয়' রচনা এবং প্রকাশের কালে কতখানি মন দিয়ে যে তিনি বিজ্ঞানচর্চা করেছেন, তার চাক্ষুষ প্রমাণ পাই ১৯৩৮ খৃস্টাব্দের একটি ডায়ারিতে। Narayan's Diary নামাঙ্কিত এই ডায়ারি কবি উপহার পেয়েছিলেন ডায়ারি প্রকাশক রাধারমণ ব্যানার্জীর কাছ থেকে। ডায়ারির ১৩ পৃষ্ঠা থেকে ১৯ পৃষ্ঠা পর্যন্ত, অর্থাৎ মোট সাত পৃষ্ঠা জুড়ে, কবি বিশদভাবে নোট নিয়েছেন দুটি বই থেকে। তার মধ্যে প্রথম বইটির নাম 'দ্য ইউনিভার্স সারভেয়েড', লেখক হ্যারল্ড রিচার্ডস। প্রথম প্রকাশ ১৯৩৭ খৃস্টাব্দের জুন মাসে, প্রকাশক নিউ ইয়র্কের ভ্যান নস্ট্র্যান্ড কোম্পানি। রবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত কপিটি বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগারে পাওয়া গেছে। এটি ১৯৩৮ খৃস্টাব্দের এপ্রিলে মুদ্রিত, অর্থাৎ একেবারে সদ্য কেনা হয়েছিল। এই প্রবন্ধের সঙ্গে আমরা রিচার্ডসের বই থেকে নেওয়া কবির নোটের একটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপি দিলাম। প্রতিটি বিষয়ের পাশে মূল বইয়ের পৃষ্ঠাসংখ্যা লেখা আছে। বিষয়গুলি আদ্যন্ত 'বিশ্ব-পরিচয়'-এর সঙ্গে যুক্ত। এই সময়ে 'বিশ্ব-পরিচয়'-এর নতুন নতুন সংস্করণ হচ্ছিল। মনে হয় সেই সূত্রেই কবির এই পরিশ্রম। ঠিক একই ভাবে কবি নোট নিয়েছেন ক্লাইড ফিশারের বই থেকে।

এবারে বৈজ্ঞানিক রচনা হিসেবে 'বিশ্ব-পরিচয়'-এর কথা ভাবা যাক। বলা বাহুল্য, 'বিশ্ব-পরিচয়'-এর প্রাথমিক মূল্য লোকশিক্ষার বই হিসেবেই। এই শতাব্দীর সেই সুদূর চতুর্থ দশকে বাংলায় বিজ্ঞানচর্চার অবস্থার কথা মনে রেখে প্রধানত লোকশিক্ষার নিরিখেই বইটির বিচার করতে হবে। উৎসর্গপত্রেই রবীন্দ্রনাথ এ-ধরনের প্রচেষ্টার কৈফিয়ৎ দিয়ে রেখেছেন।

'আমাদের মতো আনাড়ি এই অভাব (অর্থাৎ বিজ্ঞানচর্চার অভাব) অল্পমাত্র দূর করবার চেষ্টাতেও প্রবৃত্ত হলে তারাই সবচেয়ে কৌতুক বোধ করবে যারা আমারই মতো আনাড়ির দলে। কিন্তু আমার তরফে সামান্য কিছু বলবার আছে। শিশুর প্রতি মায়ের ঔৎসুক্য আছে কিন্তু ডাক্তারের মতো তার বিদ্যা নেই। বিদ্যাটি সে ধার করে নিতে পারে কিন্তু ঔৎসুক্য ধার করা চলে না। এই ঔৎসুক্য-শুশ্রূষায় যে রস জোগায় সেটা অবহেলা করবার জিনিস নয়।'

এই কথা বলে নিয়ে তার পর রবীন্দ্রনাথ চেষ্টা করেছেন বিজ্ঞান সম্বন্ধে নিজের জীবনব্যাপী কৌতূহলের কথা বুঝিয়ে বলতে। এখানে আমরা সেই প্রসঙ্গে যাব না। কিন্তু একটা কথা বলে নেওয়া দরকার। যে ঔৎসুক্যের কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, আজও কি তার প্রাচুর্য আমরা দেখতে পাই আমাদের সমাজে? এমন-কি বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে যাঁরা উচ্চতর শিক্ষা লাভ করছেন এবং বিতরণ করছেন, তাঁদের মধ্যেও? এখনও কি এ দেশে অনেক 'গবেষণা' হচ্ছে না যার মূলে আছে প্রধানত অর্থোপার্জন এবং প্রতিষ্ঠালাভের আকাঙ্ক্ষা? আসলে, এই-সব প্রশ্নের সঙ্গে জড়িয়ে আছে সমাজ এবং সংস্কৃতির কিছু মূলগত প্রবণতা, যা রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি এড়ায় নি। ঐ অনুচ্ছেদটির ঠিক আগেই তিনি লিখেছেন,

'বড়ো অরণ্যে গাছতলায় শুকনো পাতা আপনি খসে পড়ে, তাতেই মাটিকে করে উর্বরা। বিজ্ঞানচর্চার দেশে জ্ঞানের

টুকরো জিনিসগুলি কেবলই ঝরে ঝরে ছড়িয়ে পড়ছে। তাতে চিত্তভূমিতে বৈজ্ঞানিক উর্বরতার জীবধর্ম জেগে উঠতে থাকে। তারই অভাবে আমাদের মন আছে অবৈজ্ঞানিক হয়ে। এই দৈন্য কেবল বিদ্যার বিভাগে নয়, কাজের ক্ষেত্রে আমাদের অকৃতার্থ করে রাখছে।'

এখানে কিন্তু কবি শুধু তথ্যের কথা বলছেন না, বলছেন বিজ্ঞানের নিজস্ব সংস্কৃতির কথা। এই সংস্কৃতির গোড়াকার কথাই হল ঔৎসুক্য, সমস্ত বিশ্বসংসার সম্বন্ধে অপরিসীম ঔৎসুক্য। আর সেই ঔৎসুক্য যখন তৃপ্ত হয় সার্থক হয়, তখনই জিজ্ঞাসুর মনে রসের সঞ্চার হয়। বিজ্ঞানকে যাঁরা শুধু তথ্যের সমাহার বলে ভাবেন, তাঁরা তার প্রেরণার উৎসটাকেই জানেন না। বিজ্ঞানচর্চার অন্তিম সার্থকতা আসে একধরনের সৌন্দর্যের উপলব্ধি থেকেই। ধন নয়, প্রতিষ্ঠা নয়, যথার্থ বিজ্ঞানের পুরস্কার হল সেই সৌন্দর্যবোধ। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ যে 'রস জোগানো'র কথা বলেছেন, যে-কোনো বড়ো বিজ্ঞানী সে সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে একমত হবেন। বেশিদূরে যেতে হবে না, এ-কালের একজন শ্রেষ্ঠ পদার্থবিদ ইউজিন ভিগনার তাঁর 'সিমেট্রিজ অ্যান্ড রিফ্লেকশন্‌স' প্রবন্ধমালার শেষ প্রবন্ধে বলছেন :

'It has been said that the only occupations which bring true joy and satisfaction are those of poets, artists, and scientists, and of these, the scientists are apparently the happiest. Scientists derive an immense amount of pleasure from the study and understanding of science, and even more from discovering or rediscovcring relations between phenomena, and from the discussion and cummunication of these to students and to each other.'

কবি রবীন্দ্রনাথের 'বিশ্ব-পরিচয়' রচনার মূলে যেমন কাজ করেছে এই আনন্দের অনুভব, তেমনি গোটা বইটির মধ্যেও সেই অনুভব সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। একেবারে গোড়াতেই তিনি কবুল করেছেন, 'বালককাল থেকে বিজ্ঞানের রস-আস্বাদনে আমার লোভের অন্ত ছিল না'। তার পর ঐ উৎসর্গপত্রেই আবার বলছেন :

'বিজ্ঞান থেকে যাঁরা চিত্তের খাদ্য সংগ্রহ করতে পারেন তাঁরা তপস্বী।— মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ, আমি রস পাই মাত্র। সেটা গর্ব করবার মতো কিছু নয়, কিন্তু মন খুশি হয়ে বলে 'যথালাভ'।'

এই উক্তিগুলি কিন্তু নিছক কবির বিনয়কেই সূচিত করে না। আমাদের দেশে আজও সাধারণ মানুষের মনে বিজ্ঞানের যে ভাবমূর্তি আছে, স্টেরিয়োটাইপ আছে, তার প্রধান কথা হল 'বিজ্ঞানের উপকারিতা'। ঘুরে ফিরে অধিকাংশ অব্যবসায়ীকে এই 'উপকারিতা'র কথাই বলতে শোনা যায়, যার যাবতীয় সম্পর্ক হল প্রয়োগের সঙ্গে। স্কুলের ছাত্রই বলুন আর রাষ্ট্রীয় নেতাই বলুন, বিজ্ঞান যে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক একধরনের মানসিক চর্চার ব্যাপার, এ কথা প্রায়ই কেউ মনে রাখেন না। যাঁরা বিজ্ঞানচর্চা করেন, তাঁদের যে সৃষ্টিশীলভাবে চিন্তা করতে হয়, আইডিয়া নিয়ে কারবার করতে হয় এবং সেই-সব আইডিয়ার সাহায্যে প্রপঞ্চময় জগতের ঘটনাসমূহের বর্ণনা দেওয়ার চেষ্টা করতে হয়, এ কথা আমাদের দেশের মানুষের কাছে এখনো তেমন স্পষ্ট নয়। কবি কিংবা শিল্পীর মতো বিজ্ঞানীও যে নিজের সৃষ্টিশীলতা থেকে রস পেতে পারেন, সে কথাও তাঁদের অনেকেরই অজানা। শুধু সাধারণ মানুষই বা কেন, বিজ্ঞানীদের নিজেদের মধ্যেও কি নিজেদের পেশার এই দিকটা সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতনতা আছে? অন্য দিকে মুশকিল হচ্ছে, নানা স্তরে বিজ্ঞানের চর্চা নানা দিকে প্রসারিত না হলে তার সাংস্কৃতিক মূল্যও মানুষের নজরে আসবে না। যে-কোনো সাংস্কৃতিক চর্চার মতো এখানেও কর্ষণের ভিতর দিয়েই জমি তৈরি হতে থাকে। রবীন্দ্রনাথের নিজের দেওয়া ঐ উপমাটি খুবই উপযোগী— বড়ো অরণ্যের গাছতলায় ঝরে পড়া পাতাগুলোই পরের প্রজন্মের বৃক্ষশিশুর জন্যে জমিকে উর্বর করে তোলে। সেই কারণেই রবীন্দ্রনাথ নিজের যোগ্যতা সম্বন্ধে মাথা না ঘামিয়ে সর্বজনের জন্যে এমন একটি বই লিখতে অগ্রসর হয়েছেন। আর খুব স্বাভাবিকভাবেই নিজের রসের অনুভবকে বইটির সর্বাঙ্গে প্রকাশ করেছেন। 'বিশ্ব-পরিচয়' হল বিজ্ঞান সম্বন্ধে একজন কবির আনন্দ-অনুভবের দলিল। যে-সে কবির নয়, সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবির। সেইখানেই তার প্রথম গুরুত্ব। তবে সেইখানেই তার শেষ

নয়। আরো আছে। সেই প্রসঙ্গে আমরা একটু পরে আসব। তার আগে বিজ্ঞানের রসের দিকটি 'বিশ্ব-পরিচয়ে' কিভাবে প্রকাশ পেয়েছে, একটু দেখা যাক।

প্রথমেই বলতে হয় ভাষা এবং রচনাশৈলীর কথা। বইটি হাতে নিলেই পাঠকের দৃষ্টি এইদিকে যাবে। প্রমথনাথ সেনগুপ্তকে যে-পরামর্শ কবি দিয়েছিলেন, তার প্রয়োগের আদর্শ এই বইয়ে পাওয়া যাবে। সেই আদর্শের মূল কথাটা হচ্ছে এই : লোকশিক্ষাই যদি উদ্দেশ্য হয়, তবে লেখার মধ্যে সাহিত্যগুণ থাকলে ক্ষতি নেই, যদি বিজ্ঞানের দাবিও সঙ্গে সঙ্গে মিটিয়ে দেওয়া যায়। কেন, সেটা তাঁর নিজের ভাষাতেই শোনা যাক। 'বিশ্ব-পরিচয়'-এর উৎসর্গপত্রেই সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে তিনি বলছেন :

'শিক্ষা যারা আরম্ভ করেছে, গোড়া থেকেই বিজ্ঞানের ভাণ্ডারে না হোক, বিজ্ঞানের আঙিনায় তাদের প্রবেশ করা অত্যাবশ্যক। এই জায়গায় বিজ্ঞানের সেই প্রথম পরিচয় ঘটিয়ে দেবার কাজে সাহিত্যের সহায়তা স্বীকার করলে তাতে অগৌরব নেই। সেই দায়িত্ব নিয়েই আমি এ কাজ শুরু করেছি। কিন্তু এর জবাবদিহি একা কেবল সাহিত্যের কাছেই নয়, বিজ্ঞানের কাছেও বটে। তথ্যের যাথার্থ্যে এবং সেটাকে প্রকাশ করবার যাথাযথ্যে বিজ্ঞান অল্পমাত্রেও স্খলন ক্ষমা করে না।'

স্পষ্টতই রবীন্দ্রনাথ এখানে নিজের উপরে কঠিন শর্ত আরোপ করেছেন। তথ্যের যাথার্থ্য তো বজায় রাখতেই হবে। কিন্তু তাছাড়াও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র দুটি শর্তের কথা তিনি বলেছেন। একদিকে সাহিত্যগুণ আর অন্যদিকে প্রকাশভঙ্গির যাথাযথ্য। এই দুটি দাবি একসঙ্গে মেটানো সহজ কাজ নয়। পরোক্ষভাবে বিজ্ঞানবিষয়ক সাহিত্য রচনার একটি উচ্চাকাঙ্ক্ষী আদর্শই তিনি তুলে ধরেছেন।

আমাদের আলোচনা যখন প্রধানত 'বিশ্ব-পরিচয়'কে নিয়েই, তখন বলে রাখা দরকার যে উপরের দুটি শর্তই বইটিতে আগাগোড়া পালিত হয়েছে। 'বিশ্ব-পরিচয়'-এর সাহিত্যগুণ এমনই স্বপ্রকাশ যে তা যাচাইয়ের অপেক্ষা রাখে না। সাহিত্য হিসেবে এই রচনার প্রধান লক্ষণ হল স্বচ্ছতা। এমন এক ধরনের ভাষা দিয়ে তার শরীর গড়ে উঠেছে, যা স্ফটিকের মতোই স্বচ্ছ এবং অন্তর্দর্শী। সেই ভাষা কোথাও বক্তব্যকে ছাপিয়ে ওঠে না। বক্তব্যকে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করাতেই তার চরিতার্থতা। মুখের ভাষার সঙ্গে তার তফাত খুব সামান্য। সেই মুখের ভাষাটা অবশ্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের। যেটুকু অলংকরণ আছে, তা সেই বাবদে। বনেদী পরিবারের বুদ্ধিমতী সুন্দরী মেয়ের গলার খুব সরু সোনার হারের মতো। অনাবশ্যক কোনো বাহুল্য তাতে নেই। অবশ্য সেটাই তো প্রত্যাশিত। বক্তব্য বিষয়ের মধ্যেই যেখানে ক্রমাগত নতুন নতুন ধারণা চলে আসে, পদে পদে বিমূর্ত চিন্তা এবং বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয়, সেখানে ভাষার স্বচ্ছতা এবং সারল্য না থাকলে পাঠকের উপরে অযথা অত্যাচার করা হয়। প্রশ্ন উঠতে পারে, তা হলে আর অলংকরণের অবকাশটা রইল কোথায়? অবকাশ থাকে। অলংকরণ জড়িয়ে থাকে লেখকের বিশ্বদৃষ্টি আর ব্যক্তিত্বের সঙ্গে। জীবনব্যাপী বিকাশের ইতিহাসের সঙ্গে। রবীন্দ্রনাথের মুখের ভাষার পক্ষেও সম্ভব ছিল না একেবারে নিরাভরণ হওয়া। সম্পূর্ণ নিরলংকার হতে হলে তাঁকে সম্পূর্ণ নীরবই হতে হত। ছোট্ট একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। 'নক্ষত্রলোক' অধ্যায়ে তিনি বলছেন :

'আমাদের সূর্য তার সব গ্রহগুলিকে নিয়ে ঘুর খাচ্ছে আর তার সঙ্গেই ঘুরছে এই নাক্ষত্র চক্রবর্তীর সব তারাই, একটি কেন্দ্রের চার দিকে। এই মহলে সূর্যের ঘূর্ণিপাকের গতিবেগ এক সেকেন্ডে প্রায় দুশো মাইল। চলতি চাকার থেকে ছিটকে-পড়া কাদার মতোই সে ঘোরার বেগে নাক্ষত্র চক্র থেকে ছিটকে পড়ত ; এই চক্রের হাজার কোটি নক্ষত্র ওকে টেনে রাখছে, সীমার বাইরে যেতে দেয় না।'

'ঘুর খাচ্ছে', 'চলতি চাকার থেকে ছিটকে-পড়া কাদার মতোই' ইত্যাদি বাক্যাংশের মৌখিক ধরন অবশ্যই পাঠকের নজরে পড়বে। তৎসম শব্দের ব্যাপারে তাঁর মিতব্যয়িতাও মনে রাখার মতো। কিন্তু প্রয়োজনবোধে ওইজাতের শব্দকে নিয়েও যে তিনি খেলা করতে পারেন, সেটাও লক্ষণীয়। 'নাক্ষত্র চক্র' হল galaxy-র কবিকৃত প্রতিশব্দ। একদিক দিয়ে এটা ঠিক পরিভাষা নয়। অন্য দিকে আবার পরিভাষার চেয়ে বেশি। কেননা আমাদের নক্ষত্রপুঞ্জের আকার যে অনেকটা

চাকার মতো, সেই ইঙ্গিতও এখানে পাচ্ছি। প্রথম বাক্যটিতে আবার সেই 'নাক্ষত্র চক্র'ই হয়ে গেছে 'নাক্ষত্র চক্রবর্তী'। তার কারণ, এখানে তিনি হাজার কোটি নক্ষত্রের ওই সমাহারকে বৃহত্তর একটি সত্তা হিসেবে কল্পনা করতে বলছেন আমাদের। ফলে galaxy হয়ে যাচ্ছে নাক্ষত্র সম্রাট। শব্দ নিয়ে এই যে খেলা, এর মূলগত উদ্দেশ্য কিন্তু বিষয়বস্তুকেই নানাভাবে আলোকিত করা। অর্থাৎ বিজ্ঞানের যাথাযথ্যের সঙ্গে এখানে তিনি সাহিত্যগুণকে স্বচ্ছন্দে মিলিয়ে দিয়েছেন, কোথাও কোনো ফাঁক রাখেন নি। তেমনি, 'চলতি চাকার থেকে ছিটকে-পড়া কাদার মতো' এই বাক্যাংশটিও নিছক উপমা নয়। চাকা যখন ঘোরে, তখন তার গায়ে লেগে থাকা কাদার উপর একটা বল ক্রিয়া করে। পরিভাষায় তাকে বলে কেন্দ্রাতিগ বল (centrifugal force)। সেই বলের দরুনই ঘুরন্ত চাকা থেকে কাদা ছিটকে বেরিয়ে যায়। নাক্ষত্র চক্রের অন্তর্গত নক্ষত্রগুলির উপরেও কিন্তু সেই একই বল ক্রিয়া করে। তবু যে তারা ছিটকে বেরিয়ে যায় না, তার কারণ প্রতিটি নক্ষত্রকে অন্য নক্ষত্রগুলি মহাকর্ষের টানে বেঁধে রাখে। সুতরাং ঘুরন্ত চাকার সঙ্গে নাক্ষত্র চক্রের বেশ একটা বাস্তব সাদৃশ্য আছে। এখানেও সাহিত্যের উপমা আর বিজ্ঞানের তুলনা মিলেমিশে আছে। অলংকার আছে, কিন্তু তা বিজ্ঞানেরই আনুকূল্য করছে। এরকম আরো অনেক দৃষ্টান্ত 'বিশ্ব-পরিচয়'-এর সর্বত্র ছড়িয়ে আছে।

এই যে সামান্য দৃষ্টান্তটুকু দেওয়া হল, তা থেকে একটা কথা কিন্তু স্পষ্ট বোঝা যায়। সাহিত্যগুণ আর বৈজ্ঞানিক যাথাযথ্যের এই যে রাজযোটক, এর পথ ক্ষুরস্য ধারার মতো। বাংলায় বিজ্ঞানের বই লিখবার উৎসাহ যাঁদের আছে, ভাষার স্বাচ্ছন্দ্য আর বৈজ্ঞানিক যাথার্থ্যের ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের কাছে এখনো তাঁদের অনেক শেখার আছে। তার মানে কিন্তু এই নয় যে তাঁর ভাষার কাব্যগুণ আমাদের মকশ করতে হবে। তাঁর পরিধানের ঢিলে জোব্বা যেমন তাঁকেই মানাত, তেমনি তাঁর কাব্যগুণমণ্ডিত আটপৌরে ভাষাও ছিল তাঁর একান্ত নিজস্ব। সে-ভাষার নকল করতে গেলে ফল ভালো না হওয়াই সম্ভব। নিজেদের ক্ষমতা ভাল করে বুঝে নিয়েই তাঁর কাছে আমাদের ভাষার সারল্যের পাঠ নিতে হবে। সারল্যেরও যে প্রকারভেদ হতে পারে, এ কথা মনে রাখতে হবে। রেখে ভাষায় যতটা সম্ভব প্রসাদগুণ আনতে হবে। কথাটা আরো পরিষ্কার হয়, যদি আর একটু খুঁটিয়ে তাঁর বাক্য গড়বার পদ্ধতি আমরা লক্ষ্য করি। ওই একই অনুচ্ছেদে পাচ্ছি, '...তার সঙ্গেই ঘুরছে এই নাক্ষত্র চক্রবর্তীর সব তারাই'। এখানে 'ঘুরছে' ক্রিয়াটির কর্তা হল 'সব তারাই'। অর্থাৎ কর্তা আসছে একেবারে শেষে। বলা বাহুল্য, বাক্যের এই গড়ন কবিতার কথা মনে করিয়ে দেয়। শুধু গড়ন নয়, 'সব তারাই' পদ দুটি শুনতে-না-শুনতে আমাদের মনে পড়ে যায় তাঁর একটি কবিতার পঙ্‌ক্তি : 'রাতের সব তারাই আছে দিনের আলোর গভীরে'। আবার সূর্যের সর্বনাম হিসেবে 'সে', 'ওকে', এই দুটি পদের ব্যবহারও কাব্যের দ্যোতনা আনে। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনে হয়, এই ক্ষুদ্র অনুচ্ছেদের তিনটি মাত্র বাক্যেও অন্তঃসলিলা গদ্যকাব্যের একটা প্রবাহ আছে, যা আমাদের মতো যে-কোনো সাধারণ লেখককে বিপজ্জনকভাবে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারত। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে সেই বিপদ ঘটে নি, কারণ শব্দ নিয়ে খেলার নিয়মগুলো তাঁর নখদর্পণে ছিল। কবিতার মৃদু ব্যঞ্জনা বজায় রেখেও তিনি বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের গতিকে অব্যাহত রেখেছেন। সেটা সম্ভব হয়েছে একদিকে তাঁর আশ্চর্য মাত্রাজ্ঞানের গুণে। আর অন্য দিকে বাংলাভাষার প্রতিটি দেশজ আর তদ্ভব শব্দের সঙ্গে তাঁর আজীবন পরিচয় আর ঘনিষ্ঠতার কল্যাণে। আমরা তো জানি, রবীন্দ্রনাথের শেষজীবনের কাব্যে এবং গদ্যরচনাতেও একই সঙ্গে একটা নির্ভার স্বচ্ছতা আর শব্দপ্রয়োগের ক্ষুরধার যাথাযথ্য আসছিল। বুদ্ধি এবং অনুভবের অতুলনীয় পরিণতি নিশ্চয়ই তার পিছনে ছিল। সঙ্গে সঙ্গে বাংলাভাষার স্বভাব সম্বন্ধে তাঁর জীবনব্যাপী চিন্তাভাবনাও তাঁকে একটা সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল। সেই সিদ্ধান্তটা হচ্ছে বাংলাভাষাকে একটি প্রাপ্তবয়স্ক স্বাধীনভাষা হিসেবে তার উপযুক্ত মর্যাদা দেওয়া। 'বাংলা শব্দতত্ত্ব' বইখানিতে তাঁর এই চিন্তাভাবনা সুস্পষ্ট আকার পেয়েছে। সেই বইয়ের একেবারে প্রথম প্রবন্ধ 'ভাষার কথা' যদিও ১৩২৩ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ বেশ আগেই লেখা, তবু তাঁর বক্তব্যের মূল সূত্রটা সেখানেই পাচ্ছি।

'আসল কথা, সংস্কৃত ভাষা যে অংশে বাংলা ভাষার সহায় সে-অংশে তাহাকে লইতে হইবে, যে-অংশে বোঝা সে-অংশে তাহাকে ত্যাগ করিতে হইবে'। বাংলাকে সংস্কৃতের সন্তান বলিয়াই যদি মানিতে হয় তবে সেইসঙ্গে এ কথাও মানা চাই যে

তার ষোলো বছর পার হইয়াছে, এখন আর শাসন চলিবে না, এখন মিত্রতার দিন। কিন্তু যতদিন বাংলা বইয়ের ভাষা চলিত ভাষার ঠাট না গ্রহণ করিবে ততদিন বাংলা ও সংস্কৃত ভাষার সত্য সীমানা পাকা হইতে পারিবে না। ততদিন সংস্কৃত বৈয়াকরণের বর্গির দল আমাদের লেখকদের ত্রস্ত করিয়া রাখিবেন। প্রাকৃত বাংলার ঠাটে যখন লিখিব তখন স্বভাবতই সুসংগতির নিয়মে সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রভাব বাংলা ভাষার বেড়া ডিঙাইয়া উৎপাত করিতে কুণ্ঠিত হইবে।'

'বিশ্ব-পরিচয়'-এর ভাষা সম্বন্ধে সবচেয়ে বড় কথা এই যে গোটা বইটাই 'প্রাকৃত বাংলার ঠাটে' লেখা। সে-ভাষার ঠাট এতটাই প্রাকৃত যে আমাদের সন্দেহ হয়, ১৩২৩ সালে ঐ প্রবন্ধটি লিখবার সময় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও হয়তো এতটা ভাবতে পারেন নি। তাগিদটা তাঁর ভিতরেই ছিল, কিন্তু সেটা সাকার হয়েছে আরো পরে। কারণ, দেখতেই পাচ্ছি, 'ভাষার কথা' প্রবন্ধের বক্তব্য যতটা আধুনিক, তার নিজের ভাষা ঠিক সেই পরিমাণে আধুনিক নয়। যাই হোক, প্রাকৃত বাংলার ঠাটে লেখা এই যে 'বিশ্ব-পরিচয়', রবীন্দ্রনাথের গদ্য রচনাবলীর মধ্যে তার বৈশিষ্ট্য কোথায়? বৈশিষ্ট্য বোধহয় এই যে আগাগোড়া গভীর মনোনিবেশ দাবি করে এমন একটি বিষয়ের আলোচনায় লেখক আগাগোড়া প্রাকৃত ঠাট বজায় রেখেছেন। আধুনিক বাংলা গদ্যের প্রধান রূপকার রবীন্দ্রনাথ যেন দেখিয়ে দিচ্ছেন, মননধর্মী সাহিত্যের ভাষা হিসেবেও আধুনিক বাংলা ভাষা কত সবাক হতে পারে। 'ভাষার কথা' যদি হয় ভবিষ্যতের বাংলা ভাষা সম্বন্ধে তাঁর সুচিন্তিত ইস্তাহার, তবে 'বিশ্ব-পরিচয়' হচ্ছে তাঁর সেই চিন্তার পরিচ্ছন্ন রূপায়ণ। বিশেষ করে, বিমূর্ত চিন্তা ছাড়া যেখানে একপাও চলা যায় না, সেইখানে দেশজ শব্দের ব্যাপক ব্যবহার খুবই লক্ষণীয়। শুধু তাই নয়, ভাষাকে সহজ করবার খাতিরে শব্দের কোনোরকম জাতবিচারই তিনি করেন নি। যেখানে 'টান' বললে চলে, সেখানে 'আকর্ষণ' ব্যবহার করেন নি। 'কম্পন' না লিখে লিখেছেন 'কাঁপন'। Radiation-এর বাংলা করেছেন 'তেজ'। তাপের দরুন যে-কোনো গরম জিনিসে কাঁপন তৈরি হয়, ফলে সেই জিনিস ছুঁলে আমাদের শরীরে ধাক্কা লাগে। আবার আলোর দরুন আকাশেও এক ধরনের কাঁপন হয়, সেই কাঁপন আমাদের চোখে এসে সাড়া জাগায়। এই দুটো কথাটাকে একসঙ্গে সাজিয়ে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, 'আলো মারে চোখে, গরম মারে গায়ে।' মাত্র ছ'টি শব্দে সবটা বলা হয়ে গেল। প্রাকৃত বাংলার ঠাট যে কতটা শক্তিমান হতে পারে, তা দেখা গেল। সঙ্গে সঙ্গে বলব, ভাষার উপরে অনেকটা দখল না থাকলে এই ধরনের বাক্য গড়ার চেষ্টা না করাই ভালো। এই ভঙ্গি সকলের কলমে ঠিক ওতরাবে না।

বিজ্ঞানবিষয়ক রচনার ভাষা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের যে-সব উক্তি আমরা উদ্‌ধৃত করেছি, তা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল বিজ্ঞান শিক্ষার পদ্ধতি (pedagogy) সম্বন্ধে। সাহিত্য কিংবা ভাষাশিক্ষার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ যে জাত-শিক্ষক ছিলেন, তা সবাই জানেন। 'সহজপাঠ' থেকে শুরু করে 'অনুবাদ চর্চা' পর্যন্ত অনেকগুলি বই তিনি লিখেছিলেন নিজের শিক্ষাচিন্তাকে প্রকাশ করে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তিনি পাঠ্যপুস্তক লেখেন নি। কিন্তু পরিণত বয়সের এই নতুন ভালোবাসার বিষয়টিতেও শিক্ষক হিসেবে তাঁর দক্ষতা যে কত উঁচুদরের ছিল, তার প্রমাণ হচ্ছে 'বিশ্ব-পরিচয়'। তফাতের মধ্যে শুধু এই যে এখানে তিনি একেবারে সর্ব সাধারণের জন্যে বই লিখেছেন। তাই ক্লাসঘরের কোনো অনুষ্ঠান কোনো ভাবভঙ্গিই এখানে অনুপ্রবেশ করে নি। একেবারে সরাসরি তিনি বিষয়ে মনোনিবেশ করতে পেরেছেন। এখানে তাঁর একমাত্র চিন্তা হচ্ছে কিভাবে অব্যবসায়ীর কাছে বিষয়টিকে সহজে পৌঁছে দেওয়া যায়। শিক্ষার্থীর নিজের বিদ্যার পুঁজি যেখানে কম, সেখানে পদ্ধতির গুরুত্ব খুব বেশি। কথাটা তিনি বিশেষভাবে বুঝতেন, কারণ তিনি নিজে বিজ্ঞানী ছিলেন না। এই শেষোক্ত ঘটনাটাও তাঁর সহায়ক হয়েছে। তিনি যে বিজ্ঞানের পেশাদারী জগতের বাইরের লোক, এই ব্যাপারটাকেও তিনি কাজে লাগিয়েছেন। হরেদরে পাঠকের মনোযোগ তিনি পেয়ে যাবেন, এরকম কোনো অহংকার তাঁর ছিল না। সেই কারণেই শিক্ষণ পদ্ধতি সম্বন্ধে তিনি অনেক বেশি খুঁটিয়ে ভেবেছেন। একটা তুলনা এইসূত্রে মনে আসে। এটা তো আমরা এখন মানি যে রবীন্দ্রনাথই এদেশে আধুনিক চিত্রকলার পথিকৃৎ। বিশেষ করে রঙের ব্যবহারে তিনি খুব একটা নতুনত্ব এনেছেন। ছবির বিমূর্ত ভাষাকেও তিনি প্রতিষ্ঠা পেতে সাহায্য করেছেন। এই কাজটা তিনি যেভাবে করলেন, প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষিত কোনো চিত্রকর তো তাঁর আগে সেইভাবে করেন নি। করেন নি মানে এই দেশে করেন

নি। ঠিক সেইভাবেই দেখছি, শুধু তাঁর সমকালে কেন, আজ পর্যন্ত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষিত কোনো অধ্যাপক কিংবা গবেষকই তো 'বিশ্ব-পরিচয়'-এর মতো আগাপাশতলা স্বকীয়তায় মোড়া বর্ণোজ্জ্বল একটি লোকশিক্ষার বই লিখতে পারেন নি। এখানেও যেন প্রথাগত শিক্ষার অভাবকেই তিনি সৃষ্টিশীলভাবে ব্যবহার করেছেন।

বই লেখার প্রথম পর্যায়ে প্রমথনাথ সেনগুপ্তকে পারিভাষিকের ব্যবহার সম্বন্ধে কিংবা অনভিজ্ঞ ব্যক্তিকে রচনা পড়তে দেওয়া সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে পরামর্শ দিয়েছিলেন, সেগুলোও তো আসলে একজন ভালো শিক্ষকেরই পরামর্শ। তা ছাড়াও অবশ্য 'বিশ্ব-পরিচয়'-এর প্রত্যেক অধ্যায়ে উৎকৃষ্ট শিক্ষণ-পদ্ধতির অনেক দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে আছে। তার মধ্যে দুয়েকটার দিকে তাকানো যেতে পারে।

'পরমাণুলোক' অধ্যায়ে পরমাণুর কেন্দ্রে স্থিত প্রোটন কিভাবে পরমাণুর বাইরের মহলের ইলেকট্রনকে টেনে ধরে রাখে, সেটা বোঝাতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ সৌরজগতের তুলনা দিয়েছেন :

'সূর্য যেমন সৌরলোকের কেন্দ্রে থেকে টানের লাগামে ঘোরাচ্ছে পৃথিবীকে, পজিটিভ বৈদ্যুতকণা তেমনি পরমাণুর কেন্দ্রে থেকে টান দিচ্ছে নেগেটিভ কণাগুলোকে, আর তারা সার্কাসের ঘোড়ার মতো লাগামধারী পজিটিভের চার দিকে ঘুরছে।'

আমরা জানি, সূর্য যে-কারণে পৃথিবীকে টানে, পজিটিভ বৈদ্যুতকণা সেই কারণে নেগেটিভ বৈদ্যুতকণাকে টানে না। প্রথম কারণটিকে আমরা বলি মহাকর্ষ, আর দ্বিতীয়টিকে বলি তড়িতের ক্রিয়া। কিন্তু দুটি ক্ষেত্রেই টানের ধরনটা একই। সুতরাং তুলনাটা ঠিক। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, দুটি ক্ষেত্রেই একটি বস্তু অন্য আরেকটি বস্তুর সংস্পর্শে না এসেই দূর থেকে তাকে টানছে। দৈনন্দিন জীবনে এর কোনো দৃষ্টান্ত দেওয়া শক্ত, যদি না চন্দ্র-সূর্যের আকর্ষণকে প্রাত্যহিক জীবনের ঘটনা বলেই ভাবি। যাই হোক, সেই নিউটনের আমল থেকেই এই ধরনের দূরাগত ক্রিয়া (action at a distance) নিয়ে অনেক ভাবনা-চিন্তা হয়েছে। বলা বাহুল্য, 'বিশ্ব-পরিচয়'-এর মতো সহজপাঠ্য বইয়ে দূরাগত ক্রিয়ার আলোচনা আমদানী করলে বেমানান হত। শিক্ষণ-পদ্ধতির এই সমস্যার সমাধান রবীন্দ্রনাথ করেছেন ঘোড়ার লাগামের উপমা ব্যবহার করে। যে-কোনো বিশেষজ্ঞ এ ক্ষেত্রে এর চেয়ে ভালো কোনো প্রকরণ বার করতে পারতেন বলে মনে হয় না।

এখন, এই যে পারস্পরিক টান, এর ফলে নেগেটিভ বৈদ্যুতকণা অর্থাৎ ইলেকট্রনটি কেন পজিটিভ বৈদ্যুতকণা বা প্রোটনের দেহে গিয়ে মিশে যায় না? এই প্রশ্নের উত্তর রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন একটু পরেই :

'এর একই জাতের প্রশ্ন হচ্ছে, পৃথিবী কেন সূর্যের গায়ে গিয়ে এঁটে যায় না। সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একটা পিণ্ডে তাল পাকিয়ে যায় না কেন। এর উত্তর, এই পৃথিবী সূর্যের টান মেনেও দৌড়ের বেগে তফাত থাকতে পারে। দৌড় যদি যথেষ্ট পরিমাণ বেশি হত তা হলে টানের বাঁধন ছিঁড়ে শূন্যে বেরিয়ে পড়ত, দৌড়ের বেগ যদিও ক্লান্ত হত তাহলে সূর্য তাকে দিত আত্মসাৎ করে।'

ঘটনা এই যে দৌড়ের বেগের দরুন পৃথিবীর উপর যে কেন্দ্রাতিগ বল ক্রিয়া করে, সেটা অনুভূত হয় ঐ টানের বিপরীতমুখে। ফলে পৃথিবী সূর্যের টানকে অতিক্রম করতে পারে। দৌড়ের বেগ বাড়লে বিপরীতমুখী বল বেড়ে যায়, ফলে পৃথিবী ছিটকে বেরিয়ে যেতে পারে। আবার বেগ কমলে সেই বলও কমে যায়, ফলে সূর্যের টানই প্রবলতর হয়ে যাবে। এখানে কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কেন্দ্রাতিগ বলের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন নি। করলে বল জিনিসটার সংজ্ঞা ভালো করে বোঝাতে হত, তার পর কেন্দ্রাতিগ বলের ধারণা দিতে হত। তা না করে তিনি দৌড়ের বেগের ব্যাপারটার উপরেই জোর দিয়েছেন। বিমূর্ত ধারণা আর কঠিন পরিভাষা, দুটোকেই এড়িয়ে গেছেন। বিচক্ষণ শিক্ষকের কাজই করেছেন। একবার যদি শিক্ষার্থী স্বজ্ঞা দিয়ে দৌড়ের বেগের ভূমিকাটি ধরতে পারেন, পরে পরিভাষা শিখে নিতে কিংবা আরো বিমূর্ত ব্যাখ্যা বুঝে নিতে তাঁর অসুবিধা হবে না।

যুক্তিসংগত কারণেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর বইয়ে পারিভাষিকের ব্যবহার যথাসাধ্য এড়িয়ে গেছেন। তবু নিতান্ত প্রয়োজনবোধে যেটুকু পরিভাষার সাহায্য তিনি নিয়েছেন, তার মধ্যেও পরিচ্ছন্ন শিক্ষাচিন্তা এবং গভীর ভাষাজ্ঞানের পরিচয়

পাই। বলা বাহুল্য, এই পরিভাষা তাঁর নিজেরই তৈরি। একদিকে এগুলি যথাযথ, অন্য দিকে বাংলা ভাষার স্বভাবের সঙ্গেও তাদের চমৎকার মিল। যেমন, ইংরেজী 'solid' কথাটির প্রতিশব্দ হিসেবে তিনি 'নিরেট' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। 'চলন্তিকা'য় solid অর্থে 'কঠিন' শব্দটি দেওয়া হয়েছে। পারিভাষিক হিসেবে এটিই বেশি ব্যবহৃত হয়। মুশকিল হচ্ছে, 'কঠিন' বলতে কাঠিন্যের যে গুণ মনে আসে, তার যথার্থ ইংরেজী প্রতিশব্দ 'Hardness'। সুতরাং 'কঠিন' বলতে 'hard'ই বোঝায়। নিরেট বলতে কিন্তু এমন জিনিসকে বোঝায় যা ফাঁপা নয়, অর্থাৎ যার ক্ষুদ্রতম অংশগুলির মধ্যে ফাঁক কম। 'Solid'কথাটারও অর্থ বাস্তবিক তাই। কোনো বস্তু নিরেট হলেই যে তাকে কঠিন হতে হবে এমন কোনো কথা নেই। এক তাল আটা অথবা প্লাস্টিসিন হাতে নিলেই কথাটা স্পষ্ট হবে।

'নিরেট' কথাটার আরেকটা গুণ এই যে তা দেশজ শব্দ, সুতরাং সহজবোধ্য। এইরকম আরো অনেক শব্দের মধ্যে একটা হল 'জুড়ি'। নক্ষত্রলোকে পরস্পরের কাছাকাছি থেকে দুটি নক্ষত্র যেখানে একে অন্যকে প্রদক্ষিণ করে, সেখানে তিনি তাদের 'যুগ্ম নক্ষত্র' না বলে বলেছেন 'জুড়ি নক্ষত্র' (binary star)। যে সহজবোধ্যতার প্রয়োজনে বাংলায় বিজ্ঞানচর্চা বাঞ্ছনীয়, এই-সব বাংলা শব্দের সেই গুণ তৎসম শব্দের চেয়ে বেশি। ব্যাপকভাবে পরিভাষার ব্যবহার না করেও রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টতই এইদিকে ইঙ্গিত করে গেছেন।

এবারে আমরা 'বিশ্ব-পরিচয়'কে লোকবিজ্ঞানের বই হিসেবে আরো একটু সামগ্রিকভাবে দেখবার চেষ্টা করতে পারি। পরিভাষার স্বল্পতা, ভাষার স্বচ্ছতা, সুস্পষ্ট সাহিত্যগুণ এবং প্রচ্ছন্ন কাব্যময়তা, সব মিলিয়ে তার এই যে চেহারা, আগেই বলেছি, আমাদের দেশে তার কোনো তুলনা পাওয়া যায় না। প্রশ্ন উঠবে, অন্য দেশের বিজ্ঞানসাহিত্যেও কি 'বিশ্ব-পরিচয়'-এর কোনো জুড়ি পাওয়া যাবে? বিশেষ করে সেই-সব দেশে, যেখানে এই ধরনের চর্চার একটা ভালো ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে? প্রশ্নটা মূলত শিক্ষণ-পদ্ধতি নিয়েই, কারণ এই ধরনের বইয়ের আসল উদ্দেশ্য তো লোকশিক্ষাই।

ইয়োরোপ-আমেরিকার সমাজজীবনে আজ বিজ্ঞান এমন একটা জায়গা দখল করে নিয়েছে যে বিজ্ঞানকে বাদ দিয়ে সেখানে সংস্কৃতির কথা ভাবাই যায় না। সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ভাষাতেও ঐ-সব দেশে বিজ্ঞানের ব্যাপক অনুপ্রবেশ ঘটেছে। স্কুলের ছাত্র থেকে শুরু করে প্রাপ্তবয়স্ক অবিজ্ঞানী মানুষ পর্যন্ত সর্বস্তরেই নানা ধরনের সহজবোধ্য বিজ্ঞানের বইয়ের চাহিদা আছে। তা ছাড়া টেলিভিশন, সাময়িক পত্রিকা আর খবরের কাগজের কল্যাণে বিজ্ঞানের যাবতীয় খবর সকলের কাছে গিয়ে পৌঁছচ্ছে। স্কুলের পাঠক্রমে তো বটেই, এমন-কি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরেও সকলকেই কিছু-না-কিছু বিজ্ঞান পড়তে হয়। সাহিত্য দর্শন কিংবা ইতিহাসের ছাত্ররাও তার থেকে বাদ পড়েন না। এই-সবের ফলে বিজ্ঞানের যে-কোনো শাখায় সাধারণ মানুষের জন্যে বই লেখার ব্যাপারটা আর সেখানে নতুন কিছু নয়। এমন-কি অর্থোপার্জনেরও যথেষ্ট সুযোগ এই কাজে আছে। সুতরাং 'বিশ্ব-পরিচয়' রচনার ভিতর দিয়ে রবীন্দ্রনাথ পথিকৃতের যে কঠিন দায়িত্ব পালন করতে চেয়েছিলেন, তার কোনো তুলনা এখনকার ইয়োরোপ কিংবা আমেরিকায় পাওয়া সম্ভব নয়। তবে অন্য একদিক দিয়ে তুলনা সম্ভবপর। শিক্ষণ-পদ্ধতি এবং সেই পদ্ধতির যে রূপায়ণ তাঁর রচনাশৈলীর মধ্যে পাওয়া যায়, তুলনাটা সেইখানে চলতে পারে। খুব ব্যাপকভাবে সেই তুলনার মধ্যে গেলে অনেকটা জায়গা লাগবে। তাই শুধু দুজন লেখকের প্রসঙ্গ আমরা এখানে তুলব—এমন দুজন যাঁদের প্রতিনিধিস্থানীয় বলে মনে করা যায়। সেই দুজন লেখক হলেন জর্জ গ্যামো আর কার্ল সেগান। এঁদের মধ্যে জর্জ গ্যামো ছিলেন বিখ্যাত পদার্থবিদ। আর কার্ল সেগান হচ্ছেন জ্যোতির্বিজ্ঞানী। গ্যামোর জন্ম হয়েছিল রাশিয়াতে, কিন্তু অল্প বয়সে তিনি মা-বাবার সঙ্গে সেখান থেকে চলে আসেন। পদার্থবিদ্যায় তাঁর বিখ্যাত গবেষণা আছে পরমাণুকেন্দ্রের তেজস্ক্রিয় ক্ষয় সম্বন্ধে। জ্যোতির্বিজ্ঞানেও তাঁর কাজ আছে। কিন্তু পশ্চিমের শিক্ষিতসমাজে তাঁর ব্যাপক পরিচয় মিস্টার টমকিনস-এর মানসপিতা হিসেবে। মিস্টার সিরিল জর্জ হেনরি টমকিনস অবশ্য পেশায় ছিলেন কনিষ্ঠ কেরানী। কিন্তু ঘটনাচক্রে তাঁর বিয়ে হয়েছিল রীতিমত নামজাদা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপকের মেয়ের সঙ্গে। সেই অধ্যাপকের আবার বিষয় ছিল পদার্থবিদ্যা। ফলে টমকিনস মহাশয়কে প্রায়ই পদার্থবিদ্যার নানাবিষয়ে বক্তৃতা শুনতে হত। সেই-সব দীর্ঘ বক্তৃতা শুনতে শুনতে টমকিনস অনিবার্যভাবেই ঘুমিয়ে

পড়তেন। আর ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখতেন। প্রত্যেকটি স্বপ্নের বিষয়বস্তু হত তাঁর শ্বশুরের দেওয়া সেই দিনকার বক্তৃতা। অর্থাৎ যেদিন শ্বশুরমশায় আপেক্ষিকতার তত্ত্ব সম্বন্ধে বললেন, সেদিন স্বপ্নের বিষয় দাঁড়াল আপেক্ষিকতা। আবার যেদিন শ্বশুরমশায় চেষ্টা করলেন জামাইকে কোয়ান্টামতত্ত্ব সম্বন্ধে শিক্ষিত করে তুলতে, সেদিন টমকিনসকে এসে আক্রমণ করল হাইজেনবার্গের অনির্দেশ্যতার বাঘ। সেই বাঘ যে ঠিক কোন্‌দিক থেকে এসে মহাশয়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে, তা বোঝবার উপায় নেই। কারণ বেশ দশাসই চেহারার বাঘ হয়েও সে অনির্দেশ্যতার সূত্র মেনে চলে। যে-কোনো মুহূর্তে তার সঠিক অবস্থান নির্ভুলভাবে জানা সম্ভব নয়। কেবল যে-কোনো জায়গায় তার থাকবার সম্ভাবনা কত, শুধু সেইটুকুই বলা সম্ভব। অতি বিপজ্জনক এবং অনিশ্চিত এই অবস্থার মধ্যে পড়ে কতকটা প্রাণের দায়েই বেচারা টমকিনস খানিকটা কোয়ান্টামতত্ত্ব শিখে ফেললেন। বলা বাহুল্য, ঘুমের মধ্যেই। শ্বশুরের বক্তৃতায় সরাসরি যেটা হতে পারত না, স্বপ্নের ভিতরে বেশ সহজেই সেটা হয়ে গেল। ঘটনাটি পাওয়া যাবে গ্যামোর 'মিস্টার টমকিনস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ড' বইখানিতে।

আপেক্ষিকতার তত্ত্বের একটা পরিণাম হল সময়ের আপেক্ষিকতা। যেমন, খুব বেশি বেগে যদি কেউ চলতে থাকেন, তবে তাঁর সময়ের গতি হয়ে যাবে অন্যদের তুলনায় শ্লথ। অন্যদের আঠারো মাসে তাঁর এক বছর হবে, কিংবা আরো কম। ফলে তাঁর বয়স বাড়বে অনেক বেশি ধীরে ধীরে। এখন, বেশি বেগে চলা বলতে বোঝায় আলোর সঙ্গে তুলনীয় বেগে চলা। দৈনন্দিন জীবনে আমরা কেউই তেমন দ্রুত চলতে পারি না, তাই সময়ের এই আপেক্ষিকতা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু এমন যদি হত যে খুব সাধারণ বেগে চলাফেরা করলেই ব্যাপারটা টের পাওয়া যেত ? সে ক্ষেত্রে যে-সব আশ্চর্য অভিজ্ঞতা আমাদের হত, তারই নিদর্শন পাই টমকিনসের আপেক্ষিকতাঘটিত একটি স্বপ্নে। গ্যামোর রচনাভঙ্গির নমুনা হিসেবে সরাসরি তাঁর ইংরেজী লেখা থেকেই তুলে দিলাম :

'Continuing his journey down the street he finally saw the railway station. A gentleman obviously in his forties got out of the train and began to move toward the exit. He was met by a very old lady, who, to Mr. Tompkins' great surprise, addressed him as "dear Grandfather." This was too much for Mr. Tompkins. Under the excuse of helping with the luggage, he started a conversation.

"Excuse me, if I am intruding into your family affairs," said he, "but are you really the grandfather of this nice old lady? You see, I am a stranger here, and I never...", "Oh, I see," said the gentleman, smiling through his moustache. "I suppose you are taking me for the Wandering Jew or something. But the thing is really quite simple. My business requires me to travel quite a lot, and, as I spend most of my life in the train, I naturally grow old much more slowly than my relatives living in the city. I am so glad I came back in time to see my dear little granddaughter still alive! But excuse me, please, I have to help her into the taxi," and he hurried away, leaving Mr. Tompkins alone again with his problems.'

সাধারণ পাঠকের কাছে অপেক্ষাকৃত কঠিন একটি বিষয়কে চিত্তাকর্ষক চেহারায় পৌঁছে দেওয়ার এই যে পদ্ধতি, এতে নিছক বর্ণনা কিংবা বিশ্লেষণের মাধ্যমে না এগিয়ে গল্পের সাহায্যও নেওয়া হয়েছে। গল্প শুনতে কার না ভালো লাগে। সুতরাং জর্জ গ্যামো যে জনপ্রিয় হয়েছিলেন, সেটা মোটেই আশ্চর্য নয়। বস্তুত তাঁর লেখা বইগুলি এখনো ব্যাপকভাবে পঠিত হয়। কিন্তু বিষয়ের উপরে অনায়াস দখল ছাড়াও এর মধ্যে অন্য একটা ব্যাপার আছে। খুব সূক্ষ্ম এক ধরনের রসবোধ গ্যামোর টমকিনস পর্যায়ের বইগুলির প্রতিটি গল্পে মাখানো আছে। বস্তুজগতের বিচিত্র ঘটনাচক্রে যে বিপন্ন বিস্ময় কেরানীকুলতিলক টমকিনস মহাশয়কে বেকায়দায় ফেলে, তারই উল্টো পিঠে দেখতে পাই বৃদ্ধা নাতনীর তরুণ দাদুর গোঁফের আড়ালে উঁকিমারা মুচকি হাসি। বলা নিষ্প্রয়োজন, ওটা আসলে গ্যামোর নিজেরই মুখের হাসি। জর্জ গ্যামোকে

যাঁরা জানেন, তাঁদের মনে সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকে না। প্রবন্ধসাহিত্য আর কথাসাহিত্য, এই দুয়ের মাঝামাঝি একটা সরস রচনাশৈলী গ্যামোর প্রসন্ন আড্ডাবাজ এবং কৌতুকপ্রিয় ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সুন্দর মানিয়ে গেছে। অবশ্য তিনিও জানতেন, পদার্থবিদ্যার যে-কোনো বিষয়ে যাবতীয় বক্তব্য শুধু এই ধরনের গল্পের মাধ্যমে বলা সম্ভব নয়। তাই প্রসঙ্গ শুরু করবার সময় তিনি টমকিনসের অধ্যাপক শ্বশুরের দেওয়া বক্তৃতার সাহায্য নিতেন। তার পর সময়মত সেই বক্তৃতার শ্রোতা শ্রীমান টমকিনসকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে 'স্বপ্নমঙ্গলের' মারফত বক্তব্যকে জীবন্ত করে তুলতেন। অর্থাৎ বর্ণনা, বিশ্লেষণ আর কথকতা এই তিনটি জিনিসেরই ব্যবহার তিনি করেছেন লোকবিজ্ঞানের রচনায়। তবে খুব সুচারুভাবে বিশ্লেষণের কাজটা অনেকটাই মিশিয়ে দিয়েছেন কথকতার সঙ্গে। সেইখানেই তাঁর বাহাদুরী।

লোকবিজ্ঞানের অন্য যে বিশিষ্ট লেখকের কথা আমরা এখানে বলতে চাই, তাঁর নাম কার্ল সেগান। ইনি একেবারে এখনকার মানুষ এবং শুধু লেখক না বলে এঁকে আধুনিক বিজ্ঞানের বহুদর্শী প্রবক্তাই বলা উচিত। পেশাগতভাবে সেগান হচ্ছেন কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং মহাকাশ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক। তা ছাড়া ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রহলোক-বিষয়ক গবেষণাগারেরও অধ্যক্ষ তিনি। গ্রহলোক সম্বন্ধে তাঁর অনেক গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা আছে। শুক্রগ্রহের আবহমণ্ডলের অতিরিক্ত উষ্ণতার মূলে যে আছে কাচঘরের (greenhouse) সঙ্গে তুলনীয় একটা অবস্থা, এটা সেগানই প্রথম অনুমান করেন জেমস পোলাকের সঙ্গে। মঙ্গলগ্রহে প্রায় দশ কিলোমিটার উঁচু পর্বতের অস্তিত্বও তিনি প্রমাণ করেন ঐ পোলাকের সঙ্গেই, রেডার যন্ত্রের সাহায্যে। বৃহস্পতির আবহমণ্ডলে মিথেন প্রমুখ জৈব উপাদানের উপস্থিতিও সেগানই প্রমাণ করেন। এ ছাড়া পৃথিবীতে প্রাণের উদ্ভব কিভাবে হয়েছিল এবং বহির্বিশ্বে বুদ্ধিমান প্রাণীর অস্তিত্ব আছে কিনা, এই দুটি বিষয়েই সেগান একজন উৎসাহী গবেষক। প্রাণের সম্বন্ধে তাঁর এই আগ্রহ মোটেই আকস্মিক নয়। হার্ভার্ড, স্ট্যানফোর্ড এবং ক্যালিফর্নিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনলজি, এই তিনটি অগ্রগণ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা বিজ্ঞান বিভাগে তিনি কাজ করেছেন। গ্রহলোকবিষয়ক বিখ্যাত গবেষণা পত্রিকা 'ইকারুস'-এর তিনিই সম্পাদক। মেরিনার ৯ মহাকাশযানের সাহায্যে মঙ্গলগ্রহ সম্বন্ধে বিশিষ্ট গবেষণার জন্যে তিনি মার্কিন মহাকাশ সংস্থা NASA-র পদক পান। আবার ১৯৭৩ সালে প্রি গালাবের নামের আন্তর্জাতিক মহাকাশ গবেষণার পুরস্কারও তাঁকে দেওয়া হয়। তবে নিজের পড়াশোনার জগতে— বিশেষ করে জ্যোতির্বিজ্ঞানের জগতে— তাঁর নানা কৃতিত্বের কথা বললেও আসল কথাটা বলা হয় না। সেই আসল কথাটা হল, ইংরেজীতে যাকে polymath বলা হয়, কার্ল সেগান আমাদের কালের সেইরকম একজন মানুষ। বহু বিষয় যিনি শিক্ষা করেছেন, তাঁকেই বলব পলিম্যাথ। বাংলায় ঐ শিক্ষা করার খবরে কেমন যেন ঠিক জোর পাওয়া যায় না। সুতরাং 'বহুবেত্তা' কিংবা 'বহুবিদ' বলা যেতে পারে। সেগানের লেখা লোকবিজ্ঞানের বিখ্যাত বইগুলি হল : কসমস (Cosmos), দি কসমিক কনেকশন, দ্য ড্রাগনস অফ ইডেন এবং ব্রোকাজ ব্রেন (Broca's Brain)। এ ছাড়াও তাঁর অন্য বই আছে : মার্মার্স অব আর্থ, দি ভয়েজার ইন্টারস্টেলার রেকর্ড ; কম্যুনিকেশন উইথ এক্সট্রাটেরেস্ট্রিয়াল ইনটেলিজেন্স, ইত্যাদি। তবে তাঁর বহুবিদ এবং সর্বত্রগামী উৎসাহী মনের পরিচয় বিশেষ করে পাওয়া যায় লোকবিজ্ঞানের প্রথমোক্ত বইগুলিতেই। সাড়ে তিনশোর মতো বৈজ্ঞানিক এবং অন্যান্য প্রবন্ধ সেগান লিখেছেন। সেগুলির মান যে যথেষ্ট উঁচু, সে-কথা নিশ্চয়ই বলে দিতে হবে না। কিন্তু মানুষ সেগানের উজ্জ্বল পরিচয় আমরা পাই জনসাধারণের জন্যে লেখা বইগুলিতেই। সেই মানুষটি জ্ঞানবিজ্ঞানের কোনো এলাকাকেই দুর্গম অথবা অগম্য ভেবে পিছিয়ে আসতে জানেন না। সর্বত্রই তাঁর আগ্রহ। আর যেখানেই তিনি পদপাত করেন, সেখান থেকেই তিনি আহরণ করে আনতে পারেন কিছু-না-কিছু মূল্যবান অন্তর্দৃষ্টি। সেই অন্তর্দৃষ্টি অন্য অনেকের সঙ্গে ভাগ করে নিয়ে উপভোগ করাতেই তাঁর আনন্দ। অর্থাৎ তিনি শুধু বিজ্ঞানী নন, জ্ঞানের বিপুল আনন্দযজ্ঞের নিমন্ত্রণ তিনি নিয়ে আসেন সকলের জন্যে। তিনি যখন মানুষের মস্তিষ্কের বিকাশ আর গড়নের কথা বলেন 'দ্য ড্রাগনস অফ ইডেন' বইয়ে, তখন শারীরস্থান আর শারীরবৃত্ত ছাড়াও অনিবার্যভাবে এসে যায় ইতিহাস, দর্শন, নৃতত্ত্ব, সাহিত্য, চারু-কলা, মনস্তত্ত্ব আর প্রযুক্তির প্রসঙ্গ। খুব অনায়াসেই তিনি সঞ্চরণ করেন এই-সমস্ত বিষয়ে, দেখিয়ে দেন তাদের যোগসূত্রগুলো। সবসময় যে তিনি খুব নতুন কথা বলেন, তা নয়। কিন্তু তাঁর প্রাণবন্ত

আলোচনা আর সমন্বয়ধর্মী দৃষ্টিভঙ্গির গুণে অনেক জানা কথাও নতুন মাত্রা পায়। আর গবেষণালব্ধ নতুন তথ্য সম্বন্ধে নিজের প্রবল উৎসাহের ছোঁয়াচ তো তিনি দুর্নিবারভাবেই অন্যদের কাছে পৌঁছে দেন।

এই যে কার্ল সেগান, লোকবিজ্ঞানে তাঁর বৃহত্তম প্রচেষ্টা হল 'কসমস'। 'কসমস' শুধু একটি বই নয়। বরং, বলা যায়, অত্যন্ত সফল একটি রঙিন টেলিভিশন চিত্রমালার গ্রন্থরূপ। মার্কিন মহাকাশ সংস্থা যখন মঙ্গলগ্রহে ভাইকিং পর্যায়ের মহাকাশযান পাঠাবার জোগাড় করছিলেন, তখন সেগান সেই প্রয়াসের সঙ্গে গবেষক হিসেবে যুক্ত ছিলেন। পরপর দুটি যাত্রীবিহীন ভাইকিং যান মঙ্গলগ্রহে নামানো হল। ইতিহাসে এই প্রথম মানুষের তৈরি কোনো যন্ত্র সৌরলোকের অন্য একটি গ্রহের মাটিতে গিয়ে পৌঁছল। অথচ বড়ো বড়ো টেলিভিশন সংস্থাগুলি ঘটনাটাকে মোটেই গুরুত্ব দিল না। বিশেষ করে যখন জানা গেল যে মঙ্গলগ্রহের প্রাকৃতিক অবস্থা পৃথিবীর থেকে একেবারে অন্যরকমের, তখন সাংবাদিকরাও হাত গুটিয়ে নিলেন। আমাদের দেশে বাণিজ্যিক সিনেমার কর্তাব্যক্তিরা যেমন জনগণের রুচি এবং চাহিদা সম্বন্ধে নিজেদের ধ্যানধারণাকেই শেষ কথা বলে মনে করেন, ও-সব দেশের বেসরকারি সংবাদ মাধ্যমগুলি কর্তৃপক্ষের মনোভাবও অনেকটা সেইরকম। ব্যাপারটা সেগানকে বেশ নাড়া দিল। জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং সেই বিজ্ঞানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নানা প্রশ্ন সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের মনে যে যথেষ্ট কৌতূহল আছে, সে সম্বন্ধে তাঁর মনে কোনো সন্দেহ ছিল না। সুতরাং ভাইকিং প্রকল্পের নেতৃস্থানীয় সহকর্মী জেন্ট্রি লি'র সঙ্গে পরামর্শ করে সেগান এই বিষয়ে একটি চিত্রমালার ছক তৈরি করলেন। শেষ পর্যন্ত আমেরিকার শিক্ষামূলক টেলিভিশন সংস্থার লস অ্যাঞ্জেলিস শাখার সহযোগিতায় 'কসমস' পর্যায়ের তেরো কিস্তির ছবি তৈরি হল। বিষয় : গ্রহলোকের পরিক্রমা এবং তারই সঙ্গে যুক্ত নানা প্রসঙ্গ— প্রাণের উদ্‌ভব কী করে হল, এই পৃথিবী আর তার চার পাশের বিপুল বিশ্বের চালচলন, সেই বিশ্বের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ, এমন-কি অন্য কোনো জ্যোতিষ্কের আশেপাশে প্রাণ আছে কিনা, বুদ্ধিমান প্রাণীর অস্তিত্ব আছে কিনা, এই-সব। পুরো তিনবছর লেগেছিল এই চিত্রমালা তৈরি করতে। দৃশ্য এবং সংগীত, দুটো দিকেই 'কসমস' অনবদ্য হল। চিত্রনাট্য এবং শব্দগ্রহণ এমন হল যাতে মনে হয়, গোটা বিশ্বটাই দর্শকের বাড়ির বৈঠকখানায় চলে এসেছে। আর সেই বিশ্বের সঙ্গে দর্শকের আলাপ করিয়ে দিচ্ছেন স্বয়ং কার্ল সেগান— প্রাণবান, সদালাপী, বহুবিদ এবং চলিষ্ণু একজন আধুনিক মানুষ। ১৯৮০ খৃস্টাব্দে 'কসমস' মুক্তি পেল। আর ১৯৮৩ খৃস্টাব্দে গ্রন্থাকারে তার প্রকাশ হল। সেই বইয়ের ভূমিকায় সেগান জানালেন, আগের তিন বছরে মোট চোদ্দ কোটি মানুষ চিত্রমালাটি দেখেছেন। 'কসমস'-এর বিপুল জনপ্রিয়তার সম্ভাব্য কারণ সম্বন্ধে সেগান যা বলেছেন তার মূল কথা হল, সাধারণ মানুষের বুদ্ধিশুদ্ধি সম্বন্ধে সচরাচর যা ভাবা হয়ে থাকে তার অনেকটাই ভুল। সাধারণ মানুষের মনে এই বিশ্ব সম্বন্ধে যথেষ্ট কৌতূহল আছে, জানবার আগ্রহ আছে। আজকের পৃথিবীতে মানুষের ভবিষ্যৎ অনিবার্যভাবে জড়িয়ে গেছে বিজ্ঞানের গবেষণা আর ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে। সেই কারণে এবং নিছক জানবার আনন্দেও মানুষ বিজ্ঞান সম্বন্ধে জানতে চায়। তবে যেন তেন প্রকারেণ নয়, যথাসাধ্য চিত্তাকর্ষক করেই বিষয়বস্তুকে পৌঁছে দিতে হবে তার কাছে। অবহেলা করে নয়, যথেষ্ট শ্রদ্ধার সঙ্গেই চেষ্টা করতে হবে বিজ্ঞানীর সযত্নলব্ধ তথ্যগুলিকে সাধারণের বোধগম্য করে তুলতে। সেগানের 'কসমস' হচ্ছে সেইরকমই একটি সর্বাঙ্গীণ চেষ্টার ফসল।

প্রশ্ন উঠবে, এইরকম একজন বিজ্ঞান প্রচারকের সঙ্গে তাঁর কাজের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর 'বিশ্ব-পরিচয়'-এর তুলনা কিভাবে হতে পারে। কার্ল সেগান তো নিজে একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ বিজ্ঞানী, আর বিজ্ঞানকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্যে তিনি তো যোগাযোগের যাবতীয় আধুনিক প্রকরণকেই সুচারুভাবে ব্যবহার করেছেন। সারা পৃথিবীর শতকরা তিনভাগ মানুষ তাঁর বিখ্যাত ছবিটি টেলিভিশনে দেখেছেন। এঁর বিপুল কর্মকাণ্ডের সঙ্গে পঞ্চাশ বছর আগে প্রকাশিত ভারতবর্ষের একটি প্রাদেশিক ভাষার চটি বই 'বিশ্ব-পরিচয়'-এর কতটুকুই বা মিল হতে পারে?

দুঃখের বিষয়, এই প্রতিতুলনার সবটাই নিরর্থক নয়। শুধু 'বিশ্ব-পরিচয়' নয়, রবীন্দ্রনাথের জীবনব্যাপী সমস্ত কীর্তির রঙ্গমঞ্চ যে স্থাপিত হয়েছিল পৃথিবীর একটি দরিদ্রতম দেশে,এ কথা তো অস্বীকার করবার উপায় নেই। সেই দারিদ্র্য আর তার আনুষঙ্গিক সর্বাঙ্গীণ সামাজিক দৈন্য যে পদে পদে তাঁর কাজকে ব্যাহত করেছে, সে-বিষয়ে তো সন্দেহ নেই। তবু যে

সাহিত্য শিল্প সংগীত শিক্ষা সমাজচিন্তা দর্শন ইত্যাদি নানাক্ষেত্রে তাঁর সৃষ্টিশীলতা অক্ষয় গৌরব অর্জন করেছে, সে তাঁর বিপুল প্রতিভা প্রাণশক্তি আর কর্মক্ষমতার জোরেই। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কাজটা আরো অনেক শক্ত হয়ে যায়, কারণ গরিব দেশে বিজ্ঞানচর্চার পরিবেশ সহজে গড়ে ওঠে না। এমন-কি শুধু পুঁথিগতভাবে বিজ্ঞান নিয়ে নাড়াচাড়া করবার মতো মানসিক বাতাবরণও আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে তেমন একটা ছিল না এই দেশে। আর রবীন্দ্রনাথের নিজের শান্তিনিকেতন আশ্রম কিংবা বিশ্বভারতীর কথা যদি ভাবি, স্বীকার করতেই হবে, তাঁর মতো মানুষের বিজ্ঞান সম্বন্ধে কৌতূহলকে উসকে দেবার উপযুক্ত সঙ্গী বিশেষ কেউ ছিলেন না তখনকার দিনে। তিনি নিজে যে বিজ্ঞানের সাধক ছিলেন না, সে কথা তো তিনি পরিষ্কার কবুল করেছেন। সেই কারণেই যখন আমরা তাঁর এই একক চেষ্টার কথা ভাবি, অবাক না হয়ে পারি না। তাঁর সঙ্গে যখন গ্যামো কিংবা সেগানের মতো লেখক তথা প্রচারকের তুলনা করি, তখন সবটাই মনে রাখতে হয়। আর সেইভাবে দেখলেই বুঝতে পারি, অব্যবসায়ী হয়েও কতটা ক্ষমতা তিনি রাখতেন। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর লোকশিক্ষার প্রয়াসকে প্রস্তুতি কিংবা উপকরণ দিয়ে নয়, শুধু ক্ষমতা আর উৎসাহের সজীবতা দিয়েই বিচার করতে হবে। সেইখানে তাঁকে সেগানেরই পূর্বসূরী বলে ভাবতে পারি আমরা। বিজ্ঞানের জগতে অনেকটা অপরিচিত কিন্তু খুবই শক্তিধর একজন পূর্বসূরী। অপরিচিত যে, তার অনেকটা দায়ও তো তাঁর দেশবাসী এই আমাদেরই। বিজ্ঞানের যে সাংস্কৃতিক মূল্যের কথা আজ থেকে পঞ্চাশ পঞ্চান্ন বছর আগে তিনি হৃদয়ংগম করেছিলেন, জনশিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে তার যে গুরুত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়েছিলেন, দুঃখের বিষয়, আজও তা আমাদের মনকে নাড়া দেয় না। 'বিশ্ব-পরিচয়'-এর যথাযোগ্য মূল্যায়ন তাই আজও হয় নি। একদিকে বিজ্ঞান আর টেকনলজি, আর অন্য দিকে সাহিত্য শিল্প সংগীত ইতিহাস দর্শন ইত্যাদি, এই দুয়ের মধ্যে এক ধরনের বিচ্ছেদের কথা সি·পি· স্নো বলেছিলেন। তিনি এদের নাম দিয়েছিলেন 'দুই সংস্কৃতি'। ও দেশে এ বিষয়ে কিছু তর্ক আছে। কিন্তু আমাদের দেশে সম্পূর্ণ অন্যভাবে এই গোছের একটা বিচ্ছেদ তৈরি হয়েছে। তার একটা কারণ শিক্ষার বিষয়বস্তুতে বিজ্ঞানের অপ্রাচুর্য। শুধু অপ্রাচুর্য নয়, যেটুকু ব্যবস্থা আছে তার মধ্যেও আয়োজনের দীনতা। আর অন্য দিকে বিজ্ঞানের উচ্চশিক্ষায় বিদেশীভাষার প্রাধান্যের ফলে দেশের সাধারণ মানুষের থেকে বিজ্ঞানীদের বিচ্ছিন্নতা। জর্জ গ্যামো কিংবা কার্ল সেগানের প্রচেষ্টার ভিতরকার কথাটা হল বিজ্ঞানকে সাধারণ মানুষের কাছে নিয়ে যাওয়া। সঙ্গে সঙ্গে যদি দুই সংস্কৃতি বলে কিছু থাকে, তবে তাদের মাঝখানের বেড়াটুকু ভেঙে দেওয়া। 'কসমস'-এর ভূমিকায় সেগান সে কথা বলেছেন :

'The present epoch is a major crossroad for our civilization and perhaps for our species. Whatever road we take, our fate is indissolubly bound up with science. It is essential as a matter of simple survival for us to understand science. In addition, science is a delight; evolution has arranged that we take pleasure in understanding—those who understand are more likely to survive.'

স্পষ্টতই সেগান বিজ্ঞানের চিত্তগ্রাহিতার মূল খুঁজে পেয়েছেন প্রাণী হিসেবে মানুষের অস্তিত্বরক্ষার প্রয়োজনের মধ্যে। আজকের দিনে বিজ্ঞান না বুঝে আর মানুষের পক্ষে টিকে থাকাই সম্ভব নয়। আর সেই কারণেই বিজ্ঞান পড়ে এবং বুঝে আমরা আনন্দ পাই। ঐ আনন্দই পুরস্কার হয়ে আমাদের আত্মরক্ষার তাগিদ মেটায়। সেগান নিজে শুধু লোকবিজ্ঞানের লেখক নন, বিজ্ঞানীও। আর প্রাণতত্ত্বে তাঁর বিশেষ আগ্রহ। তাঁর এই বিশ্লেষণে সেই যুগ্ম পরিচয়ের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। অভিব্যক্তির তত্ত্বে যে প্রাকৃতিক নির্বাচনের কথা বলা হয়, সেগানের মতে বিজ্ঞানবোধ সেই ধরনের একটা ভূমিকা নেবে মানুষের এখনকার ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে।

রবীন্দ্রনাথ মূলত কবি। কিন্তু মানুষের সুদীর্ঘ অভিব্যক্তির ইতিহাসে বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্বন্ধে তাঁর অন্তর্দৃষ্টিও খুবই গভীর। বরং তাঁর চিন্তা আরো সুদূরপ্রসারী। কোনো বিশেষ সংকটমুহূর্তের তাগিদে নয়, সর্বকালের মানুষের এক মহৎ প্রচেষ্টা হিসেবেই তিনি বিজ্ঞানকে দেখেছেন। তাঁর কাছে বিজ্ঞান হল মানুষের সংস্কৃতির এমন একটি কর্মকাণ্ড যা

তাকে অন্য প্রাণীদের থেকে স্বতন্ত্র করেছে। 'বিশ্ব-পরিচয়'-এর ঐ উৎসর্গপত্রেই তিনি বলছেন,

'বিশ্বজগৎ আপন অতি-ছোটোকে ঢাকা দিয়ে রাখল, অতি-বড়োকে ছোটো করে দিল, কিংবা নেপথ্যে সরিয়ে ফেলল। মানুষের সহজ শক্তির কাঠামোর মধ্যে ধরতে পারে নিজের চেহারাটাকে এমনি করে সাজিয়ে আমাদের কাছে ধরল। কিন্তু মানুষ আর যাই হোক সহজ মানুষ নয়। মানুষ একমাত্র জীব যে আপনার সহজ বোধকেই সন্দেহ করেছে, প্রতিবাদ করেছে, হার মানাতে পারলেই খুশি হয়েছে। মানুষ সহজ শক্তির সীমানা ছাড়াবার সাধনায় দূরকে করেছে নিকট, অদৃশ্যকে করেছে প্রত্যক্ষ, দুর্বোধকে দিয়েছে ভাষা। প্রকাশলোকের অন্তরে আছে যে অপ্রকাশলোক, মানুষ সেই গহনে প্রবেশ করে বিশ্বব্যাপারের মূল রহস্য কেবলি অবারিত করেছে। যে সাধনায় এটা সম্ভব হয়েছে তার সুযোগ ও শক্তি পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষেরই নেই। অথচ যারা এই সাধনার শক্তি ও দান থেকে একেবারেই বঞ্চিত হল তারা আধুনিক যুগের প্রত্যন্ত দেশে একঘরে হয়ে রইল।'

এই অনুচ্ছেদের বেশিটা অংশ জুড়ে রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞানের বিষয়মুখিনতার (objectivity) আদর্শের কথা বলেছেন। সেই প্রসঙ্গে আমরা এখনই আসব। তার আগে এখানে শুধু বলে রাখি যে এত অল্প কথায় এমন সহজ করে এ বিষয়ে কোনো আলোচনা জর্জ গ্যামো করেছেন বলে আমরা জানি না। তাঁর রচনার পরিধির মধ্যে ঠিক এ জিনিস আসে না। কার্ল সেগানের কথা অবশ্য আলাদা। আজ যাকে আমরা বিজ্ঞান বলছি, নিজের পরিবেশকে বোঝা এবং নিয়ন্ত্রণ করার সেই চেষ্টাকে সেগান মানুষের অভিব্যক্তির খুব মূলগত ব্যাপার বলেই মনে করেন। মানুষকে তিনি বলেছেন সংক্রমণশীল প্রাণী (transitional animal)। ক্রমাগত সে নিজেকে বদলে নিচ্ছে পরিবেশকে বুঝে নিয়ে আয়ত্তে আনবার খাতিরে। তার এই বদলের মূলসূত্রই হচ্ছে বিজ্ঞান। অর্থাৎ ভাষাটা আলাদা হলেও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর বক্তব্যের একটা মিল আছে। দুজনের মধ্যে সময়ের ব্যবধান যদিও পঞ্চাশ বছর। এটা মনে রাখলে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাভাবনার ক্ষমতাটা বোঝা যায়।

উপরের অনুচ্ছেদের একেবারে শেষের দিকে রবীন্দ্রনাথ আধুনিক বিজ্ঞানের সংস্কৃতির সঙ্গে এদেশের মানুষের ব্যাপক অপরিচয়ের সম্বন্ধে দুঃখ করেছেন। ঘটনাটা দুঃখজনক তো বটেই। তার পশ্চাৎপট সম্বন্ধে আলোচনার জায়গা এটা নয়। তবে এটা তো স্বীকার করতে হবে যে রবীন্দ্রনাথের 'বিশ্ব-পরিচয়'ও লেখা হয়েছে সেই পশ্চাৎপটেই। সেই কারণেই ভালো লাগে যখন দেখি বিজ্ঞানকে তিনি নেহাত দারিদ্র্য মোচনের হাতিয়ার হিসেবে দেখছেন না। এটা তাঁর কাছে খুবই স্পষ্ট যে শুধু টেকনলজির খাতিরে নয়, নিছক বিজ্ঞানকে কাজে লাগাবার খাতিরে নয়, আধুনিক মানুষের শ্রেষ্ঠ অভীপ্সাকে বোঝবার জন্যেই বিজ্ঞানের শিক্ষা প্রয়োজন। 'বিশ্ব-পরিচয়' সেই উপলব্ধিরই পরিণাম। তাঁর ঐ বইয়ে যে তিনি গ্যামোর মতো জনপ্রিয় পদ্ধতি অবলম্বন করেন নি, সেটা বোধহয় একদিকে তাঁর নিজের ব্যক্তিত্ব আর অন্য দিকে পাঠকসমাজের প্রস্তুতি এবং সংস্কৃতির কথা ভেবেই। আবার সেগানের মতো অনেকগুলি বই লেখা কিংবা বই ছাড়াও অন্য মাধ্যমের ব্যবহারও তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। সে রকম সময় তাঁর হাতে ছিল না। বিজ্ঞানমনস্কতার পরিচয় তিনি দিয়েছেন অন্যভাবে, বিশেষ করে শেষ বয়সের গল্প আর কবিতায়। তবে আমাদের এই আলোচনার পক্ষে আসল কথা হল,এ দেশের যে মানুষটি এখনকার পৃথিবীতে বিজ্ঞানের ঐ সাংস্কৃতিক ভূমিকাটি সঠিকভাবে চিনেছিলেন, তিনি নিজে ছিলেন কবি। একটু তলিয়ে ভাবলে মনে হয়, ঘটনাটা খুব অপ্রত্যাশিত নয়। আকস্মিক তো নয়ই। দৃষ্টির যে সামগ্রিকতা থাকলে মানুষের সংস্কৃতির বহুমুখী প্রয়াসের অঙ্গ হিসেবে বিজ্ঞানের এই বিশিষ্ট তাৎপর্যটুকু বোঝা যায়, সেটা শুধু পেশাগত শিক্ষা থেকে আসে না। তার জন্যে সচেতন প্রয়াস চাই। সমস্ত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও উনিশশতকে আমাদের নবজাগরণের মধ্যে সে-রকম একটা প্রয়াস ছিল। সেই নবজাগরণের শ্রেষ্ঠ পুরুষ হিসেবে, সার্বভৌম বুদ্ধিজীবী হিসেবে, রবীন্দ্রনাথের পক্ষে ব্যাপারটা বোঝা অন্য অনেকের তুলনায় স্বাভাবিক ছিল। আমরা জানি, এর জন্যে যেটুকু প্রস্তুতি দরকার, সেটাও তাঁর ছিল। তা ছাড়া ইয়োরোপে বিজ্ঞানীদের মধ্যে সাহিত্য দর্শন এবং ইতিহাসচর্চার একটা ঐতিহ্য আছে, যার শিকড় রয়েছে তার রেনেসাঁসের মধ্যে। আমাদের দেশে ইদানীং বিজ্ঞানচর্চার প্রসার হয়েছে, কিন্তু তার মধ্যে সেই সাংস্কৃতিক ব্যাপ্তি এখনো আসে নি। বরং

উনিশশতকে আর এই শতকের গোড়ার দিকে কোনো কোনো চিন্তানায়ক এবং বিজ্ঞানীর মধ্যে বিজ্ঞানকে বৃহত্তর সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবনের অঙ্গ হিসেবে দেখার যেটুকু চেষ্টা ছিল, আজকের পেশাদার বিজ্ঞানীদের মধ্যে সেই দৃষ্টির সেই ব্যাপকতা যেন ততটা দেখি না। বিজ্ঞান সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মনোভাবের সেইখানেই বৈশিষ্ট্য।

এবারে আমরা বিজ্ঞানের দার্শনিক দিকটিতে চলে আসতে পারি। সতেরো শতকে ফ্রান্সিস বেকন, র‍্যনে দেকার্ত, গালিলেও গালিলেই এবং আইজ্যাক নিউটন প্রমুখ চিন্তানায়কেরা যে একদিকে যুক্তির পরম্পরা আর অন্য দিকে পরীক্ষামূলক পদ্ধতিকে অবলম্বন করে নতুন বিজ্ঞানের পত্তন করলেন, তাকেই আমরা বৈজ্ঞানিক বিপ্লব বলে থাকি। একদিক দিয়ে দেখলে সেই বিপ্লব ইয়োরোপে রেনেসাঁসেরই পরিণতি। মানুষের চিন্তাভাবনার ইতিহাসে বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের গুরুত্বের কথা সাম্প্রতিক কালে যাঁরা খুব গুছিয়ে সুন্দর করে বলেছেন, তাঁদের মধ্যে জেকব ব্রনায়োস্কির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একজায়গায় তিনি বলছেন,

'In the evolution of any animal there come moments when the species takes a radically new step, a mutation is built into the total genetic complex, and from that moment on the species is committed to some new way of life— like coming out of the water onto the land. Now I believe that the scientific revolution has done exactly that kind of thing to our cultural history and we must simply face this fact. It isn't just that science has happened, that if you don't look it might go away. There has been an irreversible step in the cultural evolution of man; it took place at the beginning of the scientific revolution from, say, 1500 to 1700, and it will never be undone.'

এই যে বৈজ্ঞানিক বিপ্লব, এর ফলে মানুষের মধ্যে ঠিক কী ধরনের বদল এল? এক কথায় বলতে হয়, তার চিন্তার ধরনটাই বদলে গেল। জগৎসংসারকে দেখবার ভঙ্গিটাই পালটে গেল। এখন থেকে তার চার পাশের জগৎটাকে সে উলটে পালটে নেড়ে চেড়ে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে খুঁটিয়ে দেখতে শুরু করল। শুধু বাইরে থেকে নয়, ভিতর থেকেও। ব্রনায়োস্কির ভাষায়:

'What is very special about human beings is that in making their plans they look into not only the outside world but also into themselves. The paradoxes of science and the paradoxes of literature both derive from this ability of the human mind and of all human language to frame self-referential questions.... knowing about the physical world is not simply a process of experimenting as if the world existed outside ourselves. There is no language which describes the outside world like that, although science, of course, tries to do it all the time. And it tries to do it in terms in which other people are also accessible to our kind of insight. We have the extraordinary and unique gift that we are able to see ourselves and to recognize ourselves in others and then to recognize the human condition in ourselves.'

শেষ পর্যন্ত প্রাণী হিসেবে মানুষের স্বাতন্ত্র্য এইখানে যে একমাত্র সে-ই জগৎটাকে ভিতর থেকে আর বাইরে থেকে এই দুভাবেই দেখে। মানুষই একমাত্র প্রাণী যে নিজের ভিতর দিকে তাকিয়ে নিজের প্রেরণাগুলোকে দেখতে পায়। আবার সেই মানুষই যখন অন্য মানুষের দিকে তাকায়, তখন তাদের সে নিজের অবিকল প্রতিচ্ছবি হিসেবে দেখে না, আলাদা সত্তা হিসেবেই দেখে। এই যে দুভাবে দেখা, মানুষের এই ক্ষমতা না থাকলে আজকাল যাকে সমাজবিজ্ঞান বলা হয় সে জিনিস অবশ্যই সম্ভবপর হত না। কিন্তু মজার কথা হচ্ছে, প্রকৃতিঘটিত বিজ্ঞানও ঐ একই ক্ষমতার উপরে নির্ভরশীল। কারণ, যাকে আমরা বিষয়মুখ (objective) দৃষ্টিভঙ্গি বলি, সেটা আসে ঐ দুরকম দেখার ফলাফলকে সচেতনভাবে তুলনা

করেই। প্রকৃতিঘটিত বিজ্ঞানে এই বিষয়মুখিনতা অপেক্ষাকৃত সহজে আসে, এটাই প্রচলিত ধারণা। হয়তো কথাটা তুলনামূলকভাবে সত্যিও। কিন্তু এমন-কি সেখানেও যে ব্যাপারটা খুব অনায়াস নয়, এটাই ব্রনায়োস্কির বক্তব্য। আমরা না থাকলেও জগৎসংসারটা থাকবে, এটা অবশ্যই সমস্ত পদার্থবিদ্যার গোড়াকার অনুমান। কিন্তু সেই অনুমান যে সহজে আসে নি, তার সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ পাই পদার্থবিদ্যার গণিতপ্রধান স্বতন্ত্র ভাষায়। অনেক কষ্ট করে এই ভাষা তৈরি করে নিতে হয়েছে, কারণ তা না হলে ঐ অনুমানকে ভিত্তি করে বেশিদূর অগ্রসর হওয়া যেত না। মানবসমাজের মুখের অন্য যে ভাষা, তার সর্বাঙ্গে মানুষের সংবেদন (sensation) আর আত্মচেতনার গন্ধ মাখানো আছে। বহির্জগতের পর্যবেক্ষণের ফলে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আমরা যে-সব সংবেদন পাই, ঐ জগৎসম্বন্ধে জ্ঞানসঞ্চয়ের ব্যাপারে সেগুলোই আমাদের অপরিহার্য প্রাথমিক উপকরণ। কিন্তু, হায়, শুধু তাই দিয়ে বিজ্ঞান হয় না। চিন্তাভাবনার সাহায্যে অনেক ঝাড়াই বাছাই এবং প্রসাধন করে নিয়ে সেগুলো থেকে আমরা ধাপে ধাপে বস্তুজগৎ সম্বন্ধে একটা ধারণা খাড়া করি। সেই ধারণাকেও আবার পদে পদে পরখ করে নিতে হয়। কিভাবে এটা হয়, বিজ্ঞানের বাস্তবতার কথা বলতে গিয়ে অ্যালবার্ট আইনস্টাইন সে কথা খুব সুন্দর করে বলেছেন। শুধু ইন্দ্রিয়লব্ধ সহজ বোধ থেকে যে বিজ্ঞান হয় না, মানুষের মনের যুক্তি এবং কল্পনার সেখানে যে একটা বড়ো ভূমিকা থাকে, এটাই তাঁর বক্তব্য। ঐ যুক্তি আর কল্পনার কাজই হল ভিতর থেকে আর বাইরে থেকে দেখাকে মেলানো।

এবারে 'বিশ্ব-পরিচয়'-এর উৎসর্গপত্রের ঐ শেষ উদ্‌ধৃতিটির দিকে আর একবার তাকানো যাক।

'বিশ্বজগৎ আপন অতি-ছোটোকে ঢাকা দিয়ে রাখল, অতি-বড়োকে ছোটো করে দিল, কিংবা নেপথ্যে সরিয়ে ফেলল। মানুষের সহজ শক্তির কাঠামোর মধ্যে ধরতে পারে নিজের চেহারাটাকে এমনি করে সাজিয়ে আমাদের কাছে ধরল। কিন্তু মানুষ আর যাই হোক সহজ মানুষ নয়। মানুষ একমাত্র জীব যে আপনার সহজ বোধকেই সন্দেহ করেছে, প্রতিবাদ করেছে, হার মানাতে পারলেই খুশি হয়েছে। মানুষ সহজ শক্তির সীমানা ছাড়াবার সাধনায় দূরকে করেছে নিকট, অদৃশ্যকে করেছে প্রত্যক্ষ, দুর্বোধকে দিয়েছে ভাষা।'

এই অংশটিতে তো দেখছি বিজ্ঞানের জ্ঞানতত্ত্বের (epistemology) সেই গোড়াকার কথাই তিনি বলেছেন, তাঁর নিজস্ব অনবদ্য ভাষায়। প্রকাশভঙ্গির দিক দিয়ে তো তাঁর এই ঘনসংবদ্ধ উক্তির কোনো তুলনাই হয় না। এত কম কথায় তিনি আসল কথাটি বলেছেন যে বার বার পড়ে দেখলে তবেই পুরো তাৎপর্যটুকু ধরা যায়। বুঝতে অসুবিধা হয় না, বিজ্ঞানের বিষয়মুখিনতার ব্যাপারটা নিয়ে তিনি বেশ ভালো করেই ভেবেছেন। আইনস্টাইন যখন বলেন, শুধু ইন্দ্রিয়লব্ধ সংবেদন দিয়ে বিজ্ঞান হয় না, তখন তিনিও তো এই 'সহজবোধকে সন্দেহ করার' কথাই বলেন। তাঁর 'ফিজিক্স অ্যান্ড রিয়্যালিটি' প্রবন্ধটি প্রথম প্রকাশিত হয় ফ্র্যাঙ্কলিন ইনস্টিট্যুটের গবেষণা পত্রিকায়, ১৯৩৬ খৃস্টাব্দের মার্চ মাসে। বইয়ের মধ্যে তা সংকলিত হয় দীর্ঘকাল পরে। এই প্রবন্ধ দেখবার সুযোগ রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই পান নি। ১৯৩৭ খৃস্টাব্দে 'বিশ্ব-পরিচয়' প্রকাশের আগে তো সে প্রশ্নই ওঠে না। আর ব্রনায়োস্কির লেখা ? তাঁর আলোচ্য বই 'ম্যাজিক, সায়েন্স অ্যান্ড সিভিলাইজেশন' বেরোয় ১৯৭৮ খৃস্টাব্দে। এঁদের দুজনের লেখাই অবশ্য অনেকটা সুবিস্তৃত— জ্ঞান আহরণের ব্যাপারে বিজ্ঞানের নিজস্ব পন্থাটি তাঁরা অনেকটা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। কিন্তু 'বিশ্ব-পরিচয়'-এর উৎসর্গপত্রের তো সেটা প্রধান উদ্দেশ্য ছিল না। রবীন্দ্রনাথের কাছে যদি আমাদের কোনো অনুযোগ থাকে তো সে এইখানেই। নিজের যোগ্যতা সম্বন্ধে অত কুণ্ঠা না করে তিনি যদি নিজের চিন্তাভাবনার কথা আরো একটু হাত খুলে লিখতেন, মনে হয় আমরা লাভবান হতাম।

আমাদের দেশের ঐতিহ্যে কবিকে শুধু কাব্যরচয়িতা বলে ভাবা হয় নি, দ্রষ্টা হিসেবেও কল্পনা করা হয়েছে। সেই ব্যাপকতর অর্থেই রবীন্দ্রনাথের কবিধর্ম 'বিশ্ব-পরিচয়'কে সমৃদ্ধ করেছে। রবীন্দ্রনাথের পরিণত বয়সের কাব্যে যে বিশ্বদৃষ্টির পরিচয় পাই, তাতে মানুষকে এক বৃহৎ বিশ্বের পটভূমিকায় স্থাপন করা হয়েছে। একদিকে মানুষ প্রমুখ প্রাণী, আর অন্য দিকে বিপুল জড়জগৎ,এই দুটোকে তিনি বিচ্ছিন্ন করে দেখেন নি। অবশ্য আমাদের দেশের ধর্মে এবং সাহিত্যে প্রকৃতির

সঙ্গে মানুষের যে ঐক্যের বোধ প্রকাশ পেয়েছে, রবীন্দ্রনাথের এই পরিণত বয়সের সংশ্লেষণ ঠিক তার সঙ্গে তুলনীয় নয়। উপনিষদে কিংবা জাতকে গাছপালা কিংবা ইতরপ্রাণীর সঙ্গে মানুষের যে সহজ আত্মীয়তার ভাব দেখতে পাই, তার মধ্যে এক ধরনের আদিম সারল্য আছে। এক কথায় তাকে সর্বপ্রাণবাদ বললে বোধহয় অন্যায় হবে না। রবীন্দ্রনাথের এই শেষের দিকের বিশ্বদৃষ্টির মধ্যে কিন্তু অনেক বেশি সচেতন চিন্তা আছে, পড়াশোনা তো আছেই। কবিতার মধ্যে সেই চিন্তা এবং পড়াশোনা অবশ্যই উদ্‌গতি লাভ করেছে। তবু তাঁর এই যুগের কাব্যের রস পেতে সুবিধাই হয়, যদি তার পিছনের সচেতন চর্চার ইতিহাসটা জানা থাকে। সেইখানেও 'বিশ্ব-পরিচয়' আমাদের সাহায্য করতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের যে বিশ্বদৃষ্টির কথা আমরা বলছি, তার প্রথম কথা হল কল্পনার ব্যাপ্তি (scale)। সচরাচর আমরা সেই সাহিত্যিককেই বিশ্বজনীন বলি, সমস্ত মানুষই যাঁর চিন্তাভাবনার অন্তর্গত। সেই লক্ষণ তো রবীন্দ্রনাথের কাব্যে নানাভাবে আগেই দেখা গেছে। কেউ কেউ বলবেন, একেবারে প্রথম জীবনেই তো তিনি আমাদের শুনিয়েছেন, 'হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি, জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি।' কিন্তু আমরা যে মানসিক অবস্থার কথা বলছি, তা এই ধরনের কোনো আকস্মিক খুলে যাওয়ার ব্যাপার নয়, বিশেষ করে হৃদয়ের তো নয়ই। তার পিছনে দীর্ঘ প্রস্তুতি আছে, মনন আছে। সমস্ত মনুষ্যসমাজ অবশ্যই তার বিষয়বস্তুর অন্তর্গত। কিন্তু সেই সমাজকেও তিনি দেখছেন দেশ (space) এবং কালের (time) সুবৃহৎ পটভূমিতে। এই দৃষ্টিতে স্পষ্টতই বিজ্ঞানের দান আছে। এইভাবে দেখলে বুদ্ধিমান প্রাণীহিসেবে মানুষের অস্তিত্বের ট্র্যাজিক সৌন্দর্যই বিশেষ করে চোখে পড়ে। এ জিনিস রবীন্দ্রনাথ কিভাবে পেয়েছেন, তা 'বিশ্ব-পরিচয়' একটু যত্ন করে পড়লেই বোঝা যাবে। সেই বইয়ের 'নক্ষত্রলোক' অধ্যায়ের একেবারে শেষ অনুচ্ছেদে তিনি বলছেন :

'নাক্ষত্রজগতের দেশকালের পরিমাপ পরিমাণ গতিবেগ দূরত্ব ও তার অগ্নি-আবর্তের চিন্তনাতীত প্রচণ্ডতা দেখে যতই বিস্ময় বোধ করি, এ কথা মানতে হবে বিশ্বে সকলের চেয়ে বড়ো আশ্চর্যের বিষয় এই যে, মানুষ তাদের জানছে, এবং নিজের আশু জীবিকার প্রয়োজন অতিক্রম করে তাদের জানতে চাচ্ছে। ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ক্ষণভঙ্গুর তার দেহ, বিশ্বইতিহাসের কণামাত্র সময়টুকুতে সে বর্তমান, বিরাট বিশ্বসংস্থিতির অণুমাত্র স্থানে তার অবস্থান, অথচ অসীমের কাছ ঘেঁষা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের দুষ্পরিমেয় বৃহৎ ও দুরধিগম্য সূক্ষ্মের হিসাব সে রাখছে— এর চেয়ে আশ্চর্য মহিমা বিশ্বে আর কিছুই নেই, কিংবা বিপুল সৃষ্টিতে নিরবধি কালে কী জানি আর কোনো লোকে আর কোনো চিত্তকে অধিকার করে আর কোনো ভাবে প্রকাশ পাচ্ছে কি না।'

শেষ পর্যন্ত মানুষ যে তার সমস্ত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এই বিশ্বকে জানছে, এটাই তাঁর কাছে সবচেয়ে বড়ো বিস্ময়। অনেকটা এই কথাই মনে রেখে অ্যালবার্ট আইনস্টাইন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ বিষয়মুখ ভাষায় বলেছিলেন, 'এই বিশ্বটা যে বোধগম্য, সেটাই তার চিরন্তন রহস্য।' রবীন্দ্রনাথ নিজে কবি বলেই বোধ হয় অতটা নৈর্ব্যক্তিক হতে পারেন নি। শুধু জ্ঞাতব্য এই বিশ্ব নয়, জ্ঞাতা হয়ে বিশ্বকে যে দেখছে সেই মানুষের ক্ষণভঙ্গুর অবস্থাকেও তিনি ভুলতে পারেন নি। পারেন নি বলেই তর সেই চেষ্টার মহত্ত্ব তাঁকে মুগ্ধ করেছে।

রবীন্দ্রনাথের ঐ অনুচ্ছেদটি পড়ে কার্ল সেগানের 'কসমস'-এরই কয়েকটি ছত্র আমাদের মনে পড়ে যায় :

'We have examined the universe in space, and seen that we live on a mote of dust circling a humdrum star in the remotest corner of an obscure galaxy. And if we are a speck in the immensity of space, we also occupy an instant in the expanse of ages. We now know that our universe— or at least its most recent incarnation— is some fifteen or twenty billion years old. This is the time since a remarkable explosive event called the Big Bang. At the beginning of this universe, there were no galaxies, stars or planets, no life or civilisations, merely a uniform radiant fireball filling all of space. The passage from the Chaos of the Big Bang to the Cosmos that we are beginning to know is the most awesome transformation of matter and energy that

we have been privileged to glimpse. And until we find more intelligent beings elsewhere, we are ourselves the most spectacular of all the transformations— the remote descendants of the Big Bang, dedicated to understanding and further transforming the Cosmos from which we spring.'

রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের সঙ্গে কী আশ্চর্যভাবে সমান্তরাল সেগানের এই উক্তির অনেকটাই। শুধু মনে রাখতে হবে, 'বিশ্ব-পরিচয়' প্রকাশিত হয়েছিল 'কসমস'-এর ঠিক চুয়াল্লিশ বছর আগে। মাঝখানে জ্যোতির্বিজ্ঞান আর প্রাণতত্ত্বের অনেক যুগান্তকারী আবিষ্কার ঘটে গেছে।

সেগানের উক্তির বাকি অংশের পূর্বাভাসও আমরা 'বিশ্ব-পরিচয়ে'ই পাই। খুব সুস্পষ্টভাবে। এই প্রসঙ্গে এসেই রবীন্দ্রনাথ আরো গভীর একটি দার্শনিক স্তরে বিজ্ঞানকে গ্রহণ করেছেন।

বিজ্ঞানের যে-সব মূলগত প্রশ্ন নিয়ে মানুষের মন অনেককাল ধরে নাড়াচাড়া করে এসেছে, তার মধ্যে একটি হল প্রাণের উদ্ভব। অপ্রাণ জড় জগতের উপাদানসমূহ থেকেই যে প্রাণের জন্ম হতে পারে, এই সম্ভাবনা মেনে নেওয়া এখনো অনেক বুদ্ধিমান মানুষের পক্ষেই কষ্টকর। উপরন্তু সেই প্রাণের মধ্যে যেখানে মনের প্রকাশ দেখা যায়, সেখানে জড়ের সঙ্গে তার আত্মীয়তা কল্পনা করা যেন আরো দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। জড় আর মন, এই দুটি প্রাথমিক ধারণার দ্বন্দ্ব দর্শনের ইতিহাসে বহুকাল ধরে প্রতিষ্ঠিত। পাশ্চাত্য দর্শনে তার শিকড় পাওয়া যাবে প্লেটোর চিন্তার মধ্যে। ধর্মের প্রভাব আবার সেই দ্বন্দ্বকে জিইয়ে রাখতে সাহায্য করেছে। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু দৃশ্যতই তাকে অতিক্রম করেছেন। 'বিশ্ব-পরিচয়'-এর ভূলোক অধ্যায়ে তিনি বলছেন :

'বিশ্বরচনার মূলতম উপকরণ পরমাণু ; সেই পরমাণুগুলি অচিন্তনীয় বিশেষ নিয়মে অতি ক্ষুদ্র জীবকোষরূপে সংহত হল। প্রত্যেক কোষটি সম্পূর্ণ এবং স্বতন্ত্র, তাদের প্রত্যেকের নিজের ভিতরেই একটা আশ্চর্য শক্তি আছে যাতে করে বাইরে থেকে খাদ্য নিয়ে নিজেকে পুষ্ট, অনাবশ্যককে ত্যাগ ও নিজেকে বহুগুণিত করতে পারে।... এই জীবাণুকোষ প্রাণলোকে প্রথমে একলা হয়ে দেখা দিয়েছে। তার পরে এরা যত সংঘবদ্ধ হতে লাগল ততই জীবজগতে উৎকর্ষ ও বৈচিত্র্য ঘটতে লাগল। যেমন বহুকোটি তারার সমবায়ে একটি নীহারিকা তেমনি বহুকোটি জীবকোষের সমাবেশে এক-একটি দেহ। বংশাবলীর ভিতর দিয়ে এই দেহজগৎ একটি প্রবাহ সৃষ্টি করে নূতন নূতন রূপের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হয়ে চলেছে।... উদ্দাম তেজকে শান্ত করে দিয়ে ক্ষুদ্রায়তন গ্রহরূপে পৃথিবী যে অনতিক্ষুব্ধ পরিণতি লাভ করেছে সেই অবস্থাতেই প্রাণ এবং তার সহচর মনের আবির্ভাব সম্ভবপর হয়েছে, এ কথা যখন চিন্তা করি তখন স্বীকার করতেই হবে জগতে এই পরিণতিই শ্রেষ্ঠ পরিণতি।'

এর মধ্যে কোথাও কোনো সংশয় নেই, অস্পষ্টতাও নেই। যে 'অচিন্তনীয় বিশেষ নিয়মে' পরমাণুগুলির জীবকোষরূপে সংহত হওয়ার কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, আজ আর তারা আমাদের কাছে অচিন্তনীয় নয়। কারণ আমরা জানি যে তাদের ভিত্তি আছে রসায়ন এবং পদার্থবিদ্যার মধ্যেই। উনিশ শো পঞ্চাশের দশকে সেই-সব নিয়মের আশ্চর্য উদ্‌ঘাটন শুরু হয়। সঙ্গে সঙ্গে পর্যবেক্ষণ এবং বিশ্লেষণের নতুন নতুন পদ্ধতির বিকাশ হয়, যার সাহায্যে প্রাণপদার্থের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম গড়ন এবং আচরণ মানুষের অধিগম্য হয়ে ওঠে। এরই ফলে আণবিক প্রাণতত্ত্ব নামে নতুন এক বিদ্যা গড়ে ওঠে, রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় যার অস্তিত্ব ছিল না। সুতরাং ঐটুকু বাদ দিলে এই ছত্রগুলিতে তিনি যা বলেছেন, তার সঙ্গে আধুনিক প্রাণতত্ত্বের কোনো মতদ্বৈধ হবে না। এমন-কি জীবকোষের সমবায় সম্বন্ধে তিনি যা বলেছেন, আজকের প্রাণীবিদ্যায় তারও সুস্পষ্ট সমর্থন পাওয়া যায়। বরং তাঁর বলার ভঙ্গিতে কথাগুলো স্মরণীয় হয়ে উঠেছে।

'বিশ্ব-পরিচয়'-এর উপসংহারে এসে রবীন্দ্রনাথ জড়ের সঙ্গে চৈতন্যের সম্ভাব্য যোগসূত্র হিসেবে তেজ বা জ্যোতিঃপদার্থের কথা ভেবেছেন।

'আমরা জড়বিশ্বের সঙ্গে মনোবিশ্বের মূলগত ঐক্য কল্পনা করতে পারি সর্বব্যাপী তেজ বা জ্যোতিঃপদার্থের মধ্যে।

অনেককাল পরে বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে যে আপাতদৃষ্টিতে যে-সকল স্থূল পদার্থ জ্যোতির্হীন, তাদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন আকারে নিত্যই জ্যোতির ক্রিয়া চলছে। এই মহাজ্যোতিরই সূক্ষ্ম বিকাশ প্রাণে এবং আরো সূক্ষ্মতর বিকাশ চৈতন্যে এবং মনে। বিশ্বসৃষ্টির আদিতে মহাজ্যোতি ছাড়া আর কিছুই যখন পাওয়া যায় না, তখন বলা যেতে পারে চৈতন্যে তারই প্রকাশ। জড় থেকে জীবে একে একে পর্দা উঠে মানুষের মধ্যে এই মহাচৈতন্যের আবরণ ঘোচাবার সাধনা চলেছে। চৈতন্যের এই মুক্তির অভিব্যক্তিই বোধ করি সৃষ্টির শেষ পরিণাম।

কার্ল সেগান যাকে বলছেন, 'a uniform, radiant fireball filling all of space', রবীন্দ্রনাথ তাকেই বলেছেন 'সর্বব্যাপী তেজ বা জ্যোতিঃপদার্থ'। সেই জ্যোতিঃপদার্থ থেকে কালক্রমে চৈতন্যস্বরূপ মানুষের উদ্ভব সম্বন্ধেই তো সেগান বলছেন, 'We are ourselves the most spectacular of all the transformations— the remote descendants of the Big Bang, dedicated to understanding and transforming the Cosmos from which we spring.' কবির উক্তিতে সেই উপলব্ধিই মন্ত্রোচ্চারণের মাত্রা পেয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের গানে সাংগীতিকতা

রাজ্যেশ্বর মিত্র

সাংগীতিকতা বলতে কী বোঝাতে চাইছি সেটা পরিস্ফুট করা দরকার। গানকেই আমরা সংগীত বলি অর্থাৎ ইংরিজিতে যাকে বলে মেলডি। কিন্তু, শুধু ঠিক সুরে গেয়ে গেলেই যে সেটা সংগীতে উত্তীর্ণ হল, এমন কথা বললে, সত্যভাষণ হয় না ; সংগীত আরো অনেক কিছু চায়, বিশেষ করে কাব্যসংগীত, যা রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টি করে গেছেন। প্রথম কথা হচ্ছে কাব্য একটা বিষয়কে নানাভাবে বিকশিত করে ; এই যে বিকাশ একে রসে, রঙে, আভাসে, আবেগে ফুটিয়ে তুলতে পারলে তবেই সেটা হবে উৎকৃষ্ট সংগীত ; নইলে যেটা দাঁড়াবে সেটা সুর করে কাব্যকে পড়ে যাওয়া মাত্র তার বেশি কিছু নয়। এই যে গানের কাব্যগত রূপকে উজ্জ্বলভাবে প্রতিভাত করা এই প্রক্রিয়াটাকেই বলা যায় সাংগীতিকতা। এর সঙ্গে বেশ-কিছুটা নাট্যের-আঙ্গিকও স্বাভাবিকভাবে জড়িত। রবীন্দ্রনাথ যখনই শান্তিনিকেতনের আশ্রমবাসীদের নিয়ে সংগীতানুষ্ঠান করতেন তখনই এই নাট্যভঙ্গির সৌন্দর্য উপলব্ধি করা যেত। বর্তমানে শান্তিদেব ঘোষ মহাশয়ের গানে ঠিক এই বস্তুটিই প্রত্যক্ষ করতে পারা যায়। এই ক্রিয়াঙ্গকে বাদ দিয়ে যে রবীন্দ্রসংগীত তার মধ্যে রবীন্দ্রবৈশিষ্ট্য অনেকখানিই ধরা পড়ে না।

এই যে গানের ভিতর দিয়ে ভাববিন্যাসের একটা বিশিষ্ট ক্রিয়া পদ্ধতি, এ কিন্তু বহুযুগ আগেকার প্রথা। কিছুটা প্রসঙ্গান্তর হলেও এই রীতিপদ্ধতির কথাটা বলবার প্রয়োজনীয়তা আছে, কেননা এটা আমাদের প্রযুক্ত সংগীতের একটা বিশেষ চিন্তার ফল। একেবারে আদিযুগের কথাই বলি। সংগীতশাস্ত্রীরা বলেন বৈদিক সাম থেকেই আমাদের সংগীতের উদ্ভব। এই যে সাম, এর ভাষা কিন্তু ঠিক সংস্কৃত ছিল না, একে একধরনের প্রাকৃতই বলা যায়। এ গানে ছন্দকে রাখা হত না, অথচ ছটা স্বরে এক-একটা পর্যায়ভাগ করে উদ্গাতারা এই গান গাইতেন। প্রথমদিকে গানটা হত নিষ্প্রাণ এক ধরনের সুরের প্রকাশ মাত্র। তাই, ক্রমে একটা ওজঃশক্তি এবং বৈচিত্র্য আনবার জন্যে এই-সব গানের মাঝে মাঝে নানারকম অক্ষর যোজনা করা হতে লাগল, যাকে বলে "স্তোভ"। এর ফলে গানে বহুল পরিমাণে বৈচিত্র্য এল এবং এই প্রথা স্বীকৃত হল। এ ছাড়া অনেকে লৌকিক নিয়মেও এই-সব গান গাইতেন, যাতে দেশের লোকেরা একটা উপভোগ্য সংগীতের নিদর্শন পেতেন। রবীন্দ্রনাথ নিজেও তো বেশ-কিছু বৈদিক কাব্যে স্বাধীনভাবে সুরসংযোগ করেছেন, যাকে বলতে পারি "রবীন্দ্রসাম"। এর বেশ কয়েক শতাব্দী পরে গোটা বৈদিক সাহিত্যসৃষ্টিকেই পুরোপুরি সংস্কৃতভাষায় রূপান্তরিত করা হল। এই রূপায়ণের সময় স্রষ্টারা বিবিধ ছন্দে এই-সব কাব্যবন্ধকে পুনর্গঠিত করলেন। এই ছন্দের উপলব্ধি থেকে প্রচণ্ড একটা আন্দোলন এবং উন্মাদনার সৃষ্টি হয়েছিল। ছন্দের মধ্যে তাঁরা প্রকাশের এক-একটা বিচিত্র মাধ্যম খুঁজে পেলেন, যা পঠনপাঠনের মধ্যে ফুটে উঠতে লাগল। একে আরো "সাজেস্টিভ" করবার জন্যে তাঁরা প্রয়োগ করলেন উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত প্রভৃতি স্বর যা নদীর তরঙ্গের মতন ওঠাপড়ার ভঙ্গিতে তাঁদের আবৃত্তিতে নতুন প্রেরণার সৃষ্টি করল। যাঁরা অভিনিবেশ সহকারে সামবেদীয় "পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ" অনুশীলন করেছেন, তাঁরা উপলব্ধি করেছেন একযোগে সেই সুপ্রাচীন প্রাকৃত গানের ধারা এবং আধুনিকতর সংস্কৃত ছন্দ কী বিরাটভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল তৎকালীন ক্রিয়াকর্মের অনুষ্ঠাতাদের। কত ছন্দ বার বার কতরকমভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আবৃত্তি করা হয়েছে শুধু প্রকাশের বৈচিত্র্যসৃষ্টির উদ্দেশ্যে। সমস্ত চলমান স্পন্দমান জগৎসংসারের আকৃতি-প্রকৃতির সঙ্গে এক করে নেওয়া হয়েছে এই-সব ছন্দকে। ছন্দের এই দার্শনিক তত্ত্বের কথা আজও আমাদের অধিকাংশেরই অজানা, কেননা এই দৃষ্টিকোণ থেকে ছন্দের তাৎপর্যকে

উপলব্ধি করবার সুযোগ আমাদের অনেকেরই হয় নি। এইখানেও আসছে বেদপাঠে সেই নাট্যভঙ্গির প্রয়োগ।

আমাদের বর্তমান লৌকিক সংগীত এসেছে প্রাচীন নাটকের গান থেকে। প্রথমদিকে নাটকে সংগীতাংশ ছিল দুর্বল। ক্রমে তাকে নানান রসের প্রস্ফুটনের কাজে নিয়োগ করা হতে লাগল। এই প্রচেষ্টায় নাট্যসংগীতে অভূতপূর্ব বৈশিষ্ট্য দেখা দিল। নাটক সংগীতের মাধ্যমে বহুলভাবে লোকের মনোরঞ্জন করতে সমর্থ হল। আর এই যে একটা রসের প্রতি আসক্তি-সঞ্চারের প্রবণতা একেই "রাগ" আখ্যায় প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে, যা আজও অপ্রতিহতভাবে প্রচলিত রয়েছে। এই-সব গানও নানা বিচিত্র ছন্দে সংস্কৃত এবং প্রাকৃতভাষায় নিবদ্ধ হয়েছে। এক নাট্যশাস্ত্রেই বহু প্রাকৃতভাষায় রচিত গানের ছন্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। এর মধ্যেও নিহিত রয়েছে প্রকাশের একটা নাট্যপ্রয়াস।

এইবারে গানের যুগটা যখন বিগত কয়েক শতাব্দীর মধ্যে এল তখন অবস্থাটা কী দাঁড়াল সেটা দেখা যাক। এটা কিন্তু সম্পূর্ণ দরবারি সংগীতের যুগ ; অর্থাৎ সংগীতের পরিধি যার যাগ, যজ্ঞ, ক্রিয়া কলাপ বা নাটকের ভেতরে নিবদ্ধ রইল না সেটা এসে গেল সংকীর্ণ সমাজে কয়েকজন তথাকথিত বোদ্ধাদের কাছে। এঁদের মধ্যে কেউ চাইলেন মেলডি বা সুর, কেউ চাইলেন সংগীতে তালের বিবিধ প্রয়োগ। এই সূত্রেই আমাদের সংগীতে প্রবেশ করল ওস্তাদী রীতিনীতি।

ওস্তাদেরা রাগসংগীতকে সমৃদ্ধ করলেন ঠিকই, কিন্তু বেছে নিলেন কেবলমাত্র রাগের বিস্তারকে ; অর্থাৎ তাঁদের কণ্ঠে মেলডিটুকু নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করতে লাগল, কিন্তু তাঁরা যে পরিমাণে সুরের জাল বুনে চললেন সে পরিমাণে কাব্যকে প্রকাশ করলেন না। প্রথম দিকে তাঁরা ধ্রুপদ গাইতেন, ধ্রুপদের কাব্যাংশ দুর্বল ; প্রধানত রাজারাজড়ার স্তুতি অথবা ঠাকুর-দেবতার নামমাহাত্ম্য নিয়ে এগুলি রচিত হত, ধামারও একই পর্যায়ে পড়ে, তবে এটিতে প্রধানত কৃষ্ণলীলাই স্থান পায়। ধ্রুপদের যদিও চারটি কলি আছে, তথাপি ওস্তাদ গায়কবর্গ সেগুলিকে একটা আর্টের রূপ দিতে চাইলেন না, কোনোক্রমে গানের কাজটা সেরেই তাঁরা একঘেয়ে তালের সংঘাতে মেতে উঠলেন, ধামারের ক্ষেত্রে তার মাত্রা ছিল আরো অনেক পরিমাণে বেশি। এতে ওস্তাদী বরমাল্য লাভ করলেও মার খেল সংগীত এবং তার কাব্যাংশ। তাল আমাদের সংগীতের যেমন উপকার করেছে, ক্ষতিও বড়ো কম করে নি। আসলে আমাদের তালপদ্ধতি যে খুব দুরূহ এমন নয়, কিছুটা অভ্যাসসাপেক্ষ। ধ্রুপদ, খেয়াল গাইবার মতন তালকে শাসনে বা আয়ত্তে রাখবার জন্যে কিছুকাল তালযন্ত্রের সঙ্গে সাধনা করলেই এটি অভ্যাসে পরিণত হয় এবং তার পরে গায়ক বা বাদকের কাছে সেটা কোনো সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় না। কিন্তু, ব্যাপারটা হল এই যে ওস্তাদেরা তালকে নিয়ে এমন একটা বৃত্ত রচনা করেন, যেখানে সংগীতের কোনো সৌন্দর্য আত্মপ্রকাশ করবার সুযোগ পায় না এবং গানের পূর্বাংশে আলাপ নামক যে বস্তুটি তাঁরা মেলডি দিয়ে গড়ে তোলেন সেটা তাঁদের গানের ভিতর দিয়ে তালের মাধ্যমে লীলায়িত না হয়ে নিছক ওস্তাদীতে পর্যবসিত হয়। অর্থাৎ এতে না থাকে রাগের কোনো মাহাত্ম্য, না থাকে গানের কোনো সৌন্দর্য। ফলে রস নামক বস্তুটি লোপ পায়, থাকে মাত্র কতকগুলি একঘেয়ে টেকনিক বা প্রক্রিয়া। অথচ, ধ্রুপদ, খেয়ালও চমৎকারভাবে রূপায়িত হতে পারে যদি তাদের বাগাংশ এবং কাব্যাংশের অন্তর্নিহিত আবেগ বা আবেদনকে যথাযথভাবে ফুটিয়ে তোলা যায়। এইখানেও আসছে সেই নাট্যপ্রয়াস বা একটা প্রতিকৃতিকে রূপ দেবার মতন উপলব্ধি।

রাগসংগীতের এই অপারগতার ফলেই গড়ে উঠল গানের আর একটা রীতি, যাকে আমরা বলি কাব্যসংগীত। বাংলায় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে যে-সব লিরিক দেখা যায় সেগুলি মুখ্যত রাগকে অবলম্বন করেই আত্মপ্রকাশে ব্রতী হয়েছিল, কিন্তু মূল আবেদনটি ছিল কাব্যের, তথা মনস্তাত্ত্বিক।

আমার নয়ন মানে না, চল, বোঝালে কি হবে সই,
তুমি বল সে আসিবে আমি বলি কই।

এই দুটি লাইনের বাক্যার্থকে যদি জৌনপুরী রাগে ফুটিয়ে তুলতে হয়, তা হলে কেবল রাগের আঙ্গিকটা প্রয়োগ করলেই চলবে না, নায়িকার অধীরতা, তার বাঞ্ছিতকে দুটি চোখ ভরে দেখবার ব্যাকুলতাকেও সর্বতোভাবে ফুটিয়ে তুলতে হবে। নিধুবাবু তাঁর গানে এই মর্মকথাকেই প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন, তাই আজ দুশো বছর ধরে তিনি আমাদের কাব্যসংগীতের

আদিপুরুষরূপে স্বীকৃত হয়ে আসছেন। এই প্রকাশের রীতিতে যে বিস্তার যে তানের কাজ প্রয়োগ করতে হবে তার মধ্যে কতকগুলি বিশেষ ইঙ্গিত থাকবে যা ঐ কাব্যাংশের উপলব্ধি থেকে নির্গত হয়েছে। এইটিই হচ্ছে এই গানের সাংগীতিকতা। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

যদি বারণ কর তবে গাহিব না।
যদি শরম লাগে মুখে চাহিব না ॥

এও রাগসংগীত ; কিন্তু "রাগ" বলতে যা বোঝায় এখানে তার কর্তব্য সেটুকুই অর্থাৎ কাব্যের মধ্যে নিহিত উদ্দেশ্যটুকুকে পরিব্যক্ত করা। রাগ শব্দের মূল অর্থ হচ্ছে একটা তীব্র আকর্ষণ বা আকাঙ্ক্ষা। এই চাওয়া বা কামনার নানান প্রকারভেদ আছে, সেই প্রয়াসের অভিব্যক্তি একটা নাট্যোপলব্ধি না থাকলে হয় না। রবীন্দ্রনাথ এবং দ্বিজেন্দ্রলালের মধ্যে এই উপলব্ধি অত্যন্ত তীব্র ছিল, তাই এঁরা দুজন এখনো কম্পোজার হিসাবে অতুলনীয়। পক্ষান্তরে, অতুলপ্রসাদ সেন বা রজনীকান্ত সেন মেলডির সুগভীরে প্রয়াণ করেছেন কিন্তু এতখানি নাট্যধর্মিতা তাঁদের মধ্যে ছিল না। এ যুগে নজরুল ইসলামের মধ্যে এই গুণ অনেকখানি ছিল, কিন্তু তাঁর রচনায় কাব্যগত মান শ্রেষ্ঠতর হলে তিনি তাঁর সুরবিন্যাসকে আরো অনেক বুদ্ধিদীপ্ত করতে পারতেন। তবু তাঁর বেশ কয়েকটি গানে তিনি এইদিক থেকে সার্থকতা অর্জন করেছেন।

সাংগীতিক অভিব্যক্তির জন্যে গায়নরীতির যে কতকগুলি বিশেষ প্রয়োগ আছে সেটি বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ করা যায় কবির পরিণত বয়সের রচনায়। এ সম্বন্ধে লিখে বোঝাতে গেলে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়, হয়তো বা ঠিক বোঝানোও যায় না, কারণ গান গেয়ে দেখিয়ে দেবার জিনিস, লিখে বোঝাবার নয়। এ কথা সত্যি যে আমরা স্বরলিপি করে গানকে রক্ষা করি, কিন্তু গানের মধ্যে যা ফুটে ওঠা সমীচীন তাকে প্রয়োগ করতে পারি নে। এইজন্যে যাঁরা বহু কাব্যসংগীত লিখেছেন, বহু গায়কীর সঙ্গে পরিচিত, তাঁরা একটা স্বরলিপি দেখলেই বুঝতে পারেন, তার প্রকাশভঙ্গি, গায়নরীতি কেমন হবে। অপরের পক্ষে সেটা সম্ভব হয় না। তাই আজকাল যেভাবে গ্রামোফোনে, রেডিও-টেলিভিশনে বা নানান আসরে রবীন্দ্রনাথের গান শুনি তাতে মন ভরে না, মনে হয় যেন একটা স্বরলিপির অনুসরণটুকু মাত্র বোঝা গেল, স্বরলিপির মধ্যে যে "ধ্বনি"টা রয়ে গেছে সেটা গায়ক বা গায়িকার কণ্ঠে উচ্চারিত হল না। কয়েকদিন আগে রেকর্ডকরা একটি গান শুনছিলুম—"চলে যায় মরি হায় বসন্তের দিন"। গানটির সঞ্চারী অংশ এইরূপ :—

পুলকিত আম্রবীথি ফাল্গুনেরই তাপে,
মধুকর-গুঞ্জরণে ছায়াতল কাঁপে।

এইখানটা শোনবামাত্র মনে হল আর্টিস্ট স্বরলিপিটুকু অনুসরণ করেছেন, কিন্তু যে পদ্ধতিতে এই অংশটি পরিবেশিত হত তা জানবার সুযোগ তাঁর হয় নি। ঐ যে "পুলকিত" শব্দটি, সেটি এমনভাবে উচ্চারিত হত যে, সঙ্গে সঙ্গে একঝলক পুলক যেন সমস্ত উচ্ছ্বাস নিয়ে পরিব্যাপ্ত হয়ে যেত। শুধু তাই নয়, এই অংশটি কবি এমন ছন্দে বিন্যাস করে গায়কী প্রস্তুত করেছিলেন যে "মধুকর-গুঞ্জরণে" ছায়াতলের কম্পনটুকুও অনুভব করা যেত।

এইরকম আরো বহু উদাহরণ দেওয়া যায়। ধরা যাক "কেন পান্থ,এ চঞ্চলতা" গানটির কথা। এ তো অতি বিখ্যাত গান, যাঁরা রবীন্দ্রনাথের গান করেন, তাঁরা প্রায় সবাই এই গানটি জানেন ; কিন্তু ঠিক সেই বস্তুকে ফুটিয়ে তুলতে পারেন কি, যা আমরা আমাদের বাল্যকালে যোগ্যব্যক্তিদের গানে ফুটে উঠতে দেখেছি। এরও সঞ্চারী-অংশটুকুর কথাই বলব—

কেশরকীর্ণ কদম্ববনে মর্মরমুখরিত মৃদুপবনে
বর্ষণহর্ষ-ভরা ধরণীর বিরহবিশঙ্কিত করুণ কথা।

এই জায়গাটা আজকাল যখনই শুনি তখনই মনে হয় যেন গায়ক বা গায়িকা শুদ্ধভাবে স্বরলিপিটুকু তাঁর গানের মধ্যে যথাযথভাবে রক্ষা করে গেলেন, কিন্তু সেই ছন্দের হিল্লোল জাগাতে পারলেন না যাতে সমস্ত অংশের সব-কিছু সেন্টিমেন্ট নিয়ে একটি গোটা সাংগীতিক চিত্র প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে।

পুষ্পগুচ্ছ
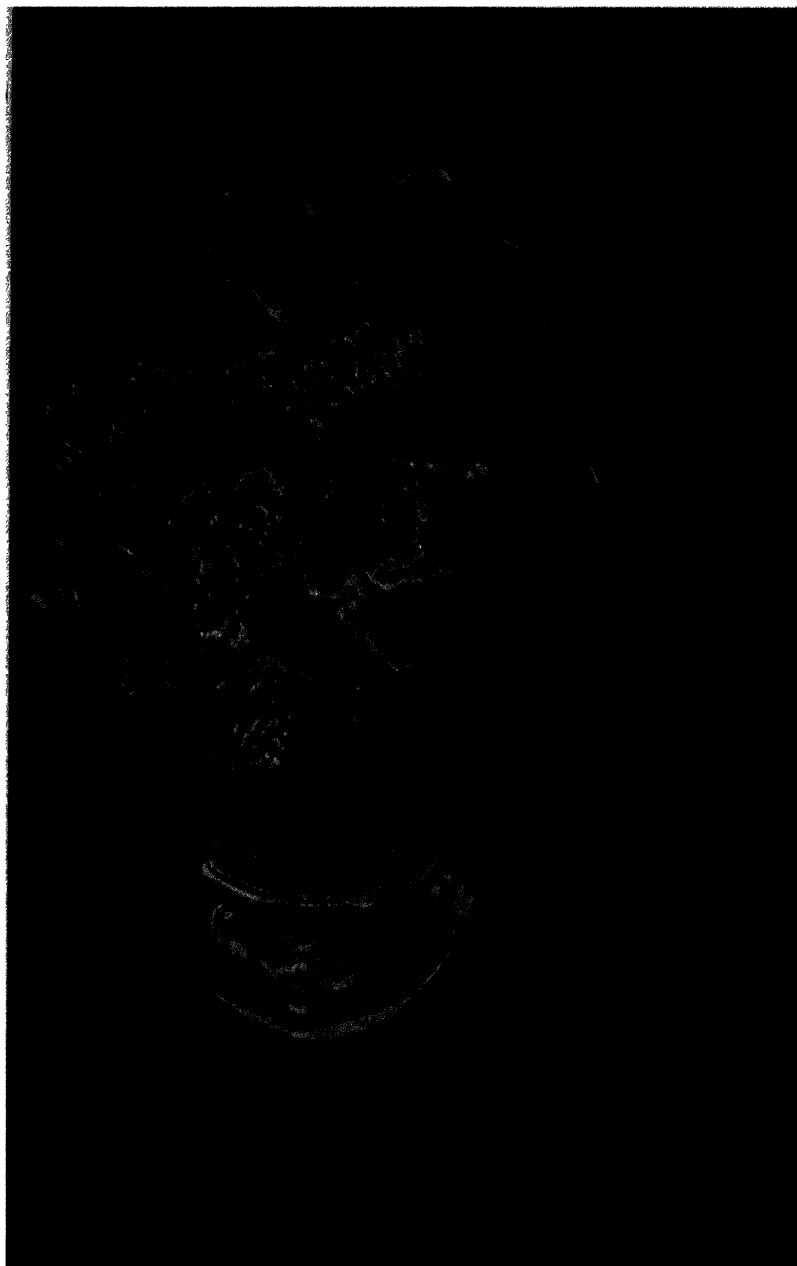
"দারুণ অগ্নিবাণে হৃদয় তৃষায় হানে", "চক্ষে আমার তৃষ্ণা, ওগো, তৃষ্ণা আমার বক্ষ জুড়ে", "বজ্রমানিক দিয়ে গাঁথা আষাঢ় তোমার মালা", "আজি দখিন দুয়ার খোলা", "কে দেবে চাঁদ তোমায় দোলা", "ফাগুন হাওয়ায় হাওয়ায় করেছি যে দান"— প্রভৃতি বহু পরিচিত গান যখন আজকাল একাধিকবার শুনি তখন হতাশ হতে হয় এই ভেবে যে এই ধরনের গানের প্রকাশের মধ্যে যে একটা গায়নতত্ত্ব আছে সেটা অনেকেরই অজানা। এমন-কি অনেকে, যাঁরা কবিগুরুর জীবিতকালে শান্তিনিকেতনে গান শিখেছেন, তাঁদেরও সংগীতের এই মধুকোষের পথ জানা ছিল না, কেননা তাঁরা ততটা খেয়াল করে গান শেখায় মন দেন নি। কিন্তু অমিতা সেন যখন গাইতেন তখন এই শিহরনগুলি শ্রোতাদের আপ্লুত করে দিত। সমরেশ চৌধুরীর কথা মনে পড়ে, তাঁর কণ্ঠেও এইরকম একধরনের মাদকতা ফুটে উঠত। আবার কিছু গায়ক-গায়িকাকে রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাঁর অনেক গান শিখিয়েছেন যেখানে মেলডির প্রাধান্য বেশি, ঠিক এই ধরনের নাট্যধর্মী গান হয়তো তাঁদের গলায় মানাবে না বলে, সেখানে তাঁদের নিয়ে যেতে চান নি। তাঁদের কথা স্বতন্ত্রভাবে বিচার করলে ভালো হবে কারণ তাঁরাও স্বনামধন্য শিল্পী। কিন্তু সব-কিছু স্বীকার করলেও এ সত্যটা অবশ্যই থেকে যায় যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে একটি অভিনয়ের প্রকাশকে প্রাধান্য দিতে ভালোবাসতেন এবং এটিই তাঁর সৃষ্টির প্রধানতম বিশেষত্ব। বোধ হয় এই কারণেই তিনি সম্মেলকগানে অত্যন্ত আগ্রহান্বিত ছিলেন। একান্ত ধৈর্য এবং পরিশ্রম সহকারেই তিনি সম্মেলকগানগুলিকে বিকাশের একটি শ্রেষ্ঠ মাধ্যম করে তুলেছিলেন। আমি নিজে প্রত্যক্ষ করেছি, মঞ্চের ওপরে যখনই তাঁর মনে হয়েছে সম্মেলকগানে কোথাও কোনো অভাব দেখা দিয়েছে তখনই তিনি ইঙ্গিতে প্রেরণা দিয়েছেন, একবার ভ্রূক্ষেপও করেন নি দর্শকদের কাছে সেটা সমালোচনার কারণ হবে কি না।

এমন অনেক শান্তপ্রকৃতির গান আছে যেগুলি সুরের গুণেই সুসমৃদ্ধ তথাপি তাদের প্রকাশের মধ্যে স্থানে স্থানে এমন কিছু নির্দেশ দেখা যায় যা নাট্যধর্মিতা ব্যতিরেকে নিজেকে পরিব্যক্ত করতে সক্ষম নয়। উদাহরণস্বরূপ একটি গানের কথা মনে হচ্ছে—"ক্লান্ত যখন আম্রকলির কাল, মাধবী ঝরিল ভূমিতলে অবসন্ন"। শুধুমাত্র স্বরলিপিকে অনুসরণ করে গাইলে এই গানের প্রকৃত আবেদন ধরা পড়বে কিনা সন্দেহ। এর গায়কীতে এমন কিছু রীতিপ্রকৃতি আছে যা শিল্পীর কণ্ঠেই একমাত্র রূপায়িত হতে পারে, স্বরলিপিতে সেই ভাবমূর্তির সন্ধান দেওয়া দুঃসাধ্য।

এই যে আলোচনাগুলি করা হল সেটা কিন্তু শিল্পীসম্প্রদায়ের প্রতি কটাক্ষপাত করবার উদ্দেশ্যে নয়, কেবল কবির যে আদর্শ ছিল, সেটা বোঝাবার জন্যে। আমরা কবির উপস্থিতিতে প্রকাশ্য মঞ্চের ওপর তাঁর অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করেছি। কবির যখন দেহাবসান হয় তখন আমার যৌবনকাল। অতএব, নিরপেক্ষভাবে রবীন্দ্রনাথের সাংগীতিক অভিব্যক্তি আমাদের কাছে যেভাবে স্পষ্ট হয়েছে ততটা অনেকের কাছে হওয়া সম্ভব নয় এবং এই সংখ্যাও এখন বিরল হয়ে এসেছে।

আসলে, এ যুগের শিল্পীরা এ যুগের আদর্শ ধরে চলেছেন, তাঁদের ধারা আর আগেকার ধারা এক নয়। তাঁরা কণ্ঠকে অবরুদ্ধ রাখা পছন্দ করেন, এমন-কি চড়াতে গেলেও কণ্ঠের চাপাভাবটা রক্ষা করে চলেন। তাঁদের ধারণা, স্বরলিপির অনুসরণটা শুদ্ধ হলেই গানের প্রচারটা শুদ্ধ হতে বাধ্য। আগের যুগের বাংলাগানের বহু প্রয়োগরীতি তাঁদের অজানা, তাঁরা ততটা ব্যাপকভাবে বাংলাসংগীতের চর্চা করেন নি ; অতএব শিক্ষকের কাছ থেকেই হোক বা স্বরলিপি থেকেই হোক, রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি বিশেষ পুরাতন গানের রূপায়ণ তাঁরা যে ভাবে আয়ত্ত করেন, সেটার মধ্যে অনেক ত্রুটি থেকে যায়। এই প্রসঙ্গে একটি গান উদ্‌ধৃত করি :

ও যে মানে না মানা
আঁখি ফিরাইলে বলে না, না, না।
যত বলি নাই রাতি মলিন হয়েছে বাতি
মুখপানে চেয়ে বলে না, না, না।
ইত্যাদি।

এই গানটি, বিগত যুগের টপ্পা, আড়-খেমটা চালের গান না জানলে সুষ্ঠুভাবে গেয়ে দেখানো যাবে না। এই-সব রীতি রবীন্দ্রনাথের যৌবনে প্রচলিত ছিল, অতএব, তাঁর গলায় এগুলি অত্যন্ত সুন্দরভাবে ফুটে উঠত ; কিন্তু বর্তমানে শিল্পীদের গলায় গানটা মোটামুটি একরকম দাঁড়াতে পারে, তবে সেই ছোটো ছোটো কাজগুলি কিছুতেই ধরা পড়বে না। এ শিক্ষা দেবার মতন লোক এখন আর প্রায় নেই বললেই চলে। এখনকার শ্রোতারাও এ নিয়ে বিতর্ক উত্থাপন করবেন না, কারণ তাঁরা আধুনিক ধারাটাই শুনতে অভ্যস্ত এবং এই ভাবেই রবীন্দ্রসংগীতে একটা বিপুল পরিবর্তন এসে গেছে যার কারণ নির্দেশ করতে গেলে কালের বিস্মৃতিকেই দায়ী করতে হয়।

অপরপক্ষে, রবীন্দ্রনাথ যখন গান গেয়েছেন তখন গলা ছেড়ে গাওয়াটা রীতিসম্মত ছিল, অলংকরণ এবং গায়কীর কতকগুলি বিশিষ্ট ধারা ছিল, গানের সংগঠনের দিকটা বেশ ভেবেচিন্তে নির্ণয় করতে হত। এখন অনেক শিল্পী গলা ছেড়ে গাওয়াকে "লাউড" বলে নিন্দা করেন, অনেক অলংকরণ তাঁদের মতে এ যুগের পক্ষে অচল বা বাহুল্যমাত্র। কিন্তু এ সমস্তটাই অক্ষমতার অজুহাত, তাঁদের জানার পরিধি যদি ব্যাপকতর হত তা হলে তাঁরা এ কথা বলতেন না এবং স্বরলিপি দেখা মাত্র বুঝতে পারতেন কোন্ প্রয়োগটা কিভাবে হবে।

আর্ট বস্তুটা এমন, যে তা কখনোই অচল হয়ে যায় না, একটা ধারা আর-একটা ধারার কাছে আত্মসমর্পণ করে যায়, কিন্তু রেখেও যায় তার অনেকখানি। এইভাবেই অভিনয় জগতে গিরিশ ঘোষ থেকে শিশির ভাদুড়ী পর্যন্ত নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। সংগীতের জগতেও সেই নিধুবাবুর কাল থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত ক্রমিক নিয়ম অনুসারে একটা কালচারকে ধীরে ধীরে অগ্রসর করে এনে অপেক্ষমাণ ভবিষ্যতের জন্য সমর্পণ করে গেছেন। তাঁরা মূল্যবোধ করতে পারতেন, তাঁদের স্বকীয়তা ছিল এবং সর্বাধিক ছিল আত্মপ্রত্যয় যা তাঁদের প্রতিভাকে নিত্য নূতন সন্ধানে ব্যাপৃত রেখেছে। আজ সেইখানে দেখা দিয়েছে অনুশীলনের দৈন্য, ব্যাপক শিক্ষার অভাব, যা একটা ঐতিহ্যের অবলুপ্তিকে ডেকে নিয়ে আসতে উদ্যত। এইরকম অবস্থায় প্রতিভার স্ফুরণ ঘটা কী করে সম্ভব হতে পারে, স্রষ্টার অন্তর্দৃষ্টি লাভ করা আরো কঠিন ব্যাপার। এই-সব কারণেই আজ রবীন্দ্রনাথের গান কেবলমাত্র স্বরলিপির কাঠামোর ওপর দাঁড়িয়ে আছে, তার পরিপূর্ণ প্রতিকৃতি দুর্লভ। তবু ভাগ্যিস স্বরলিপিগুলি ছিল, যার সিংহভাগ লিপিবদ্ধ করে গেছেন দিনেন্দ্রনাথের মতন অসামান্য প্রতিভা ; নতুবা রবীন্দ্রসংগীতের এই নিদর্শনও পাওয়া যেত কিনা সন্দেহ।

রবীন্দ্র-কবিতায় বিশেষণের ব্যবহার

জীবেন্দ্র সিংহ রায়

উচ্চারিত উক্তির মাধ্যমে জীবনের স্তরবহুল অভিজ্ঞতা প্রকাশ করাই মানুষের লক্ষ্য। কবিও বাক্যের মধ্যবর্তিতায় নিজের অভিজ্ঞতার স্তরবৈচিত্র্য পাঠকের কাছে পৌঁছিয়ে দিতে চান—অবশ্যই সৃষ্টির রহস্যভূমিতে দাঁড়িয়ে ভিন্নতর অনুক্রমে। মানুষের জীবনময় অভিজ্ঞতা অর্জনের পেছনে একটা নির্বিচার সারল্য আছে এবং তার মধ্যে বাছ-বিচারের কোনো চেষ্টিত বিভাজন নেই। কিন্তু সেই-সব অভিজ্ঞতার যথেচ্ছ সংগ্রহকে সে যখন ভাষার সামর্থ্যে ব্যক্ত করতে অগ্রসর হয় তখন ব্যবহারিক প্রয়োজন অনুসারে তাতে ছাঁটকাট করতেই হয়। আর সেইজন্য মানুষের অর্জিত অভিজ্ঞতার পরিমাণ যতটা, ভাষায় তার নিশ্চিত প্রকাশ কখনোই ততটা হয় না। কবির ক্ষেত্রেও সেই একই গ্রহণ-বর্জনের প্রশ্ন কাজ করে— কিন্তু আরো অনেক বেশি কঠোরভাবে, আরো অনেক বেশি নৈপুণ্যের সঙ্গে। কবির মনোজীবন ঠিক ফোটাগ্রাফারের ক্যামেরা নয়— যার ওপর আলোকপাত করে, তার ছবি সে কখনো হুবহু তুলে নেয় না। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে যত অভিজ্ঞতারই সমাবেশ হোক-না কেন, তাঁর গ্রাহক মন ঝাড়-পোঁছের পর সেই সন্নিবদ্ধ জ্ঞানের সারাংশ মাত্র সচেতনভাবে স্বীকার করে নেয়।

এইভাবে অর্জিত অভিজ্ঞতাকে নির্মমভাবে ছেঁকে নেওয়ার পর কবির মন অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ শৈল্পিক কর্তব্য পালনে অগ্রসর হয়। সেটি হচ্ছে, জীবনের ছেঁকে-নেওয়া অভিজ্ঞতাকে আরো শোধন করে নিয়ে তাকে যোগ্য ও সংগত বাঙ্ময়তার মধ্যে মুক্তি দেওয়া। মনে রাখতে হবে, কাব্য হচ্ছে কবির পরিশুদ্ধ অভিজ্ঞতার মোক্ষভূমি— নিজের অভিজ্ঞতার বন্ধন থেকে কবির পরিচ্ছন্নভাবে নিক্রান্ত হওয়ার প্রশস্ত ক্ষেত্র।

কিন্তু কবিজীবনের কোনো শুদ্ধীকৃত অভিজ্ঞতা বা দোষমুক্ত পর্যবেক্ষণকে ভাষার মধ্যে কোনোপ্রকারে সমর্পণ করতে পারলেই তা কাব্য হয়ে ওঠে না। কবি যখন তাঁর পরিস্রুত স্মৃতির সঞ্চয় বা শুদ্ধীকৃত অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার বা পরিশীলিত বহুদর্শিতাকে যথার্থভাবে শব্দার্থে সমর্পণ করেন তখন বিষয়কে সোজাসুজি উপস্থাপিত করার নিরঙ্কুশ সারল্য তাতে থাকে না। তার মধ্যে এসে যায় স্তরীভূত অভিজ্ঞতার ক্রমমুক্তির জটিলতা, ভিন্ন ভিন্ন পর্যবেক্ষণের নানা আয়তন, বিচিত্র শব্দরাশির বিচ্ছুরিত শ্রুতিময়তা, চিত্র ও চিত্রকল্পের সুরচিত সৌন্দর্যমাত্রা ইত্যাদি ইত্যাদি। তাই তো কাব্যোক্তির আরেক নাম ব্যঞ্জনাময় বক্রোক্তি, কাব্যজগতের আরেক নাম রহস্যময় সৃষ্টির জগৎ।

সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, কাব্য বলতে শুধু কবির পরিশোধিত অভিজ্ঞতার বাঙ্ময় প্রকাশ বোঝায় না— বোঝায় তার শিল্প-শীলিত বাঙ্ময় প্রকাশও। শাস্ত্রবাক্যের অনুসরণে বলা যায়, প্রেমময়ী স্ত্রী যেমন স্বামীর মনোরঞ্জনের জন্য সুন্দর বস্ত্রের সাহায্যে নিজের শরীরে সৌন্দর্যের আগুন জ্বালিয়ে দেয় তেমনি কবির বাক্-সমুচ্চয় শিল্পানুশীলনের সাহায্যে নিজের তনুরুচিতে বিস্ফোরণ ঘটায়। কাব্যের বাক্-বিভূতির সেই শোভনসুন্দর স্ফূর্তির নানা উপায়ের মধ্যে একটি হচ্ছে বিশেষণ পদের সুমিত ও সুশৃঙ্খল প্রয়োগ। অস্বীকার করার উপায় নেই যে, সৌন্দর্যসন্ধানী কবিমাত্রই নির্বাচিত বিশেষণের শরীরে শরনিক্ষেপ করতে ভালোবাসেন। তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আছে মিল্টনের কাব্যগ্রন্থাবলীতে। রবীন্দ্রনাথও সারাজীবন ধরে ভারতচন্দ্রের অন্নদার মতো একটা কথাই উচ্চারণ করে গেছেন—'বিশেষণে সবিশেষ কহিবারে পারি।'

এ কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, রবীন্দ্রনাথ বিশেষণ ছাড়া কবিতায় কথা বলতে পারতেন না। বস্তুত অন্যান্য কবির মতো তাঁর কবিতায়ও এমন একটা অংশ নিশ্চয়ই দেখতে পাওয়া যায় যেখানে কবিত্ব ও সৌন্দর্যের তেমন স্ফূর্তি হয় নি। তা নিতান্তই সাদামাটা বিবৃতি মাত্র এবং তাতে কাব্যগত প্রয়োজনে বিশেষণের শব্দৈশ্বর্য আমন্ত্রিত হয় নি। এটা ঘটেছে রবীন্দ্রনাথের সব বয়সের কবিতাতেই। কবির সেই-সব বিশেষণহীন সৌন্দর্যহীন কবিতাচর্চার কিছু নিদর্শন দেখাচ্ছি—

কেন গো, কী হয়েছিল তার।
একবার শুধালে না কেহ—
কী লাগি সে তেয়াগিল দেহ।
যদি কেহ শুধাইত
আমি জানি কী যে সে কহিত।
যতদিন বেঁচে ছিল
আমি জানি কী তারে দহিত।
সে কেবল হাসির যন্ত্রণা,
আর কিছু না।

—"তারকার আত্মহত্যা", 'সন্ধ্যাসঙ্গীত'

শুধু বিঘে দুই ছিল মোর ভুঁই আর সবি গেছে ঋণে।
বাবু বলিলেন, 'বুঝেছ উপেন, এ জমি লইব কিনে।'
কহিলাম আমি, 'তুমি ভূস্বামী, ভূমির অন্ত নাই।
চেয়ে দেখো মোর আছে বড়ো-জোর মরিবার মতো ঠাঁই।'
শুনি রাজা কহে, 'বাপু জান তো হে, করেছি বাগানখানা,
পেলে দুই বিঘে প্রস্থে ও দীঘে সমান হইবে টানা—
ওটা দিতে হবে।'

—"দুই বিঘা জমি", 'কাহিনী'

যাত্রীঘরে বিছানাটা দিলেম পেতে,
বলে দিলেম, 'বিনু এবার চুপটি করে ঘুমোও আরামেতে।'
প্ল্যাটফরমে চেয়ার টেনে
পড়তে শুরু করে দিলেম ইংরেজি এক নভেল কিনে এনে।
গেল কত মালের গাড়ি, গেল প্যাসেঞ্জার,
ঘণ্টা তিনেক হয়ে গেল পার।
এমন সময় যাত্রীঘরের দ্বারের কাছে
বাহির হয়ে বললে বিনু, 'কথা একটা আছে।'

—"ফাঁকি", 'পলাতকা'

এমন সময় আসে কাকের দল,
খাদ্যকণায় ঠোকর মেরে দেখে কী হয় ফল।
একটুখানি যাচ্ছে সরে আসছে আবার কাছে,
উড়ে গিয়ে বসছে তেঁতুলগাছে।
বাঁকিয়ে গ্রীবা ভাবছে বারংবার,
নিরাপদের সীমা কোথায় তার।
এবার মনে হয়,
এতক্ষণে পরস্পরের ভাঙল সমন্বয়।

—"পাখির ভোজ", 'আকাশপ্রদীপ'

আবার রবীন্দ্র-কবিতায় এমন বাক্যচর্চারও অভাব নেই যেখানে কবিত্বগুণ ও সৌন্দর্যধর্ম প্রতিষ্ঠা পেয়েছে, অথচ বিশেষণের কোনো প্রয়োগ চোখে পড়ে না। বস্তুত কাব্যপ্রাণতা ও সৌন্দর্যবাচকতা যে বিশেষণ নামক পদবন্ধের ওপর অপরিহার্যভাবে নির্ভরশীল নয়, তার অনেক নিদর্শন রবীন্দ্রনাথ রেখে গেছেন। এটা বুঝতে তাঁর কষ্ট হয় নি যে, বাক্যরূপকে বিশেষণের দ্বারা বিভূষিত না করেও কবিতাকে কলাবতী করা যায়। যেমন—

মাকে আমার পড়ে না মনে।
শুধু কখন খেলতে গিয়ে
হঠাৎ অকারণে
একটা কী সুর গুনগুনিয়ে
কানে আমার বাজে,
মায়ের কথা মিলায় যেন
আমার খেলার মাঝে।
মা বুঝি গান গাইত, আমার
দোলনা ঠেলে ঠেলে ;
মা গিয়েছে যেতে যেতে
গানটি গেছে ফেলে।

—"মনে পড়া", 'শিশু ভোলানাথ'

রূপনারানের কূলে
জেগে উঠিলাম,
জানিলাম এ জগৎ
স্বপ্ন নয়।
রক্তের অক্ষরে দেখিলাম
আপনার রূপ,
চিনিলাম আপনারে
আঘাতে আঘাতে
বেদনায় বেদনায় ;

৩

কিন্তু বিশেষণহীন বাক্যবন্ধে রবীন্দ্রনাথ কতটা কবিত্বচর্চা কিংবা সৌন্দর্যচর্চা করতে পেরেছেন, তা এখানে আলোচনার বিষয় নয়। এখানে স্থিরীকৃত বিষয় হচ্ছে, রবীন্দ্র-কবিতায় কতখানি ও কী ধরনের বিশেষণচর্চা আছে তারই বিচার। এই প্রসঙ্গে প্রবেশ করার আগে আমাদের একটা কথা স্মরণ রাখতে হবে। মনের ভাব ব্যক্ত করতে গিয়ে মানুষ মৌখিকভাবে বা লিখিতভাবে যে বাক্য গঠন করে তাতে বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, ক্রিয়া, ক্রিয়ার বিশেষণ, অব্যয় এই পদগুলি প্রয়োগ করে থাকে। বিচার-বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, বাংলা বাক্যে বিশেষ্য ও ক্রিয়া পদের পরই বিশেষণ পদের ব্যবহার বেশি। তাই বাঙালি কবির কাব্যকৃতিতেও বিশেষণচর্চার হার স্বাভাবিকভাবেই বেশি হয়ে থাকে। রবীন্দ্রনাথ এ কথা অবশ্যই জানতেন ও বুঝতেন। তাই তিনি তাঁর কাব্যকলায় আমৃত্যু বিশেষণচর্চার দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি রেখেছেন। সেই বিশেষণচর্চা তাঁর কবিতাকে যে কবিত্বগুণোপেত ও সৌন্দর্যাশ্রিত করে তুলেছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

প্রথমে রবীন্দ্র-কবিতায় বিশেষণের প্রয়োগ কতখানি, তা নির্ধারণ করা যাক। তিনি যেমন কোনো কোনো কবিতার এক-একটা অংশে বিশেষণ একেবারেই ব্যবহার করেন নি, তেমনি আবার এক-একটা অংশে বিশেষণ খুবই কম ব্যবহার করেছেন। বিশেষণের সেই বিরল প্রয়োগ বলতে একটি, বড়ো-জোর দুটি প্রয়োগ বুঝতে হবে। বিশেষণহীন বাক্যবন্ধের কিছু পরিচয় আগে দেখেছি, এবার বিশেষণের বিরল প্রয়োগের কিছু পরিচয় নেওয়া যাক—

সে যখন বেঁচে ছিল গো, তখন
যা দিয়েছে বার বার
তার প্রতিদান দিব যে এখন
সে সময় নাহি আর।
রজনী তাহার হয়েছে প্রভাত,
তুমি তারে আজি লয়েছ হে নাথ—
তোমারি চরণে দিলাম সঁপিয়া
কৃতজ্ঞ উপহার।

তার কাছে যত করেছিনু দোষ
যত ঘটেছিল ত্রুটি,
তোমা কাছে তার মাগি লব ক্ষমা
চরণের তলে লুটি।
তারে যাহা-কিছু দেওয়া হয় নাই,
তারে যাহা-কিছু সঁপিবারে চাই,
তোমারি পূজার থালায় ধরিনু
আজি সে প্রেমের হার।

— 'স্মরণ' ২

ক্লান্তি আমার ক্ষমা করো প্রভু,
পথে যদি পিছিয়ে পড়ি কভু।
এই-যে হিয়া থরোথরো
কাঁপে আজি এমনতরো

এই বেদনা ক্ষমা করো,
ক্ষমা করো প্রভু।

এই দীনতা ক্ষমা করো প্রভু,
পিছন-পানে তাকাই যদি কভু।
দিনের তাপে রৌদ্রজ্বালায়
শুকায় মালা পূজার থালায়,
সেই ম্লানতা ক্ষমা করো
ক্ষমা করো প্রভু।

—'গীতালি' ৫৯

ঐ মহামানব আসে :
দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে
মর্ত্যধূলির ঘাসে ঘাসে।
সুরলোকে বেজে উঠে শঙ্খ,
নরলোকে বাজে জয়ডঙ্ক—
এল মহাজন্মের লগ্ন।
আজি অমারাত্রির দুর্গতোরণ যত
ধূলিতলে হয়ে গেল ভগ্ন।
উদয়শিখরে জাগে মাভৈঃ মাভৈঃ রব
নব জীবনের আশ্বাসে।
জয় জয় জয় রে মানব-অভ্যুদয়,
মন্দ্রি উঠিল মহাকাশে।

—'শেষ লেখা' ৬

লক্ষণীয় এই যে, প্রথম দুটি দৃষ্টান্তই পূর্ণাঙ্গ কবিতা এবং তাদের প্রত্যেকটির মধ্যে মাত্র একটি করে বিশেষণ আছে। তৃতীয় দৃষ্টান্তে দুটি বিশেষণ আছে এবং এই দৃষ্টান্তটিও একটি পূর্ণাঙ্গ কবিতা। বুঝতে অসুবিধা নেই যে, এই কবিতাগুলিতে বিশেষণের সাহায্যে কথা কওয়ার দিকে কবি রবীন্দ্রনাথ বিশেষ নজর দেন নি। তবে বিশেষণ পদের এমন বিরল প্রয়োগের নিদর্শন রবীন্দ্রকাব্যে বেশি নেই।

৪

আসলে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যকলায় বিশেষণ ব্যবহারে সব সময়েই আগ্রহ দেখিয়েছেন। সেই কারণে তাঁর কবিতায় বিশেষণের বিচিত্র ও বহুল প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। তিনি যেমন বিশেষণের অনেক একক প্রয়োগ ঘটিয়ে কবিতার শরীর ভরিয়ে তুলেছেন, তেমনি একাধিক বিশেষণের উপর্যুপরি প্রয়োগ ঘটিয়ে সেই শরীরকে আকর্ষণীয় করে তুলেছেন। বিশেষণের একক, অথচ প্রচুর প্রয়োগের নিদর্শন রবীন্দ্র-কবিতা থেকে তুলে ধরছি—

দ্বিধায় **জড়িত** পদে **কম্প্র** বক্ষে **নম্র** নেত্রপাতে
স্মিত হাস্যে নাহি চল **সলজ্জিত** বাসরশয্যাতে
স্তব্ধ অর্ধরাতে।

—"উর্বশী", 'চিত্রা'

তিনটি ছত্রে মোট ছয়টি একক বিশেষণ এখানে প্রয়োগ করা হয়েছে।

মলিনবরন মালাখানি
শিথিল কেশে সাজে,
ক্লিষ্টকরুণ রাগে তাদের
ক্লান্ত বাঁশি বাজে।

—"অবারিত", 'খেয়া'

এখানে চারটি ছত্রের প্রত্যেকটির মধ্যে একটি করে একক বিশেষণ ব্যবহৃত হয়েছে। বিশেষণের মোট সংখ্যা চার।

তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ **আকীর্ণ** করি
বিচিত্র ছলনাজালে,
হে ছলনাময়ী।
মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ পেতেছ **নিপুণ** হাতে
সরল জীবনে।

—'শেষলেখা' ১৫

পাঁচটি ছত্রে মোট পাঁচটি একক বিশেষণ প্রয়োগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এই উদ্ধৃতিতে আছে। 'ছলনাময়ী' শব্দ বিশেষণ হলেও বিশেষ্যের মতো ব্যবহৃত হয়েছে বলে এই হিসেবের মধ্যে ধরা হয় নি।

একাধিক বিশেষণের উপর্যুপরি ব্যবহারের বিচিত্র নিদর্শন আমরা রবীন্দ্রনাথের কবিতায় দেখতে পাই—

তাদের চিত্তমহাসাগর **উদ্দাম উত্তাল**
মগ্ন করে অন্তবিহীন কাল :

—"চলতি ছবি", 'সেঁজুতি'

উপর্যুপরি তিনটি বিশেষণের প্রয়োগ এখানে হয়েছে।

নিরাসক্ত নিরাকাঙ্ক্ষ ধ্যানাতীত মহাযোগীশ্বর
কেমনে দিলেন ধরা **সুকোমল দুর্বল সুন্দর**
বাহুর করুণ আকর্ষণে—

—'উৎসর্গ' ২৫

এখানে উপর্যুপরি তিনটি বিশেষণের দু'বার ব্যবহার দেখা যাচ্ছে!

সেই যে **বিধুর তীব্র মধুর ত্রাসদোদুল** বক্ষ দুরু দুরু—
উড়ো পাখির ডানার মতো যুগল কালো ভুরু,

—"নূতন শ্রোতা", 'পরিশেষ'

উপর্যুপরি প্রয়োগে চারটি বিশেষণ এখানে চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছে।

একই সঙ্গে অনেকগুলি বিশেষণের এই ব্যবহার নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথের কবিরুচির বিরোধী ছিল না, তা না হলে তাঁর কবিতায় এমনিতর গুচ্ছপ্রয়োগ অবশ্যই দেখা যেত না। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, তিনি পর পর আটটি বিশেষণ ব্যবহার করতেও কুণ্ঠিত হন নি। মনে হয়, রবীন্দ্র-কবিতায় বিশেষণ ব্যবহারের এই হচ্ছে ঊর্ধ্বতন সীমা—

...জল শুধু জল
দেখে দেখে চিত্ত তার হয়েছে **বিকল**।
মসৃণ চিক্কণ কৃষ্ণ কুটিল নিষ্ঠুর,
লোলুপ লেলিহজিহ্ব সর্পসম ক্রূর...

—"দেবতার গ্রাস", 'কাহিনী'

৫

রবীন্দ্র-কবিতায় বিশেষণের প্রয়োগ কতখানি— বিশেষণের বিরল ও বহুল প্রয়োগের নিম্নতন ও ঊর্ধ্বতন সীমা কী, তা দৃষ্টান্তসহযোগে দেখা গেল। এর পর সেই-সব বিশেষণের গুণগত বা চরিত্রগত পরিচয় নেওয়া দরকার। রবীন্দ্রনাথ কোথাও বিশেষণ কম, কোথাও বেশি ব্যবহার করেছেন— কোথাও বিচ্ছিন্নভাবে, কোথাও উপর্যুপরি ব্যবহার করেছেন। তাঁর ব্যবহৃত বিশেষণের পরিমাণ বা সংখ্যা যা-ই হোক-না, সেই-সব বিশেষণ কী ধরনের গুণাগুণ নিয়ে কবিতায় এসেছে তা বিচার করে দেখা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়। আগেই বলেছি, কবিতাকে যথোচিতভাবে কবিত্ব অর্জনে সহায়তা করা, কবিতার মধ্যে সৌন্দর্যের মাত্রা যোজনা করা বিশেষণের কাজ। রবীন্দ্র-কবিতার বিশেষণগুলি সেই দায়িত্ব পালন করতে পেরেছে কিনা, এটাই এখন বিচার্য বিষয়।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সহজাত কাব্য-সংস্কার ও নবজাত কাব্য-রুচি বশে অল্প বয়স থেকেই এ কথা বুঝেছিলেন যে, বাস্তব জীবনে ও কবিজীবনে কথা বলতে গেলে বিশেষণের শরণাপন্ন হতে হয়। আমরা প্রত্যহ কথায় কথায় বলি— ভালো ছেলে, মিষ্টি মেয়ে, সুন্দর সকাল, স্নিগ্ধ সন্ধ্যা, গভীর রাত্রি, নীল আকাশ, অনেক সুখ, প্রচণ্ড দুঃখ ইত্যাদি ইত্যাদি। এই-সব বিশেষণের সাহায্যে আমরা মনের বিচিত্র ভাব প্রকাশ করে থাকি। রবীন্দ্রনাথ তা জানতেন এবং আরো জানতেন, পূর্বসূরীরা তাঁদের কবিতায় কী ধরনের বিশেষণচর্চা করে তাঁদের ভাবলোকের দ্বারোদ্‌ঘাটন করে গেছেন— বস্তু, ব্যক্তি, জাতি, ক্রিয়া ইত্যাদিকে বিশেষিত করে গেছেন। চিত্রজগৎ ও সৌন্দর্যজগৎ রচনায় তাঁদের ব্যবহৃত দোষগুণনির্দেশক শব্দ-উপাদান সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ অবশ্যই অবহিত ছিলেন।

বন থেকে এল এক টিয়ে **মনোহর**।

— ঈশ্বরগুপ্ত, "আনারস"

কি কাজ রঞ্জনে রাঙি কমলের দলে ?
নিজরূপে শশিকলা **উজ্জ্বল** আকাশে !

— মধুসূদন দত্ত, "মিত্রাক্ষর"

উটজ অঙ্গনে চলি, যেতেছে কুরঙ্গাবলী,
তরুপুঞ্জ-মূল **সিক্ত** জলে,
আসে যজ্ঞধেনুগণ, **প্রজ্বলিত** হুতাশন,
কিবা শোভা আশ্রম-সকলে ॥

— রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, "কুমারসম্ভব"

একদিন দেব **তরুণ** তপন দেখিলেন সুর-নদীর জলে,
অপরূপ এক কুমারী-রতন খেলা করে **নীল** নলিনী-দলে।

— বিহারীলাল চক্রবর্তী, "বঙ্গসুন্দরী"

হর্ম্যগণ **সুশোভন, উচ্চাকার** আয়তন
তোমা মত ছুঁয়েছে আকাশ।

— দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, "স্বপ্ন-প্রয়াণ"

এই-সব বিশেষণের প্রয়োগ রবীন্দ্র-পূর্ব যুগে যদি কিছুটা নতুন বলে মনে হয়েও থাকে, রবীন্দ্রনাথের সময়ে তা সমস্ত চাকচিক্য হারিয়ে নিতান্তই ঐতিহ্যগত শব্দ-সংস্কারে পরিণত হয়েছিল। অন্য সব কবির মতোই রবীন্দ্রনাথকেও সেই পূর্বাগত বিশেষণগুলি পূর্বসূরীদের কাছ থেকে হাত পেতে নিতে হয়েছিল ও অনিবার্য উত্তরাধিকার হিসেবে আমৃত্যু বহন করতে হয়েছিল।

তাই রবীন্দ্র-কবিতায় প্রথানুগত বিশেষণ প্রয়োগ যথেষ্ট পরিমাণে দেখা যায়। শিল্পী যখন সুন্দরের মূর্তি রচনা করেন অপরূপ স্বপ্ন-কল্পনায় বিভোর হয়ে, তখন তাঁকে প্রথাসিদ্ধভাবে কাদামাটি হাতে নিতে হয়। তেমনি রবীন্দ্রনাথ যখন চিত্ত-চমৎকারী কবিতাকল্পনালতা রচনা করেছেন তখন তাঁকেও প্রথাসিদ্ধভাবে বাংলা ভাষার প্রচলিত শব্দভাণ্ডারটি হাতে নিতে হয়েছে। সেই চলতি শব্দসম্পুট থেকেই তিনি তাঁর কবিতায় প্রথানুগত বিশেষণগুলি নিয়ে এসেছেন। তারা রবীন্দ্র-কবিতায় এসেছে কোনো নতুন জৌলুসের প্রতিশ্রুতি নিয়ে নয়— নিতান্তই চিত্ররচনার গতানুগতিক দায় নিয়ে। কবির চর্চিত প্রথানুগত বিশেষণগুলির কিছু নিদর্শন এখানে তুলে ধরছি—

মরিতে চাহি না আমি **সুন্দর** ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।
এই সূর্যকরে এই **পুষ্পিত** কাননে
জীবন্ত হৃদয় মাঝে যদি স্থান পাই।

—"প্রাণ", 'কড়ি ও কোমল'

আমার প্রিয়ার **মুগ্ধ** দৃষ্টি
করেছে ভুবন **নূতন** সৃষ্টি
মুচকি হাসির সুধার বৃষ্টি
চলেছে আজি জগৎ জুড়ে।

—"অতিবাদ", 'ক্ষণিকা'

গলির মোড়েই থাকে কান্তবাবু,
যত্নে-পাট-করা লম্বা চুল,
বড়ো বড়ো চোখ,
শৌখিন মেজাজ।

—"বাঁশি", 'পুনশ্চ'

দুর্গম তুষারগিরি **অসীম নিঃশব্দ** নীলিমায়
অশ্রুত যে গান গায়
আমার অন্তরে বার বার
পাঠায়েছে নিমন্ত্রণ তার।

—'জন্মদিনে' ৯

কিছু তার **অসমাপ্ত, অপূর্ণ** কিছু বা।
রোগীকক্ষে **নিবিড় একান্ত** পরিচয়
একাগ্র লক্ষ্যের চারি দিকে,
নূতন বিস্ময় সে যে
দেখা দেয় **অপরূপ** রূপে।

—'রোগশয্যায়' ১৮

এই চিহ্নিত বিশেষণগুলিকে সংশ্লিষ্ট বিশেষ্যগুলির সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে বোঝা যায়, এদের কোনোটিই অ-পূর্ব ও অ-ভাবিত প্রয়োগ হিসেবে রবীন্দ্রনাথের কবিতায় আসে নি। এই জাতীয় প্রথানুগত ও বহুচর্চিত বিশেষণের জ্যা টেনে কবি কোনো নতুন টংকার তুলতে পারেন নি। তবু তাদের বাদ দিয়ে রবীন্দ্র-কবিতার সম্যক্ রসাস্বাদ গ্রহণ সম্ভব নয়।

৬

আসলে কবিতা-প্রজননের চমৎকার অভিজ্ঞতা ও সৌন্দর্য-সৃজনের বিলক্ষণ সম্ভাবনা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের কবিতার প্রথাবিরোধী নতুন বিশেষণগুলি। এদের মধ্যে নিহিত আছে তাঁর কল্পনাসুন্দর কবিতাভুবন সৃষ্টির অন্যতম প্রধান উপাদান। সেই ঝকঝকে আনকোরা বিশেষণগুলিই আমাদের চিনিয়ে দেয় সেই সৃষ্টিক্ষম কবিকে যিনি অব্যর্থ শব্দসন্ধানের দ্বারা সৌন্দর্যের নতুন রাধাচক্র বিদ্ধ করতে জানেন।

রবীন্দ্রনাথ পূর্বসূরী মধুসূদন দত্ত, বিহারীলাল চক্রবর্তীর মতো 'যৌবনের' বিশেষণ হিসেবে 'নব', 'নবীন' ইত্যাদি ব্যবহার করেছেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আরো এগিয়ে গিয়ে লিখেছেন—

এখন কি মনে পড়ে সেই ব্যাকুলতা,
সেই **চিরপিপাসিত** যৌবনের কথা,

—"মোহ", 'কড়ি ও কোমল'

নব নব বর্ণময়ী মদিরার ধারা
তোমাদের **তৃষিত** যৌবনে ;...

—"ঋতুসংহার", 'চৈতালি'

পেলব যৌবন বাঁধি পরুষ বল্কলে
আলবালে করিতেছে সলিল সেচন।

—"তপোবন", 'চৈতালি'

রাগরক্ত কিংশুকে গোলাপে,
নিদ্রাহীন যৌবনের গানে।

—'বলাকা' ২৩

বন্দী যৌবনের দিন
আবার শৃঙ্খলাহীন

—"তপোভঙ্গ", 'পূরবী'

কেমনে গোপনে রাত্রিদিন
তরল যৌবনবহ্নি মজ্জায় রাখিয়াছিল ভবে।

—"মহুয়া", 'মহুয়া'

বুঝতে কষ্ট হয় না, রবীন্দ্রনাথ কবিজীবনের কৈশোরক পর্ব থেকেই প্রথানুগত বিশেষণের বাঁধাঘাট থেকে দূরে নোঙর ফেলতে চেয়েছেন, যদিও সে-কাজ খুব সহজসাধ্য ছিল না। বিশেষ্য 'যৌবনের' এই বিশেষণগুলির মধ্যে যতটা নূতনত্ব আছে, তার চেয়েও বেশি নূতনত্ব আছে তাঁর আরো অনেক বিশেষণ প্রয়োগের মধ্যে। যেমন—

কহিনু আমি, 'রেখো না ভয় মনে,
তনু দেহটি সাজাব তব আমার আভরণে।

—"সাগরিকা", 'মহুয়া'

মাঝখানটুকু ভরা থাক্
একটি নিরেট অশ্রুবিন্দু দিয়ে—
দুর্লভ, মূল্যহীন।

—"সাধারণ মেয়ে", 'পুনশ্চ'

ঊর্ধ্বে গিরিচূড়ায় বসে আছে ভক্ত, তুষারশুভ্র নীরবতার মধ্যে

—"শিশুতীর্থ", 'পুনশ্চ'

সাড়ে দশটা বেজে যায়,
তার পরে ঘরে এসে নিরালা নিঘুম অন্ধকার।

—"বাঁশি", 'পুনশ্চ'

স্বীকার করতেই হবে, এই চারটি উদ্ধৃতির চিহ্নিত বিশেষণগুলি গতানুগতিক ধূলিধূসর চেহারা নিয়ে আসে নি। তারা এসেছে সেই ঝকঝকে নতুন চেহারা নিয়ে যা কবিত্বের অচেনা দিগন্ত স্পর্শ করতে পারে। রবীন্দ্রনাথ এই ধরনের জ্যোতিষ্মান বিশেষণের সোনার কাঠি বাজিয়ে তাঁর কবিতার নিজস্ব জলতরঙ্গ সৃষ্টি করে গেছেন। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, বিশেষণ ব্যবহারের এর চেয়ে আরো অনেক বেশি বিপ্লব আনার দৃষ্টান্তও কবি রেখে গেছেন। সেই-সব ক্ষেত্রে কবি বিশেষণকে সংলগ্ন বিশেষ্য থেকে বিযুক্ত করে অসংলগ্ন বিশেষ্যের সঙ্গে যুক্ত ও সম্পর্কান্বিত করেছেন। বিশেষ্য-বিশেষণের যুগ্মজগৎ থেকে অভাবিত তাৎপর্য ও সৌন্দর্য নিষ্কাশিত করাই তাঁর সেই-সব অন্যাসক্ত বিশেষণ ব্যবহারের উদ্দেশ্য। উদাহরণ দিচ্ছি—

তব জনহীন ভবনে
থেকে থেকে আসে ব্যাকুল গন্ধ
নববসন্তপবনে।

—"ভগ্নমন্দির", 'কল্পনা'

এখানে 'চিত্ত' বা 'মনের' সংলগ্ন বিশেষণ 'ব্যাকুল' শব্দটি 'গন্ধের' ক্ষেত্রে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। ফলে 'ব্যাকুল' বিশেষণটি অন্যাসক্ত হয়ে পড়েছে।

অরুণ ঠোঁটে **তরুণ** ফোটে হাসি,
কাজল চোখে করুণ আঁখিজল,

—"যথাসময়", 'ক্ষণিকা'

'অরুণ' শব্দ বিশেষণ রূপে (আরক্ত অর্থে) 'নয়ন' বিশেষ্যের সঙ্গে ('অরুণ নয়ন') সাধারণত বসে, কিন্তু সেই সংলগ্ন বিশেষণটিকে এখানে অসংলগ্ন বিশেষ্য 'ঠোঁটের' সঙ্গে ব্যবহার করা হয়েছে। 'তরুণ' বিশেষণটির সংলগ্ন বিশেষ্য হচ্ছে 'যুবক', 'শিক্ষক', 'সন্ন্যাসী' ইত্যাদি ব্যক্তিবাচক শব্দ। কিন্তু সেই বিশেষণটিকে এখানে ব্যক্তিবাচক বিশেষ্য থেকে সরিয়ে এনে গুণবাচক বিশেষ্য 'হাসি'-র সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং এই দুটি হচ্ছে অন্যাসক্ত বিশেষণ ব্যবহারের উদাহরণ।

নামে সন্ধ্যা **তন্দ্রালসা**, সোনার আঁচল খসা
হাতে দীপশিখা,

—"অশেষ", 'কল্পনা'

'মানবীর' বিশেষণ 'তন্দ্রালসা'কে কবি এখানে অসংলগ্ন 'সন্ধ্যা' বিশেষ্যের সঙ্গে যুক্ত ও সম্পর্কান্বিত করেছেন।

চাহি' সেই দিগন্তের পানে
শ্যামশ্রী **মূর্ছিত** হয়ে নীলিমায় মরিছে যেখানে।

—'বলাকা' ২৫

এখানে 'মূর্ছিত' বিশেষণটিকে ব্যক্তিবাচক বিশেষ্য 'মানব' বা 'মানবীর' ক্ষেত্র থেকে গুণগত বিশেষ্য 'শ্যামশ্রীর' ক্ষেত্রে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

বিরহের কালোগুহা **ক্ষুধিত** গহ্বর থেকে
ঢেলে দিয়েছে **ক্ষুভিত** সুরের ঝর্না রাত্রিদিন।

—'পত্রপুট' ১২

'গহ্বর' কখনো 'ক্ষুধিত' হতে পারে না, 'সুর' হতে পারে না 'ক্ষুভিত'। ঐ শব্দদুটি নিশ্চিতভাবেই প্রাণী কিংবা মানুষের বিশেষণ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সেই দুটি বিশেষণ ভিন্নতর ক্ষেত্রে ব্যবহার করে কবিতায় নূতনত্ব সৃষ্টি করেছেন।

সুতরাং এই সিদ্ধান্ত অনিবার্য যে, প্রথানুগত বিশেষণের জের টেনেও রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে হাত পেতেছেন সেই প্রথাবিরোধী নতুন বিশেষণগুলির কাছে যাদের মধ্যে তিনি দেখতে পেয়েছেন সুকুমার কবিত্বের সৌন্দর্যসুধা। আর সেখানেই রবীন্দ্র-কবিতায় বিশেষণ প্রয়োগের প্রমূল্য নিহিত আছে।

কবি রবীন্দ্রনাথ : সমালোচকের দৃষ্টিতে

গোপিকানাথ রায় চৌধুরী

রবীন্দ্র-সাহিত্য যেমন এক অপার অতল সমুদ্র, তাঁকে ঘিরে সমীক্ষা-সমালোচনার প্রবাহও তেমনি বিপুল ও অনিঃশেষ। একেবারে আদি যুগের সেই ভাবোচ্ছ্বাস কিংবা নিন্দা-স্তুতির পর্ব থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ শতবর্ষেরও বেশি সময় ধরে যে-রবীন্দ্রচর্চা স্বদেশে ও বিদেশে হয়েছে— তা আয়তনে শুধু বিপুল নয়, দৃষ্টিভঙ্গির বৈচিত্র্যেও অনেকসময় বিস্ময়কর। বাংলাসাহিত্যের প্রতিটি শাখা— কবিতা, নাটক কথাসাহিত্য, প্রবন্ধকে রবীন্দ্রনাথ ফলবান্ পরিণত রূপ দিয়ে গেছেন। তাঁর সৃষ্টির এই-সব ধারাপ্রবাহ নিয়ে পৃথক্‌ভাবে নানা বিশ্লেষণী দৃষ্টিকোণ থেকে, এবং এদের সমবায়ে স্রষ্টার যে সামগ্রিক সারস্বত ব্যক্তিত্ব, তার অন্বেষণেও নানা আলোচনা শুরু হয়েছে। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, রবীন্দ্রজীবনী-মূলক বিচিত্র তথ্যভিত্তিক ও স্মৃতি-আলেখ্য-শ্রেণীর রচনার সংখ্যাও আজ আর নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর নয়।

এই বিপুল সংখ্যক গ্রন্থ বা আলোচনা-নিবন্ধের কোনো তথ্যনির্ভর পরিচয়দান বর্তমান প্রবন্ধের অন্বিষ্ট নয়। মুখ্যত কবি রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে যে আলোচনার ধারা আদিযুগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত অব্যাহত চলেছে, তার কয়েকটি তাৎপর্যপূর্ণ তরঙ্গের স্বরূপ-বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করতে প্রয়াসী হব এখানে। একশো বছরেরও বেশি সময় ধ'রে অজস্র লেখক-সমালোচক যে-সব মতামত রেখে গেছেন এই ক্ষুদ্রপরিসর নিবন্ধে তার কালক্রমিক ইতিহাস রচনা সম্ভব নয়, আমাদের তা উদ্দেশ্যও নয়। ফলে আমাদের আলোচনায় অনেক খ্যাতনামা সমালোচকের নাম কিংবা রচনা হয়তো উল্লিখিত হবে না। এর অর্থ কখনোই এ নয় যে, আমাদের চোখে তাঁদের সমালোচনার তেমন কোনো মূল্য বা গুরুত্ব নেই। স্বতন্ত্রভাবে তাঁদের রবীন্দ্রবীক্ষায় তথ্য কিংবা বিশ্লেষণের মূল্য হয়তো সংশয়াতীত। কিন্তু সবিনয়ে জানাই, সেই-সব বিশ্রুত রবীন্দ্র-সমালোচকের নিছক মূল্যায়নের জন্য এ প্রবন্ধ নয় ; সে সামর্থ্যও আমি আদৌ দাবি করি নে। আমি খুঁজতে চাইছি রবীন্দ্রকাব্য সমালোচনার এমন কয়েকটি অর্থবহ পর্যায় বা 'মাইলস্টোন', যাদের দিকে তাকালে বুঝতে পারি রবীন্দ্রকাব্য-সমীক্ষা-ধারার পরিবর্তনের তাৎপর্যকে, বুঝতে পারি কবি রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে সমালোচকদের চিন্তা ও চেতনার স্রোত কতদূর পর্যন্ত ও কোন্ পথে বয়ে এসেছে। এখানে উল্লেখ্য যে, আমাদের সমীক্ষা মুখ্যত বাংলা ভাষায় রচিত রবীন্দ্রসমালোচনামূলক নিবন্ধ ও গ্রন্থে সীমিত থাকবে।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসৃষ্টি নিয়ে সমালোচনার যে দীর্ঘপ্রসারী পথরেখাটি আমাদের চোখে পড়ে, বলা নিষ্প্রয়োজন, তার একেবারে সূচনাপর্বে পথিকৃৎ রূপে বিরাজ করছেন অজিতকুমার চক্রবর্তী। রবীন্দ্রসাহিত্য-সমালোচনার ক্ষেত্রে অজিতকুমারের ভূমিকাগত তাৎপর্য কেবল তাঁর রচিত প্রবন্ধ বা গ্রন্থের মধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে খুঁজলে পাওয়া যাবে না। তাঁর প্রকৃত মূল্যায়ন করতে গেলে তাঁকে দেখতে হবে তাঁর আত্মপ্রকাশের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে।

রবীন্দ্রনাথ তখন পঁয়তাল্লিশ বছরের পরিণত বয়ঃসীমায় পৌঁচেছেন। 'সোনার তরী'-'চিত্রা'র যুগ পেরিয়ে কবি এলেন 'কল্পনা'-'ক্ষণিকা' ও 'নৈবেদ্য'র পর্বে। সেটি ১৯০৬ খৃস্টাব্দের কথা। এর আগে রবীন্দ্রসমালোচনার যে-প্রেক্ষাপট— সেখানে দেখি বঙ্কিমানুসারী সমালোচকগোষ্ঠী রবীন্দ্রকাব্যের মূল্যায়নে নিযুক্ত। এঁদের মধ্যে ছিলেন কালীপ্রসন্ন ঘোষ, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ। এঁদের সামনে তখন বাংলা কাব্যরীতির আদর্শ— হেমচন্দ্রের

কবিতা। একদিকে বঙ্কিমচন্দ্রের সমাজবোধ ও নীতি-প্রভাবিত জীবনাদর্শ, অন্য দিকে হেমচন্দ্রের কাব্যাদর্শ— এই পটভূমিতে দাঁড়িয়ে পূর্বোক্ত সমালোচকবৃন্দ রবীন্দ্রনাথের কবিতার মর্মরস খুব গভীরভাবে গ্রহণ করতে না পারলেও তাকে যে আন্তরিক অভ্যর্থনা জানাতে পেরেছিলেন, এটি অবশ্যই তাঁদের প্রশংসনীয় গ্রহণ-ক্ষমতার পরিচায়ক।

কিন্তু এঁদের এই মনোভাব যতই প্রশংসার্হ হোক, এঁদের সমালোচনার মাপকাঠির সীমাবদ্ধতা কখনোই এঁদের রবীন্দ্রকাব্যের মর্মলোকে প্রবেশের অধিকার দেয় নি। সেই অধিকারের প্রথম প্রকাশ দেখি প্রিয়নাথ সেনের 'মানসী' সমালোচনায় (১৮৯৩) এবং পরে মোহিতচন্দ্র সেন -সম্পাদিত 'কাব্যগ্রন্থে'র (১৯০৩) ভূমিকা-প্রবন্ধে। রবীন্দ্রকাব্যকে যে পূর্বতন 'নিওক্ল্যাসিকাল' খণ্ডকাব্যের মানদণ্ডে বিচার করা সম্ভব নয়, এই নতুন কালের ব্যক্তিহৃদয়াশ্রিত সূক্ষ্ম অন্তর্মুখী কবিতার রসসৌন্দর্য উপলব্ধি করতে হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন মন নিয়ে— এই সত্য এঁদের লেখার মধ্য দিয়ে প্রথম আভাসিত হল।

কিন্তু এ আভাসমাত্র। এটি স্ফুটতর হল স্বয়ং কবির একটি রচনায়— 'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থের (১৯০৪) অন্তর্ভুক্ত রবীন্দ্রনাথের আত্মপরিচয়মূলক প্রবন্ধে, যেখানে তিনি বললেন, 'কাব্যেই কবির প্রকৃত জীবনী'। রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধির এই নিগূঢ় ইঙ্গিত গ্রহণ করার মতো উপযুক্ত মর্মজ্ঞ ব্যক্তি সেদিন বাঙালি পাঠকগোষ্ঠীর মধ্যে তেমন বেশি কেউ ছিলেন না। কেবল একজনই সেদিন কবির অতলগভীর চেতনার ব্যঞ্জনাময় অস্ফুট আলোর রেখা অনুসরণ করে বৃহত্তর পাঠকসমাজে আত্মপ্রকাশ করলেন বাংলাসাহিত্যে কবি রবীন্দ্রনাথের অনন্য আবির্ভাবকে বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে দৃঢ় সমর্থন জানাতে। তিনি অজিতকুমার চক্রবর্তী। তাঁর প্রথম তাৎপর্যপূর্ণ রচনা "কাব্যের প্রকাশ" (১৯০৬)। 'কাব্যের প্রকাশ'-এর প্রত্যক্ষ নয়, পরোক্ষ অবলম্বন রবীন্দ্রনাথ। প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথের নামোল্লেখমাত্র নেই, কিন্তু সমগ্র রচনাটির মধ্য দিয়ে বিচ্ছুরিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও ভাবজীবনের অন্তর্গূঢ় দ্যুতি। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে কাব্যের প্রকাশ যে নিছক বহিরঙ্গ জীবনের প্রকাশ নয়, তা যে গভীর ভাবের অভিব্যক্তি, বৃহৎ আইডিয়াধর্মী পরম রহস্যময় এক জীবনবোধের উন্মোচন— এ কথা এমন স্পষ্ট অথচ গভীর ভাবে কোনো সমালোচক এর আগে ব্যক্ত করেন নি।

'কাব্যের প্রকাশ' আকারে একটি ছোটো নিবন্ধ। কিন্তু একে উপলক্ষ করেই শুরু হল রবীন্দ্র-বিরোধিতার ঝড়। আসরে আবির্ভূত হলেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায় "কাব্যের অভিব্যক্তি" (১৯০৬) নিয়ে। "সোনার তরী" কবিতাটি বিশ্লেষণ করে দ্বিজেন্দ্রলাল অভিযোগ করলেন— রবীন্দ্রকাব্যের প্রধান ত্রুটি তার 'অস্পষ্টতা'। এর পর আরম্ভ হল দ্বিজেন্দ্রলালের মতের প্রতিবাদ এবং রবীন্দ্রনাথের কবিতায় তথাকথিত অস্পষ্টতার সপ্রশংস সমর্থন। যদুনাথ সরকার ও ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় একাধিক প্রবন্ধ লিখলেন। হেমচন্দ্রের কবিতার মানদণ্ডে রবীন্দ্রনাথকে বিচার করতে গেলে যে বিভ্রম অনিবার্য, যদুনাথ তাঁর এক প্রবন্ধে ("দুই রকম কবি : হেমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ") সেদিন এই সত্যটিকে তুলে ধরেছিলেন।

অস্পষ্টতার অভিযোগ করেই ক্ষান্ত হলেন না দ্বিজেন্দ্রলাল। 'চিত্রাঙ্গদা' অবলম্বন করে রবীন্দ্রকাব্যকে দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত করলেন "কাব্যে নীতি" প্রবন্ধে (১৯০৯)। সেই অভিযোগ নিয়েও বাদপ্রতিবাদের ঝড় উঠল। এতে অংশ নিলেন প্রিয়নাথ সেন, ললিত বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রমথ চৌধুরী।

দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যু ও রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি— এই দুই ঘটনাকে আশ্রয় করে ১৯১৩ খ্রস্টাব্দে রবীন্দ্রসমালোচনার এক তাৎপর্যপূর্ণ পর্বের সমাপ্তি ঘটল। সূচিত হল আরেক নতুন অভিযোগ নিয়ে বিতর্কের জোয়ার। এই অভিযোগ কাব্যে অস্পষ্টতা বা দুর্নীতি নিয়ে নয়, 'বাস্তবতা'র অভাব নিয়ে। বলা নিষ্প্রয়োজন, এই অভিযোগের মধ্যে আবহমান নীতি-দুর্নীতির প্রসঙ্গ নয়, বাস্তববাদের সমর্থনে নতুন কালের কণ্ঠস্বর শোনা গেল : "রবীন্দ্রকাব্য...কচিৎ বস্তুতন্ত্র হইয়াছে।" অর্থাৎ রবীন্দ্রসাহিত্যের সঙ্গে জীবনের যোগ নিতান্ত ক্ষীণ, তা 'মায়িক'। বিপিনচন্দ্র পাল ও রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের মতো মনস্বী লেখক এই বিরূপ সমালোচনার তীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ করলেন। বলা বাহুল্য, এর বিরোধিতাও শুরু হল প্রবল বেগে। 'বঙ্গদর্শন', 'প্রবাসী' ও 'সবুজপত্র' মুখর হয়ে উঠল এই বিতর্কের কোলাহলে।

অজিতকুমার রবীন্দ্রসাহিত্যে বাস্তবতার এই প্রশ্ন নিয়ে বিতর্কে নেমেছিলেন এই পর্যায়ের সূচনাপর্বে— ১৯১২

খৃস্টাব্দে। প্রবন্ধের শিরোনাম : "রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও দেশচর্যা কি বস্তুতন্ত্রতাহীন"। প্রবন্ধটি বিতর্কমূলক, কিন্তু কলহের তুচ্ছতা ও হীনতা থেকে মুক্ত। শান্ত দৃঢ় ভঙ্গিতে লেখক রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-ভাবনাকে এক বৃহৎ জীবনের পটে বিন্যস্ত করতে চাইলেন :

"রবীন্দ্রনাথের সমস্ত কাব্যজীবনের ভিতরকার তত্ত্বই আমরা দেখিলাম এই যে বরাবরই তিনি খণ্ড অনুভূতিকে বিশ্বানুভূতির দ্বারা পূর্ণ করিয়া লইয়াছেন, আপনার অবস্থাকে আপনি অতিক্রম করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।"

এই মন্তব্যের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে জীবনের গূঢ় বাস্তবতাবোধের প্রকৃত তাৎপর্য, তাঁর সহজাত উত্তরণ-ক্ষমতার স্বরূপটিকে ব্যক্ত করতে চেয়েছেন অজিতকুমার।

আর এই মনোভঙ্গিরই এক প্রসারিত রূপের অভিব্যক্তি ঘটেছিল এরই কাছাকাছি সময়ে প্রকাশিত বিশেষভাবে 'রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে। কেবল কলহ-বিতর্কের সংকীর্ণ ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন নি অজিতকুমার। এর ঊর্ধ্বে যে মহত্তর সামগ্রিক অন্বেষণ ও উপলব্ধির প্রয়াস, অজিতকুমার সেই সাধনাতেও আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তারই সাক্ষ্য বহন করছে তাঁর দুটি গ্রন্থ : 'রবীন্দ্রনাথ' এবং 'কাব্যপরিক্রমা'। এ দুটি রচনায় কোনো বিতর্ক নেই, কোনো বিরোধ-বিসংবাদ নেই। অন্য দিকে, কোনো অতিশয়িত ভক্তি বা অনুরাগজনিত প্রবল উচ্ছ্বাসও নেই, বরং শান্ত বিচারশীল রসজ্ঞ মন নিয়ে অজিতকুমার রবীন্দ্রনাথকে বুঝতে চেয়েছেন তাঁর দৃষ্টির সমগ্রতায়— তাঁর জীবনচেতনার বৃহৎ ব্যাপ্তিতে, অতল গভীরতায়।

'রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থ রবীন্দ্র-সাহিত্য-সমালোচনার আদি উৎস। কোনো সমকালীন জীবিত লেখককে-নিয়ে-লেখা সমালোচনাগ্রন্থ হিসাবেও এটি বাংলাসাহিত্যে পথিকৃৎ। গ্রন্থটিতে রবীন্দ্রকাব্যের সৌন্দর্যব্যাখ্যার তুলনায় তত্ত্বালোচনা বেশি, সন্দেহ নেই। কিন্তু মনে রাখতে হবে, সেদিনের প্রেক্ষাপটে এর প্রয়োজনই ছিল সর্বাধিক। রবীন্দ্রবিরোধীদের অন্যতম প্রধান বক্তব্য ছিল যে, এঁর কাব্য লঘু, তরল ভাবোচ্ছ্বাসে পূর্ণ কিছু বিচ্ছিন্ন কবিতার সমষ্টি। এর মধ্যে জীবনের প্রকৃত সত্য নেই। অজিতকুমার এই অপবাদের বিরুদ্ধে দৃঢ় প্রতিবাদ করে এটাই বলতে চাইলেন যে, প্রকৃত সত্য এর ঠিক বিপরীত। রবীন্দ্রনাথের সকল সৃষ্টির মধ্য দিয়ে এক গভীর ভাবজীবন ক্রমপরিণতি লাভ করেছে :

"বড় সাহিত্যিকের বা কবির সকল রচনার মধ্যে অভিব্যক্তির একটি অবিচ্ছিন্ন সূত্র থাকে ; সেই সূত্র তাহার পূর্বকে উত্তরের সঙ্গে গাঁথিয়া তোলে, তাহার সমস্ত বিচ্ছিন্নতাকে বাঁধিয়া দেয়।"[১]

রবীন্দ্রনাথের কবিতার ধারা অনুসরণ করে অজিতকুমার কবির সেই অন্তর্জীবনের 'অভিব্যক্তির অবিচ্ছিন্ন সূত্র'টিকে, তাঁর কবিসত্তার সমগ্ররূপকে সন্ধান করেছেন। এর ফলেই কাব্যবিশ্লেষণের চেয়ে কবির ভাবজীবন-সংক্রান্ত তত্ত্বালোচনা বেশি গুরুত্ব পেয়েছে তাঁর দুটি গ্রন্থেই। বস্তুত নিন্দা-স্তুতির ঊর্ধ্বে রবীন্দ্রনাথের যে মহৎ জীবনচেতনা ও শিল্পবোধ—রবীন্দ্র-বিরোধিতার ধূলিমলিন প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে তাকেই প্রকাশ করার এক ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছিলেন সেদিন সুধী সমালোচক অজিতকুমার চক্রবর্তী।

কাব্যের মধ্যে কবিমানসের সন্ধান, কবির ভাবজীবনের আলোয় তাঁর কাব্য-উপলব্ধির প্রয়াস, রবীন্দ্রনাথকে বিচ্ছিন্ন কিছু কবিতার রচয়িতারূপে না বিচার ক'রে তাঁর মধ্য দিয়ে পরিণামমুখী সমগ্রতাসন্ধানী এক কবিসত্তাকে আবিষ্কারের চেষ্টা— অজিতকুমার চক্রবর্তী তাঁর সংক্ষিপ্ত আয়ুষ্কালে, তাঁর নাতিবিস্তৃত আলোচনার মাধ্যমে পূর্বোক্ত দৃষ্টিভঙ্গির ইঙ্গিত রেখে গিয়েছিলেন, পরবর্তীকালে একাধিক বিদগ্ধ সংবেদী লেখকের সমালোচনায় তারই স্ফুটতর বিস্তৃততর ভাষ্যরূপ চোখে পড়ে। এঁদের মধ্যে অন্যতম বিশিষ্ট হলেন প্রমথনাথ বিশী। 'রবীন্দ্রকাব্য-প্রবাহ' (১৯৩৯), 'রবীন্দ্রকাব্য নির্ঝর' (১৯৪৬) ও 'রবীন্দ্রসরণী' (১৯৬২)— সব-ক'টি গ্রন্থের মুখ্য অন্বিষ্ট মূলত অজিতকুমারের সগোত্র। শ্রীযুক্ত বিশীও কবির ভাবজীবনের সঙ্গে তাঁর সৃষ্টিকর্মকে অন্বিত ক'রে রবীন্দ্রকাব্যের তথা কবিমানসের একটি তত্ত্বসূত্রের সন্ধান করেছেন। এ কথা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন রবীন্দ্রসরণী গ্রন্থের 'নিবেদন'-এ। সেই তত্ত্বভাবনাকে বাইরে থেকে হঠাৎ আরোপ করেন নি সমালোচক। তার একটি ক্রমিক ত্বরান্বিত উন্মোচন ঘটিয়েছেন কবির জীবন ও কবিপ্রকৃতির সম্পর্ক বিচারের মাধ্যমে।

কলিকাতা-শিলাইদহ-শান্তিনিকেতন—এই তিনটি ভূখণ্ড কেমন করে রবীন্দ্রনাথের কবি-ব্যক্তিত্বকে গঠন করেছে, তার বিশ্লেষণ আছে 'রবীন্দ্রসরণী'-তে। সমগ্র রবীন্দ্রকাব্য বিচারের ফলে প্রমথনাথ অজিত চক্রবর্তীর মতোই 'সীমার মধ্যেই অসীমের মিলন সাধন'কেই কবির কাব্যরচনার ধ্রুপদী সংকেত বলে সর্বশেষ সিদ্ধান্ত করেছেন। এখানে উল্লেখ্য যে উত্তরপর্বের সমালোচকদের মধ্যে শ্রীক্ষুদিরাম দাস যে বলেছেন, "রবীন্দ্রনাথের বিশুদ্ধ কবিসত্তা তার কবিস্বভাব বজায় রেখেও ধীরে ধীরে দার্শনিক সত্তায় লীন হয়ে গেছে"[২] এর মধ্যে অজিতকুমার-প্রমথনাথের চিন্তাপ্রবাহ লক্ষিত হলেও, শ্রীদাসের চিন্তার স্বাতন্ত্র্যও আদৌ দুর্লক্ষ্য নয়। রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালে তাঁর কাব্যসম্পর্কে সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য সমালোচনাগ্রন্থ নীহাররঞ্জন রায়ের 'রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা' (১৯৪১)। অজিত চক্রবর্তী ও পরে প্রমথনাথ বিশী রবীন্দ্র-সমালোচনার যে-ধারা বহন করে এনেছিলেন, নীহাররঞ্জন সেই ধারারই অনুগামী হয়েও কিছু স্বাতন্ত্র্যের স্বাক্ষর রেখেছিলেন। নীহাররঞ্জনও স্বীকার করেছেন রবীন্দ্রনাথের পক্ষে 'কাব্যসাধনাই তাঁহার জীবন-সাধনা'। রবীন্দ্রকাব্যকে অনুসরণ ক'রে তাঁর সেই ভাবজীবনের তথা পরিণামমুখী কবিমানসের অন্বেষণ করতে চেয়েছেন তিনি। তবে নীহাররঞ্জনের আলোচনা স্পষ্টত পূর্বসূরীদের তুলনায় অনেক বেশি কালানুক্রমিক। তিনি বলেছেন,"পরম্পরাগত ঐতিহাসিক সমগ্রতার অনুধ্যানই আমার লক্ষ্য।" আর এই ঐতিহাসিক সমগ্রতার সন্ধানেই তিনি রবীন্দ্রকাব্যকে 'দেশকালের পটভূমিকা'য় উপলব্ধি করতে চেয়েছেন।

পূর্বসূরীদের থেকে নীহাররঞ্জনের আরেকটি লক্ষণীয় স্বাতন্ত্র্য এই যে, তাঁর আলোচনায় তত্ত্বান্বেষণের প্রয়াস নেই। কারণ তাঁর মতে এই অন্বেষণ রবীন্দ্রকাব্যপাঠের প্রধান অন্তরায়— রবীন্দ্রকাব্যে "তত্ত্ব নাই... এ কথা আমি বলি না... কিন্তু সে তত্ত্ব অনুভূত প্রত্যয়মাত্র... কাব্যের বাহিরে তাহার কোনও সত্তা নাই।" নীহাররঞ্জন মনে করেন, কোনো বিশেষ তত্ত্বের দিক্ থেকে রবীন্দ্রকাব্য পাঠ করলে "পাঠকের সমগ্র দৃষ্টি তাহাতে ব্যাহত হয়, রসোপলব্ধির ব্যাঘাত হয়।" নীহাররঞ্জন তাঁর গ্রন্থে রসোপলব্ধির উপর অনেকখানি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সমালোচক হিসাবে তাঁর চূড়ান্ত স্বকীয় দৃষ্টি তাই 'রসগ্রাহী সৌন্দর্যবাদী'র দৃষ্টি— তত্ত্বান্বেষীর নয়। আর এই স্বাতন্ত্র্যের জন্যই রবীন্দ্র-সমালোচক হিসাবে নীহাররঞ্জনের দৃষ্টিভঙ্গি পৃথক্‌ভাবে উল্লেখযোগ্য।

রবীন্দ্রকাব্য-সমালোচনার ক্ষেত্রে এক স্বতন্ত্র ধারা প্রবর্তনের প্রয়াসী হলেন কবি মোহিতলাল। প্রথম জীবনে দীর্ঘদিন ধরে কাব্যরচনা করেছেন। সেই সুদীর্ঘ কাব্যসাধনায় তাঁর জীবনদৃষ্টির স্বাতন্ত্র্য-চিহ্ন স্পষ্ট মুদ্রিত হয়েছে। পরিণত বয়সে যখন রবীন্দ্র-সমালোচনায় অবতীর্ণ হলেন, তখন সেখানেও পরিস্ফুট হল তাঁর দৃষ্টির স্বকীয়তা। 'রবি-প্রদক্ষিণ' গ্রন্থের ভূমিকায় মোহিতলাল পূর্বসূরীদের প্রদর্শিত কবিমানসের পরিচয় উদ্‌ঘাটনের প্রয়াসের নিন্দা করেছেন। তাঁর কাছে রবীন্দ্রনাথের 'ব্যক্তিধর্মে'র চেয়ে 'কবিধর্ম এবং 'কবিমানসের পরিচয় সাধন'-এর চেয়ে 'কাব্যসৃষ্টির লক্ষণ বিচার'-ই বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে। আর সেই লক্ষণসমূহের অনুপুঙ্খ বিচারে তিনি প্রবৃত্ত হয়েছিলেন জীবনের-শেষ পর্বে। কিন্তু তার আগে তিনি নিজেও রবীন্দ্রনাথের কবিমানসের স্বরূপ সন্ধানে ব্যাহত হয়েছেন— দেশকালের, বিশেষত উনিশ শতকের নবযুগের প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের ক্রমবিকাশের বিশ্লেষণে প্রয়াসী হয়েছেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর 'রবি-প্রদক্ষিণ' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত "রবীন্দ্রকাব্যে কবিপুরুষ", "বাংলার নবযুগ ও রবীন্দ্রনাথ" প্রবন্ধ এবং 'বাংলার নবযুগ' গ্রন্থ উল্লেখনীয়।

বস্তুত রবীন্দ্রকাব্য-পর্যালোচনার মোহিতলালের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রচনা 'কবি রবীন্দ্র ও রবীন্দ্রকাব্য'— দুইখণ্ড (১৯৪৯ ও ১৯৫২)। মোহিতলালের সঙ্গে তাঁর প্রিয় সমালোচক ম্যাথু আর্নল্ড-এর দৃষ্টিস্বাতন্ত্র্য এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। আর্নল্ড কবিজীবনের আলোয় বিচার করতে চেয়েছেন সাহিত্যকে। কিন্তু মোহিতলাল এ ক্ষেত্রে ভিন্নমতে বিশ্বাসী : "কবির ব্যক্তিধর্ম যেমনই হোক তাঁহার সেই ব্যক্তিজীবনের ভাবনাচিন্তা সংশয়বিশ্বাস যেমনই হোক, সেই সকলের ভাষ্যরূপে কবিতাপাঠ করিব না।"[৩]

তাঁর সেই কবিতাপাঠের পরাদর্শ ব্যক্ত হয়েছে পূর্বোক্ত দুখণ্ড গ্রন্থে। 'সঞ্চয়িতা'র কবিতাগুলিকে উপলক্ষ করে "গীতিকবি রবীন্দ্রনাথের কবিকল্পনা ও কাব্যকলার পরিচয় দান"-ই লেখকের অভীষ্ট। এই 'পরিচয়দান' সূত্রে মোহিতলাল

বলেছেন যে, তিনি মুখ্যত কাব্যপাঠই করবেন, কবিকে পাঠ করবেন না।

অস্কার ওয়াইল্ড বলেছিলেন সমালোচনা হল, 'more creative than creation'।[৪] এলিয়টও মনে করতেন যে, সকল সফল শিল্পীই হতে পারেন সমালোচক।— এই-সব মন্তব্যের আলোয় মোহিতলালের রবীন্দ্রকাব্যপাঠের প্রয়াসকে বিচার করলে বুঝতে পারি যে, কবি মোহিতলালই কবিতা-সম্ভোগ করেছেন। কবি-সমালোচক রবীন্দ্র-কবিতার 'ক্রিয়েটিভ প্রসেস'-কে উন্মোচন করতে চেয়েছেন আপন সৃষ্টিশীল কবিসত্তার সহায়তায়। শুধু এ-ই নয়, বলা চলে রবীন্দ্রকাব্য-সমালোচনায় 'প্র্যাক্‌টিক্যাল ক্রিটিসিজ্‌মে'র সূচনা হল এই গ্রন্থেই। এ ধরনের সমালোচনার বৈশিষ্ট্য হল "close study of particular works"। যে 'নিউ ক্রিটিসিজ্‌মে'র ধারা একালে পশ্চিমী দেশে দেখা দিয়েছে, তার বৈশিষ্ট্যও প্রসঙ্গত স্মরণীয়। তা হল, "a specifically literary criticism as distinguished from a study of sources or of social backgrounds..."[৫]

এই নব্য সমালোচনারীতিতে কবিতার গঠনরীতি বিচারের উপর গুরুত্ব সর্বাধিক, কবি-মন বা কবি-ব্যক্তিত্বের উপর তেমন নয়।

বলা নিষ্প্রয়োজন, মোহিতলালের আলোচ্য দুখণ্ডে এ ধরনের বৈশিষ্ট্যের পরিচয় মেলে। কিন্তু তবু স্বীকার করতেই হয় যে, মোহিতলাল নিজে যেহেতু কবি, এবং সেই কবিস্বভাবের মধ্যে রোম্যান্টিক প্রবণতা অবশ্যই ছিল, তাই তাঁর ঐ ধরনের সমালোচনায় এক মিশ্র মনোভঙ্গি ও রীতির উদ্‌ভব হয়েছে। সে রীতি তাঁরই নিজস্ব। তাই এখানে এক-একটি কবিতার কাব্য ভাষা ও রীতি -সংক্রান্ত আলোচনার পাশাপাশি গীতিকবিতাটির গূঢ় মর্ম-সৌন্দর্যের পরিচয় উন্মোচিত করেছেন রোম্যান্টিক কাব্যরসিক মোহিতলাল। তিনি এই পদ্ধতিতেই রবীন্দ্রকাব্যের অন্তর্লোকে প্রবেশলিপ্সু পাঠকের সহযাত্রী হতে চেয়েছেন। মোহিতলাল হয়তো রবীন্দ্রকাব্য বিচারের এই পদ্ধতিতে সম্পূর্ণ সফল হন নি। সার্থকতর ভাবে হয়তো উত্তরকালে আরো কেউ কেউ এই পদ্ধতি নিয়ে নিরীক্ষা করেছেন। কিন্তু নিঃসন্দেহে পথিকৃতের গৌরব তাঁরই।

রবীন্দ্রকাব্য যে-সব সমালোচকের দৃষ্টির প্রতিফলনে নতুন নতুন মাত্রা পেয়েছে, তাঁদের মনন চেতনা ও অনুভবের আলোয় বিচিত্র সৌন্দর্যে উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠেছে বিভিন্ন কালপর্বে— তাঁদের ব্যক্তিসত্তার মধ্যে মৌলিক একটি পার্থক্য চোখে পড়ে। একশ্রেণীর সমালোচক সাধারণত মননজীবী অধ্যাপক। আরেক ধরনের ভাষ্যকার নিজেরাই কবি। তাঁরাও অবশ্যই মননজীবী এবং অনেকক্ষেত্রে তাঁরাও শিক্ষাব্রতী, কিন্তু পূর্বোক্ত শ্রেণীর লেখকদের সমালোচনা যেখানে অনেকাংশে 'অ্যাকাডেমিক' তথা বিশ্লেষণ-নির্ভর, শেষোক্ত শ্রেণীর আলোচনার প্রেরণা সেখানে মুখ্যত স্বীয় জীবনদৃষ্টি ও সৌন্দর্যচেতনা।

বুদ্ধদেব বসু থেকে এই আলোচনা ধারার সুস্পষ্ট সূচনা। মোহিতলাল নিজে বিশিষ্ট কবি ছিলেন সন্দেহ নেই। কিন্তু যখন তাঁর রবীন্দ্র-সমালোচনা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, তখন কাব্যরচনার সৃষ্টিশীল জগৎ থেকে তিনি অনেকখানি সরে এসেছেন। অর্থাৎ সৃষ্টিশীল মনের প্রত্যক্ষ অনুভব তখন কিছুটা স্তিমিত। কিন্তু বুদ্ধদেব, ও পরে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে এবং আরো পরে শঙ্খ ঘোষ যখন রবীন্দ্রকাব্য নিয়ে আলোচনা করছেন— তখন তাঁরা নিজেরাও সৃষ্টিকর্মে পুরোপুরি নিমগ্ন। রবীন্দ্রনাথের কাব্যালোচনার মধ্য দিয়ে তাঁদের কবিসত্তার একধরনের আত্মসমীক্ষা ঘটছে, রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়নের সঙ্গে সঙ্গে নিজেদেরও পট-পরিবেশ, সৃজনশীল সত্তা ও সামর্থ্যেরও পরিমাপ করে চলেছেন গোচরে ও অগোচরে। সেই সূত্রে গূঢ় সংঘাত ঘটছে এই-সব আধুনিক কবির দ্বিধান্বিত দৃষ্টির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মতো কবি-'অগ্রজের অটল বিশ্বাসে'র। আর এভাবেই একালের রবীন্দ্র-সমালোচনায় যুক্ত হয়েছে নানা নতুন মাত্রা। সব মিলিয়ে তাই বলা চলে, আধুনিক কবিদের সঙ্গে রবীন্দ্রকাব্যের 'ইনভল্‌ভ্‌মেন্ট' একটু আলাদা ধরনের— প্রথাবদ্ধ বা আবহমান রবীন্দ্র-সমালোচনা-ধারার ঠিক অনুরূপ নয়।

আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন দেখি যে, তরুণ বুদ্ধদেব 'প্রগতি'র পৃষ্ঠায় (১৯২৭-৩০) রবীন্দ্রসাহিত্যের তীক্ষ্ণ সমালোচনা করছেন। এই-সব সমালোচনা আসলে স্বীয় জায়মান তরুণ কবিসত্তার বিক্ষুব্ধ প্রতিবাদী মনের অভিব্যক্তি।

বস্তুত ১৯৫২ খৃস্টাব্দে লেখা "রবীন্দ্রনাথ ও উত্তর সাধক" নিবন্ধে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বুদ্ধদেবের যে বক্তব্য— "তাঁর কাব্যে বাস্তবের ঘনিষ্ঠতা নেই, সংরাগের তীব্রতা নেই, নেই জীবনের জ্বালাযন্ত্রণার চিহ্ন, মনে হলো তাঁর জীবন-দর্শনে মানুষের অনতিক্রম্য শরীরটাকে তিনি অন্যায়ভাবে উপেক্ষা করে গেছেন।"[৬]—এর পূর্বাভাস পেয়েছি 'প্রগতি'র কাছাকাছি সময়ে লেখা 'জয়ন্তী উৎসর্গে'র (১৯৩১) অন্তর্গত "রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতা" প্রবন্ধে। স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়তো বাহুল্য মাত্র যে, সময়টা 'বিদ্রোহী কল্লোল'-এর ঠিক পরবর্তী।

ক্রমশ সেই মন পরিণতি পেয়েছে 'কবিতা' পত্রিকায় (১৯৩৫ থেকে) প্রকাশিত রবীন্দ্রকবিতা-সংক্রান্ত প্রকীর্ণ সমালোচনায়। সেই-সব আলোচনায় বিক্ষুব্ধ তারুণ্যের দ্রোহবুদ্ধি স্তিমিত, মন ও মনন অপেক্ষাকৃত পরিণত। সহজেই অনুমেয় তরুণ কবির ব্যক্তিগত মানসপ্রতীতি সেই বিচারে মুখ্য ভূমিকা পেয়েছে। আরেকটি বিশিষ্টতাও চোখে পড়ে সেখানে। দেখতে পাই, বুদ্ধদেব রবীন্দ্রনাথের কবিতাকে মুখ্যত শিল্পরীতির চোখ দিয়ে নিরীক্ষণ করছেন। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এর কিছুদিন আগেই সাহিত্যবিচারে এই শিল্পরীতি বা 'রূপ'-এর বিশেষ ভূমিকার কথা স্বীকার করেছেন— "রসসাহিত্যে বিষয়টা উপাদান, তার রূপটাই চরম।" ("সাহিত্যরূপ" (১৯২৮)— 'সাহিত্যের পথে') অবশ্য দুজনের দৃষ্টিভঙ্গি নিশ্চয় সমধর্মী নয়। রবীন্দ্রনাথ বিষয় ও আঙ্গিককে সর্বদাই অচ্ছেদ্য মনে করেছেন— দু'য়ের সমন্বিত সামগ্রিক প্রকাশই তাঁর একমাত্র কাম্য। কিন্তু বুদ্ধদেব সেখানে নিছক আঙ্গিক বিচারেই তৃপ্ত থাকেন, বলা বাহুল্য, সে বিচার প্রায়শই অত্যন্ত প্রশংসার্হ। এক যথার্থ সৌন্দর্যসন্ধানী 'ইস্থেট'-এর দৃষ্টিসম্পন্ন বুদ্ধদেবকেও তখন অস্কার ওয়াইল্ডের মতো এই বক্তব্যে আস্থাশীল মনে হয় : "Form is everything. It is the secret of life."[৭] বুদ্ধদেবের এই পর্যায়ের রবীন্দ্রকাব্য-সমীক্ষায় প্রাধান্য পেয়েছে ছন্দ, মিল, কাব্যভাষা, চিত্রকল্প, স্তবকবিন্যাসরীতি কিংবা সাংগীতিক মাধুর্য নিয়ে পর্যালোচনা

'কবিতা' পত্রিকায় রবীন্দ্রকাব্য বিচারে যে প্রযুক্তি-প্রবণতার পরিচয় দিয়েছেন বুদ্ধদেব, অনেকদিন পরে প্রকাশিত 'সঙ্গ নিঃসঙ্গতা রবীন্দ্রনাথ'-এর কোনো কোনো নিবন্ধে সেই একই প্রবণতা চোখে পড়ে। 'মানসী'-সংক্রান্ত লেখায় ও "রবীন্দ্রনাথের উপমা" নিবন্ধে যথাক্রমে কবিতায় ছন্দ-মিল সৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের আশ্চর্য নৈপুণ্য এবং উপমাপ্রধান কবি না হয়েও উপমাসৃষ্টিতে ('উপমা' অর্থে বুদ্ধদেব উপমা, উৎপ্রেক্ষা, চিত্রকল্প, এমন-কি প্রতীক বোঝাতে চেয়েছেন) তাঁর অনন্যতার দিকটি তুলে ধরেছেন লেখক।

কবিতা-পত্রিকার খণ্ড-আলোচনা এবং 'সঙ্গ নিঃসঙ্গতা রবীন্দ্রনাথ'-এর এই-সব প্রযুক্তি-প্রবণ সমীক্ষা থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, ১৯৩৫-এর পর থেকেই বুদ্ধদেব রবীন্দ্রকাব্য বিচারে এক নতুন মাত্রা যোগ করলেন। অজিতকুমার চক্রবর্তীর যুগ থেকে দীর্ঘদিন প্রায় একটানা কবির ভাবজীবনের পর্যালোচনাই হয়ে এসেছে। পরবর্তী পর্যায়ে যে বিরলসংখ্যক সমালোচক রবীন্দ্রকাব্য বিচারের ক্ষেত্রে এই দৃষ্টিকোণ প্রয়োগ করতে চেয়েছেন, বুদ্ধদেব তাঁদের মধ্যে অন্যতম বিশিষ্ট।

কিন্তু বুদ্ধদেবের রবীন্দ্রকাব্যে সৌন্দর্য-অন্বেষা কেবল প্রকরণে সীমাবদ্ধ থাকে নি। তা প্রবেশ করতে চেয়েছে ভাবের গভীরেও। ইয়েট্‌সের সেই বিখ্যাত সূত্র "যা কিছু কবিতা নয়, তা থেকে কবিতাকে মুক্তি দিতে হবে" — সেটিকে রবীন্দ্রকাব্যের ভাবসৌন্দর্য-উন্মোচনে প্রয়োগ করতে চেয়েছেন বুদ্ধদেব। এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় মেলে তাঁর ক্ষুদ্রায়ত গ্রন্থ 'কবি রবীন্দ্রনাথ' (১৯৬৬)-এ। বুদ্ধদেব বলেছেন,

•"সারত ও সর্বোপরি, রবীন্দ্রনাথ একজন গীতিকবি··· তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতা অধিকাংশই আকারে ছোটো অথবা তা কাব্যসংগীত।"[৮]

গীতিকবিতা বিচারের মধ্য দিয়েই কবিমনের গতি প্রকৃতির রহস্য খুঁজতে চেয়েছেন বুদ্ধদেব। শেষ অবধি গিয়ে পৌঁচেছেন গীতাঞ্জলি পর্বে। এখানে রবীন্দ্রকবিতার এক বিস্ময়কর অথচ ভাবগভীর রসসিদ্ধি ঘটেছে বলে বুদ্ধদেবের বিশ্বাস। 'গীতাঞ্জলি'র প্রধান গুণ যা তাঁর চোখে পড়েছে তা হল এর সংগতি বা অখণ্ডতা। এই আশ্চর্য সংবদ্ধ গীতিকবিতাগুলিতে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন ঈশ্বর চেতনার সঙ্গে কবিতার সৌন্দর্য ও রহস্যবোধের সমন্বয়। যে কাব্যকে প্রমথনাথ বিশী রবীন্দ্রকাব্যের মূলধারার অঙ্গীভূত নয় বলে প্রথম জীবনে উপেক্ষা করেছিলেন, তা বুদ্ধদেবের কবিদৃষ্টিতে

অর্থবহরূপে উদ্‌ভাসিত : "'গীতাঞ্জলি'তে পরমের জন্য আকাঙ্ক্ষা যেমন প্রবল, তেমনি গভীর মানবজীবনের স্বীকৃতি ; এর জন্যেই এর আবেদন এমন সার্বিক" ।[৯]

বুদ্ধদেবের রবীন্দ্র-সমীক্ষা এইখানে এসে থেমে গেছে। 'বলাকা' কিংবা তার উত্তরপর্বের অধিকাংশ কাব্য সম্পর্কেই যথেষ্ট উৎসাহ বোধ করেন নি তিনি। বস্তুত এক শুদ্ধ শিল্পসৌন্দর্যময় জগৎ ছিল তাঁর অন্বিষ্ট। সম্ভবত তাঁর মনে হয়েছে, 'বলাকা'য় ও তৎপরবর্তী অধিকাংশ কাব্যে এই বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের মায়াবী ইন্দ্রজাল ঝাপসা হয়ে এসেছে, সেখানে ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব পেয়েছে স্বদেশ ও বিশ্বের নানা জটিল সমস্যা ও সংক্ষোভ। তবু স্বীকার করতেই হয় যে রবীন্দ্রসমীক্ষার ক্ষেত্রে বুদ্ধদেবের এই পরিধিগত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও তাঁর সমকালীন কবিদের মধ্যে কেউই তাঁর মতো এত নিবিষ্ট চিত্তে ও এত দীর্ঘকাল ধরে রবীন্দ্রকাব্যের ভাববস্তু ও শিল্পরূপের আলোচনা করেন নি। অবশ্য ঐ-সব কবিরা সকলেই বুদ্ধদেবের মতো রবীন্দ্রকাব্যের উত্তুঙ্গ মহিমায় গভীরভাবে আস্থাশীল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সংক্রান্ত আলোচনার চেয়ে এঁদের কাছে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নিজেদের সম্পর্ক নির্ধারণ— 'আধুনিকতার অগ্রদূত' হলেও যে রবীন্দ্রনাথকে তাঁদের বিশ্বাস ও চেতনা থেকে অনেক দূরবর্তী মনে হয়, যিনি একই সঙ্গে তাঁদের অগ্রজ ও চিরায়ত এক কবি, অন্য দিকে তাঁদেরই সমকালীন। এই দ্বন্দ্ব-বোধের মধ্য দিয়ে তাঁরা আধুনিকতার চেতনার প্রেক্ষাপটে খোঁজেন একই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে এবং আপন কবিসত্তাকে।

এঁদের মধ্যে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের রবীন্দ্রকাব্য সম্পর্কিত আলোচনার পরিমাণ ও গুরুত্ব দুইই অপেক্ষাকৃত বেশি। বিশ্বাসের দিক থেকে সুধীন্দ্রনাথ রবীন্দ্র-জগৎ থেকে নিঃসন্দেহে দূরবর্তী হলেও আধুনিক বাংলা কবিতায় রবীন্দ্রনাথের ছন্দ ও কাব্যভাষার প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে তিনি বিশেষভাবে অবহিত। 'কুলায় ও কালপুরুষ' গ্রন্থের (১৯৫৭) বিভিন্ন প্রবন্ধ এর সাক্ষ্য দেবে। রবীন্দ্রনাথের গদ্যছন্দ সুধীন্দ্রনাথ নিজে গ্রহণ করেন নি, কিন্তু এর বিশদ আলোচনা প্রসঙ্গে আধুনিক কাব্যচর্চায় এর ভূমিকা, এই গদ্যপদ্যের বিরোধ-মীমাংসার প্রয়োজন তিনি যথার্থ উপলব্ধি করেছিলেন।

সময়ের বিচারে এঁদের পরবর্তী পর্যায়ে এলেন আবু সয়ীদ আইয়ুব। আইয়ুব নিজে কবি নন। দর্শন ও বিজ্ঞানের কৃতী ছাত্র। কিন্তু তাঁর মধ্যে বৈজ্ঞানিকের যুক্তিনিষ্ঠা, দার্শনিকের গভীর সামগ্রিক দৃষ্টির সঙ্গে কবিজনোচিত প্রগাঢ় রসগ্রাহিতার এক বিস্ময়কর সংশ্লেষ ঘটেছিল। আইয়ুব রবীন্দ্রকাব্য সমীক্ষার প্রচলিত পথে চললেন না। রসশাস্ত্র বা নন্দনতত্ত্বের সূত্র মিলিয়ে কাব্যসৌন্দর্যবিচার বস্তুত তাঁর অন্বিষ্ট নয়। তিনি রবীন্দ্রনাথকে দেখতে চাইলেন আধুনিককালের চিন্তা ও চেতনার প্রেক্ষাপটে। চিনতে চাইলেন তাঁকে জীবনদৃষ্টির সমগ্রতায়— ভালোমন্দ শুভ-অশুভ মঙ্গল-অমঙ্গল সব আপাত-বিপরীতের সমাহারে যে জীবন, জীবনের যে বহুবিচিত্র পথ— সেই পথের সঙ্গীরূপে।

বিশ শতকের পঞ্চাশের দশক থেকে বিশেষভাবে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে একটি প্রধান অভিযোগ উঠেছে : জগতের অশুভ কদর্য বীভৎস রূপটা রবীন্দ্রনাথের চোখে ঠিকমতো ধরা দেয় নি। রোম্যান্টিক ভাবালুতায় তিনি সব-কিছু অত্যন্ত শুভ ও সুন্দর করে দেখেছেন।

আইয়ুব মুখ্যত এই অভিযোগটি মনে রেখেই 'আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ' বইটি লিখেছেন। তিনি দেখাতে চেয়েছেন, অমঙ্গলের চেতনা রবীন্দ্রকাব্যের বিভিন্ন পর্যায়ে কীভাবে কখনো সংকুচিত, কখনো সম্প্রসারিত হয়েছে এবং শেষ পর্বের কাব্যরচনায় তা কত গভীর ও পরিব্যাপ্ত হয়ে উঠেছে। অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে এ-ও তাঁর প্রতিপাদ্য যে, প্রধানত এরই পরিণামে কবি রবীন্দ্রনাথের বিশ্বনিরীক্ষা ও জীবনবোধ কেমন করে পর্যায়ক্রমে পরিবর্তিত ও পরিণত হয়ে উঠেছে। এই পরিণতি হল, শ্রেয়োবোধের সমুন্নত স্তরে অমঙ্গলবোধের আত্যন্তিকতার উত্তরণ। 'পান্থজনের সখা' গ্রন্থেও কবির এই মঙ্গলচেতনায় বিশ্বাসের প্রশ্ন গভীরভাবে আলোচিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের জীবনগত যা-কিছু উপলব্ধি, তা কোনোদিনই অনড় তত্ত্বমাত্র নয়, তা এক পান্থজনের বৈচিত্র্যময় গতিশীল চেতনা-উপলব্ধির রূপ। আর তাই রবীন্দ্রনাথ আইয়ুবের কাছে এক তত্ত্বান্বেষী কবিমাত্র নন, তাঁর মতো অনেক জীবনসন্ধানী 'পান্থজনে'র পরম প্রিয় 'সখা'-ও বটে।

রবীন্দ্রকাব্যের যে ধরনের সমালোচনায় আমরা অভ্যস্ত, আগেই বলেছি, 'আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ' সে ধরনের সমালোচনাগ্রন্থ নয়। বইটি আসলে এক বিতর্কের মনোভাব থেকে লেখা। আধুনিক কবিদের অনেকেরই গুরুস্থানীয় হলেন বোদলেয়র। ইনিই বিশ্বসাহিত্যে রোম্যান্টিকতার অবসান ঘটিয়ে অমঙ্গলবোধের অভিঘাত আনলেন। বোদলেয়রকে বলা হয়, "প্রথম কাউন্টার-রোম্যান্টিক ও কাব্যে আধুনিকতার পথিকৃৎ"।[১০] আধুনিক কবিদের চোখে তাই বোদলেয়র-প্রবর্তিত জগৎ সম্পর্কে বিতৃষ্ণা ঘৃণা ও বিবমিষার মনোভাবই যথার্থ আধুনিকতার লক্ষণ। আর সেই কারণেই শ্রেয়োনীতিতে বিশ্বাসী রবীন্দ্রনাথ তাঁদের চোখে যথেষ্ট আধুনিক নন।

আইয়ুব তাঁর রবীন্দ্র-সমীক্ষায় এই বিতর্কের মুখোমুখি হয়েছেন সুদৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে। তাঁর রবীন্দ্রকাব্য-বিশ্লেষণে প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর অসামান্য ধীশক্তি, গভীর রসবোধ ও পরিণত দার্শনিক দৃষ্টি। এই সমীক্ষা শেষ পর্যন্ত নিছক এক বিতর্কের জবাবে সীমিত থাকে নি, এর মধ্য দিয়ে রবীন্দ্র-কাব্য এক প্রসারিত নূতন মাত্রা পেয়েছে— যার মধ্যে আছে কবির জীবন-দৃষ্টির সঙ্গে তাঁর কবিতার ভাষার নিবিড় সাযুজ্য-রহস্য। যেখানে স্থান পেয়েছে রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর-অনুভব ও মানবচেতনার বিচিত্র নিগূঢ় দিক্।

রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্বের কবিতা সম্পর্কে আরেকটি বিতর্কমূলক সমালোচনার উল্লেখ করা চলে। একালের বিশিষ্ট কবি-সমালোচক শঙ্খ ঘোষ রবীন্দ্রনাথের শেষ দশবছরের কবিতা সম্পর্কে সর্বদা তেমন সপ্রশংস হন নি ('নিঃশব্দের তর্জনী' দ্রষ্টব্য)। তাঁর মনে হয়েছে এই পর্বের কবিতায় সর্বত্র কোনো 'অনিবার্যতা অনুভব' করেন না পাঠক। এই পর্বের অসংখ্য কবিতায় "খুব অল্প কয়েকটি কথাকেই কত বিশদ অজস্রতায় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বোঝাতে"[১১] চেয়েছেন কবি। যার ফলে 'প্রথম দিনের সূর্য'-এর মতো দ্যুতিময় হীরকখণ্ড কিছু থাকলেও, অনেক কবিতাই আসলে স্খলিত রচনা।

কিন্তু শেষ পর্বের কবিতা সম্পর্কে আইয়ুবের মত প্রায় সম্পূর্ণ আলাদা। তিনি মনে করেছেন এই পর্বে রবীন্দ্রপ্রতিভা 'অমোঘ' ও 'দুঃসাহসিক'। এখানে তিনি প্রচলিত গণ্ডি ভাঙতে চেয়েছেন। "পদ্যে এনেছেন গদ্যের ঋজুতা, গদ্যে জাগিয়েছেন পদ্যের স্পন্দন। বোধিকে করেছেন বেদনাময়, তত্ত্বকে করেছেন প্রাণস্পন্দিত।"[১২] এই পর্বের কবিতার আগেকার যে-কোনো পর্বের কবিতার প্রেক্ষিতে নিঃসন্দেহে উন্নতমানের।

আধুনিক কালের মননজীবী সমালোচকদের এ ধরনের বিতর্কের এক বিশেষ সার্থকতা আছে। মতের এই বিরোধ রবীন্দ্র-সমালোচনার প্রথম যুগের নিন্দা-স্তুতির মতো স্থূল বিরোধ নয়। রবীন্দ্রনাথের অনন্য প্রতিভায় এঁদের শ্রদ্ধা, সংশয়ের অতীত। তাই এঁদের বিপ্রতীপ ভাবনার বিদগ্ধ উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রকাব্য সমালোচনা এক বিশেষ তাৎপর্য পায়— পাঠকের চেতনা কবিতা সম্পর্কে নানা গূঢ় মৌলিক জিজ্ঞাসায় উচ্চকিত হয়ে ওঠে।

এখানে একটি কথা বলা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ষাটের দশকের শেষ পর্বের এই বিতর্কের পাশে যদি সত্তরের দশকের শেষ দিকে লেখা শঙ্খ ঘোষের 'নির্মাণ আর সৃষ্টি'র দৃষ্টিভঙ্গি আর বক্তব্যকে রাখি, তা হলে হয়তো শঙ্খবাবুর রবীন্দ্রসমীক্ষার এক পূর্ণায়ত ছবি ফুটে উঠবে। সেখানে তিনি 'প্রান্তিক' থেকে 'শেষ লেখা' পর্যন্ত পাঁচখানি কাব্যগ্রন্থে কবির "সত্তা চৈতন্যের উপলব্ধি"র যে "সামগ্রিক প্রতিমা"কে প্রত্যক্ষ করেছেন, তা রবীন্দ্রসমীক্ষার এক অসামান্য দিক্‌কে উন্মোচিত করে। শেষ পর্বের রবীন্দ্রনাথের এই লোকোত্তর মূর্তি কবি-সমালোচকের শব্দচিত্রে আত্মপ্রকাশ করেছে অপরূপ মহিমায়।

রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে এই আলোচনা-বিতর্কের কোনো শেষ নেই। শেষ হবেও না। তবে শতাব্দীর সূচনাপর্বের বিতর্কের সঙ্গে আধুনিক মননজীবীদের বিতর্কের তুলনা করলেই রবীন্দ্র-সমীক্ষার বিবর্তনের স্বরূপ বহুলাংশে পরিস্ফুট হবে। অজিত চক্রবর্তী থেকে রবীন্দ্রকাব্যের যে অর্থবহ সমালোচনার ধারা চলতে শুরু করেছে, কালে কালে সেই ধারা স্ফীততর ও গভীরতর হয়েছে, বিচিত্র মনন চিন্তা ও চেতনার সংস্পর্শে ফুটে উঠেছে তার বহুমাত্রিক রূপ। এক সার্বভৌম

কবি-ব্যক্তিত্বের উপর অজস্র দৃষ্টিকোণের আলো এসে পড়েছে— শুধু ভাববাদী নয়, বস্তুবাদী দ্বান্দ্বিক দৃষ্টি ; শুধু কন্টেন্ট-আশ্রিত নয়, ফর্ম-কেন্দ্রিক দৃষ্টি, নিছক 'অ্যাকাডেমিক' নয়, রোম্যান্টিক ও ইম্প্রেশনধর্মী— এমনি অজস্র দৃষ্টিভঙ্গির আলোকপাত ঘটেছে রবীন্দ্রসৃষ্টির মর্মলোকে। কোনো দৃষ্টিভঙ্গিই একেবারে নিরর্থক বা নগণ্য নয়, উপেক্ষণীয়ও নয়— এই-সব আপাত-খণ্ডিত, অনেক ক্ষেত্রে আপাত-বিরোধী ভাষ্যের মধ্য দিয়েই ক্রমাগত উন্মোচিত হতে থাকবে রবীন্দ্রনাথের কবিতার বহুবিচিত্র নিহিত মাত্রা, তাঁর কবিচেতনার নানা অজানা প্রচ্ছন্ন ভূখণ্ড। আর সেই সব-কিছুর সমবায়ে আমাদের দৃষ্টির সামনে জেগে উঠবে তাঁর অনন্য কবিসত্তার এক সামগ্রিক পরিচয়।

উল্লেখপঞ্জী

১ "নিবেদন", 'রবীন্দ্রনাথ' (১৩৫৩)
২ 'রবীন্দ্র প্রতিভার পরিচয়' (দ্বিতীয় প্রকাশ), পৃ· ৩৪০
৩ 'কবি রবীন্দ্র ও রবীন্দ্রকাব্য' (১ম খণ্ড, ১ম সং), পৃ· ৶·
৪ *The Critic as Artist* Part II : Intentions, p. 352
৫ *Princeton Encyclopaedia of Poetry and Poeties* Ed. A Preminger, 1974, p. 568
৬ 'সাহিত্যচর্চা', ১৯৮১, পৃ· ১২৬
৭ *The Critic as Artist* Part II : Intentions, p. 341.
৮ 'কবি রবীন্দ্রনাথ', ১৯৬৬, পৃ· ১২
৯ তদেব, পৃ· ৮৯
১০ আবু সয়ীদ আইয়ুব, 'আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ', ১৯৮৩, পৃ· ৪
১১ 'নিঃশব্দের তর্জনী', ১৩৮৪, পৃ· ৭৪
১২ 'আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ', ১৯৮৩, পৃ· ১৫৯।

বিজয়ী নবীন রাজা

উজ্জ্বলকুমার মজুমদার

রবীন্দ্রনাথ যখন ছোটোবেলায় কালিদাসের কুমারসম্ভব-কাব্য অনুবাদ করেন তখন শিক্ষক জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্যের কাছে প্রথম তিন সর্গ পড়বার পরই অনুবাদ করেছিলেন। প্রথম সর্গের হিমালয় বর্ণনা, উমার জন্ম ও রূপ বর্ণনা এবং উমার শিবসেবা, দ্বিতীয় সর্গে ব্রহ্মার প্রতি দেবতাদের বন্দনা, তারকাসুর উৎপীড়ন এবং অসুরনিধনে ব্রহ্মার উপায় নির্দেশ, তৃতীয় সর্গে মদনের নিয়োগ, রুদ্রের তপোবনে অকালবসন্ত, শিবসেবায় উমার আগমন এবং মদন-ভস্ম— এইটুকুর মধ্যে বারো-তেরো বছরের রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করেছিল, এবং নিশ্চয় মদনভস্মের ঘটনা যা পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি-দর্শনের কাব্যিক সত্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কুমার-প্রসঙ্গ ছোটোবেলাকার কুমারসম্ভব পাঠে কবির মনে তেমন করে গেঁথে যায় নি। পরে যখন তিনি "কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা" প্রবন্ধ লিখলেন বঙ্গদর্শনে, ১৩০৮ সালের পৌষ সংখ্যায়, তখন এই কাব্যের গভীর মর্মার্থে তিনি যে সৌন্দর্যের সঙ্গে কল্যাণের অচ্ছেদ্য সম্পর্ক লক্ষ্য করলেন তা আমরা দেখেছি। কিন্তু এর বছর-পাঁচেক আগে জমিদারি-সংক্রান্ত ব্যাপারে (১৮৯৬ সালের মাঝামাঝি) রবীন্দ্রনাথ যখন সাজাদপুরে গেছেন তখন তিনি কালিদাস পড়ছেন, ঋতুসংহার, মেঘদূতের ওপর সনেট লিখছেন। 'মানসী' কাব্যের "মেঘদূত" ও "অহল্যার প্রতি" (১৮৯০ সালের ৭-৮ জ্যৈষ্ঠ ও ১১-১২ জ্যৈষ্ঠ) কবিতায় ক্লাসিক্যাল সাহিত্যের নিখুঁত ছবি-আঁকার পর এই প্রথম নতুন করে কালিদাস-পাঠ। কিন্তু 'চৈতালি'-তেই প্রথম পেলাম "কুমারসম্ভব গান" নামে ছোটো একটি সনেট। সেখানে কবিকল্পনায় কালিদাস দেব-দম্পতিকে কুমারসম্ভব গান শোনাচ্ছেন। প্রমথরা চার দিকে ঘিরে রয়েছেন। পর্বতশিখরে সন্ধ্যায় শান্ত মেঘস্তর নেমে এসেছে। বিদ্যুৎলীলা স্তব্ধ। মেঘে গর্জন নেই। আর 'কুমারের শিখী করি পুচ্ছ অবনত/ স্থির হয়ে দাঁড়াইলা পার্বতীর পাশে/ বাঁকায়ে উন্নত গ্রীবা।' দেবী যখন গান শুনতে শুনতে লজ্জায় চোখের পাতাটি নামালেন, কবিও যেন তখন গান অসমাপ্ত রেখে থেমে গেলেন। এখানে কুমারের যে শিখীটিকে দেখা গেছে তা মেঘদূতের অব্যর্থ স্মারক। সে বর্ণনায় ভবানী স্কন্দের বইটিকে 'পুত্র প্রেমণা কুবলয়দল প্রাসি কর্ণে করোতি' এবং সেই ময়ূরটি 'ধৌতাপাঙ্গং হরশশিরুচা পাবকেস্তং ময়ূরং' বলেই তাকে গুরুগর্জনে নাচাতে হবে। যাই হোক, এখনো 'কুমার' রবীন্দ্রনাথের কাছে বিশেষ তাৎপর্যে প্রতীকের মর্যাদা পায় নি।

প্রথম প্রতীকী তাৎপর্য 'কুমার' বা 'কিশোর' উদ্‌ভাসিত হয়ে এল "বর্ষশেষ" কবিতায়, ১৩০৫ সালে ৩০শে চৈত্রের এক ঝড়ের দিনে। কবিতাটির মধ্যে বৈশাখী ঝড়ের অসাধারণ বর্ণনা পাই, পুরোনো ও নতুন বছরের সন্ধিক্ষণে। প্রথম দুটি স্তবকে দিনান্তের আকাশে অন্ধবেগে ধাবিত নীলাঞ্জন পুঞ্জমেঘের ছবি এবং জীবজগতে তার প্রতিক্রিয়া। তৃতীয় স্তবকে প্রাকৃতিক শক্তির পেছনে কোনো অদৃশ্য বীণাতন্ত্রীর ঝঙ্কার-ঝঞ্জনা, সুরের মধ্যে নির্দয় হৃদয়াঘাতের প্রবল প্রাচুর্য। ঝড় যেন ধাবমান গান। চতুর্থ স্তবকে কালবৈশাখীর ভয়ংকর নৃত্যের পদাঘাতে পুরোনো সব সঞ্চয় ধুলো হয়ে উড়ে যাচ্ছে। পঞ্চম স্তবকে সেই ভয়ংকর শক্তিকে মুক্তদ্বার আত্মহৃদয়ে আহ্বান। ঝড় যেন জাগ্রত চিত্তে মঙ্গল নির্ঘোষ। ষষ্ঠ স্তবক থেকে সেই প্রাকৃতিক শক্তির রূপান্তর— 'সদ্যস্নাত ঋজু শুভ্র মুক্ত জীবনের জয়ধ্বনিময়।' সপ্তম স্তবকে সে শক্তি যেন পিপাসাবিদ্ধ প্রশান্তি আনছে। অষ্টম স্তবকে সে 'বিজয়ী রাজা'— 'রথচক্র ঘর্ঘরিয়া এসেছ বিজয়ীরাজসম'। নবম স্তবকে সেই নিষ্ঠুর 'নূতন'কে কবির প্রণতি। এবং দশম স্তবকে সেই শক্তিই হয়ে দাঁড়াল 'কুমার'—

তোমারে প্রণমি আমি, হে ভীষণ, সুস্নিগ্ধ শ্যামল,
অক্লান্ত অম্লান।
সদ্যোজাত মহাবীর, কী এনেছ করিয়া বহন
কিছু নাহি জান।
উড়েছে তোমার ধ্বজা মেঘরন্ধ্র-পুত তপনের
জ্বলদর্চিরেখা—
করজোড়ে চেয়ে আছি উর্ধ্বমুখে, পাড়িতে জানি না—
কী তাহাতে লেখা।

সদ্যোজাত কুমার তার পতাকায় মেঘান্তরালবর্তী সূর্যের জ্বলন্তশিখা নিয়ে হাজির। বৈদিক সূক্তে অগ্নির প্রতিশব্দরূপে 'কুমার' শব্দের প্রয়োগ এই মুহূর্তে মনে পড়বে। মনে পড়বে, কঠোপনিষদে নচিকেতা-কুমারের উপাখ্যানে কুমারের রহস্যময় রথটিকে। মনে পড়বে, পৌরাণিক কুমারের পূর্ণতারুণ্য এবং ঔজ্জ্বল্য, কুমার-অগ্নি মোটিফের একটি বিশেষণ চিত্রশিশু, the wonderful babe। মনে পড়বে, মহাভারতের স্কন্দের জন্মবৃত্তান্তে চতুর্দিনের সূর্যদীপ্ত অস্ত্রনিক্ষেপকারী শিশুর কথা। কিংবা, ছান্দোগ্য উপনিষদে সনৎকুমার— স্কন্দ-মোটিফে চিরকৌমার্যের (the eternal youth) কথা।

কিন্তু "বর্ষশেষ" কবিতার কুমার-মোটিফে নতুনত্ব এই, কুমার এখানে একাধারে বিধ্বংসী ও নতুন সৃষ্টিশক্তি— প্রাকৃতিক ও জৈবিকশক্তি— কবি-প্রতিভার এক প্রলয়ান্তকারী সৃষ্টি-শক্তি। তাই ঝড় রূপান্তরিত হয়ে গেল 'বিজয়ী রাজা'য় যে রাজার অন্তরাল থেকে উদ্ভিন্ন হল 'সদ্যোজাত মহাবীর' কুমার। তাই দেখি, বর্ষশেষের ঝঞ্ঝার মধ্যে কবি কুমারকেই আহ্বান করছেন :

হে কুমার, হাস্যমুখে তোমার ধনুকে দাও টান
ঝনন রণন,
বক্ষের পঞ্জর ভেদি অন্তরেতে হউক কম্পিত
সুতীব্র স্বনন।
হে কিশোর, তুলে লও তোমার জয়ভেরী,
করহ আহ্বান।
আমরা দাঁড়াব উঠি, আমরা ছুটিয়া বাহিরিব,
অর্পিব পরান।

কুমার-কিশোর-মোটিফ রবীন্দ্রকাব্যে এই প্রথম বৈশাখী ঝড়ের ছদ্মবেশে এসে পুরোনো ক্ষয়িত জীবনকে ঠেলে ফেলে দিয়ে নতুন সৃষ্টির অঙ্কুর জাগিয়েছে নতুন বৃষ্টিধারা এনে। কুমার এখানে অনেকটা অ্যাডোনিসের মতো vegetative god, জায়মান উদ্ভিদ জগতের দেবতা। শেলী তাঁর "Ode to the West Wind" কবিতায় এই ধরনেরই এক পৌরাণিক শক্তি— Maenad-এর প্রসঙ্গ টেনেছেন তুলনার সূত্রে। অনেকেই "বর্ষশেষ" এবং "ওড টু দি ওয়েস্ট উইন্ড"-এর তুলনা করেন। কিন্তু তুলনার ব্যাপ্তিটা যে কতখানি তা বোঝা যায় এই Maenad ও কুমারের তুলনা করলে। Maenad প্রকৃতি-পুরাণে এমনই ঝড়বৃষ্টির প্রতীক যা ভূমির উর্বরতা শক্তি আনে। শেলির ওডের মধ্যে প্রাসঙ্গিক ছবিটি লক্ষ্য করা যেতে পারে : "Loose clouds.../ Angels of rain and lightning! there are spread / On the blue surface of thine airy surge./ Like the bright hair uplifted from the head / Of some fierce Maenad."। বর্ষশেষের কুমার ঝড়-ঝঞ্ঝা-বৃষ্টির মধ্য দিয়ে যে নতুন জীবনের আহ্বান আনছে 'নবাঙ্কুর ইক্ষুবনে'ই তার ইঙ্গিত আছে। এখানে কৌমার্য-শক্তি সেই উর্বরতারই ইঙ্গিত দিচ্ছে।

আরো লক্ষণীয়, এই কুমার-কিশোর একাধারে যেভাবে ধ্বংস-সৃষ্টির লীলায় মেতেছে (শেলীর ওডের মধ্যেও রয়েছে : Destroyer and Preserver, hear, O hear!) তার সঙ্গে জন্মদাতা ভৈরব-রুদ্রের বা নটরাজ-মহেশ্বরের ক্রিয়াকলাপের পার্থক্য অন্তত রবীন্দ্রকাব্যে নেই। "বর্ষশেষ" রবীন্দ্রনাথের যে কাব্যের অন্তর্ভুক্ত সেই কল্পনা-কাব্যেরই "বৈশাখ"-কবিতায় কবি বলেছেন : "জ্বলিতেছে সম্মুখে তোমার/ লোলুপ চিতাগ্নিশিখা, লেহি লেহি বিরাট অম্বর/ নিখিলের পরিত্যক্ত মৃতস্তূপ বিগত বৎসর/ করি ভস্মসার।/ চিতা জ্বলে সম্মুখে তোমার।' বর্ষশেষের ঝড়কে ডেকে যেমন কবি বলেছিলেন : 'শঙ্খের মতন তুলি একটি ফুৎকার হানি দাও/ হৃদয়ের মুখে।', যার 'সাম-মন্ত্রসম বেদধ্বনি'-কে মনে হয়েছিল 'নাহি তাহে দুঃখ সুখ পুরাতন পাপ পরিতাপ। কম্প লজ্জা ভয়', বৈশাখের রৌদ্ররূপে দীপ্তচক্ষু সন্ন্যাসীকে তেমনি ডেকে বলেছেন, 'দুঃখসুখ আশা ও নৈরাশ/ তোমার ফুৎকার ক্ষুব্ধ ধুলাসম উড়ুক গগনে।' বর্ষশেষের কুমার-কিশোর যেন ভৈরব নটরাজের ক্ষুদ্র সংস্করণ। একই সক্রিয়তায় এই দুটি পৌরাণিক শক্তি-চরিত্র একাধারে প্রকৃতি ও জীবনের রূপান্তরের মৌলিক শক্তি-প্রতীক। রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব প্রকৃতি-পুরাণে দুই ঋতুর সন্ধিক্ষণে নবীন জীবনচেতনার প্রতীক। নটরাজকে আমরা এই মুহূর্তে আপাতত ঋতু-পরিবর্তনের শক্তি রূপেই দেখব। আপাতত গ্রীষ্ম-বর্ষার সন্ধিক্ষণেই পাচ্ছি এই দুটি শক্তিকে।

২

"বর্ষশেষ" কবিতায় বিজয়ী রাজার রূপে যে বৈশাখী এসেছিল পুরাতন জীর্ণতাকে ভেঙে-চুরে নতুনকে আহ্বান করতে, সেই নবীন আগন্তুকই রবীন্দ্রনাথের গানে 'নবীন রাজা' হয়ে এসেছে। বসন্তের গানে তাই নবীন রাজার আবির্ভাব। কুমার তো বৈদিক-পরবৈদিক-মহাকাব্যের যুগ থেকেই যৌবন বা কৌমার্যের প্রতীক। বসন্ত ঋতু তো রবীন্দ্রনাথের কাব্যে-নাটকে গীতিনাট্যে যৌবনদূত। তাই বসন্তের সঙ্গে কুমারের মৌলিক সম্পর্ক। এবং, মদনের সঙ্গেও। তাই বসন্তে নবীন রাজা কখনো অদৃশ্য, অস্পষ্ট, কিন্তু অবধারিত প্রেরণা, কখনো স্পষ্ট বিস্ময়কর তার অগ্নিময় উপস্থিতি।

পুরাতনকে বিদায় দিলে না যে ওগো নবীন রাজা।
শুধু বাঁশি তোমার বাজালে তার পরান-মাঝে ওগো নবীন রাজা।

"বর্ষশেষে" কুমার ধনুকের টংকার-ঝঞ্ঝনা বাজিয়েছিল, বাজিয়েছিল জয়ভেরী, এখানে নবীন রাজা বাজিয়েছেন বাঁশি। তাতে কবির চিত্তবীণা সুরে সুর মিলিয়েছে :

তোমার মালা দিলে গলে খেলার ছলে হায়—
তোমার সুরে সুরে তাহার বীণা বাজে ওগো নবীন রাজা।

কুমার আবার রঙও এনেছে। যৌবনের রঙ, বসন্তের রঙ : 'তোমার রঙে দিলে তুমি রাঙিয়া ও তোর আঙিয়া ওগো নবীন রাজা।' অগ্নি-সংশ্লিষ্ট কুমার (ঋগ্বেদে 'কুমার' 'অগ্নির'ই প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত। দ্রষ্টব্য ৫ : ২) তো অগ্নিবর্ণের সঞ্চারই ঘটাবেন। এখানে আবার মদনের সঙ্গেও কুমার-কিশোরের একাত্মতা ঘটেছে। বসন্তের যৌবন-উদ্‌বোধনের সূত্রে নবীন রাজা, কুমার-কিশোর, নবীন-পান্থ একাধারে মদন ও কুমারের যৌথরূপ। 'ফাল্গুনী' নাটকের (১৩২১) চতুর্থ দৃশ্যের গীতিভূমিকায় নবীন রূপের গানে কীভাবে মদন ও কুমার-প্রতীক একাত্ম হয়ে গেছে তার একটি উদাহরণ দিই :

এতদিন যে বসেছিলেম পথ চেয়ে আর কাল গুণে
দেখা পেলেম ফাল্গুনে।
বালকবীরের বেশে তুমি করলে বিশ্বজয়
একি গো বিস্ময়।
অবাক্ আমি তরুণ গলার গান শুনে ॥

গন্ধে উদাস হাওয়ার মতো উড়ে তোমার উত্তরী,
কর্ণে তোমার কৃষ্ণচূড়ার মঞ্জরী।
তরুণ হাসির আড়ালে কোন্ আগুন ঢাকা রয়—
একি গো বিস্ময়।
অস্ত্র তোমার গোপন রাখো কোন্ তূণে।

'ফাল্গুনী'র গীতিভূমিকায় ঠিক এর আগে প্রবীণ-নবীনের বোঝাপড়ার গানেও বলা হয়েছে :

এবার তো যৌবনের কাছে
মেনেছ, হার মেনেছ ?
—মেনেছি।...
লুকিয়ে তোমার অমর-পুরী
ধুলা-অসুর করে চুরি,
তাহারে আজ মরণ-আঘাত হেনেছ ?
হেনেছি।

এই 'নবীন' বসন্ত হতে পারে, সমস্ত সৃষ্টি-শক্তির প্রতীক কামদেবও হতে পারে, কিন্তু সে যদি অমরপুরী দীর্ণ করবার শক্তিকে বা ধুলা-অসুরকে মরণ-আঘাত হেনে থাকে তবে সে নিশ্চয় 'কুমার'ও বটে, অসুরধ্বংসী কুমার। এই নাটকেই অন্ধবাউল যে নবীনের আবির্ভাবকে উপলব্ধি করতে পেরে গেয়ে উঠেছে : 'হবে জয়, হবে জয়, হবে জয় রে/ ওহে বীর হে নির্ভয়।' এখানেও কুমারকেই আহ্বান, কিংবা কুমার-মদনের মিশ্ররূপকে অর্থাৎ বীরপ্রেমকেই আহ্বান।

"মদনভস্মের পূর্বে" কবিতায় মদনের তূণের কথা আছে : "শূন্য হলে তোমার তূণ বাছিয়া ফুলমুকুলে/ সায়ক তারা গড়িত গোপনে।" হাসির কথা আছে : "হাসিয়া যবে তুলিতে ধনু প্রণয়ভীরু ষোড়শী/ চরণে ধরি মিনতি।" কিংবা "এসো চতুর মধুর হাসি তড়িৎসম সহসা।" কাজেই কুমারের মতো মদনের এই তূণধারী হাস্যমুখ ছবি এখানেও আছে। কিন্তু 'বালকবীরের বেশে তুমি করলে বিশ্বজয়' এ পঙ্‌ক্তিটি অবশ্যই বিশ্বজয়ী প্রেমের দেবতা মদনেরই অবধারিত ব্যঞ্জনা। কিন্তু বালকবীর ? এই বিশেষণটি সর্বজয়ী মদনের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হতে বাধা নেই ঠিকই, কিন্তু বর্ষশেষ কবিতায় যে নবীন কিশোর উদার জয়ভেরী বাজিয়েছে, বীণাতন্ত্রের ঝঙ্কার শুনিয়েছে, 'বজ্রমন্ত্র' শুনিয়েছে, সেই সদ্যোজাত মহাবীর সপ্তদিবসেই 'পরিণত' বীর স্কন্দ-কার্তিকেয়ের সঙ্গে বেশি মাত্রায় ঘনিষ্ঠ বলে মনে হয়। বালক-বীর যে কুমারেরই নামান্তর তা 'বনবাণী'তে কয়েকটি গানে আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। গ্রীষ্মের তৃষিতা প্রিয়ার কাছে ঐশ্বর্যময় আগমনীর মধ্যে বালকবীরের ছবি আছে

ওই বুঝি আসে আকাশে অবকাশে
সমারোহ তার বিস্তারি।
বিজয়ী সে বীর ও রে ভয়ভীতা
যাবে তোর ভয়, ও রে পিপাসিতা
তৃষা হতে দিবে নিস্তারি।

—"আষাঢ়', 'বনবাণী'।

তেমনি আবার শরতের আগমনীর মধ্যেও রয়েছে। শরৎকালের মেঘমুক্ত পরিবেশে বর্ষার কালো আবরণ ভেদ করে তরুণ আলো ফুটেছে অর্থাৎ অশুভকে জয় করেছে যে শুভশক্তি, কুমার সেই শুভশক্তির প্রতীক। শারদা বা দুর্গার পুত্র হিসেবে কুমার দানবরূপী অন্ধকারকে বিনাশ করতে উদ্যত :

শরৎ এনেছে অপরূপ রূপকথা
নিত্যকালের বালকবীরের মানসে
নবীন রক্তে জাগায় চঞ্চলতা—
বলে চলো চলো, অশ্ব তোমার আনো-সে।
ধেয়ে যেতে হবে দুস্তর প্রান্তরে
বন্দিনী কোন্ রাজকন্যার ঘরে
মায়াজাল ভেদি চলে সে রুদ্ধ ঘরে
লও কার্মুক, দানবের বুকে হানো-সে।

এই দানবহন্তা অশুভ-শক্তি-নাশী বালকবীর হলেন কুমার স্কন্দ, মদন নয়। এই কুমার পুরাণে, মহাকাব্যে এবং কালিদাসের কাব্যে অসুরনাশী বলে বন্দিত হয়েছেন। রঘুবংশের চতুর্থ সর্গে রঘুর দিগ্বিজয়-সূত্রে শরৎকালের উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে :

রাজ্যে শান্তি স্থাপনের পর রঘু একটু সুস্থির হলে তাঁর কাছে দ্বিতীয় রাজ-লক্ষ্মীর মতো পদ্মলক্ষণ শরৎ এল। ১৪ রিক্ত বৃষ্টি লঘুমেঘ পথে মুক্ত করে দেওয়ায় রঘুর এবং সূর্যের দুঃসহ প্রতাপ একই সঙ্গে দশদিকে ছড়িয়ে পড়ল। ১৫ ইত্যাদি।

মেঘদূতের পূর্বমেঘে (শ্লোক ৪৪) আছে :

রক্ষাহেতোর্নবশশিভৃতা বাসবীনাং চমূনাং। সত্যাদিত্যং হুতবহমুখে সম্ভৃতং তদ্ধি তেজঃ।

দেবগিরিতে নিয়ত-বসতি যে স্কন্দ তাকে পুষ্পবর্ষণে স্নান করাতে বলা হয়েছে, যে স্কন্দকে মহাদেব ইন্দ্রসেনারক্ষার জন্যে অগ্নির মধ্যে সূর্যাতিক্রমী তেজ নিক্ষেপ করে জন্ম দিয়েছিলেন। তাই শরতের ওই গানের মধ্যেই পাচ্ছি :

ওরে, শারদার জয়মন্ত্রের গুণে
বীর গৌরবে পার হতে হবে সাগরে।
ইন্দ্রের শর ভরি নিতে হবে তূণে—
রাক্ষসপুরী জিনে নিতে হবে, জাগো রে।

এখানে রাক্ষসপুরী জয়োদ্যত বীর গৌরবান্বিত যে দেবতাকে ইন্দ্রশরে তূণ ভরে নিতে বলা হয়েছে সে যে ইন্দ্র-সম্মানিত বৈদিক মহাকাব্যিক এবং ক্লাসিকাল সাহিত্যেরই স্কন্দ-কুমার সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। এবং কুমার যে এখানে কালোর প্রতিস্পর্ধী আলোর প্রতীক তাও এই কবিতাটির প্রথম স্তবকের শেষ চারটি লাইনে স্পষ্ট :

গেল খুলি গেল মেঘের ছায়ার দ্বার,
দিকে দিকে ঘোচে কালো আবরণ-ভার,
তরুণ আলোর মুকুট পরেছে তার—
বিজয়শঙ্খ বেজে ওঠে তাই ত্রিলোকে।

'শরৎ' কবিতাটির ঠিক পরের কবিতাটিই 'নটরাজ'। এখানেও শরতের নীলাকাশের হাতছানির মধ্যে কুমারেরই মালিন্যমুক্তির দৈত্যজয়ী অভিযানী মনোভাব :

'দেবী শারদার যে প্রসাদ শিরে লয়ি
দেবসেনাপতি কুমার দৈত্যজয়ী,
সে প্রসাদখানি দাও গো অমৃতময়ী'—
এই মহাবর চরণে তাঁহার মাগো রে।

এই মহাবর প্রার্থনার উদ্দেশ্যও স্পষ্ট :

আজি আশ্বিনে স্বচ্ছ বিমল প্রভাতে
  শুভ্রের পায়ে অম্লান মনে নমো রে।
স্বর্গের রাখী বাঁধো দক্ষিণ হাতে
  আঁধারের সাথে আলোকের মহাসমরে।

কাজেই দেব-দানবের সংগ্রাম এক অর্থে আঁধার-আলোর সংগ্রাম, কুমার সেই আঁধার-জয়ী আলো। আবার এভাবেও হয়তো ব্যাখ্যা করা অন্যায় হবে না যে, যে নটরাজের নৃত্যের ছন্দে ঋতুর দল নেচে নেচে পৃথিবীকে মুক্ত ও নবীন করে দিচ্ছে। জরাকে অবিরাম রূপান্তরিত করছে যৌবনে, সেই নটরাজেরই এক রূপ হল 'কুমার', যে উমা-মহেশ্বরের দাক্ষিণ্য পেয়ে তিমির-হন্তা রূপে অশুভ মালিন্য দূর করে নতুন যৌবনের আলো নিয়ে আসছে ধরিত্রীর বুকে। নইলে এই 'নটরাজ' কবিতাটি তমোবিনাশী রবির বন্দনায় মুখর হবে কেন ? কেনই বা দৈত্যজয়ী কুমারের ওপর বর্ষিত শারদার প্রসাদখানি চাওয়ার প্রয়োজন হয়ে পড়বে ? আসলে জড়ের বিরুদ্ধে প্রাণকে যেভাবে কবি নানা উৎপ্রেক্ষায় ও রূপকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন (যেমন, রামচন্দ্র-অহল্যার কাহিনীর মাধ্যমে), এখানেও তেমনি আঁধারের বিরুদ্ধে আলো, অশুভের বিরুদ্ধে শুভ, আবেশ-আলস্যের বিরুদ্ধে উদ্যোগী নিষ্ঠুর 'নূতন'-কে দানবজয়ী তরুণ কুমারের পৌরাণিক প্রতিমায় প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। কুমার নতুন শুভশক্তি প্রতিষ্ঠার এক যৌবনময় রূপ এবং এই যৌবন প্রকাশে পুষ্পধনু বা মদনের ভূমিকাও রয়েছে। কুমার অনেক সময়েই মদনের বেশে এসেছে। কিংবা উল্টোটাও দেখি। মদনের বেশে কুমারকে। নইলে, ফাল্গুনের অধীর প্রতীক্ষার পর মদনকে বালকবীরের বেশে বিশ্বজয় করতে দেখা যাবে কেন ? মদন ও কুমারের এই পারস্পরিক প্রতীক-মিশ্রণে রবীন্দ্রনাথের প্রেমের ধারণাটিও যে পরিবর্তিত হচ্ছে তার ইঙ্গিত পাই। প্রেমের সঙ্গে বীর্যের সমন্বয় সাধন। ব্যাপক প্রেমের সর্বগ্রাসী শক্তি তুচ্ছ লজ্জাত্রাস উত্তীর্ণ হয়ে প্রকৃতির মতোই আবেশমুক্ত হয়ে চলতে শুরু করেছে। 'মহুয়া'র প্রথম কবিতাতেই তার প্রমাণ : 'হে অতনু বীরের তনুতে লহো তনু।' 'পুনশ্চ'র শেষ কবিতা "পয়লা আশ্বিন"-এ শিশির-ধোয়া রোদে ইতিহাসের নৈরাশ্যমুক্ত মোহমুক্ত আত্মত্যাগী বিশ্ববিজয়ী বীরদের নীরব নির্ঘোষণ কবি যে শুনতে পাচ্ছেন তার পেছনেও ওই কুমারেরই মৃত্যুভয়হীন বিশ্ববিজয়ী রূপটিই প্রচ্ছন্ন রয়েছে। এই কবিতাটিই তিন বছর পরে লেখা 'বীথিকা'র অন্তর্গত 'আশ্বিনে' কবিতাটিতে আবার ওই 'নবীন রাজা'রই ছদ্মবেশে কুমারের আবির্ভাব। সেই ছুটির নীল আকাশ, সেই অজানা রোমাঞ্চকর অভিযানী মনোতৃপ্তিকে খুঁজে নেবার চেষ্টা—

এমনি শরতে ছেলেবেলাকার দেশে
  রূপকথাটির নবীন রাজার ছেলে
বাহিরে ছুটিতে কী জানি কী উদ্দেশে
  এ পারের চিরপরিচিত ঘর ফেলে।
আজি মোর মনে সে রূপকথার মায়া
  ঘনায়ে উঠিছে চাহিয়া আপন পানে।
তেপান্তরের সুদূর আলোকছায়া
  ছড়ায়ে পড়িল ঘরছাড়া মোর প্রাণে।
মন বলে, ওগো অজানা বন্ধু, তব
  সন্ধানে আমি সমুদ্রে দিব পাড়ি।
ব্যথিত হৃদয়ে পরশরতন লব
  চিরসঞ্চিত দৈন্যের বোঝা ছাড়ি।...

৩

কবি-ব্যক্তিত্বের কাছে কুমার যেমন বীর্য-শৌর্যের প্রতীক, নতুন রূপান্তরের উজ্জীবনী শক্তি, জাগ্রত বসন্তের প্রতীক মদনেরই রূপান্তরিত বীর্যময় সত্তা, জৈবিক প্রেম-উত্তীর্ণ এক কর্মোদ্যোগী সত্তা, তেমনি কবির ব্যাপকতর সামাজিক সত্তায় কুমার হয়ে উঠেছে ঊর্ধ্বগামী অমঙ্গলভেদী এক অতি মানবিক বা মহামানবিক শক্তি। দুটি বিশ্বযুদ্ধ ও তার অন্তর্বর্তীকালীন সামাজিক অবক্ষয়ের পরিবেশে মানবাত্মাকে যে-ভাবে বিধ্বস্ত ও গ্লানিময় দেখা গেছে সেই অপমানিত মানবাত্মাকে উদ্‌বোধিত করবার জন্যেই যেন এই কুমার দেবশক্তির বাহন হয়ে মর্ত্যসীমা পূর্ণ করতে চাইছে। শরতের নীলিমার আলো যেন মৃত্যুবক্ষভেদী দেবতারই বোধনের উপযুক্ত পরিবেশ। 'বীথিকা'র "দেবতা" কবিতায় (২৬ শ্রাবণ, ১৩৪২, সেপ্টেম্বর/ ১৯৩৫):

দেবতা মানবলোকে ধরা দিতে চায়
মানবের অনিত্যলীলায়।
মাঝে মাঝে দেখি তাই—
আমি যেন নাই,
ঝঙ্কৃত বীণার তন্তুসম দেহখানা
হয় যেন অদৃশ্য অজানা;
আকাশের অতিদূর সূক্ষ্ম নীলিমায়
সংগীতে হারায়ে যায়;
নিবিড় আনন্দরূপে
পল্লবের স্তূপে
আমলকী বীথিকার গাছে গাছে
ব্যাপ্ত হয় শরতের আলোকের নাচে।
প্রেয়সীর প্রেমে
প্রত্যহের ধূলি-আবরণ যায় নেমে
দৃষ্টি হতে শ্রুতি হতে;
স্বর্গসুধাস্রোতে
ধৌত হয় নিখিল গগন—
যাহা দেখি যাহা শুনি তাহা যে একান্ত অতুলন।
মর্ত্যের অমৃতরসে দেবতার রুচি
পাই যেন আপনাতে, সীমা হতে সীমা যায় ঘুচি।
দেবসেনাপতি
নিয়ে আসে আপনার দিব্যজ্যোতি
যখন মরণপণে হানি অমঙ্গল;
ত্যাগের বিপুল বল
কোথা হতে বক্ষে আসে;
অনায়াসে
দাঁড়াই উপেক্ষা করি প্রচণ্ড অন্যায়ে
অকুণ্ঠিত সর্বস্বের ব্যয়ে।

তখন মৃত্যুর বক্ষ হতে
দেবতা বাহিরি আসে অমৃত আলোতে ;
তখন তাহার পরিচয়
মর্ত্যলোকে অমর্ত্যেরে করি তোলে অক্ষুণ্ণ অক্ষয়।

দুটি বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তীকালে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে যে অমঙ্গল ও অন্যায় বোধ কবিকে জর্জরিত, এবং সময় সময় দ্বিধান্বিত, করেছিল, তাকে উত্তীর্ণ হবার অন্যতম উপাদান-শক্তি ছিল এই দেবসেনাপতির পৌরাণিক প্রতীক, মানব-দেবতার সমন্বয়ের প্রতীক।

৪

এই মানব-দেবতাকে সংসারে আমরা যে কতভাবে পেতে চাই, আমাদের সেই-সব কামনা-বাসনার সামগ্রিক ইচ্ছাপূরণ হয়েছে এই কবিতাটিরই বছর চারেক আগে লেখা (১২ মাঘ, ১৩৩৮) 'বিচিত্রিতা'-কাব্যের অন্তর্ভুক্ত "কুমার" নামে একটি অনতিখ্যাত কিন্তু অসাধারণ কবিতার মধ্যে। কবিতাটি বড়ো। কিন্তু কুমারের বিচিত্র ভূমিকাকে স্পষ্ট করতে গেলে অন্তত আংশিক উদ্‌ধৃতি দিতেই হয় :

কুমার, তোমার প্রতীক্ষা করে নারী,
অভিষেক তরে এনেছে তীর্থবারি।
সাজাবে অঙ্গ উজ্জ্বল বরবেশে,
জয়মাল্য যে পরাবে তোমার কেশে,
বরণ করিবে তোমারে, সে-উদ্দেশে
দাঁড়ায়েছে সারি সারি।
দৈত্যের হাতে স্বর্গের পরাভবে
বারে বারে বীর, জাগো ভয়ার্ত ভবে।
ভাই বলে তাই নারী করে আহ্বান,
তোমারে রমণী পেতে চাহে সন্তান,
প্রিয় বলে গলে করিবে মাল্যদান
আনন্দে গৌরবে।...
তুমি নাই, মিছে বসন্ত আসে বনে
বিরহবিকল চঞ্চল সমীরণে
দুর্বল মোহ কোন্ আয়োজন করে
যেথা অরাজক হিয়া লজ্জায় মরে,
ঐভাবে, রাজা, এসো হে শূন্য করে
হৃদয় সিংহাসনে।...
চাহে নারী তব রথসঙ্গিনী হবে,
তোমার ধনুর তূণ চিহ্নিয়া লবে।
অবারিত পথে আছে আগ্রহ ভরে
তব যাত্রায় আত্মদানের তরে,
গ্রহণ করিয়ো সম্মানে সমাদরে
জাগ্রত করি রাখিয়ো শঙ্খরবে ॥

কবিতাটির মধ্যে পৃথিবীর সমস্ত নারীজাতি কুমারকে বিচিত্রভাবে আহ্বান ও বন্দনা করেছে। কুমারের অভিষেকের জন্যে নারীরা সারি দিয়ে দাঁড়িয়েছে। দৈত্যের হাতে পরাভূত স্বর্গকে উদ্ধারের জন্যে ভয়ার্ত পৃথিবীতে বার বার কুমার জেগে উঠেছে। সেই আশাতেই নারীদের মধ্যে কেউ তাকে ভাই হিসেবে,কেউ সন্তান হিসেবে, কেউ প্রিয় হিসেবে কুমারকে গৌরবমালা পরাতে চায়। কুমারের আবির্ভাবে কুৎসিত ভীরুতা লজ্জা পাবে, বন্দীশালার দ্বার মুক্ত হবে। বসন্তের চঞ্চল হাওয়ায় দুর্বল মোহ দূর হবে। বিদ্যুৎকশা লেগে কুমারের রথের অশ্ব ছুটছে। তার অগ্নিবর্ণ চক্র ঘুরছে। শূন্যে তার ঘর্ঘর আওয়াজ। অদূরে সুনীল সাগরের তরঙ্গিত সীমা পেরিয়ে পথিক ঝড় যাচ্ছে 'রুদ্রে'র অভিসারে। 'রুদ্র' এখানে 'কুমার'-ই। শতপথব্রাহ্মণের কুমারের জন্ম বর্ণনায় বলা হয়েছে : প্রজাপতি উমার গর্ভে যে-বীজ রাখলেন সেই বীজ থেকে কুমারের জন্ম হল। তিনি রোদন করলেন বলে তাঁর নাম হল রুদ্র। কবি আরো বলছেন, কোনো আত্মলোপের কারাবাসে বন্দী হবার মতো শক্তি কুমার নয়। তার উদ্দাম বন্ধনহীন শক্তি কোনো 'শঙ্কার কার্মুকটঙ্কারে'ও বিহ্বল হবার নয়। তাই মৃত্যুর ছায়া পেরিয়ে কুমার চলেছে চির-উজ্জ্বল ধ্রুবতারকাকে লক্ষ্য ক'রে। দেবতা-মানবের মিলন হবে সেইখানেই। এই পরিপূর্ণ মানব-ভাগ্যের অংশী হতে চায় নারী। কুমারের লক্ষ্যভেদী তূণটিকে সে চিনে নিতে চায়। তাই সে আত্মদানের জন্যে আগ্রহী হয়ে রয়েছে। কুমারের শঙ্খরবে তারা সম্মানিত হোক।

আধুনিক কালের ব্যক্তিত্বসচেতন নারী পুরুষেরই কর্মোদ্যোগের সঙ্গিনী। তাই শক্তির জাগরণে উভয়েরই যৌথ ভূমিকাকে অনিবার্য ভেবেই কবি নারীকে কুমারের জন্যে প্রতীক্ষারতা হিসেবে দেখিয়েছেন। এ শক্তি নির্ভীক, আত্মবিশ্বাসী, দুঃসাহসিক এবং নতুন প্রাণশক্তির আলোকে দীপ্ত। কুমার এই শক্তিরই প্রতীক। মনে হয়, তিরিশের দশকের দেশীয় রাজনৈতিক আন্দোলনের পুনর্জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে কবি তাঁর পূর্বব্যবহৃত এই পৌরাণিক প্রতীককেই নতুন ক'রে নতুন শক্তির প্রয়োজনে অভিষিক্ত করেছেন। এবং, আবার বলি, এই কুমার-ধারণার পেছনে যে দৃপ্ত নির্ভীক বন্ধনহীন ও দুঃসাহসিক শক্তিমানের প্রলয়ান্তরিত সংগঠনী ভাবনা কাজ করছে তা একটু আগে থেকেই কবির প্রেমের সাধনবেগের উপলব্ধিতে মিশে গেছে— বিচিত্রিতা'র অন্তর্গত এই "কুমার" কবিতাটির প্রায় আড়াই বছর আগে লেখা 'মহুয়া'র "উজ্জীবন" কবিতায় (ভাদ্র ? ১৩৩৬) তারই স্পষ্ট প্রকাশ। 'কল্পনা'-কাব্যের যুগে যেমন মদন ভস্ম হয়ে সমস্ত বিশ্বকে ব্যাকুল বিরহে আপ্লুত করেছিল এখানে তার ঠিক বিপরীত চরিত্র। ভস্মীভূত মদনকে ভস্ম-অপমান-শয্যা ছেড়ে রুদ্র-বহ্নি থেকে নতুন স্ফুলিঙ্গ নিতে বলেছেন :

> ভস্ম-অপমান শয্যা ছাড়ো, পুষ্পধনু,
> রুদ্রবহ্নি হতে লহো জ্বলদর্চিতনু

এর ফলে বিরহ-মিলনেরে ধারণাও পরিবর্তিত হল :

> মিলনেরে করুক প্রখর,
> বিচ্ছেদেরে করে দিক দুঃসহ সুন্দর।

এই প্রখর ও দুঃসহ সুন্দর রূপ নিয়ে রুদ্র মৃত্যুঞ্জয়ের অভিশপ্ত মৃত্যুকে ভেদ ক'রে কে বেরিয়ে এল ? কবি বলেছেন,

> দুঃখে সুখে বেদনায় বন্ধুর যে পথ
> সে দুর্গমে চলুক প্রেমের জয়রথ।
> তিমির তোরণে রজনীর
> মন্দ্রিবে সে রথ-চক্র নির্ঘোষ গম্ভীর।`
> উল্লঙ্ঘিয়া তুচ্ছ লজ্জাত্রাস
> উচ্ছলিবে আত্মহারা উদবেল উল্লাস।
> মৃত্যু হতে ওঠো পুষ্পধনু
> হে অতনু, বীরের তনুতে লহো তনু।

এই নতুন বীরতনুলব্ধ অতনুর বর্ণনার সঙ্গে 'বিচিত্রিতা'র "কুমার" কবিতায় বর্ণিত বিদ্যুৎ-কশা-লাগা বহ্নিবরন চক্রলগ্ন রথাশ্ববাহী কুমারের দুর্গম দুঃসাহসের টানে ছুটে চলার কোনো পার্থক্য আছে কি ? মৃত্যু থেকে ওঠা পুষ্পধনু আর 'মৃত্যুর ছায়া ভেদিয়া তিমির পারে/ নির্ভয়ে ধাও যেথা জ্বলে ধ্রুবতারা' ইত্যাদি বর্ণনায় পাওয়া কুমারের নিঃশঙ্ক রূপের মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কি ? "বর্ষশেষ" কবিতায় কুমারের রথের ধ্বজায় ছিল 'মেঘরন্ধ্রচ্যুত তপনের জ্বলদর্চিরেখা' আর মহুয়ার উজ্জীবিত পুষ্পধনুকে কবি বলেছেন, 'রুদ্রবহ্নি হতে লহো জ্বলদর্চিতনু।' দুটি ক্ষেত্রেই 'জ্বলদর্চি' প্রতীক। একজনের ধ্বজায়। আরেকজনের দেহে। উজ্জীবিত মদন যে কুমারেরই অগ্নিরূপ নিয়ে এসে অতিমানব বা সুপারম্যান হতে চাইছে তাতে সন্দেহ থাকে না। প্রায় তিরিশবছরের ব্যবধানে জ্বলদর্চি শব্দটির পুনর্ব্যবহার মদন ও কুমার-প্রতীকের একাত্মতাকেই দৃঢ় করে।

৫

'মহুয়া'র "উজ্জীবন" কবিতাটি ১৩৩৬ সালের ভাদ্রে লেখা। 'বিচিত্রিতা'-র "কুমার" ১৩৩৮ সালের মাঘে, আর 'পত্রপুটে'র বারো-সংখ্যক কবিতা ('বসেছি অপরাহ্ণে পারের খেয়াঘাটে') কুমার-কবিতাটির চার বছরের কিছু বেশি পরে লেখা। পত্রপুটের এই কবিতাটি উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে, রবীন্দ্রনাথের কবিসত্তা বহুকালের আত্মমগ্নতার গভীর আক্ষেপ থেকে শেষজীবনে এক বিরাট মানব-সত্তার সঙ্গে একাত্ম হতে চাইছে, যে মানবসত্তা আদিকাল থেকে নানাভাবে নিজের সীমাবন্দী দশা থেকে ভেঙে বেরিয়ে আসার প্রমাণ রেখেছে। পঁচাত্তর বছরের কবি দেশীয় নানা আন্দোলন ও পরশাসনের দুর্যোগ দেখে, এক বিশ্বযুদ্ধের বিভীষিকা কাটিয়ে আরেক বিশ্বযুদ্ধের আতঙ্কের সামনে দাঁড়িয়ে নিজের অক্ষমতার বেড়া ভেঙে নিজেকে ছিঁড়ে-খুঁড়ে ভেতরকার এক উদ্দাম উদ্‌বেল রুদ্র-ভৈরবকে জাগাতে চেয়েছেন বার বার। নিজেকে সেই অতিমানবের সমস্ত দুঃসাহসিক অসম্ভবের মুখোমুখি করতে চেয়েছেন, এবং মাঝে মাঝে তার কণাটুকুও স্পর্শ করতে পারেন নি বলে যন্ত্রণায় ক্রমশ শান্ত ও বিষণ্ণ হয়ে পড়েছেন। অন্তর্নিহিত সেই মহান পুরুষের জন্যে আর্তনাদে কবি তাঁর দেহ-আচ্ছাদন ছিন্ন করে মৃত্যুকে দেখতে চেয়েছেন। বুঝতে পেরেছেন, সেই জ্যোতির্ময় সত্তার সঙ্গে মৃত্যুর কোনো ভেদ নেই। পত্রপুটের এই কবিতাটির মধ্যে সেই অসম্ভব প্রাণশক্তির বিরাট রূপকে ধরবার জন্যে গভীরতম আক্ষেপ-ব্যাকুলতার মুখে সেই দেবসেনাপতির আহ্বান-বাণী তাই খুবই তাৎপর্যপূর্ণ, কবিতাটিতে কবি বলছেন, অপরাহ্ণে খেয়াঘাটের শেষ ধাপটিতে বসে আছেন কবি। পূর্বস্মৃতির টানে মনে পড়ছে উদ্‌বেলিত কত আবেগের ঠিক ঠিক সাড়া পান নি বলে বিষণ্ণ হয়েছেন। কিন্তু জীবনের শেষে সে-সব দুঃখের সে-সব সঞ্চয় মৃত্যুর অর্ঘ্যপাত্রে দান করে দিতে তিনি প্রস্তুত। কিন্তু দানের দুটো দিক আছে। নিজেকে খুঁজে পাবার জন্যে যে গান, তা তিনি পেয়েছেন অন্তরে, কিন্তু 'যে মানুষ দেয় প্রাণ দেখা মেলে নি তার।' আরো স্পষ্ট করে বলেছেন,

> "মৃত্যুর গ্রন্থি থেকে ছিনিয়ে
> যে উদ্ধার করে জীবনকে
> সেই রুদ্র মানবের আত্মপরিচয়ে বঞ্চিত
> ক্ষীণ পাণ্ডুর আমি
> অপরিস্ফুটতার অসম্মান নিয়ে
> যাচ্ছি চলে।"

এই ক্ষীণ পাণ্ডুর আমিকে রুদ্রমানবের সঙ্গে পরিচিতি করাবার জন্যে মৃত্যুভেদী আহ্বান শুনেছেন দেবসেনাপতি কুমারের কণ্ঠে, যেহেতু রুদ্রভৈরবের তিনিই অগ্রদূত :

> দুর্গম ভীষণের ওপারে
> অন্ধকারে অপেক্ষা করছে জ্ঞানের বরদাত্রী ;

মানবের অভ্রভেদী, বন্ধনশালা
তুলেছে কালো পাথরে গাঁথা উদ্ধত চূড়া
সূর্যোদয়ের পথে ;
বহু শতাব্দীর ব্যথিত ক্ষত মুষ্টি
রক্তলাঞ্ছিত বিদ্রোহের ছাপ
লেপে দিয়ে যায় তার দ্বারফলকে ;
ইতিহাস বিধাতার শ্রেষ্ঠ সম্পদ
দৈত্যের লৌহ দুর্গে প্রচ্ছন্ন ;
আকাশে দেবসেনাপতির কণ্ঠ শোনা যায়—
'এসো মৃত্যুবিজয়ী।'

কিন্তু বৃদ্ধকবির অনুতাপ এই :

বাজল ভেরী
তবু জাগলে না রণদুর্মদ
এই নিরাপদ নিশ্চেষ্ট জীবনে।
ব্যূহ ভেদ করে
স্থান নিই নি যুধ্যমান দেবলোকের সংগ্রাম সহকারিতায়।
কেবল স্বপ্নে শুনেছি ডমরুর গুরুগুরু
কেবল সমরযাত্রীর পদপাতকম্পন
মিলেছে হৃৎস্পন্দনে বাহিরের পথ থেকে।

কাজেই সংগ্রামের মাধ্যমে সেই রুদ্রভৈরবের দর্শন-অভিজ্ঞতা না পেয়ে কবি প্রণাম জানাচ্ছেন তাঁরই অগ্রদূত 'বীরে'র উদ্দেশে :

যুগে যুগে যে মানুষের সৃষ্টি প্রলয়ের ক্ষেত্রে,
সেই শ্মশানচারী ভৈরবের পরিচয়জ্যোতি
ম্লান হয়ে রইল আমার সত্তায় ;
শুধু রেখে গেলেম নতমস্তকের প্রণাম
মানবের হৃদয়াসীন সেই বীরের উদ্দেশে—
মর্ত্যের অমরাবতী যাঁর সৃষ্টি
মৃত্যুর মূল্যে, দুঃখের দীপ্তিতে।

মৃত্যুভেদী সেই রুদ্রভৈরবের পরিচয়সূত্র, দেবমানবের সমন্বয়সূত্র হল 'বীর' দেবসেনাপতি কুমার। কবি তো বলেইছেন, 'দেবতা মানবলোকে ধরা দিতে চায়।' শেষ জীবনে কবি-ব্যক্তিত্বের আবরণভঙ্গ ঘটিয়ে বিরাটের সঙ্গে তাকে একাত্ম করবার জন্যে 'দুর্গমজয়ের স্পর্ধিত অধ্যবসায়' নিয়ে যে মৃত্যুর আলোকে রুদ্রের পরিচয়জ্যোতি পেতে চেয়েছে সে ওই দেবসেনাপতি কুমারের কণ্ঠেই মৃত্যুজয়ী বাণী শুনতে পেয়েছে। বুদ্ধ খৃস্ট রামচন্দ্র যেমন সেই 'বিজয়ী রাজা'র বেশে মিশেছে, তেমনি মিশেছে রুদ্র, অগ্নি, ইন্দ্র, মদন ও কুমার। সেই বালকবীর সেই নবীন রাজা সেই হাস্যমুখ কুমার কবিকে মোহ-আবেশ ও মদমত্ততা থেকে সেই দুঃসহ-সুন্দর জ্বলদর্চিতনু প্রখর ও মৃত্যুভেদী বিরাটের সামনে বীরবেশে দাঁড় করাতে চেয়েছে।

'লেখাজোখার কারখানাতে' : একটি নিবেদন

শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়

মোটামুটিভাবে একটি বহুজনপরিচিত কবিতার কথাই ধরা যাক। 'গীতাঞ্জলি'র ১০৬-সংখ্যক কবিতা, যার প্রথম ছত্র 'হে মোর চিত্ত, পুণ্যতীর্থে' রবীন্দ্রসাহিত্য পাঠকের কাছে অচেনা কবিতা নয়। 'গীতাঞ্জলি' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯১০ সালে। তদবধি বহুবার পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। ১৯২৮ সালে বিশ্বভারতী তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন। বিশ্বভারতী-কর্তৃক সংস্করণের আগেও একটি সংস্করণ হয়েছিল ১৯১৪ সালে। কবির জীবদ্দশায় ১৯৩৯ সালে শেষবার পুনর্মুদ্রিত হয়। তাঁর মৃত্যুর পর ১৯৪২ সালে বিশ্বভারতী একটি নতুন সংস্করণ প্রকাশ করেন। বর্তমানে এই সংস্করণের পুনর্মুদ্রণই প্রচলিত আছে। 'গীতাঞ্জলি' ছাড়া ১৯১৬ সালে ইন্ডিয়ান প্রেস -কর্তৃক প্রকাশিত 'কাব্যগ্রন্থ'-এর অষ্টম খণ্ডে ৯৯-সংখ্যক কবিতারূপে, ১৯৪২ সালে বিশ্বভারতী-প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাবলীর একাদশ খণ্ডে 'গীতাঞ্জলি'র অন্তর্ভুক্ত কবিতারূপে এবং ১৯৩১ সালে কবি-কর্তৃক সংকলিত 'সঞ্চয়িতা'য় কবিতাটি মুদ্রিত আছে। কবিতাটির অংশবিশেষ গান হিসেবে 'গীতবিতান'-এর প্রথম খণ্ডে (প্রথম সংস্করণ ১৯৩১, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৩৮, নূতন সংস্করণ ১৯৪৫) মুদ্রিত। কবির হস্তাক্ষরে কবিতাটির দুটি পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে। ক্ষিতিমোহন সেন-সংগ্রহে কবির হস্তাক্ষরে '১৮ আষাঢ় ১৩১৭' তারিখসহ যে পাণ্ডুলিপিটি পাওয়া যায় তাকে 'গীতাঞ্জলি'র খসড়া পাণ্ডুলিপি বলা যায়। দ্বিতীয় আরেকটি পাণ্ডুলিপি চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় -সংগ্রহে পাওয়া যায়। এ পাণ্ডুলিপিতে '১৮ আষাঢ় ১৩১৭' কবির হস্তাক্ষরে লেখা থাকলেও, মনে হয় এ পাণ্ডুলিপি প্রথম পাণ্ডুলিপির পরবর্তীকালের।[১] মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় -সংগ্রহে 'গীতাঞ্জলি'র আর-একটি পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়— যেটিকে কবির হস্তাক্ষরে প্রেসকপি বলা যেতে পারে। তবে এই পাণ্ডুলিপিতে আলোচ্য কবিতাটি নেই। চারুচন্দ্র-সংগ্রহের পাণ্ডুলিপিটিতে কবিতাটির একটি শিরোনাম আছে। মুদ্রিত গীতাঞ্জলির কোনো কবিতায় কোনো শিরোনাম নেই। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে চারুচন্দ্র-সংগ্রহে যে শিরোনাম কবির হস্তাক্ষরে লিপিবদ্ধ আছে সঞ্চয়িতাতে সে শিরোনাম ব্যবহার করা হয় নি। পাণ্ডুলিপিতে শিরোনাম 'মাতৃ-অভিষেক' আর সঞ্চয়িতাতে নামকরণ হয়েছে 'ভারততীর্থ'। 'মাতৃ-অভিষেক' পাণ্ডুলিপিটি বর্তমানে প্রচলিত গীতাঞ্জলিতে সম্পূর্ণত মুদ্রিত আছে। কবিতাটি (তৃতীয় স্তবক বর্জিত) কবিকণ্ঠে রেকর্ড করানো হয়েছিল। রেকর্ডে কবিতাটি 'ভারততীর্থ' নামে চিহ্নিত। কবিতাটির ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী -কৃত একটি ইংরেজি অনুবাদ 'বিশ্বভারতী কোয়ারটারলি'র ১৯২৯ সালের জানুয়ারি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এর প্রথম ছত্র 'O heart of mine, awake in the holy place of pilgrimage, in the land of India'। 'বিশ্বভারতী কোয়ারটারলি'তে কবিতাটির শিরোনাম "He Mor Chitta"। এটি সম্পূর্ণ কবিতার অনুবাদ নয়। তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম স্তবক বর্জিত। গীতবিতানেও এই স্তবক-কয়টি বর্জিত। তবে ইন্দিরাদেবী চৌধুরানীর অনুবাদ গীতবিতানের পাঠানুগ নয়। সম্প্রতিকালে প্রচারিত লং প্লেয়িং রেকর্ডের আচ্ছাদনে কবিতাটির যে সামান্য অংশের অনুবাদ পাওয়া যায় তা

১ কবি এটি প্রবাসীতে প্রকাশের জন্য পাঠিয়েছিলেন। সঙ্গে মন্তব্য ছিল :
"এই কবিতাটি শ্রাবণের সংখ্যায় বাহির হইতে পারিবে কি? যদি না হয় তবে ভাদ্রের প্রবাসী বাহির হইবার পূর্ব্বেই পুস্তকের মধ্যে প্রকাশিত হইয়া যাইবে। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর"

ইন্দিরাদেবী চৌধুরানীর অনুবাদ থেকে ভিন্ন। অতি সম্প্রতি দিল্লীর কোনো এক সরকারি অনুষ্ঠানপত্রে অপর একটি ইংরেজি অনুবাদ দেখা যায়। সেখানে শিরোনাম "He Chitto, Punno Tirthe"!

পাণ্ডুলিপির পাঠ, বিভিন্ন গ্রন্থে ও সংকলনে কবিতাটির পাঠ, কবিকণ্ঠে কবিতাটির পাঠ এবং বিভিন্ন ইংরেজি অনুবাদের ভিত্তি হিসেবে কোন্ পাঠ গৃহীত হয়েছে— এ-সব তথ্য কবিতাটির পাঠ বিচারে জরুরি। সেই কারণে তার বিশদ বিবরণ উল্লেখ করা হল।

ক্ষিতিমোহন সেন -সংগ্রহের খসড়া পাণ্ডুলিপির পাঠ গীতাঞ্জলিতে প্রথম মুদ্রণকালে সংশোধিত হয়েছে। ছত্রবিন্যাসেও পরিবর্তন ঘটেছে। খসড়া পাণ্ডুলিপির ছত্রবিন্যাস 'সঞ্চয়িতা'র অনুরূপ। অন্য সকল মুদ্রিত পাঠে ছত্রবিন্যাস চারুচন্দ্র-সংগ্রহভুক্ত পাণ্ডুলিপির অনুরূপ। বিভিন্ন মুদ্রণে যতিচিহ্নের বিচিত্র পরিবর্তনের কারণে যতিচিহ্ন বর্তমান আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি। বানানের ক্ষেত্রে পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রায় অনুযায়ী বিশ্বভারতী-কর্তৃক নির্দিষ্ট বানান পদ্ধতি ছাড়া অন্তত একটি ক্ষেত্রে অনভিপ্রেত পরিবর্তন লক্ষ করা গিয়েছে। ছত্রবিন্যাস, যতিচিহ্ন বা বানান-এর চেয়ে পাঠের পরিবর্তনই অধিকতর জরুরি নিঃসন্দেহে। খসড়া পাণ্ডুলিপি থেকে প্রথম মুদ্রণকালে নিচে উল্লিখিত পাঁচ স্থানে যে পরিবর্তন করা হয় তা সর্বত্র অনুসৃত হয়ে আসছে—

১· চতুর্থ ছত্র[১] ॥ উদারছন্দে পরমানন্দে বন্দনা করি তাঁরে (খসড়া পাণ্ডুলিপি)/
উদারছন্দে পরমানন্দে বন্দন করি তাঁরে (অন্য সর্বত্র)

২· দশম ছত্র ॥ হেথায় আর্য্য হেথা অনার্য্য দ্রাবিড় যুনানী চীন (খসড়া পাণ্ডুলিপি)/
হেথায় আর্য, হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন (অন্য সর্বত্র)

৩· দ্বাদশ ছত্র ॥ ...সেথা হতে আসে লয়ে উপহার (খসড়া পাণ্ডুলিপি)/
...সেথা হতে সবে আনে উপহার (অন্য সর্বত্র)

৪· ত্রয়োবিংশ ছত্র ॥ একের মন্ত্রে হৃদয়তন্ত্রে...(খসড়া পাণ্ডুলিপি)/
হৃদয়তন্ত্রে একের মন্ত্রে...(অন্য সর্বত্র)

৫· ঊনচত্বারিংশ ছত্র ॥ ...অপনীত তব অপমানভার (খসড়া পাণ্ডুলিপি)/
...অপনীত সব অপমানভার (অন্য সর্বত্র)

এই সংশোধন চারুচন্দ্র-সংগ্রহভুক্ত পাণ্ডুলিপিতেও অনুসৃত। বস্তুত চারুচন্দ্র-সংগ্রহভুক্ত পাণ্ডুলিপির পাঠই ছত্রবিন্যাসসহ হুবহু গীতাঞ্জলির প্রথম সংস্করণে গৃহীত। কেবল গীতাঞ্জলিতে কোনো কবিতার পৃথক শিরোনাম নেই বলে, এই কবিতার ক্ষেত্রেও 'মাতৃ-অভিষেক' নামটি ব্যবহার করা হয় নি। 'সঞ্চয়িতা'য় অন্তর্ভুক্তি কালে এই শিরোনাম আর ফিরে আসে নি, নতুন নামকরণ হয় 'ভারততীর্থ'। মাতৃ-অভিষেকের প্রসঙ্গ কবিতাটির মধ্যে আছে— 'মার অভিষেকে এসো এসো ত্বরা'। অপিচ যে কালে এই পাণ্ডুলিপিটি রচিত তখন দেশকে মাতৃসম্ভাষণ অধিক প্রচলিত এবং স্বাভাবিক ছিল। ১৯৩১ সালে সঞ্চয়িতা সংকলনকালে নতুন নামকরণে কবির মানসিকতার বিবর্তন বা কবিতাটির তাৎপর্য প্রসঙ্গে কবির ভাবনার বিবর্তন পরিলক্ষিত হয় কিনা তা কবির মনন-ভাবনার বিচারক্ষেত্রে আলোচ্য। পরবর্তীকালে 'ভারততীর্থ' (১৯৪৭) নামে যে স্বরলিপি-সংবলিত রবীন্দ্রগীতি সংগ্রহ প্রচারিত হয় সেখানে এই গানটির গীতবিতান-অনুযায়ী পাঠ অন্তর্ভুক্ত। এই কবিতার কয়েকটি স্থলে পাঠ বিভিন্নতা পাঠকচিত্তে কিঞ্চিৎ সমস্যা সৃষ্টি করে। অন্তত তিনটি স্থলে দুই পাণ্ডুলিপি এবং গীতাঞ্জলির প্রথম সংস্করণের পাঠ পরে কবির জীবদ্দশাতেই অনুসৃত হয় নি। অপর একটি স্থলে একটি পরিবর্তন কবির জীবদ্দশায় ঘটে নি, পরবর্তীকালে খুব সম্ভবত মুদ্রণ প্রমাদের সূত্রে অনুপ্রবেশ করে এবং এখনও এই পরিবর্তিত পাঠ অনুসৃত হয়ে চলেছে। যে তিনটি পরিবর্তন কবির জীবদ্দশাতেই ঘটেছে— ১· 'পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার' স্থলে 'পশ্চিমে

১ খসড়া পাণ্ডুলিপি এবং 'সঞ্চয়িতা'র ছত্রবিন্যাস অভিন্ন।

আজি খুলিয়াছে দ্বার', ২. 'তারি বিচিত্র সুর' স্থলে 'তার বিচিত্র সুর', এবং ৩. 'করো অপনীত সব অপমানভার' স্থলে 'হোক অপনীত সব অপমানভার'। এই পরিবর্তিত পাঠের প্রথম প্রয়োগ ১৯১৬ সালে ইন্ডিয়ান প্রেস প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের অষ্টম খণ্ডে। এই তিনটি পরিবর্তন তার পর থেকে রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালে মুদ্রিত 'গীতাঞ্জলি'র সকল পুনর্মুদ্রণে এবং সংস্করণে, 'সঞ্চয়িতা'র সকল পুনর্মুদ্রণে এবং সংস্করণে, এবং 'গীতবিতান'-এর সকল সংস্করণে[১] অব্যাহত। কেবল মুদ্রিত গ্রন্থে নয় কবিকণ্ঠে রেকর্ডেও এই পাঠ পাওয়া যায়। সেখানে যদিও 'তারি বিচিত্র সুর'-সংবলিত স্তবকটি বর্জিত। যদিও ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী -কৃত ইংরেজি অনুবাদ-এর পাঠ বিচার করলে দেখা যায় যে তিনি সে সময় (১৯২৯) প্রচলিত কোনো মুদ্রিত পাঠকে তাঁর অনুবাদের ভিত্তি করেন নি। তিনি পাণ্ডুলিপি বা ১৯১৬ সালের পূর্ববর্তী কালে প্রকাশিত গীতাঞ্জলির পাঠ অনুসরণ করেছিলেন। তাঁর অনুবাদে আছে Now the West has opened her doors. এই অনুবাদের বাংলা 'পশ্চিমে' নয়, 'পশ্চিম'। ইন্দিরাদেবী চৌধুরানীর অনুবাদে যে Wipe out all dishonour আছে তারও ভিত্তি 'হোক অপনীত' নয়, 'করো অপনীত'।

ইন্দিরাদেবী চৌধুরানীর অনুবাদ উল্লেখ করা হলেও, রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালের দীর্ঘ একটি অংশ (১৯১৬-১৯৪১) বাঙালি পাঠক এই কবিতার যে পাঠে অভ্যস্ত হয়েছিল তা কবির পাণ্ডুলিপিতে বা প্রথম সংস্করণে না থাকলেও এ পরিবর্তন কবিকৃত নয় এ কথা জোর করে বলার মতো দলিল আমাদের হাতে নেই। বরং বিপরীত দিকেই পাল্লা ভারী। প্রথমত, পরিবর্তনগুলিকে নিছক মুদ্রণপ্রমাদ বলা যায় না বোধ হয়, বিশেষত তৃতীয় পরিবর্তনটির ক্ষেত্রে— 'করো' থেকে 'হোক'। পরিবর্তনগুলির ফলে বাক্যগুলি অর্থহীন হয়ে পড়ে নি। দ্বিতীয়ত দীর্ঘকাল কবির জীবদ্দশায় এই পাঠ প্রচলিত ছিল, এই পরিবর্তনের প্রতি কোনো কৌতূহলী বা নিষ্ঠাবান পাঠক কবির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন বলে জানা নেই, বিশেষত কবি স্বয়ং প্রুফ দেখতেন এবং প্রুফ স্তরে পরিবর্তন করতেন এই দৃষ্টান্ত খুব বিরল নয়। তৃতীয়ত, যন্ত্রে যে কবিকণ্ঠ ধরা আছে, সেখানেও এই পাঠ অব্যাহত। ভাবীকালে একসময় হয়তো কবির হস্তলিপির চেয়ে যন্ত্রধৃত কবিকণ্ঠই অধিকতর প্রামাণ্য বলে স্বীকৃতি পাবে। চতুর্থত, এই পরিবর্তনগুলি কবির মৃত্যুর পর গীতাঞ্জলিতে পাণ্ডুলিপি-অনুগত পাঠ মুদ্রণের পরেও অন্য দুটি গ্রন্থে অব্যাহত রয়ে গেল। বর্তমানে প্রচলিত সঞ্চয়িতা এবং গীতবিতানে এখনও এই পাঠ মুদ্রিত হচ্ছে। যার ফলে রবীন্দ্র-সাহিত্যের পাঠক নিশ্চিতভাবে কোনো স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারবেন না।

অপর একটি পাঠের ক্ষেত্রে ('যজ্ঞশালায় খোলা আজি দ্বার') দেখা যায় কবির জীবদ্দশায় সর্বত্র এক পাঠ অনুসৃত হলেও কবির মৃত্যুর পর পাঠ পরিবর্তন ঘটে গীতাঞ্জলিতে, যদিও গীতাঞ্জলিতে অন্যত্র পাণ্ডুলিপির অনুসরণে পূর্বপ্রচলিত পাঠ পরিবর্তন করা হয়েছে, এই একটি ক্ষেত্রে পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপি, যা গ্রন্থেই মুদ্রিত হয়েছে, তা থেকে ভিন্ন পাঠ করে দেওয়া হয়েছে, যার সমর্থন পূর্বে প্রকাশিত কোনো গ্রন্থেই নেই। পাণ্ডুলিপি এবং পূর্বে মুদ্রিত সকল গ্রন্থে যেখানে 'যজ্ঞশালায়' ছিল, বর্তমানে প্রচলিত গীতাঞ্জলিতে সেখানে 'যজ্ঞশালার' মুদ্রিত। একে নিছক মুদ্রণ প্রমাদ বলে অগ্রাহ্য করা যেত, যদি না এই পাঠের অনুসরণে প্রচলিত সঞ্চয়িতাতেও 'যজ্ঞশালার' করা হত।[২] প্রচলিত গীতাঞ্জলির সবই যে যান্ত্রিকভাবে প্রচলিত সঞ্চয়িতায় অনুসৃত তা মনে হয় না। তা হলে প্রচলিত গীতাঞ্জলির 'রনরনি' বানান সঞ্চয়িতাতেও অনুসৃত হত। সেখানে কিন্তু পূর্বাপর প্রচলিত এবং রবীন্দ্রনাথ-অভিপ্রেত 'রণরণি' বানানই আছে।

এই বহুজনপরিচিত কবিতাটির বিশুদ্ধ পাঠ নির্ণয়ের উদ্দেশ্য নিয়ে এ নিবন্ধের অবতারণা নয়। একটি পরিচিত কবিতার সূত্রে রবীন্দ্ররচনার পাঠ নির্ণয় যে কত সমস্যাসংকুল তাই বিদগ্ধ পাঠকের দৃষ্টিপথে আনার জন্য কবিতাটির আনুপূর্বিক পাঠ-পরিচয় দেবার চেষ্টা করা হয়েছে মাত্র।

কবি যেখানে স্বয়ং তাঁর রচনার চূড়ান্ত পাঠ নির্ণয় করে যান না বা যাওয়া সম্ভব হয় না, সেখানে বিশুদ্ধ পাঠ বা

১ গীতবিতানে 'তারি বিচিত্র সুর' যে স্তবকে আছে সেটি বর্জিত।

২ গীতাঞ্জলির একটি পুনর্মুদ্রণে (১৩২০ বঙ্গাব্দ) 'যজ্ঞশালায় খোল আজি দ্বার' মুদ্রিত হয়েছিল; কিন্তু পরবর্তী মুদ্রণে এটি সংশোধিত হয়েছিল।

কবি-অভিপ্রেত পাঠ নির্ণয়ের দুটি বহু আলোচিত পদ্ধতির কথা মনে করা যেতে পারে : ১· কবির জীবদ্দশায় প্রকাশিত শেষ পাঠ অথবা ২· কবির পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেলে, পাণ্ডুলিপি-অনুগ পাঠ অথবা পাণ্ডুলিপির অভাবে প্রথম সংস্করণের পাঠ। কবির জীবদ্দশায় প্রকাশিত শেষ পাঠকে চূড়ান্ত পাঠ তখনই মনে করা যেতে পারে যেখানে নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে কবি স্বয়ং সেই পাঠ নির্ধারণ বা অনুমোদন করে গেছেন। যদিও তর্ক উঠতে পারে যে কবির জীবদ্দশায় মুদ্রিত পাঠে কবির আপত্তি থাকলে তা তিনি কেন ব্যক্ত বা লিপিবদ্ধ করে যাবেন না। সেই মুদ্রিত পাঠে কোনো অনভিপ্রেত মুদ্রণপ্রমাদ যদি স্পষ্টত বোঝা যায় তা কবির চোখে না পড়লেও নিষ্ঠাবান অন্তরঙ্গ পাঠক তাঁর গোচরে আনবেন এটাও আশা করা যায়। সেই কারণেই জীবদ্দশায় শেষ পাঠ সম্পর্কে কবি বা কবির ঘনিষ্ঠ নিষ্ঠাবান পাঠকের একটি বিশেষ দায় থেকে যায়। বর্তমান ক্ষেত্রে যদিও দেখা যাচ্ছে যে সে দায় কবি বা তাঁর কোনো পরিচিত নিষ্ঠাবান পাঠক বহন করেন নি। যে কবিতা তিনি উনপঞ্চাশ বছরে লেখেন এবং ছাপেন, তার এক ভিন্ন পাঠ তাঁর পঞ্চান্ন বছর বয়স থেকে আশি বছর পর্যন্ত ক্রমাগত নানা গ্রন্থে মুদ্রিত হতে থাকল, অথচ তা কবির দৃষ্টি বা কর্ণগোচর হল না, এটাকে স্বাভাবিক মনে করা কঠিন, বিশেষত কবি স্বয়ং এই ভিন্ন পাঠই আবৃত্তি করলেন গ্রামোফোন রেকর্ডের জন্য, তখনও তাঁর মনে হল না যে তিনি যে পাঠ পড়ছেন, তা তাঁর রচিত বা অভিপ্রেত পাঠ নয়। মনে হয় কবি রেকর্ড করার সময় 'সঞ্চয়িতা' সামনে রেখে পড়েছিলেন, যদিও সে সময় প্রচলিত গীতাঞ্জলির যে-কোনো কপি থেকেও ঐ পাঠই তাঁকে পড়তে হত। যদি ধরে নেওয়া যায় যে এই পরিবর্তন কবি-অভিপ্রেতই বটে, তবে আবার প্রশ্ন থাকে ১৯২৯ সালে ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী -কৃত ইংরেজি অনুবাদের ভিত্তি হিসেবে সেই পাঠ গৃহীত হল না কেন। 'বিশ্বভারতী কোয়ারটারলি'তে প্রকাশিত অনুবাদ কবির দৃষ্টিগোচর হয় নি মনে করা কঠিন। ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী ১৯১৬-পূর্ববর্তী পাঠকে তাঁর অনুবাদের ভিত্তি হিসেবে নিলেন। অথচ অনুবাদ কালে প্রচলিত গীতাঞ্জলির পাঠবিভিন্নতা সম্বন্ধে কবির দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন না, এটা কী করে সম্ভব হল তার ব্যাখ্যা সহজসাধ্য নয়।

এ থেকে আবার পরস্পর অসম্পৃক্ত দুটি সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর সম্ভাবনা থেকে যায়। প্রথমত, বলা যেতে পারে দুটি পাঠই কবি-অনুমোদিত। সুতরাং দুটি পাঠই রক্ষণীয় যা বর্তমানে গীতাঞ্জলি এবং সঞ্চয়িতা-গীতবিতান সূত্রে রক্ষিত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, সবিনয়ে নিবেদন করা যেতে পারে যে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাঁর সমসাময়িককাল থেকে অদ্যাবধি যতই গর্ববোধ বা ভক্তি থাক্-না কেন, তাঁর রচনার পাঠের বিশুদ্ধতা নিয়ে সেকালে বা একালে সতর্কদৃষ্টির বিলক্ষণ অভাব। যদিও এ সিদ্ধান্ত আমাদের রসবিচার এবং নিষ্ঠার প্রতি নিশ্চিত অশ্রদ্ধার প্রকাশ। যাই হোক, প্রথম সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রেও কিঞ্চিৎ প্রশ্ন থেকে যায়। যদি দুটি পাঠই রক্ষণীয় হয়, তা হলে রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় ১৯১৬ সাল থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত পাঠক-সমাজ একমাত্র ইন্দিরাদেবী চৌধুরানীর ইংরেজি অনুবাদসূত্রে ভিন্ন একটিমাত্র পাঠের রস ও ব্যাখ্যাই লাভ করে গেছেন। কিন্তু সেকালেও কোনো কোনো গ্রন্থসংগ্রাহকের কাছে ১৯১৬-পূর্ববর্তী গীতাঞ্জলির কোনো সংস্করণ বা পুনর্মুদ্রণ থাকলে, এবং সেই গ্রন্থের পাঠ এবং ১৯১৬-পরবর্তী কোনো পাঠ তুলনা করলে মনে সংশয় আসা স্বাভাবিক ছিল। রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় তবু একটি সান্ত্বনা যে একই সময়ে দু'রকম পাঠ মুদ্রিত হতে থাকে নি, যা ১৯৪২ থেকে হয়ে চলেছে। আবার এই দুরকম পাঠের একটি পাঠ অবলুপ্ত হয়ে যেত যদি পাণ্ডুলিপি দুটি এবং ১৯১৬-পূর্ববর্তী গীতাঞ্জলির সংস্করণগুলির সন্ধান পাওয়া না যেত। রবীন্দ্রনাথের পাণ্ডুলিপির অনেক অংশ আমাদের হাতে এসে পৌঁছায় নি, ভবিষ্যতে এ-সব পাণ্ডুলিপি সংগ্রহের সম্ভাবনাও অত্যন্ত ক্ষীণ, পরন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রথম বা প্রাচীন সংস্করণগুলিও ক্রমশই দুর্লভ হয়ে উঠছে। অথচ এ-সব উপাদানের অভাবে রবীন্দ্ররচনার পাঠ নির্ণয় একদিকে যেমন কঠিন হয়ে পড়তে পারে, অপর দিকে তেমন পাঠনির্ণয়জনিত সমস্যার অস্তিত্বও অজ্ঞাত থেকে যেতে পারে। ফলে রবীন্দ্র-রচনার পাণ্ডুলিপি এবং প্রথম এবং সম্ভব হলে জীবদ্দশায় প্রকাশিত যাবতীয় সংস্করণ-সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ পাঠনির্ণয়ের কাজে এক প্রাথমিক কৃত্য।

যদিও তার ফলেও কবি-অভিপ্রেত পাঠ নির্ণয় সম্ভব হবে তা হলপ করে বলা যাবে না। কারণ, কবি তাঁর রচনার পরিবর্তন বা সংশোধন প্রায়শ করতেন প্রেসকপিতে বা প্রুফ কপিতে। কবি-সংশোধিত প্রুফের যে সামান্য অংশ রক্ষা পেয়েছে তা থেকে দেখা যায় যে সেগুলি পাণ্ডুলিপির চেয়ে কম মূল্যবান উপাদান নয়।

কিন্তু এ ছাড়াও সমস্যা থেকে যায় যদি কবির জীবদ্দশাতেই মুদ্রণপ্রমাদজনিত পরিবর্তন ঘটে যায়। মুদ্রণপ্রমাদের ফলে অর্থহীন শব্দ বা বাক্য পাওয়া গেলে, তা সংশোধন কঠিন হয় না বটে, কিন্তু অর্থবান মুদ্রণপ্রমাদ যথার্থই মুদ্রণপ্রমাদ, না কবি-কৃত পরিবর্তন তা নির্ধারণ এক কঠিন সমস্যা, যদি না কবির জীবদ্দশায় এই পরিবর্তন প্রসঙ্গে কোনো সতর্ক পাঠক কবির দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, কবির জীবদ্দশায় তাঁর রচনার পাঠের পরিবর্তন নিয়ে আলোচনার দৃষ্টান্ত নিতান্তই কম। এইসূত্রে একটি কৌতুককর ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ ১৩০৮ বঙ্গাব্দের ১২ আশ্বিন বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে "বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত" নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন এবং সে বছরই সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। প্রবন্ধটি পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশের পূর্বেই শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী 'ভারতী' পত্রিকার অগ্রহায়ণ সংখ্যায় "নূতন বাংলা ব্যাকরণ" নামে এক প্রতিবাদ প্রকাশ করেন। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের একটি মন্তব্য :

"প্রতিবাদী মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধের একস্থলে প্রশ্ন করিয়াছেন :

> রবীন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন 'ধ্যালো মাংস'—এ ধ্যালোটা কী।

অবশেষে শ্রান্ত বিমর্ষ, হতাশ হইয়া লিখিতেছেন :

> অনেককে জিজ্ঞাসা করিলাম, কেহই বলিতে পারিলেন না। কলিকাতার অধিবাসী অথচ যাঁহাদের গৃহে সাহিত্যচর্চাও আছে এবং নির্বিশেষে মৎস্যমাংসের গতিবিধিও আছে এমন ব্যক্তির নিকট জিজ্ঞাসু হইয়াছি, তাহাতেও কোনো ফল হয় নাই।

পণ্ডিত মহাশয়ের যে এত প্রচুর শ্রম ও দুঃখের কারণ হইয়াছি, ইহাতে নিজেকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছা হয়। আমার প্রবন্ধ বহন করিয়া আজ পর্যন্ত পরিষৎ-পত্রিকা বাহির হয় নাই, এবং পণ্ডিতমহাশয় আমার পাঠ শুনিয়াই প্রতিবাদ লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এ কথা স্বীকারই করিয়াছেন। অতএব, যখন আমি 'ধ্যাৎলা' বলিয়াছিলাম, তখন যদি বক্তার দুরদৃষ্টক্রমে শ্রোতা ধ্যালোই শুনিয়া থাকেন, তবে সেজন্য বক্তা ক্ষমা প্রার্থনা করিতে প্রস্তুত আছেন।...প্রতিবাদী মহাশয় যদি কোনো সুযোগে পরিষৎ-পত্রিকার প্রুফ সংগ্রহ করিয়া তাহাতে এই ভুল দেখিয়া থাকেন তবে সেজন্যও আমাকে ক্ষমা করিবেন। ছাপার ভুলে যদি দণ্ডিত হইতে হয়, তবে দণ্ডশালায় পণ্ডিত-মহাশয়েরও সঙ্গ লাভ হইতে বঞ্চিত হইব না।"

সতর্ক রবীন্দ্র-রচনাপাঠক জানেন যে ছাপার ভুল শুধু 'ধ্যালো' আর 'ধ্যাৎলা'র মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, মুদ্রণপ্রমাদের দণ্ড এখনও পাঠক সমাজকে নানাভাবে বহন করতে হচ্ছে। পণ্ডিতমহাশয় নাহয় 'ধ্যালো' নামক অচেনা শব্দের অর্থোদ্ধারের জন্য 'কলিকাতার অধিবাসী অথচ যাঁহাদের গৃহে সাহিত্যচর্চাও আছে এবং নির্বিশেষে মৎস্য মাংসের গতিবিধিও আছে এমন ব্যক্তি নিকট জিজ্ঞাসু' হয়েছিলেন, কিন্তু 'আপনাকে এই লুকিয়ে রাখা *ধুলার* ঢাকা ধুইয়ে দাও'-এর স্থলে যদি 'আপনাকে এই লুকিয়ে-রাখা *ধুলায়* ঢাকা ধুইয়ে দাও' মুদ্রিত থাকে, তবে পাঠকের সংশয় জাগবেই বা কেন যে এ পাঠ কবি-অভিপ্রেত পাঠ নয় বা এখানে কোনো মুদ্রণপ্রমাদের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। একমাত্র যদি না দেখা যায় যে কবির পাণ্ডুলিপিতে এবং জীবদ্দশায় একবার এই পাঠই মুদ্রিত ছিল। আবার বিপরীত দৃষ্টান্তও অবিরল নয়। কবির পাণ্ডুলিপি, সাময়িকপত্রে এবং প্রথম সংস্করণে যে পাঠ আছে, পরবর্তী সংস্করণে কবি নিশ্চিতভাবে তাঁর পরিবর্তন করেছেন এবং তদনুযায়ী তাঁর জীবিতকালের শেষ সংস্করণ পর্যন্ত এই পরিবর্তিত পাঠ প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও তাঁর মৃত্যুর পর আদিপাঠে প্রত্যাবর্তন করা হয়েছে 'খেয়া' গ্রন্থের প্রথম কবিতা 'শেষ খেয়া'য়। 'গীতাঞ্জলি'র ১০৬-সংখ্যক কবিতায় 'পশ্চিম'/'পশ্চিমে', 'তা রি'/তার' এমন কি 'করো'/'হোক'—পরিবর্তন মুদ্রণপ্রমাদজনিত বলে সিদ্ধান্ত করা গেলেও 'খেয়ার' শেষ খেয়া' কবিতার 'নামিয়ে'/'নামায়ে, 'চুকিয়ে'/ 'চুকায়ে', 'ফুলের বার নাইক আর ফসল যার'/'ফুলের বাহার নাইকো যাহার, ফসল যাহার', 'চোখের জল'/'অশ্রু যাহার'—এই পরিবর্তনগুলিকে নিছক মুদ্রণপ্রমাদ বলা যাবে না। সুতরাং এই দুই কবিতায় পাণ্ডুলিপি বা প্রথম সংস্করণের পাঠে ফিরে যাবার যুক্তি অভিন্ন হতে পারে না। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই পাঠক বড়ো অসহায়বোধ করেন। 'গীতাঞ্জলি'র ক্ষেত্রে দুইসূত্রে দুটি পাঠই কেন প্রচলিত রইবে তার কোনো ব্যাখ্যা পাঠকের হাতে দেওয়া হল না, আবার 'খেয়া'র ক্ষেত্রে পূর্বতর পাঠে ফিরে যাওয়া যে পরবর্তীকালের সম্পাদকের বিবেচনাপ্রসূত সিদ্ধান্ত তাও পাঠক জানতে

পারলেন না। সমস্যাটি বাংলাভাষী পাঠককে অতিক্রম করে ইংরেজিভাষার পাঠককেও স্পর্শ করেছে যখন দেখা যায় যে ১৯২৯ সালে ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী-কৃত অনুবাদ এবং সম্প্রতি প্রচারিত দিল্লির সরকারি অনুষ্ঠানপত্রে মুদ্রিত অনুবাদের ভিত্তি দ্বিধাবিভক্ত। ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী ১৯২৯ সালে অনুবাদকালে সমসাময়িককালে প্রচলিত কোনো পাঠকে তাঁর অনুবাদের ভিত্তি করেন নি আর দিল্লির সরকারি অনুষ্ঠানপত্রে মুদ্রিত অনুবাদের ভিত্তি হিসেবে গৃহীত হল না ১৯৪২-পরবর্তী পাণ্ডুলিপি-সমর্থিত পাঠ— সেখানে নিশ্চিতভাবে 'পশ্চিমে' এবং খুব সম্ভব 'হোক অপনীত' অনুবাদের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে মনে হয় প্রচলিত সঞ্চয়িতার সূত্রে। ফলে কবিতাটির ইংরেজি অনুবাদের পাঠকও রবীন্দ্র-রচনার দ্বিচারিতার পরিচয় পেয়ে গেলেন।

একদিকে কবির জীবদ্দশায় তাঁর রচনার বিভিন্নতা নিয়ে কবির সাক্ষ্য গ্রহণের দৃষ্টান্তের অভাব, অপর দিকে ১৯৪১-পরবর্তী গ্রন্থপ্রকাশের ক্ষেত্রে সম্পাদকীয় বিবেচনাজনিত পরিবর্তনের বিশদ ব্যাখ্যা-সংবলিত পাদটীকার অভাব, তদুপরি অনিবার্য মুদ্রণপ্রমাদের চিরস্থায়িত্ব রবীন্দ্র-রচনার পাঠনির্ণয় সমস্যা ভাবীকালের পাঠককে এক দুস্ক্রমনীয় জটিলতার মধ্যে নিক্ষেপ করছে সন্দেহ নেই।

সাধারণ পাঠক পাণ্ডুলিপি এবং সকল সংস্করণের পাঠ তুলনা করে রবীন্দ্র-রচনা পড়বেন এটা আশা করা যায় না, তাঁরা হাতের কাছে সহজলভ্য পাঠেই সন্তুষ্ট থাকতে চাইবেন। অনুসন্ধিৎসু সতর্ক পাঠকের পক্ষেও পাণ্ডুলিপি এবং সকল সংস্করণের পাঠ তুলনা করা সর্বদা সম্ভব হতে পারে না। অথচ রবীন্দ্র-রচনার পাঠবিকৃতি রোধের দায়িত্বও অস্বীকার করা যায় না। বিভিন্ন সূত্রে বিভিন্ন পাঠ শেষ পর্যন্ত 'নানা রবীন্দ্রনাথ'কে পাঠকের সামনে এনে হাজির করবে বলে আশঙ্কা হয়। সমস্যাটির অস্তিত্ব সম্বন্ধে যদি কারও মনে কোনো সংশয় থাকে, তা নিরসনের উদ্দেশ্যেই বর্তমান নিবন্ধের অবতারণা। দৃষ্টান্ত বহুগুণিত করে এর পরিমাণের ধারণাও দেওয়া যেতে পারে। তবে পাণ্ডুলিপি, সাময়িকপত্রে মুদ্রিত পাঠ এবং অচিরে সকল সংস্করণ সংগ্রহ এবং তার ভিত্তিতে যাবতীয় পরিবর্তন সংকলন করা ভিন্ন কোনো স্থায়ী সমাধান আছে বলে মনে হয় না।

রবীন্দ্রনাথের সত্তাদর্শনে প্রাতিভবৃত্তির ভূমিকা

পবিত্রকুমার রায়

'Tis not solely in poetry and music we must follow our taste and sentiment, but likewise in philosophy.

—ডেভিড হিউম, *A Treatise of Human Nature*

If thought speaks deprecatingly of the imagination, imagination in its turn speaks deprecatingly of thought; and likewise with feeling. The task is not to exalt the one at the expense of the other, but to give them an equal status, to unify them in simultaneity; the medium in which they are unified is *existence*.

—সোরেন কীয়ের্কেগায়ার্ড, *Concluding Unscientific Postscript.*

রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক চিন্তা সম্প্রতি সত্তাদর্শন[১] (Philosophy of existence) রূপে স্বীকৃত হচ্ছে। বক্ষ্যমাণ নিবন্ধে তাঁর দার্শনিক চিন্তায় বা সত্তাদর্শনে প্রাতিভবৃত্তির ভূমিকাই বিশেষভাবে আলোচিত হবে। অধুনা বাংলায় ইংরাজি imagination-এর অর্থে 'কল্পনা' পদটি ব্যবহৃত হলেও ভারতীয় দর্শনের কয়েকটি শাখায়, যথা ন্যায় বা বৌদ্ধ দর্শনে, উক্ত পদ ইংরাজি hypothesis অর্থেই প্রসিদ্ধ। অথচ প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় অলংকারশাস্ত্রে 'প্রতিভা' 'imagination'-এর তাৎপর্যবাহী পদ। 'দৃষ্টি'[২] পদটি ভারতীয় বাগ্বিধি অনুসারে point of view সূচক। আনন্দবর্ধন ও অভিনবগুপ্ত উভয়েই প্রতিভা প্রসঙ্গে 'দৃষ্টি' পদটি প্রয়োগ করেছেন। 'বৃত্তি' পদটির দ্বারা দার্শনিক প্রসঙ্গে mode of action, function অথবা operation বোঝানো হয়। এবংবিধ বিচারে আমরা ইংরাজি the imagination অর্থে 'প্রাতিভবৃত্তি' পদটির প্রয়োগ করব। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের সত্তাদর্শনে প্রতিভা এক দৃষ্টিবিশেষ, এবং তা প্রাতিভবৃত্তির প্রকাশক। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, রবীন্দ্রনাথের সত্তাদর্শনে 'সত্তা' মানব অস্তিতা (existence)-রই দ্যোতক।

১

প্রাতিভবৃত্তির কোনো উল্লেখ সাম্প্রতিক কালের বিশ্লেষণবাদী দার্শনিকদের দ্বারা প্রস্তাবিত মানসবৃত্তিসূচক ধারণাবলীর তালিকায় দেখা যায় না। অথচ তাঁদেরই জনৈক পূর্বাচার্য, ডেভিড হিউম, প্রাতিভবৃত্তিকে তাঁর জ্ঞানতত্ত্বে (epistemology) মৌলিক পদবী দান করেছিলেন। প্রত্যক্ষবাদী (empiricist) দার্শনিক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে 'প্রতিভা'র সম্যক বিশ্লেষণও দুর্লভ। এর কারণ প্রত্যক্ষবাদী পরম্পরায় সুবিন্যস্ত সৌন্দর্যতত্ত্ব (aesthetics) প্রায় নেই। পক্ষান্তরে, বিজ্ঞানবাদী (idealist) দর্শনের অনুসারী সৌন্দর্যতত্ত্বে প্রাতিভবৃত্তির আলোচনা সুলভ। বিজ্ঞানবাদীগণের ব্যাখ্যায় প্রাতিভবৃত্তি সৌন্দর্যবিষয়ক অভিজ্ঞতা ও সৌন্দর্যেতর অনুভবের মধ্যে সেতু স্বরূপ।[৩] কান্টের বিজ্ঞানবাদেও প্রতিভা জ্ঞানের সম্ভবপরতার হেতুরূপে অন্যতম নৈসর্গিকবৃত্তি। হাইডেগার তাঁর *Kant and the Problem of Metaphysics*

গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন যে, কান্টের প্রথম *Critique*-এর যে-অংশে প্রাতিভবৃত্তির মাধ্যমে বুদ্ধির শুদ্ধ বিন্যাসী প্রকার (categories) গুলির রূপায়ণের (Schematization) আলোচনা আছে সেই অংশটিই উক্ত বিখ্যাত গ্রন্থের হৃদয়স্বরূপ। হাইডেগারের মতে মানুষের প্রাতিভবৃত্তি ও তার কালিক সত্তা (temporality) বৌদ্ধিকচেতনাকে সম্ভবপর করে তোলে। এই দুইয়ের সক্রিয়তার ফলে মানুষের জগৎ ও জীবনের অভিজ্ঞতা সার্থকতা পায়। কান্টের সমগ্র দার্শনিক রচনাতেই প্রাতিভবৃত্তির সক্রিয় ভূমিকা লক্ষণীয়।[৪] রবীন্দ্রনাথের সত্তাদর্শনেও অনুরূপ প্রবর্তনা লক্ষ্য করা যায়।

২

রবীন্দ্রনাথের সত্তাদর্শন যুগপৎ মানবতত্ত্ব (anthropologic) ও সৌন্দর্যতত্ত্ববিচার।[৫] উভয়ক্ষেত্রেই প্রাতিভবৃত্তি শুধু যে মানুষের মানসপ্রতিমা নির্মাণ এবং তার বিশ্বকে বিন্যস্তই করে তা নয়, তার সত্তারও নিয়ামক।

মানুষের বিশ্ব মানুষেরই সৃষ্টি, যার মূলে তার চৈতন্যের বিন্যাসী প্রকারগুলি সক্রিয়। কান্টের মতো রবীন্দ্রনাথেরও এইরূপ ভাবনা ছিল। বিষয়টিকে তিনি এইভাবে বলেছেন : মানুষের বুদ্ধির বহির্জাগতীয় বিস্তারের ফলে সৃষ্টি হয়েছে বিজ্ঞান। বহির্জগতের শৃঙ্খলায় মানববুদ্ধির মৌলিক বিধিগুলিরই (laws) অনুমোদন মেলে। জ্ঞানে মানুষেরবহির্জগৎ ও আন্তরজগতের মিলন ঘটে। একে আমরা রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধতত্ত্ব বলতে পারি। এই সম্বন্ধ স্থাপনের দ্বারাই মানুষের সৃজনশীলতা বিকশিত হয়ে ওঠে বলে তাঁর বিশ্বাস। মানুষ ও বিশ্বজগতের সম্বন্ধ স্থাপনে মানুষের জ্ঞানোন্মেষক বৃত্তিগুলির জগন্মুখিতা (intentionality) ক্রিয়াশীল থাকে। কান্ট যাকে চৈতন্যের বিন্যাসী প্রকারসমূহের বস্তুনিরপেক্ষ প্রয়োগ বলে অভিহিত করেছেন, তা অসম্ভব না-হলেও তা জগৎ থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন করে রাখে। কিন্তু যখন চৈতন্যের বিন্যাসী প্রকারগুলির দ্বারা আমরা জগৎকে জানি, সে-জগৎ জ্ঞাতার চৈতন্যের আলোয় উদ্‌ভাসিত জগৎ। রবীন্দ্রনাথ নানা ভাবে বলেছেন যে জ্ঞান জ্ঞাতার ধর্মেই সম্ভবপর হয়, সে তার স্বরূপকেই জগতে উপলব্ধি করে। তাই জ্ঞান হল জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের আনোন্যসম্বন্ধ। আর তা যেহেতু মানুষেই সম্ভব, তাই এই সম্বন্ধ জ্ঞাতার মানবস্বরূপের পরিচায়ক। জ্ঞাতা জ্ঞেয় বস্তুকে তার নিজ বিশ্বের বিষয় করে তোলে।

রবীন্দ্রনাথ-কথিত মানুষের বিশ্বের (man's universe) সত্তাসূচক পরিপ্রেক্ষিত (existential perspective)টি লক্ষ্য করা যাক। মানুষ প্রাণের ধারা বেয়ে দেশে কালে আবির্ভূত হয়েছে, এবং তার শ্রেষ্ঠতর বিকাশে সে জৈব প্রয়োজনের অতীত এক শক্তির লীলার সামর্থ্য অর্জন করেছে। ব্যক্তিচৈতন্য ক্রমশ পরিমাণ থেকে গুণে, জাড্য থেকে চেতনার স্ফূর্তিতে উপনীত হয়। এই উত্তরণের প্রতি পর্যায়ে মানুষ ও বিশ্বের সম্বন্ধের প্রকারভেদ ঘটতে থাকে নব নব মূল্য বা ইষ্টবোধের উদ্ভাসে। বস্তুত মানুষ যতই বিবর্তিত হতে থাকে, ততই তার সঙ্গে জগতের সম্বন্ধটিও বিস্তার লাভ করে, বাধ্যতা থেকে অহৈতুকতায়। মানুষ তার বিশ্বের সঙ্গে যতই সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্বন্ধ স্থাপনে সমর্থ হয়, ততই তার জীবন হয়ে ওঠে মুক্ত, অহৈতুক লীলাপ্রদ, সৃজনশীলতার দ্বারা অনুপ্রাণিত। ঠিক কী ভাবে এই অহৈতুকতা সম্ভবপর হয় তা মূলত এক রহস্য। তবে তা-যে ঘটে, তার অস্বীকৃতি সম্ভব নয়। এই রহস্য মানবসত্তারই প্রকাশের অনপনেয় রহস্য।

যে-স্তরে মানুষ জগৎকে কেবল বাহ্যিক পরিমাণভিত্তিক প্রয়োজনের দৃষ্টিতে দেখে, সে-স্তরে তার জীবন সদাই আপতিক সংকট থেকে উদ্ধার লাভ করা ও তদুপযোগী উপায়ের অন্বেষণেই ব্যয়িত হয়। এই স্তরে তার সক্ষমতা তার যথার্থ মুক্তির পরিচায়ক নয়। তখন তার দৃষ্টি তথ্য ও পরিমাণের অঙ্কের দ্বারা ভারাক্রান্ত থাকে। সে যেন বিশেষজ্ঞের চোখে বিশ্বকে পর্যবেক্ষণ করে। প্রচেষ্টায় সাফল্য লাভ করা, আবশ্যিকতা ও অর্থক্রিয়াকারিত্বের অনুবর্তী হওয়াতেই তার সত্তা তৃপ্ত হয়। রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় এই হল বদ্ধজীবের[৬] (physical man) পরিচয়। তবু মুমুক্ষার দ্বারা মানুষ তাড়িত হয়ে কখনো কখনো তার চৈতন্যকে আবিশ্ব বিস্তৃত করতে প্রয়াসী হতে পারে। আর তখনই সে যথার্থ মানুষ হয়ে ওঠে। যথার্থ মানুষ শুধু এক চৈতন্যময় সত্তা নয়, তার চেতনায় জাগ্রত থাকে এক ঐক্যের বোধ। জগৎ ও জীবনের বিচিত্র অনুভবকে সে ঐক্যসূত্রে গাঁথতে পারে। আর তার ফলেই সে তথ্য থেকে সত্যে, পরিমেয়তা থেকে গুণে, আবশ্যিকতা থেকে

নির্হেতুকতায়, অপ্রকাশ থেকে প্রকাশে নিজ স্বরূপকে উপলব্ধি করে। মানুষের এই আদর্শায়িত অথচ সম্ভবপর সত্তাকে রবীন্দ্রনাথ personal man আখ্যা দিয়েছেন।

মানুষের স্বরূপচৈতন্য প্রকাশাত্মক, সদা উত্তরণশীল। চেতনার আবিশ্ব প্রসারের দ্বারাই মানুষের আত্মোপলব্ধি ঘটে। 'অভ্যাসের-সীমা-টানা চৈতন্যের সংকীর্ণ সংকোচ'[৭]-এর ঔদাস্যকে অতিক্রম করে যে-বিস্ময়রস জন্ম নেয় তা-ই মানবসত্তার প্রকৃত পরিচায়ক। এই বিস্ময়রসই সৃজনশীলতার আকর।

সৃজনশীল চৈতন্যের সম্ভাবনার স্থাপনা রবীন্দ্রনাথ উদ্‌বৃত্ত তত্ত্বের প্রস্তাব করেছেন। এই তত্ত্ব তাঁর নানা রচনায়, কবিতায় ও গানে প্রকাশ পেলেও, বিশেষভাবে তাঁর ইংরাজি দার্শনিক প্রবন্ধে, যথা "what is art?" *Man* ও *The Religion of Man* ইত্যাদিতে বিশদীকৃত। উক্ত তত্ত্বের ব্যাখ্যায় তিনি মানবসত্তার এমন একটি শক্তি অথবা বৃত্তির কথা বলতে চেয়েছেন যার দ্বারা আমরা মানবিক ইষ্টসমূহের সম্ভবপরতার আশ্বাস পেতে পারি। রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যানুসারে মানবসত্তায় উদ্‌বৃত্ত কোটি হল তার জীবনযাত্রায় অভ্যাসের জাড্য, জৈবনীতির বাধ্যতা ও প্রাণধারণের জন্য আবশ্যিক কৃত্যাদির মণ্ডলের ঊর্ধ্বে এক মুক্তভূমি। মানুষের যা-কিছু ইষ্টবোধ, যা-কিছু সৃজনাত্মক তা সবই উদ্‌ভূত হয় এই উদ্‌বৃত্ত কোটি থেকে। রবীন্দ্রনাথ যদিও বলেন নি যে, উদ্‌বৃত্তের উৎস কোথায়। তবু আমাদের অভিজ্ঞতায় এমন কিছু তথ্য হয়তো পাওয়া দুর্লভ হবে না যার সাক্ষ্যে আমরা এই সার্বিক বচনকে সত্যি বলে গ্রহণ করতে পারি যে, মানুষের যা-কিছু সৃজনাত্মক তার উৎস হল মানবচৈতন্যের উদ্‌বৃত্ত কোটি।

মানবসত্তার নৈতিক ও জৈবিক জীবন প্রধানত কৃত্যমূলক। কিন্তু উদ্‌বৃত্ত কোটি মুখ্যত ক্রান্তদৃষ্টির ভূমি। এই ভূমিতে আরূঢ় মানুষ জগৎ ও জীবনকে স্রষ্টার চোখে দেখে, প্রকাশের আনন্দই উদ্‌বৃত্ত ভূমিবাসী মানুষের একমাত্র উদ্দেশ্য। উদ্‌বৃত্ত কোটির মানুষ সদা সৃসিক্ষু, কারণ এই ভূমিতে সে আপতিকতা ও প্রয়োজনসিদ্ধির বাধ্যতা থেকে মুক্ত বলেই যে ক্রীড়াশীল। প্রকাশাত্মক ক্রীড়া বা লীলামানতাই মানুষের স্বরূপ। অসীম সম্ভবপরতার পটভূমিতেই তার বিকাশ ও প্রকাশ।

৩

রবীন্দ্রনাথের উদ্‌বৃত্ততত্ত্বের দার্শনিক গোত্রবিচার বিশেষ তাৎপর্যময় হতে পারে। প্লেটোর *Jon, Apology* ও *Meno* প্রভৃতি সংলাপে মানবসত্তার এমন এক বৃত্তির কথা বলা হয়েছে যা নিছক বিধি (rule) ও পরিমেয়তা (measure) নয়। বরং তাকে প্রেরণা, আকাঙ্ক্ষা বা প্রতিভা বলাই সংগত। Phaedrus (246f)-এ কথিত হয়েছে, যে-আত্মা সত্যকে জেনেছে তার জন্ম হয় দার্শনিক, শিল্পী, প্রেমিক অথবা সংগীতজ্ঞ রূপে। অর্থাৎ দর্শনশাস্ত্রে প্রাতিভবৃত্তির ভূমিকা কবিতাদি শিল্পকেও স্পর্শ করে থাকে।

ইতিপূর্বে আমরা কান্টের দর্শনে প্রাতিভবৃত্তির ভূমিকার উল্লেখ করেছি। তাঁর মতে প্রাতিভবৃত্তি মানুষের গভীরতম বৃত্তিগুলির অন্যতম। যদি রবীন্দ্রনাথ মানুষের উদ্‌বৃত্ত কোটিকে তার অসীম সম্ভাবনার ভূমি (ontology of possibilities or hope) রূপে চিহ্নিত করতে চেয়ে থাকেন, তা হলে তা মানুষের প্রাতিভবৃত্তি, আর যাবতীয় ভবিতব্য চিন্তা ও কর্মের উৎসস্বরূপ। কান্ট ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই রোম্যান্টিক আদর্শের ভাবুক। সাধারণত কান্টকে পূর্বতসিদ্ধ *(a priori)* বৌদ্ধিক বিন্যাসী প্রকার বিষয়ক ভাবনার আচার্য রূপে দেখা হয়। কিন্তু জ্ঞান ও কৃত্যবিধির তত্ত্বের ক্ষেত্রে পূর্বতসিদ্ধ প্রকারের উদ্‌গাতা হলেও কান্ট তাঁর *Critique of Judgment* গ্রন্থে এমন অনেক কথা বলেছেন যা প্রকৃতপক্ষে তাঁর পূর্বতন দার্শনিক সিদ্ধান্ত ও পরিচয়কে নূতনতর রূপ দান করে। গ্যেয়ঠে যথার্থই বলেছিলেন যে, অনুভূতির পূর্বতসিদ্ধ প্রকারসমূহের প্রতিপাদনের দ্বারা কান্ট সমগ্র মানবসত্তার সৃজনশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। কান্টের দর্শনে মানবসত্তার সংবেদক (aesthetic) এবং উদ্দেশ্যমূলক (telcological) চিন্তার যে-স্থান তারই সমান্তরাল তত্ত্ব হল রবীন্দ্রনাথের উদ্‌বৃত্ততত্ত্ব।

কান্ট-পরবর্তী ও অনেকাংশে অনুবর্তী দার্শনিকদের চিন্তায় কান্টের ভাবনার প্রসার ও সমৃদ্ধি ঘটেছিল। শোপেনহাউয়ার[৮]

কাব্যের ও দর্শনের দূরত্ব অনেকটাই ঘুচিয়ে দিতে চেয়েছিলেন স্বজ্ঞার সাহায্যে ধারণাকে সমৃদ্ধতর করে তোলার আবশ্যকতা দেখিয়ে। কান্টের নিজের দর্শনেই এমনতরো ধারণার সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে যা একান্তভাবে প্রাতিভবৃত্তির দান। যথা তাঁর বিখ্যাত kingdom of ends নামক ধারণা, যা কদাপি বুদ্ধিজাত হতে পারে না। দর্শনের অন্যত্রও প্রাতিভবৃত্তি সক্রিয়তা লক্ষ্য করা যাবে। মার্ক্স-কথিত dictatorship of the proletariate প্রাতিভবৃত্তিজন্য ধারণা। অধুনা যাকে ideology বলা হয়, তা-ও একান্তভাবে, বুদ্ধিপ্রসূত হতে পারে না। অন্তত কর্মের ঔচিত্যবোধের প্রেরকরূপে প্রাতিভবৃত্তি দর্শনে সতত ক্রিয়াশীল থেকেছে। আর উচিত কর্মের দ্বারাই নূতন জগৎ সৃষ্টি সম্ভব হয়। যে-utopia বাস্তবকে সংশোধন করে তা প্রাতিভবৃত্তিরই দান। প্রাতিভবৃত্তির ভূমি যে-উদ্‌বৃত্ত কোটি তা 'আরো সত্যে'র জগৎ। রবীন্দ্রনাথের উদ্‌বৃত্ততত্ত্ব কান্ট-পরবর্তী বিজ্ঞানবাদী ও রোম্যান্টিক দর্শনের মানবতত্ত্বে প্রাতিভবৃত্তির মৌলিক ভূমিকা স্বীকার ক'রে তাকে অভিনবত্ব দান করেছে। এই বিষয়ে প্রাসঙ্গিক পাঠ *The Religion of Man* গ্রন্থের ১১ ও ১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।[৯]

৪

বিলিয়ম ব্লেক তাঁর এক কবিতায়[১০] প্রশ্ন করেছেন, যে-হাত বাঘের থাবা গঠন করেছে, সেই হাত-ই কি মেষশাবক সৃষ্টি করেছিল? এই প্রশ্নটি যদি তাৎপর্যহীন হয়, তা হলে আমরা প্রাতিভবৃত্তির দুইটি স্তর বা ভূমির কথা ভাবতে পারি। এই স্তর দুটি পরস্পরবিরোধী নয়, তারা একত্রে সক্রিয় থাকতে পারে, আবার কখনো কখনো একটি স্তরই সমধিক গুরুত্ব পেতে পারে কোনো স্রষ্টার ক্ষেত্রে। অবশ্য উভয়স্তরই সমভাবে সৌন্দর্যবেদী ও আধ্যাত্মিক। 'আধ্যাত্মিক' অর্থে আমরা সেই-সব অভিজ্ঞতাপুঞ্জকে বুঝব যার দ্বারা আমাদের জীবনবোধ নূতন রূপ লাভ করে। মনে রাখা প্রয়োজন যে রবীন্দ্রনাথের কাছে 'আধ্যাত্মিক' ও সৌন্দর্যবেদ্যতা প্রায় সমার্থক ধারণা। যে-অভিজ্ঞতা অথবা অনুভূতি এই জনমে জন্মজন্মান্তর ঘটায় তা যেমন সৌন্দর্যবেদী, তেমনই আধ্যাত্মিক। উভয় ক্ষেত্রেই আমাদের আত্মউত্তরণ ঘটে। উভয়েরই মূলে প্রাতিভবৃত্তির প্রেরণা থাকায় চৈতন্য ও তার বিষয়ের মধ্যে নবতর সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং বিষয়ের নবীভবন ঘটে যায়। প্রাতিভবৃত্তির ক্রিয়াশীলতা উপরোক্ত প্রকারের ত্রিমাত্রিক সম্বন্ধ বিশিষ্ট রূপে ভাবা যেতে পারে।

প্রাতিভবৃত্তি মূলত প্রকাশাত্মক। প্রাথমিক স্তরে আমরা কোনো বিষয়কে চেতনার বর্ণে রঞ্জিত করে প্রকাশ করি। বিষয়ের সঙ্গে চৈতন্যের এক অভূতপূর্ব সম্বন্ধ স্থাপনের ফলেই তা সম্ভব। এই অভূতপূর্ব সম্বন্ধ স্থাপনের ব্যাপারটি অনুভূতির মধ্যস্থতায় প্রাতিভবৃত্তির দ্বারা সাধিত হয়। আমাদের অনুভূতিরাজি সদাই বিষয়োন্মুখী (intentional)। অনুভূতির বিষয়ে বিস্তার ঘটলে বিষয়ের প্রতিযোগী চেতনায় যে-রূপান্তর ঘটে তা-কে আধ্যাত্মিক আখ্যা দেওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ ইন্দ্রিয় ও চেতনার পার্থক্য স্বীকার করেছেন বলে মনে হয়। ইন্দ্রিয়ের কাজ হল প্রত্যক্ষের পঞ্জীকরণ, আর চেতনার ধর্ম বিষয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করা। সৌন্দর্যবেদী চেতনা বিষয়কে নবতর সম্বন্ধের দ্বারা বিশিষ্ট করে তোলে। ন্যায়দর্শনে বলা হয় যে চক্ষুরিন্দ্রিয় তেজঃপদার্থ। চক্ষুর প্রভার সঙ্গে দৃশ্যবস্তুর সংযোগসন্নিকর্ষ ঘটলে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয়। চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের আবর্তিত (converse) রূপ হল যখন চৈতন্য বিষয়কে শোষণ করে নেয়, ও ফলে বিষয়ের চিন্ময় রূপান্তর ঘটায়। রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যা অনুসারে সৌন্দর্যবেদী প্রত্যক্ষ (aesthetic perception) হল einfühlung নামে খ্যাত মতবাদের আবর্তিত রূপ। সেজন্য বিষয়ের তত্ত্বৎতৎপ্রকার জ্ঞানের পরিবর্তে চৈতন্যের প্রাতিভবৃত্তির দ্বারা রূপান্তরিত হয়ে বিষয় অভূতপূর্বরূপে দেখা দেয়। সৌন্দর্যানুভূতির ক্ষেত্রে চৈতন্য যেমন জগতে অধ্যাসিত হয়, তেমনই জগৎ-ও চৈতন্যে প্রবিষ্ট হয়ে রূপান্তর গ্রহণ করে। 'হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি/জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি'—এই বিস্ময়াবহ অনুভূতি প্রাতিভবৃত্তির দ্বারা সম্ভবপর হয়ে ওঠে। ভাব ও রূপের অন্যোন্য রূপান্তর সৌন্দর্যবেদী চেতনার লক্ষণ বলে ধরা যেতে পারে। প্রাচীনেরা উক্ত চিদাবস্থাকে রসানুভূতি বলেছিলেন। যেন 'ইতিহাস-জালে বাঁধা নয়, এমন এক রূপের আবির্ভাব চৈতন্যের গোচরে আসে।

প্রাতিভবৃত্তির প্রকাশাত্মক ক্রিয়া আমাদের আবেগ (emotion) ও তদ্দোচিত বিষয়ের যোগ্যতার সামঞ্জস্যের উপর

নির্ভরশীল। মানুষের চৈতন্যে উক্ত সামঞ্জস্য সম্বন্ধের যে আকার (form) ধরা দেয় তা-ই অপূর্ববস্তু রূপে নির্মিত হয়। রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় আবেগের সঙ্গে অপূর্ববস্তু নির্মাণের প্রায় তাদাত্ম্য সম্বন্ধই স্বীকৃত হয়েছে। অন্তত সেই-সব আবেগ বা অনুভূতিগুলিই প্রকাশের স্তরে পৌঁছয় যেগুলি প্রত্যক্ষের বিষয়কে প্রতিমা (image)-য় রূপান্তরিত করতে পারে।

প্রকাশাত্মক প্রাতিভবৃত্তির আধ্যাত্মিকতা ও সৌন্দর্যবেদী স্বরূপ তদনুসারী চৈতন্যের সাহায্যে বোঝা যাবে। প্রকাশাত্মক প্রাতিভবৃত্তি যে-চৈতন্যের জনক তা জীবভাব বা অহংভাবকে অতিক্রম ক'রে বিস্তার লাভ করে, এবং হয়তো বা নবতর ব্যঞ্জনায় মণ্ডিত হয়ে ওঠে। এই রূপান্তর যেমন আধ্যাত্মিক, তেমনই সৌন্দর্যবেদী। প্রকাশাত্মক প্রাতিভবৃত্তির বিষয় রূপে আমরা নিসর্গ ও বিচিত্র মানব-সম্পর্ক মণ্ডলের ('মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই') উল্লেখ করতে পারি। তবে খণ্ড কাল এবং খণ্ড দেশের পটভূমিতেই প্রকাশাত্মক প্রাতিভবৃত্তি প্রতিমা গঠন করে থাকলেও কদাচিৎ অখণ্ড দেশ ও কালের স্পর্শ সেই প্রতিমাকে উদ্দীপিত করতে পারে। সাধারণত প্রকাশাত্মক প্রাতিভবৃত্তির রূপান্তর ঘটাবার শক্তি সীমিত। তা বিষয়ের নবীকরণ করতে যতটা সমর্থ, অপূর্ববস্তু নির্মাণে যে-পরিমাণ সক্ষম, চৈতন্যের রূপান্তরে ততটা সফল নয়।

৫

কাজেই প্রাতিভবৃত্তির অন্যতর এক ভূমির কথা বলা প্রয়োজন হয়ে পড়ে, যেখানে বিষয় ও চৈতন্য একাধারে রূপান্তরিত হতে পারে। বিলিয়ম ব্লেকের পূর্বোল্লিখিত প্রশ্নটির সূত্র ধরে বলা যায় যে, প্রকাশাত্মক প্রাতিভবৃত্তি মেষ-শাবকের ন্যায় ললিত লাবণ্যের সৃষ্টি করলেও ভীষণসুন্দর ভয়াল বাঘের থাবা নির্মাণে অসমর্থ। অন্য উদাহরণের সাহায্যেও বিষয়টি আমরা বোঝার চেষ্টা করতে পারি। এলিফ্যান্টার মহেশমূর্তি, অনুরাধাপুরের সমাধিস্থ বুদ্ধ, লীয়রের উন্মত্ত প্রলাপ, কালী বা নৃসিংহের ধ্যান, ঋগ্বেদের নাসদীয় সূক্ত, Prometheus Bound নাটকে পঞ্চদশ পর্বে প্রমিথিউসের দ্বিতীয় গানটি, দান্তের ইনফার্নো, গ্যোয়ঠের ফাউস্টের walpurgis night-নামক দৃশ্য, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের জীবনের শেষ দশকে রচিত কাব্য ও চিত্রাবলী প্রাতিভবৃত্তির যে-ভূমির ফসল— কাংড়া চিত্রকলা, বৈষ্ণব পদাবলী, কালিদাসের কাব্য প্রভৃতির সৃষ্টি সেই তুলনায় যেন অন্যত্র-সম্ভব বলে মনে হয়। নীটশে[১১]-কথিত আপোল্লোনীয় ও ডাইওনিসীয় প্রতিভা বা প্রেরণার কথা স্মরণে রেখে আমরা প্রাতিভবৃত্তির প্রকাশাত্মক ও তদতিরিক্তি এক চরম ও মৌলিক সৃজনাত্মক ভূমির কল্পনা করতে পারি।

এই দ্বিতীয়োক্ত ভূমি প্রচণ্ড বিস্ফোরক শক্তি যেন 'an incessant explosion of freedom'।[১২] এই মৌলিক সৃজনাত্মক ভূমি প্রকাশের সাহসিকতায়, নবতর রূপনির্মাণের আকস্মিকতায় ও আলোড়িত চৈতন্যের উদ্ভাসে আমাদের বিচলিত করে। প্রকাশাত্মক প্রাতিভবৃত্তি চেতনার সজ্ঞান স্তরটিকেই অনুসরণ করে। কিন্তু যাকে আমরা মৌলিক সৃজনাত্মক প্রাতিভবৃত্তির স্তর বলছি তা একাধারে সমগ্র মানস জগৎ, অর্থাৎ সজ্ঞান ও নির্জ্ঞান মনকে আলোড়িত করে প্রকাশের সীমায় নিয়ে আসে। এর ফলে ব্যবহারিক জগতের রীতি নীতি, জাড্য ও অভ্যাসের দ্বারা সীমিত চৈতন্যের পরিবর্তে এক মৌলিক মুক্ত চৈতন্য সৃষ্টিতে আভাসিত হয়ে ওঠে। মুক্ত চৈতন্যের লক্ষণ হল এক অনাবিল, নিরাসক্ত স্বচ্ছ দৃষ্টি যা প্রকাশাত্মক প্রাতিভবৃত্তির প্রকাশে সর্বদা স্বচ্ছন্দ না-ও হতে পারে। কারণ খণ্ড কাল ও খণ্ড দেশের পর্বভূমিতেই প্রকাশাত্মক প্রাতিভবৃত্তি সক্রিয় থাকে।

হয়তো প্রাতিভবৃত্তির এমনতর প্রবল প্রকাশ সামর্থ্যকে মনে রেখেই প্লেটো তাঁর Jon (533 f) সংলাপে মন্তব্য করেছিলেন যে কবিরা এক মুগ্ধ অবস্থায় তাঁদের অমূল্য শব্দরাজিকে উচ্চারণ করেন। কিংবা কান্টের ভাষায়, মানুষ প্রাতিভবৃত্তির সাহায্যে তার পরমার্থিক সত্তার মুখোমুখি দাঁড়ায়।[১৩] রবীন্দ্রনাথও লুপ্তিগুহা থেকে চৈতন্যের মুক্তির কথা বলেছেন। তাঁর মতে জীবনের যা-কিছু মূল্যবান তা লালিত হয় চেতনার অন্ধকার স্তরে।[১৪] নির্জ্ঞান মনের আলি ভেঙে গেলে মানুষ দৈনন্দিন জীবনের কৃত্রিমতা থেকে মুক্তি লাভ করে ও তার সত্তার সত্যপরিচয় পেতে পারে। সে পরিচয় যদি 'রক্তের অক্ষরে' লেখা হয়, তবে প্রকাশাত্মক প্রাতিভবৃত্তি তার বাহন হতে পারে না।

শিল্পে ও সাহিত্যে মানব-সত্য প্রকাশের জন্য অকৃত্রিম মুক্ত মানসের নির্মোহ দৃষ্টির মূল্য অপরিসীম। অভ্যাসের জাড্যের

নিরাপত্তা থেকে মুক্তি লাভ করা সহজ নয়। জীবনে ও শিল্পে, উভয় ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথ এই দৃষ্টি লাভ করার সাধনার কথা বলেছেন। এই সাধনাই সৃজনশীল চৈতন্যের ধর্ম। মানবতত্ত্ব ও সৌন্দর্যতত্ত্ব রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় একীকৃত হয়ে দেখা দিয়েছে। নীটশে প্রাতিভবৃত্তির মৌলিক সৃজনাত্মক শক্তির পরিচয় দিতে গিয়ে যে-দুইটি উপমা প্রয়োগ করেছিলেন এ-প্রসঙ্গে আমরা তা স্মরণ করতে পারি। তিনি বলেছিলেন যে মৌলিক সৃজনাত্মক ডাইওনীসিয় প্রাতিভবৃত্তি ক্রীতদাসকে তার হৃত স্বাধীনতা ফিরিয়ে দেয়, অথবা আমাদের চোখের সামনে দোদুল্যমান মায়ার অনতিক্রম্য যবনিকাকে মুহূর্তে ছিন্ন করে ফেলে।

৬

তবে প্রাতিভবৃত্তির যে দুই ভূমির কথা বলা হল তারা পরস্পর বিরোধী নয়। বরং তাদের পারস্পরিক পরিপূরকতাই প্রাতিভবৃত্তির পূর্ণতার সূচক। সৃজনশীলতা হল সহিতত্ব, চেতনার পারক্য (alienation) বা বিচ্ছিন্নতাবোধকে অতিক্রম করা। এমন একটি ধারণা রবীন্দ্রনাথের নানা রচনায় পাওয়া যায়। সৃজনাত্মক প্রয়াসের দ্বারাই ব্যক্তিমানুষ যথার্থ ভাবে আত্মপ্রকাশ করে, কারণ সত্তার ঐক্য ও পূর্ণতা সৌন্দর্যবোধের উপলব্ধি করা যায় যখন সৌন্দর্যবেদী অনুভূতির দ্বারা বিচ্ছিন্ন চেতনা নিজেকে অতিক্রম করতে পারে। রবীন্দ্রনাথের মতানুসারে পারক্যই মানুষের মৌলিক সংকট, যার নিরসনে শিল্প বা সাহিত্য, যা প্রাতিভবৃত্তির দান, বিশেষ ভাবে উপযোগী। কেউ কেউ বলে থাকেন যে, দর্শনশাস্ত্রের উপজীব্য হল মানব সংকটের পর্যালোচনা ও তার নিরোধমার্গ প্রস্তাব করা। রবীন্দ্রনাথ তাঁর মানবতত্ত্বের প্রাতিভবৃত্তির দ্বারা যা করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন তাকে বলা যায় literature as philosophy।

৭

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছিল যে মৌলিক সৃজনাত্মক প্রাতিভবৃত্তি প্রকাশাত্মক প্রাতিভবৃত্তির মতোই আধ্যাত্মিক ও সৌন্দর্যবেদী। জীবভাবনার উত্তরণে সহায়ক ও ব্যবহারিক জীবনবোধের স্থলে এক নিরাসক্ত দৃষ্টির জনকরূপেই তা আধ্যাত্মিক। জীবত্বের উত্তরণ, নিরাসক্তি ও সামঞ্জস্যচেতনা প্রাতিভবৃত্তির মৌলিক সৃজনাত্মক ভূমিতে চরম পরিণতি লাভ করে যার ফলস্বরূপ মানবচৈতন্য নবতর রূপে সৃষ্ট হয়ে ওঠে। নির্মাণ বা প্রকাশের বৈশিষ্ট্যেও প্রাতিভবৃত্তির এই ভূমিটি বিশিষ্ট। এই প্রাতিভ ভূমির সৃষ্টি সামান্যত রূপকাত্মক (figurative)– ধ্বন্যাত্মক (suggestive) ও ইম্‌প্রেশনিস্টিক হয়ে থাকে। কাজেই সহজ সঞ্চার (communication) এ-ক্ষেত্রে দুর্লভ। আবার সৌন্দর্যবেদী হলেও মৌলিক সৃজনাত্মক প্রাতিভবৃত্তির সৃষ্টির লক্ষ্য প্রচলিত রুচিসম্মত প্রতিমা নির্মাণ করা নয়। উপভোগ্যতা অপেক্ষা সত্তার অকুণ্ঠ প্রকাশের উদ্দেশ্যই তার পরিচালক। বৈদিক রূপকের[১৫] সাহায্য নিয়ে বলা যায়, সত্যের মুখ যে-হিরণ্ময় পাত্র দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে প্রকাশাত্মক প্রাতিভবৃত্তি তারই বিচিত্র বর্ণালিতে বিলসিত হয়। পক্ষান্তরে, মৌলিক সৃজনাত্মক প্রাতিভবৃত্তি সেই হিরণ্ময় পাত্রের অন্তরালকে অপসারিত ক'রে সত্যের কঠিন নিরাভরণ রূপকে প্রকাশ করতেই আগ্রহী। তদনুসারে এক নবতর সৌন্দর্যতত্ত্বের প্রস্তাব ও রুচি গঠিত হয়ে ওঠে। সে সৌন্দর্য 'easy beauty'[১৬] নয়, তা 'terrible beauty'[১৭]।

কান্টের জ্ঞানতত্ত্বে উপাদান কারণ অর্থে 'Constitutive' শব্দটির প্রয়োগ প্রসিদ্ধ। কিছু ধারণা আছে যা জ্ঞান ও কর্মের নিয়ন্ত্রক। কান্ট তাদের 'regulative' বলেছেন। কিছু প্রকার বা category জ্ঞানের সম্ভবপরতার অন্যতম উপাদান কারণ। সাধারণ ব্যবহারিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে বাহ্যজগৎ প্রত্যক্ষের বিষয়। কিন্তু মৌলিক সৃজনাত্মক প্রাতিভবৃত্তি যে সত্য বা সত্তার স্থাপনা করে তা বাহ্যবস্তু নিরপেক্ষ। সেই কারণে আমরা বলতে পারি যে শ্রেষ্ঠ কাব্যে ব্যক্ত সত্তা শব্দানুবিদ্ধ। প্রাতিভবৃত্তিই তার যাথার্থ্যের উৎস। প্রাতিভ সত্য বা ইষ্ট কদাপি বিষয়গত হতে পারে না, তা প্রতিভাগত। অথবা আত্মগত। কিয়ের্কেগার্ড নৈতিকতার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মানবসত্যকেই প্রকৃত সত্য বলতে চেয়েছিলেন। তেমনি প্রাতিভ সৃষ্টির স্বাতন্ত্র্য রক্ষার্থে রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন যে, মানুষের আবেগাশ্রয়ী প্রাতিভবৃত্তির প্রেক্ষাপটেই সত্যের আবির্ভাব

ঘটে। 'সত্য' শব্দটি দ্বারা 'reality' ও 'truth' দুই-ই উদ্দিষ্ট হতে পারে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ইংরাজি রচনায়, reality শব্দ প্রাতিভ সত্যের বা যাথার্থ্যের অর্থে প্রয়োগ করেছেন। এবং এই প্রয়োগটি খুবই বিশিষ্ট। সত্য যে কেবল আমাদের চেতনার বিষয় তা নয়, তা আমাদের গভীরভাবে উদ্‌বেজিত করে। সত্যই প্রকাশযোগ্য, তা-ই যা আমরা যথার্থরূপে প্রকাশ করি তা-ই সত্য। সত্যের প্রকাশের দ্বারা মানুষ নিজেকেই সত্যের আলোকে পুনঃসৃষ্টি করে থাকে। মানুষের এই আত্মসৃষ্টি একাধারে মানবসত্তার ও শিল্পগত সত্তার উপাদান। মৌলিক সৃজনাত্মক প্রাতিভবৃত্তি যে সত্তাকে সৃষ্টি করে সে-সত্তা স্বতোপ্রামাণ্যসত্তা। কোনো শব্দশক্তি (semantics) দ্বারা তার যাথার্থ্য বিচার করা চলে না। তাই আমরা আরো বলব যে প্রাতিভবৃত্তির এই ভূমি নিরবধি দেশ ও কালের পটভূমিতে স্ফূর্তি লাভ করে। অর্থাৎ প্রাতিভ সত্য প্রপঞ্চকে স্তম্ভিত করে, রূপ ও বস্তুর অপেক্ষা ধ্বনিপ্রাণ সত্তার স্থাপনা করতে সক্ষম হয়।

৮

প্রাতিভবৃত্তির যে-বিস্তর পরিচয় আমরা দেওয়ার চেষ্টা করেছি তা মুখ্যত রবীন্দ্রনাথেরই নানা মন্তব্য ও রচনার উপর প্রতিষ্ঠিত। এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয় হল যে, বিজ্ঞানবাদীরা মানুষের মানসবৃত্তিগুলিকে বুদ্ধিমূলক (cognitive), ইচ্ছামূলক (conative), আবেগমূলক (affective) প্রভৃতি প্রকারে বিভাজিত করে দেখে থাকেন। রবীন্দ্রনাথ মানবচৈতন্যের এইরূপ বিভাজন সমর্থন করেন না। তাঁর মতে বিভিন্ন মানসবৃত্তিগুলি একই চেতনাসত্তার বিভিন্ন প্রেক্ষিত মাত্র। বিজ্ঞানবাদীরা মনে করেন যে প্রাতিভবৃত্তি প্রধানত আবেগমূলক মানসবৃত্তি। অর্থাৎ তাঁদের মতে যাবতীয় মানসবৃত্তি সমভাবে জ্ঞানগত তাৎপর্যময় নয়। কিন্তু সৌন্দর্যবেদীমতি (Aesthetic attitude) জ্ঞানের প্রকারবিশেষ না-হলেও তা যে জ্ঞানের পূর্বশর্ত হতে পারে, কার্যের এই ধারণা হয়তো রবীন্দ্রনাথও পোষণ করতেন। রবীন্দ্রনাথের মতে অনুভূতি ও বিষয় এমনই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে বিধৃত যে, উভয়ের পরিচ্ছিন্নতা অবাস্তব। এই কারণেই তিনি বলেছেন যে, শিল্প (art) হল সৃসিক্ষু আত্মার সত্যের ডাকে সাড়া দেওয়ার ঘটনা।

আমাদের প্রস্তাবিত প্রতিভার বিস্তর বিবরণ নানাভাবে মূল্যবান বলে বিবেচিত হতে পারে। প্রাতিভবৃত্তির স্বরূপ বা ভূমি অনুসারে তদনুযায়ী সৃষ্টির উপভোগ বা আলোচনাই সংগত। সাহিত্য বা চিত্রকলায় যে সৃষ্টিবৈচিত্র্য তা সর্বদা একই রসপ্রস্থান দ্বারা বোধ্য, উপভোগ্য বা উপলব্ধ হতে পারে না বলেই আমাদের বিশ্বাস। রবীন্দ্রনাথেরই নিজ সৃষ্টিতে প্রাতিভবৃত্তির ভিন্নতা হেতু বিভিন্ন রসমূর্তির আবির্ভাব ঘটেছে। তাদের প্রকৃত আস্বাদনের জন্য ভিন্নতর সৌন্দর্যতত্ত্বের প্রস্তাবই সমীচীন মনে হয়।

তাঁর জীবনের শেষ দশকের কোনো কবিতায় রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টিকর্মকে চৈতন্যের আবরণ মোচনের কাজ বলে উপমিত করেছিলেন। চৈতন্যের স্তরভেদের ধারণাটি সৃষ্টির স্বরূপ উপলব্ধি করার জন্য বিশেষ আকর্ষণীয় বলে বিবেচিত হতে পারে। শ্রীঅরবিন্দ[১৮] তাঁর কাব্যতত্ত্ব-বিষয়ক রচনায় তদীয় অধিবিদ্যার বিশিষ্ট এক ধারণাকে প্রয়োগ করে অতিমানসের কাব্যের কথা বলেছেন। আমাদের প্রস্তাবিত চৈতন্যের অথবা প্রাতিভবৃত্তির স্তরভেদ উপরোক্ত ব্যাখ্যার পদ্ধতিকে সমর্থন করে। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যতত্ত্ব তাঁর মানবতত্ত্বের এমনই অনুগত যে মানবসত্তার স্বরূপকে বিশ্লেষণ করলে তার সৃজনশীলতার রহস্যও অধিগম্য হবে। আবার সৃষ্টির বৈচিত্র্যকে সম্যক উপলব্ধি করতে হলে তার প্রকাশক চৈতন্য অথবা প্রাতিভবৃত্তির স্বরূপ বিষয়ক আলোচনা আবশ্যিক হয়ে ওঠে।

নির্দেশপঞ্জী :

১ পবিত্রকুমার রায়, 'রবীন্দ্রদর্শন', বিশ্বভারতী ; সান্ত্বনা মজুমদার, 'রবীন্দ্রনাথের সত্তাদর্শন', বিশ্বভারতী।

২ 'দৃষ্টিরিতি প্রতিভারূপা', ধ্বন্যালোক— লোচন। তুলনীয় : 'দ্বে বর্তমানী গীরাম্ দেব্যাঃ শাস্ত্রম্ চ কবিকর্মচ'

৩ Roger Scruton, *Art and Imagination*, Methuen & Co, 1974.
৪ R. Sundara Rajan, "Critique and Imagination," *Indian Philosophical Quarterly*, vol XIII, 1986.
৫ P. Roy, "Tagore's Theory of Art", *Visva-Bharati Quarterly*, vol. 45, 1979.
৬ Tagore, *Personality*, Macmillan, London, pp 3-4; 11-12
৭ "নীলমণিলতা", 'বনবাণী', বিশ্বভারতী।
৮ *The World as Idea*, Modern Library, New York, 1928, p. 186.
৯ *The Religion of Man*, George Allen & Unwin, London, 1970, pp. 11 and 15.
১০ ব্লেকের The Tyger : "Did he who made the Lamb make thee?"
১১ *The Birth of Tragedy* দ্রষ্টব্য।
১২ Tagore, *On Art & Aesthetics*, ed. P. Neogy, Orient Longmans, New Delhi, 1961, p. 49.
১৩ *Critique of Judgment*: "noumenal substrate".
১৪ *On Art & Aesthetics*, p. 12.
১৫ ঈশোপনিষদ, ১৫
১৬ *Critique of Judgment* দ্রষ্টব্য।
১৭ W. B. Yeats, "Easter, 1916".
18 *The Future Poetry* এবং P. Roy, "Poetry and Truth in Sri Aurobindo", *Sri Aurobindo Society Annual*, Baroda, 1984.

রবীন্দ্রচিন্তায় ও সৃষ্টিতে নারীমুক্তির ভাবনা

মালিনী ভট্টাচার্য

বিশাল ও সমৃদ্ধ রবীন্দ্রসাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁর নারীমুক্তির ভাবনা একটি দিক মাত্র। এই প্রশ্নটি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রধানত ব্যাপৃত ছিলেন না, প্রসঙ্গত ব্যাপৃত ছিলেন শুধু। তাঁর চিন্তায় ও সৃষ্টিতে তাই নারীমুক্তির ভাবনা অনেকসময়েই কোনো পরিষ্কার সামগ্রিক রূপ নেয় না, বার বার উপস্থিত হলেও তা আসে খণ্ডিতভাবে, আসে অন্য ভাবনার স্রোতে ভেসে। আজ যে নারীমুক্তিবাদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তাঁর রচনার পুনর্গঠনে আগ্রহ দেখা যাচ্ছে তার কারণ এই নয় যে আজ আমাদের কাছে প্রশ্নটার যতটা গুরুত্ব, রবীন্দ্রনাথের কাছেও তার সেই একই গুরুত্ব ছিল— বা থাকা উচিত ছিল। কিন্তু যে-কোনো বিষয়ে গবেষণার ক্ষেত্র কখন কোন্‌দিকে সম্প্রসারিত হবে, তা শুধু তার অন্তর্লীন যুক্তির ওপর নির্ভরশীল নয়। সেই ক্ষেত্রের বাইরেও জ্ঞানের চর্চা যখন যেভাবে এগিয়ে যায়, তার প্রভাব ঐ বিশেষ ক্ষেত্রের ওপর পড়তে বাধ্য। নারীমুক্তিবাদী তত্ত্ব ও আন্দোলনের ইতিহাস যদিও অনধিক দুশো বছরের পুরোনো, তবু এ কথা মানতেই হবে যে গত পনেরো-কুড়ি বছরে তা একটা নতুন পর্যায়ে প্রবেশ করেছে এবং তত্ত্ব ও আন্দোলন দুদিক থেকেই আমাদের নজরের একেবারে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। ঠিক এই কারণেই আজ রবীন্দ্রচর্চার ক্ষেত্রেও তা গবেষণার বিষয় হিসাবে প্রবেশাধিকার পেয়েছে ; এই প্রসঙ্গে তিনি যা বলেছেন তা যেমন গুরুত্বলাভ করেছে, তেমনি তাঁর চেতনায় যা উহ্য রয়ে গেছে, যা খণ্ডিত রয়ে গেছে, তাও আমাদের অনুসন্ধিৎসা জাগাচ্ছে।

গবেষণার প্রথম কাজ তার অভিজ্ঞেয় বা problematic কী হবে, অর্থাৎ আমাদের বিষয়টির কাছ থেকে আমরা কী জানতে চাইব, তা ঠিক করে নেওয়া। রবীন্দ্রনাথ নারীমুক্তিবাদী ছিলেন, না তিনি নারীমুক্তিবাদের বিরোধী ছিলেন। প্রশ্ন করার এই ধরনটাই বিভ্রান্তিসূচক। নারীমুক্তিবাদেরও একটা ইতিহাস আছে, আমাদের দেশের পরিপ্রেক্ষিতেও আছে। রবীন্দ্রনাথ যখন লিখছিলেন, তখন এই ইতিহাস কোন্ পর্যায়ে ছিল, এ বিষয়ে কথা বলতে গেলে কোন্ কোন্ দার্শনিক আদল ও শিল্প-আদল তখন লেখকদের কাছে লভ্য ছিল এটা আমাদের প্রথম প্রশ্ন হওয়া উচিত। কোনো লেখকের বাস্তববীক্ষণ শূন্যমার্গে হয় না, এই চলিত আদলগুলির একটি অন্যটি কখনো একটি কখনো অন্যটির মারফতই হয়। নারীত্বের যে ভাবাদর্শগুলি রবীন্দ্রনাথের সময়ে আদৌ উপস্থিত ছিল না, তার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে রবীন্দ্রনাথকে দেখতে গেলে মানবচিন্তার ঐতিহাসিকতাকে অস্বীকার করতে হয়। কিন্তু তাই বলে আমাদের প্রতিপাদ্য নয় স্থানকালগত নিছক আপেক্ষিকতা। তা হলে আজকের প্রশ্নগুলির পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের পুনর্গঠনের কথাই উঠত না। আজকের নারীমুক্তিবাদী চিন্তায় রবীন্দ্রনাথ প্রাসঙ্গিকতা পান এই কারণেই যে তাঁর সময়ে লভ্য আদলগুলি বাস্তবের রূপায়ণে ব্যবহার করতে গিয়ে, অনেকসময়ে নিজের অজ্ঞাতেও তাদের অন্তর্লীন অসংগতি ও অদৃশ্য ফাটল তাঁর রচনায় ধরে ফেলেন তিনি। ঐ আদলের চৌহদ্দিতে যে সত্য চাপা পড়ে গেছে বা বাদ পড়ে গেছে এই-সব অঙ্গীকৃত অসংগতি থেকে আজ তা আমরা অনুমান করে নিতে পারি।

যেমন, 'দেবী চৌধুরানী' উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র প্রফুল্লকে অন্তঃপুরে ফিরিয়ে এনেছেন ; যে ব্যবস্থায় সে লাঞ্ছিত ও বিতাড়িত হয়েছিল তাকে মেনে নেওয়াকে বলেছেন তার ধর্ম। এই সামগ্রিক রক্ষণশীলতা তাঁর শিল্পকৃতির একটা মূল শর্ত, হয়তো এটা তাঁর স্বীকৃত মতবাদও বটে। কিন্তু আজ আমরা যখন উপন্যাসটির পুনর্গঠনে প্রবৃত্ত হই তখন কি তার

আকৃতিতে আমরা এই মসৃণ নিটোল রক্ষণশীলতাই শুধু দেখি, না দেখি সেই ফাটলগুলিকেও যা প্রফুল্ল'র জীবনের অসংগত, নিষ্ঠুর বাস্তবের পরোক্ষ স্বীকৃতি ? প্রফুল্লকে 'দেবী'তে পরিণত করার যে পরিকল্পিত ভোজবাজি তা কি ঐ ফাটলগুলোকেই আরো স্পষ্ট করে তোলে না ? এই আদর্শগুলির অস্তিত্ব স্থানকালনির্ভর বলেই, পরিস্থিতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের ব্যবহারিক রূপে এই-সব অসংগতি স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। চিন্তার আদলগুলির সঙ্গে শিল্প-আদলগুলির কোনো সরল সাযুজ্যও কখনোই দেখা যায় না। এইভাবেই আমাদের অর্থের এষণা জটিল থেকে জটিলতর ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে থাকে।

রবীন্দ্রচর্চায় নারীমুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগের দাবি নিয়ে ইতিমধ্যে কেতকী কুশারি ডাইসন যে বইটি প্রকাশ করেছেন, তার সম্বন্ধে আমাদের মূল সমালোচনা এই যে, এই ক্ষেত্রে অভিজ্ঞেয়টি কী হতে পারে তা নির্দেশ করতে বইটি সাহায্য করবে বলে আমরা আশা করেছিলাম, কিন্তু সে আশা ব্যর্থ হয়েছে।[১] রবীন্দ্রনাথের নারীমুক্তিচিন্তার বিরাট ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটটিকে তিনি অগ্রাহ্য করেছেন এবং ওকাম্পোর সঙ্গে দেখা হবার আগের রবীন্দ্রনাথ ও পরের রবীন্দ্রনাথ— এই প্রভেদটুকু ছাড়া স্থানকালগত কোনো প্রভেদই আর করেন নি। অথচ ওকাম্পোর সঙ্গে দেখা হবার আগে রবীন্দ্রনাথের যে দীর্ঘ সাহিত্যজীবন, সেখানে সব জেনেবুঝেও নারীমুক্তির প্রশ্নটিকে রবীন্দ্রনাথ এড়িয়েই গেছেন, এই তত্ত্ব বোধ হয় আমাদের কারও রবীন্দ্রসাহিত্যের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলবে না। এই প্রসঙ্গে তাঁর কী কী বোঝা উচিত ছিল তা নিয়ে কেতকী কুশারি ডাইসন রবীন্দ্রনাথকে অনেক তিরস্কার করেছেন, কিন্তু প্রশ্নগুলি কোন্ পর্বে কী আকৃতিতে রবীন্দ্রনাথের কাছে আসা সম্ভব ছিল, তা একবারও বিবেচনা করেন নি। ফলে নারীমুক্তিবিরোধী রবীন্দ্রনাথ ও নারীমুক্তিবাদে ধর্মান্তরিত রবীন্দ্রনাথ এই দুয়ের মধ্যে সম্পর্কটি নিতান্তই যান্ত্রিক, অতি সরলীকৃত হয়ে পড়েছে। এই ধরনের বই পরোক্ষে উৎসাহিত করে এই রক্ষণশীল মতবাদকে, যে রবীন্দ্রচর্চায় নারীমুক্তির প্রসঙ্গের আমদানিটাই মোটামুটি অবান্তর। সৌরীন্দ্রনাথ মিত্র,'রবীন্দ্রনাথ ও ভিক্‌তোরিয়া ওকাম্পোর সন্ধানে' বইটির সমালোচনায় কিছুটা এ ধরনের মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন।[২] বইটি সম্বন্ধে তাঁর আপত্তিগুলি খুবই যুক্তিগ্রাহ্য। কিন্তু আগাগোড়া 'feminist' কথাটিকে তিনি প্রায় একটি গালাগাল হিসেবেই ব্যবহার করেছেন, আর রবীন্দ্রচর্চায় নারীমুক্তিবাদী প্রশ্নগুলিকে একতরফা বাতিল করেছেন এই বলে, যে নারী ও পুরুষের স্বভাবী প্রভেদগুলিকেই রবীন্দ্রনাথ রক্ষণীয় বলে মনে করেছেন, নারীপুরুষের মধ্যে সামাজিক, রাজনৈতিক, কর্মগত, শিক্ষাগত অসাম্যগুলিকে প্রশ্রয় দেবার কথা কখনোই বলেন নি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে এই স্বভাবী প্রভেদগুলি যা ছিল, তা কি আজকের নারীমুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে মেলে ? কাজেই সৌরীন্দ্রনাথ মিত্রও আসল প্রশ্নটিকে আমল দেন নি এ কথা বলতেই হবে। এই মনোভাবও রবীন্দ্রচর্চার ব্যাপ্তিতে সাহায্য করবে না। এই দুই রবীন্দ্র-গবেষকের বিতর্কের যা সম্পাদ্য, তাকে পেছনে ফেলে তাই আমাদের গোটা প্রশ্নটিকেই নতুন ভাবে উপস্থাপনা করতে হবে।

'স্ত্রী-স্বাধীনতা'র একধরনের ধারণা বঙ্গসমাজে রবীন্দ্রনাথের ছোটোবেলাতেই চালু হয়ে গেছে। দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ ব্রাহ্মসমাজে যাঁরা 'স্ত্রীস্বাধীনতার দল' বলে পরিচিত ছিলেন তাঁরা ১৮৭২-৭৩ সাল থেকে বাল্যবিবাহ, 'স্ত্রীস্বাধীনতার বিপক্ষে, স্ত্রীশিক্ষার স্বার্থেই যে শুধু সংগঠিত কাজ করছিলেন তাই নয়,১৮৭৮ সালে একটি 'ঘননিবিষ্ট দল' সৃষ্টি করে সামাজিক ও পারিবারিক ক্ষেত্রে নারীপুরুষের সমানাধিকারের স্বীকৃতিকে তার একটি আবশ্যিক শর্ত হিসাবে লিপিবদ্ধ করেন।[৩] ১৮৭৮ সালে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার পর সেখানে নারীপুরুষ নির্বিশেষে সকলের ভোটাধিকারও (universal suffrage) নীতিগতভাবে স্বীকৃত হয়।[৪] এই পর্বে এই-সব দাবির নেতৃত্ব স্বভাবতই এসেছিল যুক্তিবাদী, উদারনৈতিক কিছু মধ্যবিত্ত পুরুষের কাছ থেকে। কিন্তু বলা যায়, মধ্যবিত্তের জাতীয় জাগরণের সমাজসংস্কার প্রধান এই পর্বটিতে, বিধবা বিবাহ আইনের প্রচলন, স্ত্রীশিক্ষার আন্দোলন ও ব্রাহ্মসমাজের কতিপয় অগ্রসর মানুষের মধ্যে পূর্বোক্ত দাবিগুলি ওঠার ফলে মধ্যবিত্ত হিন্দু-ব্রাহ্ম মেয়েদের পক্ষেও বিকল্প ব্যক্তিত্ব এবং নারীজীবনের বিকল্প আদলের সম্ভাব্যতা কিছুটা স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। শিবনাথ শাস্ত্রীর 'আত্মচরিতে' যে মহালক্ষ্মী বা গণেশসুন্দরীদের কথা আমরা পাই তাঁরা কেউই চারিত্রিক দিক থেকে তেমন কিছু অসাধারণ ছিলেন না।[৫] কিন্তু রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের চৌহদ্দি থেকে ঘটনাক্রমে

বেরিয়ে-আসা এই সাধারণ মেয়েরা আমাদের সশ্রদ্ধ কৌতূহল জাগান, কেননা তাঁদের মধ্য দিয়েই সূচিত হচ্ছিল মেয়েদের চেতনার বিবর্তন। ক্রমদৃশ্যমান ব্রাহ্ম মেয়েরাই শুধু নয়, অন্তঃপুরের আড়ালে অদৃশ্য হিন্দু গৃহবধূরাও এই বিবর্তনের আওতার একেবারে বাইরে ছিলেন না। এটা যে নিছক ব্রাহ্ম প্রভাবের ব্যাপারও ছিল না, তার একটি প্রমাণ এই যে রাসসুন্দরী দেবীর 'আমার জীবন'—যা বাংলাভাষায় প্রথম আত্মচরিত বলে খ্যাত— প্রকাশিত হয়েছিল ১২৭৫ বঙ্গাব্দে, অর্থাৎ 'স্ত্রীস্বাধীনতার দল' গঠিত হবারও আগে। এই 'আত্মচরিত'টিতে যে প্রৌঢ়া রাসসুন্দরী লিখছেন, আর যে বালিকাবধূ রাসসুন্দরীর কথা তিনি লিখছেন, তাদের মধ্যে তফাতটা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করলে একটা সাহসিক ক্রমবিকাশের ইতিহাস স্পষ্ট হয়।[৬] লেখিকা একটি অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব হলেও তাঁকে তাঁর যুগের পরিবর্তনের প্রতিভূ হিসাবেও আমরা দেখতে পারি।

রাসসুন্দরী দেবীর আত্মজীবনীর ১৩০৩ বঙ্গাব্দের সংস্করণের ভূমিকা লিখেছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথও এটি পড়েছিলেন কিনা আমাদের জানা নেই। পড়ে থাকলে নিশ্চয়ই তা বাল্যবিবাহ প্রসঙ্গে নব্যহিন্দুদের সঙ্গে তাঁর তীব্র মতভেদকে আরো জোরদার করতে সাহায্য করেছিল। এই মতবিরোধ ১২৯৪ সালে লিখিত "হিন্দুবিবাহ" প্রবন্ধটিতে স্পষ্টভাবে ঘোষিত।[৭] অধুনা যে ঐতিহাসিকরা বলে থাকেন উনিশ শতকের সংস্কার-আন্দোলন ভদ্রলোক-শ্রেণীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল, এবং ফলে এটা ঔপনিবেশিক লেজুড়-বৃত্তির বেশি কিছু নয়— তাঁরা কয়েকটি জরুরি কথা ভুলে যান। প্রথমত, সংস্কারগুলি ইংরেজ-সরকারের দান নয়, মধ্যবিত্তশ্রেণীর মধ্যে দাবিগুলি সংগঠিত আন্দোলনের রূপ নেবার ফলেই তারা এ ব্যাপারে নড়েচড়ে বসতে বাধ্য হয়। দ্বিতীয়ত, সংস্কার নব্যহিন্দুরাও চেয়েছিলেন, কিন্তু এই সংস্কার তাঁরা চেয়েছিলেন সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধের সঙ্গে আপস করে; মধ্যবিত্তশ্রেণীর মধ্যে সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধের বিরোধী ধর্মনিরপেক্ষ, যুক্তিবাদী যে ধারা, নব্যহিন্দুরা তাকে 'সাহেবিয়ানা' বলে নিন্দা করলেও তা যে ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে অপেক্ষাকৃত বেশি প্রগতিশীল ছিল তাতে সন্দেহ নেই। তা ছাড়া উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদের শৃঙ্খল থেকে সম্পূর্ণ মুক্তির কোনো দৃষ্টিকোণ গড়ে ওঠে নি; এই পর্বে সংস্কারআন্দোলনগুলি যে জাতির আত্মসম্ভ্রমকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্যই করেছিল এটাও অনস্বীকার্য। রবীন্দ্রনাথের প্রাথমিক আত্মিক যোগ এই ধর্মনিরপেক্ষ যুক্তিনির্ভর উদারপন্থার সঙ্গেই ছিল; "হিন্দুবিবাহ" প্রবন্ধটি থেকে তা পরিষ্কার বোঝা যায়।

১৮৭৮-৮০ সালে 'ভারতী'তে প্রকাশিত 'য়ুরোপপ্রবাসীর পত্রে' এই আঠারো-উনিশ বছরের তরুণ 'ভারতী'-সম্পাদকের সঙ্গে যে বিতর্কে নেমেছিলেন, সে ক্ষেত্রে ঐ 'সাহেবিয়ানা'র অভিযোগই তাঁর বিরুদ্ধে আনা হয়েছিল।[৮] তাঁর অপরাধ 'মেয়েপুরুষে একত্রে মিলে আমোদপ্রমোদ' করার পাশ্চাত্য প্রথাকে তাঁর কাছে 'স্বাভাবিক' বলে মনে হয়েছিল। 'স্ত্রী স্বাধীনতার দল' তো বরাবরই এ কুৎসার শিকার হয়েছেন যে মেয়েদের বাইরে আনার পেছনে আসল উদ্দেশ্য উচ্ছৃঙ্খলতাকে প্রশ্রয় দেওয়া। যদিও সামাজিক জীবনে এই 'স্ত্রী স্বাধীনতা'র দলের কঠোর নীতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি সর্বজনবিদিত। ঐতিহাসিক সুমিত সরকার এটাকে তাঁদের একটা সীমাবদ্ধতা বলেই চিহ্নিত করেছেন এবং সঠিকভাবেই বলেছেন যথেচ্ছাচারের অভিযোগের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার অস্ত্রস্বরূপ এই শুচিবাদের (puritanism) মধ্যেও পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধের উপকরণ রয়ে গিয়েছিল।[৯] তবু নিজেদের সচেতন নীতিবাদিতা সত্ত্বেও চিন্তার জগতে তাঁরাই সেই দরজাটা খুলে দেন, যার সামনে দাঁড়িয়ে তরুণ রবীন্দ্রনাথ এই প্রশ্ন রাখতে সাহসী হয়েছিলেন যে তত্ত্বগতভাবে মেয়েদের সমানাধিকার মেনে নিলে শিক্ষা ও কর্মের ক্ষেত্রে যেমন, সামাজিক আমোদপ্রমোদের ক্ষেত্রেও তেমন মেয়েদের দৃশ্যমানতা ও তাঁদের অংশগ্রহণকে মেনে নিতে বাধা কী?

বাল্যবিবাহের প্রশ্নে নব্যহিন্দুদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিরোধকেও এই একই প্রাসঙ্গিকতার সূত্রে দেখতে হবে। এ বিষয়ে তাঁর স্পষ্টভাষণ শুধু তাঁর প্রবন্ধেই আবদ্ধ নয়; ছোটোগল্পকেও তাঁর বক্তব্যের জোরালো মাধ্যমরূপে তিনি ব্যবহার করেছেন। তাঁর ছোটোগল্প রচনার প্রথম পর্বেই, সম্ভবত ১২৯৮ বঙ্গাব্দে লেখা, 'খাতা' নামের গল্পটিতে নব্যহিন্দুদের সমর্থিত অসম বয়সের বিবাহকে তীব্রতম আঘাত হানা হয়েছে। রাসসুন্দরী দেবীর 'আত্মজীবনী'তে যেমন, 'খাতা'

গল্পটিতেও তেমনি উমার ন'বছর বয়েসে ট্র্যাজেডির সঙ্গে জড়িয়ে গেছে তার লেখাপড়া করার তীব্র আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু তার নব্যহিন্দু যুবক স্বামীর মত : "স্ত্রীশক্তি ও পুংশক্তি উভয় শক্তির সম্মিলনে পবিত্র দাম্পত্যশক্তির উদ্ভব হয় ; কিন্তু লেখাপড়া শিক্ষার দ্বারা যদি স্ত্রীশক্তি পরাভূত হইয়া একান্ত পুংশক্তির প্রাদুর্ভাব হয়, তবে পুংশক্তির সহিত পুংশক্তির প্রতিঘাতে এমন একটি প্রলয়শক্তির উৎপত্তি হয় যদ্দ্বারা দাম্পত্যশক্তি বিনাশশক্তির মধ্যে বিলীনসত্তা লাভ করে, সুতরাং রমণী বিধবা হয়। এ পর্যন্ত এ তত্ত্বের কেহ প্রতিবাদ করিতে পারে নাই।[১০] উমার একমাত্র নিজস্ব সম্পত্তি বাপের বাড়ি থেকে নিয়ে-আসা খাতাটিকে শেষ পর্যন্ত তার স্বামী বাজেয়াপ্ত করে। গল্পটির সামগ্রিক হালকা চাল বজায় রেখেও এই শেষ দৃশ্যে রবীন্দ্রনাথ তীব্র শ্লেষের মারফত ফুটিয়ে তোলেন এক মর্মান্তিক শিশু-ধর্ষণের নাটক— যেখানে উমার লজ্জা, ভয় ও অনিচ্ছাকে অগ্রাহ্য করে নিছক কর্তৃত্বের জোরে তাকে বাধ্য করা হয় তার একান্ত গোপনীয় খাতাটি দেখাতে, এবং তার পর আত্মপ্রকাশের এই একমাত্র উপায়টি তার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়। এই কাজে তার রাশভারি স্বামীর সহযোগিতা করে তার সমবয়সী ননদরা, যদিও তারাও এই একই ব্যবস্থার বন্দি। অবশ্যই 'ধর্ষণ' কথাটি এখানে রূপকার্থে ব্যবহৃত। কিন্তু মেয়েটি ন'বছরের, আর তার অপরাধ, সে লিখতে ভালোবাসে। এ ক্ষেত্রে রূপকার্থটি কি কম মর্মান্তিক ? তা ছাড়া মনে রাখতে হবে, এ শুধু রূপকও নয়। যুবক স্বামীর বালিকা স্ত্রী— এই 'উন্নীত' বাল্যবিবাহকেই নব্যহিন্দুরা আদর্শ বলে ঘোষণা করেছিলেন। এবং এই পরিস্থিতিতে বিবাহ-সম্পর্কের মধ্যে সমাজের প্রত্যক্ষ অনুমোদনে শিশু ধর্ষণের ঘটনা হয়তো উচ্চবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে আক্ষরিক অর্থেও তেমন বিরল ছিল না।[১১] আজও কি বাঙালি-মানসে বালিকা-বধূর ভাবমূর্তি কিঞ্চিৎ মোহের সঞ্চার করে না ?

এই পরিপ্রেক্ষিতে 'খাতা' গল্পটিকে শুধু লেখকের নারীদরদী মনোভাবের পরিচায়ক বলে দেখলে চলবে না। কেননা নিছক নারীর দুর্দশার জন্য দরদ আন্তরিক হলেও কখনো কখনো চূড়ান্ত রক্ষণশীলতার সঙ্গে সহাবস্থান করতে দ্বিধা করে না। কিন্তু ঐ গল্পের আসল জোর যুক্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠিত সামাজিক অযুক্তির মূলে আঘাত করবার ক্ষমতায়। বালিকা-বধূর পরিচিত রোম্যান্টিক আদলটিকে এ গল্পে ভেঙে চুরে সম্পূর্ণ বিপরীত দিক থেকে দেখানো হয়েছে। গিরিরাজনন্দিনী উমার পিতৃগৃহে আসার যে করুণ গানটি বালিকা উমা তার খাতায় লিখে নিয়েছিল, সেই রোম্যান্টিক কারুণ্যের পিছনেও রয়েছে এক নিষ্ঠুর ও বীভৎস বাস্তব তাৎপর্য। সেই তাৎপর্যকে লেখক অসাধারণ নৈপুণ্যের সঙ্গে তার অজ্ঞাতবাস থেকে টেনে বার করেছেন।

'সমাপ্তি' গল্পটি প্রায় একই সময়ে লেখা। সেখানেও পাওয়া যায় সম্পূর্ণ অনিচ্ছায় শ্বশুরালয়ের পিঁজরায় আবদ্ধ আরেক বালিকা-বধূকে। প্রশ্ন উঠতে পারে এখানে কি রবীন্দ্রনাথ সমস্যাটাকে একটু ঘোলো করে দিচ্ছেন না, গল্পের পরিণতিতে স্বাধীনচেতা মৃন্ময়ীর পোষ-মানার ব্যাপারটাই কি তাঁর পরোক্ষ সমর্থন পাচ্ছে না ? এখানেই কি তিনি দেখছেন না তার নারীত্বের সার্থকতা ? গল্পের শেষ পর্যায়ে লেখক একটি সহজ সমাধানের দিকে ঝুঁকেছেন, এটা বোধহয় না মেনে উপায় নেই। মৃন্ময়ীর বিবর্তনটা জোড়াতালি দিয়ে সারা। কিন্তু শেষটাই গল্পের সব নয়। প্রথম থেকে দেখলে বোঝা যাবে গল্পের মূল ঝোঁকটিই আলাদা। রক্ষণশীল সমাজব্যবস্থায় স্বামী স্ত্রীর প্রথাগত সম্পর্কটি মূলত ক্ষমতার সম্পর্ক। কিন্তু এ ব্যবস্থার মধ্যে থেকেও স্বামীর স্বীকৃত কর্তৃত্বের ভূমিকা পালনে যে পরাঙ্মুখ, স্ত্রীর সঙ্গে যে পুরুষ চায় একটি বিকল্প মানবিক সম্পর্ক, বিধিদত্ত শাসনদণ্ড যে স্বেচ্ছায় বর্জন করে, তার সমস্যাই এ গল্পের কেন্দ্রবিন্দু। রক্ষণশীলতার ধাঁচটিকে মেনে নিতে পারে না বলেই অপূর্ব 'পাগলি' বলে খ্যাত 'পুরুষালি' স্বভাবের মৃন্ময়ীর প্রেমে পড়ে যায়, এবং মৃন্ময়ীর সঙ্গে সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্ক স্থাপন করার জন্য মা'র কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে গিয়ে অনেক বাঁধাধরা নিয়ম ভাঙতে সে দ্বিধা করে না। অপূর্ব প্যারীমোহন নয় বলেই সামগ্রিক ব্যবস্থার নিষ্ঠুরতা ও অযৌক্তিকতা এখানে আড়ালে পড়েছে, তাই বলে তাকে লেখক উড়িয়ে দিয়ে গেছো মেয়ের পোষ মানার ছদ্মরোম্যান্টিক কাহিনী লিখতে বসেছেন এ কথা ভাবলে ভুল হবে। রবীন্দ্রনাথ তো শুধু প্রবন্ধকার নন, তার আগে তিনি সাহিত্যস্রষ্টা। সামান্য সত্য বাস্তব ক্ষেত্রে যে বিশেষিত, ব্যক্তিক রূপ নেয়, তা ফলিয়ে তোলাতেই তাঁর সার্থকতা। কিন্তু বাস্তবের এই বিশেষিত রূপ দেখাতে যাওয়া মানেই সামান্য সত্যকে অস্বীকার করা নয়।

১৮৮০র দশকে শুধু বঙ্গদেশেই নয়, মহারাষ্ট্রেও বাল্যবিবাহ, বৈবাহিক অধিকার, বিবাহে সম্মতিদানের বয়স (age of consent) প্রভৃতি নিয়ে জনমত ঘনীভূত হয়ে উঠছিল। মহারাষ্ট্রে এ ব্যাপারে জনমত সংগঠনের প্রধান নেত্রী ছিলেন পণ্ডিতা রমাবাই।[১২] 'হিন্দুবিবাহ' প্রবন্ধটির বছর দুয়েক বাদে ১৮৮৯ সালে (১২৯৬ বঙ্গাব্দ) পুনাতে রবীন্দ্রনাথ রমাবাইয়ের স্ত্রী-স্বাধীনতা বিষয়ক বক্তৃতা শোনেন। রমাবাইয়ের বক্তব্যের সঙ্গে কিন্তু রবীন্দ্রনাথ একমত হতে পারেন নি। এই অনৈক্যের মূলে ছিল তাঁর এই বিশ্বাস যে সমাজে প্রচলিত স্ত্রীপুরুষের শ্রমবিভাজনের ভিত্তি হল তাদের মধ্যেকার 'স্বাভাবিক' বা 'প্রাকৃতিক' প্রভেদ। সন্তানধারণ ও সন্তানপালনঘটিত এই প্রভেদের ফলে 'মেয়েদের সেই গৃহের মধ্যে থাকতেই হবে ; কাজে কাজেই প্রাণধারণের জন্যে পুরুষের প্রতি তাদের নির্ভর করতেই হবে।'[১৩] রমাবাই মেয়েদের সমতা প্রমাণার্থে কী যুক্তি দিয়েছিলেন জানি না, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের তোলা প্রাকৃতিক প্রভেদের প্রশ্নটির জবাব তাঁর কাছেও বোধহয় ছিল না। 'নিজের শরীরের ওপর নিজের অধিকারের' প্রশ্নটি নারীমুক্তিবাদীদের কাছে আজও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। আর ১২৯৬ বঙ্গাব্দে যখন জন্মনিয়ন্ত্রণের বৈজ্ঞানিক প্রণালী বা শিশুপালনকে সামাজিকীকরণের সম্ভাবনা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল, তখন রবীন্দ্রনাথ-কথিত প্রাকৃতিক প্রভেদকে অস্বীকার করার উপায় ছিল আজকের চেয়ে অনেক কম। স্ত্রীশিক্ষা ও অন্যান্য সমাজসংস্কার তাই রবীন্দ্রনাথের কাছে এই 'প্রাকৃতিক' পরিস্থিতিতে মেয়েদের কাছে যতটা সম্ভব সহনীয় করার উপায়মাত্র। এবং তাঁর মতে কর্মক্ষেত্রে এই আপেক্ষিক পশ্চাৎপদতা মেয়েদের মেনে নিতেই হবে। এতেই মেয়েদের সম্মান ও পুরুষের সঙ্গে আবশ্যিক সম্পর্ক বজায় থাকবে।

কিন্তু, এই 'প্রাকৃতিক' প্রভেদ থেকে সামাজিক প্রভেদের 'স্বাভাবিকতা'কেও যখন অনুমান করে নেওয়া হল, তখন হয়তো তার পেছনে অন্য প্রশ্নও কাজ করছিল। সন্তানধারণ করতে হয় বলেই মেয়েদের গৃহেই থাকতে হবে, সংসারযাত্রার সমস্ত দায়িত্ব নিতে হবে ও জীবনধারণের জন্য পুরুষের ওপর নির্ভর করতে হবে এই কার্যকারণযোগটার ভিত্তিতে অবশ্যই যুক্তি যতটা আছে তার চেয়ে বেশি আছে একটি বিশেষ সামাজিক ব্যবস্থায় বিশেষ শ্রেণীগত পরিস্থিতি থেকে উদ্ভূত কিছু সংস্কার। রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারায় এই সংস্কার স্বীকৃত ছিল, এবং এই স্বীকৃতির স্বার্থেই গড়ে উঠেছে নারী ও পুরুষের স্বতন্ত্র স্বভাবসম্পর্কিত তাঁর পরাদর্শন। কিন্তু এই সংস্কারকে তাঁর মেনে নেওয়ার ব্যাপাবে হয়তো ভারতের তৎকালীন সামগ্রিক রাজনৈতিক পরিস্থিতিরও একটা ভূমিকা ছিল।

মনে রাখতে হবে সময়টা ছিল উনিশ শতকের শেষ। ক্রমশ মাথা চাড়া-দেওয়া ভারতীয় জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর সঙ্গে ঔপনিবেশিক শাসকের দ্বন্দ্ব তখন ক্রমশ তুঙ্গে উঠছে। জাতীয় সত্তাব অনুসন্ধানে তখন সচেতনভাবেই একটি স্বদেশী আদর্শের সৃষ্টি করা হচ্ছে। ১৮৭৮-৮০ সালে তরুণ রবীন্দ্রনাথ এক সার্বভৌম যুক্তিবাদের ভিত্তিতে পাশ্চাত্যে মেয়েদের সামাজিক দৃশ্যমানতার প্রশংসা করতে পেরেছিলেন। কিন্তু তার দশ-বারো বছর বাদে দেশীয় পরিস্থিতির মৌল পার্থক্যের ধারণা তাঁর দৃষ্টিতে অনেক বেশি জরুরি। দেশের বিশেষ সত্তাকে আবিষ্কার করতে তিনি উন্মুখ। তাই ১৮৯১ সালে 'য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি'তে তিনি সুনির্দিষ্টভাবেই ভারতীয় জীবন সম্পর্কে একটি ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার চেষ্টা করছেন। তাঁর স্ত্রী-স্বাধীনতার চিন্তাও এই সামগ্রিক মানসিকতায় প্রভাবিত। এইজন্যই হয়তো বিদুষী ও সমাজের সমুচ্চ আসনে অধিষ্ঠাতা রমাবাইয়ের দেশকাল নিরপেক্ষ, সাধারণীকৃত সমতার যুক্তিকে তিনি মানতে পারেন নি।

'য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি'তে ইব্‌সেনের নাটকের উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথ বলছেন সেখানে কয়েকটি স্ত্রীচরিত্রে 'প্রচলিত সমাজবন্ধনের প্রতি একান্ত অসহিষ্ণুতা' প্রকাশ পেয়েছে ; এর কারণ হিসাবে তিনি বলেন : 'বর্তমান য়ুরোপীয় সমাজে স্ত্রীলোকের অবস্থা নিতান্তই অসংগত। পুরুষেরা না তাদের গৃহপ্রতিষ্ঠা করে দেবে, না তাদের কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের পূর্ণাধিকার দেবে।' এই অসংগতির চেতনাই তাদের 'প্রলয়মূর্তি' ধরতে বাধ্য করেছে। অন্য দিকে রবীন্দ্রনাথের মতে আমাদের মেয়েরা গৃহে স্বপ্রতিষ্ঠ ঘর ও বাইরের টানাপোড়েনে ভোগেন না বলেই য়ুরোপীয় মেয়েদের তুলনায় তাঁরা সুখী। 'আমাদের সমাজে স্ত্রীলোকদের সম্বন্ধে যে কিছুই করবার নেই, আমাদের সমাজ যে সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বসম্পূর্ণ এবং আমাদের স্ত্রীলোকদের অবস্থা তার একটা প্রমাণ।এ কথা বলা আমার অভিপ্রায় নয়।... কিন্তু তবুও মোটের উপর বলা যায় আমাদের

স্ত্রীকন্যারা সর্বদাই বিভীষিকা রাজ্যে বাস করছেন না, এবং তাঁরা সুখী'।[১৪] অর্থাৎ তাঁদের 'স্ত্রীস্বভাব' দেশের বিশেষ সমাজকাঠামোতে একধরনের চরিতার্থতা পায়। স্বদেশী সম্ভাভিমুখী যে প্রতিক্রিয়ার কথা আগে বলেছি, 'স্ত্রীভাবে'র তত্ত্বটি এখানে তাকেই প্রতিষ্ঠিত করার কাজে ব্যবহৃত। যে-সব সমাজসংস্কারকে রবীন্দ্রনাথ আরো সমর্থন করছিলেন, তার থেকে এখন তিনি পশ্চাদপসরণ করছেন এ কথা বললে ভুল হবে। 'য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি' থেকেই এ ব্যাপারে তাঁর অপরিবর্তিত মতের উদাহরণ দেওয়া যায়।[১৫] কিন্তু খাঁটি ভারতীয়ত্বের আদল আবিষ্কার করতে গিয়ে তাঁকে খাঁটি নারীত্বের যে আদলটিকে সহায়ক হিসাবে তৈরি করতে হয়েছে তার মধ্যে এক নতুন ধরনের রক্ষণশীলতার আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

ব্যাপারটা শুধু এই নয়, যে এর পরের পর্বে, সাময়িকভাবে স্বদেশিয়ানার জোয়ারে ভেসে দু-একবার তিনি এমন-কি বাল্যবিবাহকেও আমাদের বিশেষ সমাজকাঠামোর উপযোগী বলেছেন, বা সতীদাহকেও রোম্যান্টিক বর্ণে রঞ্জিত করেছেন।[১৬] এগুলো নিতান্তই তাৎক্ষণিক বিচ্যুতি। যে পর্বে (১৯০১-০৬) স্বদেশী আন্দোলনের প্রতি তাঁর ষোলো-আনাই সমর্থন, তখনো তাঁর স্বাদেশিকতা সাধারণত গোঁড়া হিন্দুয়ানির ব্যাপকতর রূপটা থেকে স্বতন্ত্রই ছিল। কিন্তু তাঁর এই স্বাদেশিকতার মধ্যেও আরেক রকম রক্ষণশীলতার উপাদান আছে। বিদেশী শাসকের সঙ্গে সরাসরি সংঘর্ষের যে ঐতিহাসিক পর্যায় তখন সূচিত হচ্ছিল, সে সম্বন্ধে একটা তীব্র অনীহা রয়েছে এই স্বাদেশিকতার মূলে। 'পোলিটিক্যাল অ্যাজিটেশনের' বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের গভীর বিতৃষ্ণা, ১৯০৬-এর পরে প্রমথনাথ চৌধুরীদের ধীরবাদী, জমিদারিকেন্দ্রিক, 'গঠনমূলক' স্বাদেশিকতার দিকে তাঁর প্রত্যাবর্তন, এই সবেরই একটা যুক্তিগত পটভূমি ছিল— স্বদেশী আন্দোলনের গোঁড়ামি, দরিদ্র মানুষের জীবনের বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে তার যোগাযোগের অভাবকে তাঁর উদার, মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তিনি সহ্য করতে পারেন নি। কিন্তু বিদেশী প্রভুর সঙ্গে ক্ষমতাদখলের জন্য মুখোমুখি সংঘর্ষের পর্ব এসে গেছে— এই ঐতিহাসিক সত্যকেও তিনি মানতে পারেন নি। তাই তাঁর চোখে বিকল্প জাতীয় আন্দোলন শুধু সমাজসংগঠনের আন্দোলন। তার অনিবার্য রাজনৈতিক দিকটাকে সযত্নে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। তাঁর ধারণার ভারতবর্ষ— সব-মেলানোর ভারতবর্ষ— তাই এমন একটি আদর্শায়িত, নিখাদ হিন্দুত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত, যেখানে সংঘর্ষ নেই, কেবল সংহতি আছে। তাঁর নারীমুক্তির চিন্তা এই সামগ্রিকতার একটি অংশ বলেই মেয়েদের 'স্বাভাবিক' গৃহমুখিতা এবং অভিভাবকত্বমূলক মুক্তির স্বীকৃতিতেই তিনি থেমে থাকেন।

স্বদেশী যুগে কিন্তু রবীন্দ্রনাথের স্ত্রীস্বাধীনতার চিন্তায় একটা নতুন মাত্রাও সংযোজিত হয়। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' বা মুকুন্দদাসের 'বঙ্গনারী'কে উদ্দেশ্য করে রচিত গান স্বদেশী আন্দোলনে মেয়েদের এক ধরনের অংশগ্রহণের দলিল। কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনের নিজস্ব মতাদর্শই ছিল মেয়েদের বাইরে আসার প্রশ্নে একান্ত রক্ষণশীল[১৭]। তাই এই আন্দোলনে মেয়েরা যে সাড়া দিয়েছেন, সাধারণত গৃহলক্ষ্মী হিসাবেই দিয়েছেন, তাঁদের সংগঠিত সক্রিয়তা এখানে খুবই সীমিত। সরলা ঘোষাল ছিলেন এই আন্দোলনের সম্ভবত একমাত্র নেত্রীস্থানীয়া মহিলা, আর তিনি এবং তাঁর সচ্ছল অথচ তুলনায় উদারপন্থী পরিবার যে নেহাৎই ব্যতিক্রম ছিলেন, সরলা দেবীর বিবাহে অনাগ্রহ যে তাঁর অভিভাবকদেরও চিন্তায় ফেলেছিল, তাঁর আত্মজীবনী থেকেই তা আমরা জানতে পারি।[১৮] তবু মনে রাখতে হবে তিনি ছিলেন ঠাকুরবাড়িরই মেয়ে। তাই দেশের মেয়েদের জীবনে আরো ব্যাপকভাবে ঘর ও বাইরের টানাপোড়েন শুরু হবার সম্ভাব্যতা যদি এই স্বদেশী যুগের প্রেক্ষাপটেই রবীন্দ্রনাথের মনে প্রথম এসে থাকে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। এই সম্ভাবনার বিপদটাই তাঁর চোখে বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছিল এ কথা সত্যি, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের দূরদর্শিতা এইখানেই যে তিনি আন্দাজ করতে পেরেছিলেন, জাতীয় অভ্যুত্থানের জটিল ও সংকটসংকুল বিকাশের সঙ্গে মেয়েদের গৃহলীন ভূমিকাটিও ক্রমশ বদলে যাবে।

১৯০৭-০৯ সালের মধ্যে 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত 'গোরা' এবং ১৯১৬ সালে প্রকাশিত 'ঘরে বাইরে', এই সময়সীমার মধ্যে স্বদেশী আন্দোলন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা তীব্র হয়ে উঠেছে। আন্দোলনে নামার আগে স্বদেশের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে অবহিত হবার প্রয়োজন 'গোরা'তে এক উদার মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির মারফত প্রকাশ পায়। ১৮৭০-৮০র

দশকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের দেশসেবামূলক প্রচেষ্টাগুলির ইউটোপীয় (utopian) চরিত্র সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ অনবহিত ছিলেন না। গোরার দেশসেবার প্রচেষ্টাতেও সচেতনভাবেই এই ইউটোপীয় উপাদান মেশানো হয়েছে। রাজনৈতিক ক্ষমতার সঙ্গে সম্পর্করহিত নিছক সমাজগঠনমূলক কাজ কতদূর সার্থক হতে পারে তা নিয়ে নিশ্চয়ই লেখকের নিজেরও প্রশ্ন ছিল। কিন্তু 'ঘরে বাইরে'তে নিখিলেশের নীরব দেশব্রতে সেই একই আদল আবার ফিরে এসেছে। গোরার অনবিদ্ধতা তো নিখিলেশে নেই, তাই যখন প্রশ্ন ওঠে নিখিলেশের সঙ্গে সন্দীপের মূল দ্বন্দ্ব কোন্‌খানে, তখন বলতেই হয় শুধু সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা বা পৌত্তলিকতা নয়, শুধু গরিব প্রজাদের ওপর গায়ের জোর ফলানো নয়, চরমপন্থীদের কার্যকলাপে নিখিলেশকে, তথা রবীন্দ্রনাথকে, যা সব চেয়ে বিচলিত করে তা হল ব্রিটিশশক্তির বিরুদ্ধে সরাসরি ক্ষমতাদখলের লড়াই। সন্দীপের ক্ষমতাদখলের মনোভাব তার স্রষ্টার কাছে নিছক স্থূলতা, তার স্বভাবগত লোভ ও স্বার্থপরতার প্রকাশ। এই পাঞ্জা-লড়ার ব্যাপারটা তাঁর মতে আন্দোলনকে হীনতার মধ্যে নামিয়ে আনতে বাধ্য। নিখিলেশ ত্যাগী, তাই সে-ই প্রকৃত দেশপ্রেমিক আর সন্দীপের দেশ সম্বন্ধে মনোভাব তার উদগ্র লোলুপতারই একটা রূপ— এই ধরনের সরলীকৃত নৈতিক প্রভেদের আড়ালে চাপা পড়ে গেছে স্বদেশী আন্দোলনের প্রকৃত রাজনৈতিক তাৎপর্য। মধ্যস্বত্বভোগী জমিদার শ্রেণীর ধীরবাদী পুরোনো ধরনের রাজনীতিকেই যেন এখানেও লেখক জাতীয়তাবাদী জাগরণকে থামিয়ে রাখতে চাইছেন, কিন্তু তা তো আর সম্ভব নয়।

মেয়েদের সম্পর্কে স্বদেশীযুগের নেতাদের পরিচিত রক্ষণশীল মতাদর্শের প্রতিভূ যে সন্দীপ নয়, তার কারণ এটাই যে তার লোলুপতাকে সর্বতোভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। পুরুষ হিসাবে ও দেশসেবক হিসাবে সন্দীপের এই লোলুপতার অন্যপিঠটা হল এই যে বিমলা যখন সন্দীপের টানে বাইরে আসে তখন সে 'মক্ষিরানী'ই থেকে যায়। তখন সে সন্দীপের নারীপ্রতিরূপ। সন্দীপের লোভের আয়নার ছায়া সে। তার কাজও মোহ সৃষ্টি করা, রস সৃষ্টি করা, তার আকর্ষণী শক্তির সাহায্যে পুরুষকে আন্দোলনের মধ্যে টেনে আনা। সন্দীপ বা নিখিলেশের সঙ্গে তার তফাত এই, যে তার ভূমিকা মূলত প্রেরণাদাত্রীর। দ্বিতীয়জনের প্রেরণাদাত্রী রূপে সে কল্যাণী, প্রথমজনের প্রেরণাদাত্রী রূপে সে প্রলয়ংকরী। স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যে বাস্তবে নারীর অন্য কোনো ভূমিকার কথা চিন্তা করা হয় নি এটা ঠিকই, কিন্তু লেখকের দৃষ্টিতেও কি বহির্গামিনী নারীর সম্ভাব্য ভূমিকা এই একটিই নয়? 'স্ত্রী-স্বভাবে'র সেই তত্ত্বকেই আবারও এখানে টেনে আনা হয়েছে নিখিলেশের সমর্থনে। বিমলার কথাতেই আমরা জানি নিখিলেশ 'স্ত্রীপুরুষের পরস্পরের প্রতি সমান অধিকারে' বিশ্বাসী।[১৯] তার ধর্মই উদার হওয়া। সে তার স্ত্রীকে শিক্ষিত করবেই, তাকে নিজের পাশে টেনে তুলবার চেষ্টা করবেই, বন্ধুর সঙ্গে তাকে আলাপ করিয়ে দেবেই। কিন্তু বিমলা স্বভাবতই তার সমকক্ষ হতে পারবে না, নিখিলেশের অভিভাবকত্বেই তার মুক্তি সম্ভব, ঐ আশ্রয় ছাড়া এক পা গেলেও সে বিপথে যাবে। নিখিলেশের কাছে বিমলাকে ফিরতে হবে বলেই সন্দীপের সৃষ্টি। এবং নিখিলেশ যার প্রতিভূ সেই ধীরবাদী (quietest) রক্ষণশীলতাকে প্রতিষ্ঠিত করার স্বার্থেই উপন্যাসে স্বদেশীদের নারীবিষয়ক রক্ষণশীলতার তথ্যটি সম্পূর্ণ চাপা পড়ে গেছে।

বিমলার কোনো রাজনৈতিক জাগরণ হল না। নারী হিসাবে তার জাগরণও আসলে তার 'সিঁথের সিঁদুরে'র মূল্য সম্পর্কেই জাগরণ। সন্দীপের মোহ নিছক মোহই, নিখিলেশ থাকুক বা না থাকুক তার আত্মিক কর্তৃত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতেই এই ক্ষণিক ভুলের অবতারণা। কিন্তু এর প্রায় দুই দশক বাদে, ১৯৩৪ সালে, প্রীতিলতা ওহদেদার, কল্পনা দত্তের নিদর্শন চোখের ওপর নিয়ে উদ্ভাবিত এলারও কোনো রাজনৈতিক জাগরণের ছবি যে রবীন্দ্রনাথের লেখনীতে এল না তার কারণ কি এই নয়, যে পরিবর্তিত সময়েও রাজনীতির ক্ষেত্রে যেমন তিনি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষের ঐতিহাসিক পর্যায়কে মেনে নিতে পারেন নি, তেমনি এই প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের মারফত মেয়েদের কোনো রাজনৈতিক জাগরণের সম্ভাবনাকেও স্বীকার করতে পারেন নি? অথচ কুড়ির দশক থেকে ত্রিশের দশকের মধ্যে গান্ধির নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন এবং আইন অমান্য আন্দোলনে মেয়েদের অংশগ্রহণ ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হয়েছে।[২০] সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনেও মেয়েরা পিছিয়ে থাকেন নি। সংসারের সীমানা অতিক্রম করেই মেয়েদের এই সংগ্রামের ক্ষেত্রে আসতে

হয়েছিল। রাজনৈতিক সংকটের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবেই জড়িয়ে গিয়েছিল তাঁদের ঘর ও বাইরের মধ্যে বিভক্ত অস্তিত্বের সংকট। কিন্তু না গান্ধিবাদী আন্দোলনে, না সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে ছিল এই সংকটের তাত্ত্বিক বা সাংগঠনিক স্বীকৃতি। গান্ধি নীতিগতভাবে মেয়েদের সমানাধিকারের দাবিকে স্বীকৃতি জানিয়েও চেয়েছিলেন মেয়েদের রাজনৈতিক কাজের ক্ষেত্রে উত্তরণ ঘটুক তাদের পারিবারিক ভূমিকা অক্ষুণ্ণ রেখেই। সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনেও রয়ে গিয়েছিল স্বদেশী আমলের হিন্দু রক্ষণশীলতার ও কৃচ্ছ্রবাদের উপাদান। এই দ্বন্দ্ব এই মেয়েদের চেতনায় কীভাবে অভিঘাত করেছিল, আজ আমাদের কাছে তা কৌতূহলের বিষয়। অথচ বাংলাভাষার মহত্তম লেখকের কাছ থেকে এই দ্বন্দ্বের কোনো বিশ্বাস্য চিত্র আমরা পাই না।

এলা যখন নিজের রাজনৈতিক অবস্থিতির ফাঁকিটা বুঝতে পারে, তখন মৃত্যুর মুহূর্তে বিকল্প মুক্তি সে খোঁজে প্রেমিকের কাছে আত্মনিবেদনে। উপন্যাসের অবয়বে এই মুক্তিটাকে সম্ভব করে অতীনের নির্লিপ্তি ও তার দুর্জয় সংযম— যা আবার নিখিলেশের কথাই মনে করিয়ে দেয়। সে সোচ্চারে বলে 'পেট্রিয়ট' বা 'ন্যাশনালিস্ট' সে নয়— 'পেট্রিয়টিজমের চেয়ে যা বড়ো তাকে যারা সর্বোচ্চ না মানে তাদের পেট্রিয়টিজম কুমিরের পিঠে চড়ে পার হবার খেয়ানৌকো'।[২১] অতীন দলে এসেছিল এলার জন্যই, কিন্তু তার মহত্ত্বকে চিহ্নিত করা হয় এইভাবে যে দলের শৃঙ্খলার স্বার্থে যখন 'স্বভাবকে হত্যা' করার পাপে সে লিপ্ত হয়েছে, তখনই চরম প্রায়শ্চিত্তের জন্যও সে প্রস্তুত হয়। ঠিক এই-সব কারণেই অতীনের হাতে নিজেকে সম্পূর্ণ ছেড়ে দেওয়াই এলার মুক্তি। কেননা ক্ষমতাসীনের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে যে পাঁক উঠে আসে অতীন তার বাইরে। সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ-বিবৃত 'পাঁক'— 'মিথ্যাচরণ, নীচতা, পরস্পরকে অবিশ্বাস, ক্ষমতালাভের চক্রান্ত, গুপ্তচরবৃত্তি'—[২২] এই-সবই যে উঠে এসেছিল তা সন্ত্রাসবাদীদের নিজেদের কথা থেকেই অনেক সময় জানা যায়। বিশেষত একটা পর্বে 'সংগঠনগুলির দুর্বলতার সুযোগে তাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকেছিল পুলিশি চরেরা।[২৩] কিন্তু তার সমস্ত মধ্যবিত্ত বিভ্রান্তি নিয়েও এই আন্দোলন ছিল সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে শাসনক্ষমতা ছিনিয়ে নেবার প্রত্যক্ষ লড়াইয়ের অন্যতম রূপ। এটাকে মেনে নিতে রবীন্দ্রনাথের যে গভীর-প্রোথিত সংকোচের কথা বলেছি, তারই ফলে তাঁর সমালোচনা হয়ে পড়ে খণ্ডিত এবং একপেশে। এই সংকোচকে একটা যুক্তিগ্রাহ্য রূপ দেবার জন্যই এলার সামগ্রিক 'অপ্রকৃতিস্থতা', তার নারীসুলভ 'সহজবুদ্ধি'র বিলোপটাই লেখকের উপস্থাপনায় প্রধান হয়ে ওঠে।

এলার 'আদর্শ স্বদেশী দিদিবৃত্তি'র ফাঁকি অতীনই তাকে ধরিয়ে দেয়, যদিও সেই আবার বলে, এলার মধ্যের 'রিয়ল' মেয়েটি যেটুকু প্রকাশ পায়, তা ঐ স্নেহশীলতা ও 'সাংসারিকতা'র মধ্যেই। ঘরের বাইরেও এটাই তার আসল ভূমিকা। অতীন এলাকে যে বিকল্পটি দেয় সেটা তা হলে কী? যে 'ধর্মক্ষেত্রে ধর্মযুদ্ধে'র পথ অতীনের মতে তারা আর নিতে পারবে না সেটাই বা কী? বানিয়ে-তোলা স্বদেশী দিদিবৃত্তি ত্যাগ করে একা অতীনের প্রেরণাদাত্রী হয়ে থাকা? সাম্রাজ্যবাদী শক্তির শেষ প্রহরে তাকে চূড়ান্ত আঘাত দেবার কাজে লিপ্ত না হয়ে নিষ্কলঙ্ক, পবিত্র দূরত্বে নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা? সংকীর্ণ ন্যাশনালিজ্‌মকে বর্জন করার নামে নিজের রাজনৈতিক জীবনকেই বিসর্জন দেওয়া? আর সেইসঙ্গে নিজের তথাকথিত 'রিয়ল' নারীসত্তার চর্চা? 'পোলিটিক্যাল ঠ্যাঙার গুঁতি'র জগতে মেয়েদের ব্যাপক প্রবেশের ফলে তাদের চেতনার সংকট সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ অনবহিত ছিলেন এ কথা কোনোভাবেই বলা যায় না। কিন্তু এটা না মেনে উপায় নেই যে 'স্ত্রীস্বভাবে'র পুরোনো আদলটি তাঁর এই উপন্যাসগুলিতে এই সংকটের প্রকৃত রূপটিকে চাপা দেবার কাজেই ব্যবহৃত হয়েছে।

কোনো একটা বিশেষ মতাদর্শের কাঠামোর মধ্যে ফেলে রবীন্দ্রসাহিত্যের যাবতীয় নারী চরিত্রের বিশ্লেষণ এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। নারীমুক্তির প্রশ্নটিকে রবীন্দ্রনাথ যে সবসময়েই একটা সামগ্রিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে দেখেন তাও নয়। কিন্তু নারীমুক্তির প্রসঙ্গে তাঁর চিন্তায় যে স্ববিরোধগুলি এখন আমরা দেখতে পাই, তাঁর রাজনৈতিক উপন্যাসগুলিতে নারীচিত্রণের আলোচনা হয়তো সেই স্ববিরোধগুলির একটি প্রধান উৎসকে বুঝতে সাহায্য করে। বস্তুত নারীর বিকল্প অস্তিত্ব ও বিকল্প চেতনার নতুন আদল পুরোনো আদর্শগুলোকে ভেতর থেকে ওলটপালট করে দিয়েও তৈরি হতে পারে,

তার প্রচেষ্টা রবীন্দ্রসাহিত্যে বার বারই ফিরে আসে।

সামাজিক উৎপীড়ন, অযুক্তি ও সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে সমালোচনার উচ্চারণ রবীন্দ্রসাহিত্যে মেয়েদের মুখ থেকেই আসে সব চেয়ে জোরদার রূপে। গোরার হিন্দুয়ানিতে তার সব চেয়ে প্রবল প্রতিপক্ষ তার মা, যাকে সে কিছুতেই বাগ মানাতে পারে না। গোরার মূল প্রতিপক্ষ কোনো পুরুষও হতে পারত, কিন্তু আনন্দময়ী মেয়ে বলেই, অদৃশ্য সামাজিক নিপীড়নের অন্যতম শিকার বলেই তাঁর মুখে ধর্মীয় সংকীর্ণতার সমালোচনা এক বিশেষ তাৎপর্য পায়। এর জন্য রবীন্দ্রনাথ মাতৃমূর্তির চিরাচরিত আদলটিকে ভেঙেছেন, তার পক্ষে সম্পূর্ণ 'অসংগত' কাজ করিয়েছেন তাকে দিয়ে। আনন্দময়ী তাঁর 'সহজবুদ্ধি' দিয়ে যা বোঝেন মাতৃস্নেহের দোহাই দিয়েও তাঁকে তার থেকে ফেরানো যায় না। অর্থাৎ আনন্দময়ীর ক্ষেত্রে তাঁর এই বুদ্ধির কাজ হল প্রথাগত সংস্কারবদ্ধ চিন্তাধারাকে ভাঙা। নারীর 'স্বাভাবিক' কাজ রবীন্দ্রনাথের মতে পালন ও পোষণ হলেও এখানে তার এই ভাঙার রূপটাকে তিনি জোরের সঙ্গে সমর্থন করেন, আনন্দময়ী বা 'স্ত্রীর পত্রে'র মৃণাল হয়ে দাঁড়ায় সামন্ততান্ত্রিক অযুক্তির বিরোধী, লেখকের উদার মানবতাবাদের প্রতিভূ। নারী ও প্রকৃতির সমীকরণের পরাদর্শন— যার মধ্যে জননী/মোহিনীরূপে নারীর কাজ পুরুষকে সংসারযাত্রার মধ্যে টেনে রাখা— বিমলা বা এলার চরিত্রায়ণে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। 'স্ত্রীস্বভাবে'র এক মেরু থেকে বিচ্যুত হয়ে আরেক মেরুতে গিয়ে ঠেকে তারা। কিন্তু আনন্দময়ী বা মৃণাল ছাড়িয়ে যায় এই 'প্রাকৃতিক' গণ্ডিটাকে।

অবশ্যই এই অস্বভাবী বুদ্ধির একটা বিরাট মূল্য দিতে হয় আনন্দময়ী ও মৃণালকে। তাদের বিদ্রোহ একধরনের সন্ন্যাসগ্রহণ, স্বাভাবিক জীবনের বৃত্তে থাকা আর তাদের পক্ষে সম্ভব নয় বলেই একজন সংসারে থেকেও সংসারের কেউ নয়, আরেকজন সংসারকে নির্মমভাবে ছেঁটে ফেলে জীবন থেকে। তাই বলে রবীন্দ্রসাহিত্যে মেয়েদের বিদ্রোহ যে সবসময়েই ত্যাগের আঙ্গিকে ঘটে তা নয়। বিশেষত তাঁর উত্তরকালের লেখায় নারীর যৌনতার (sexuality) বিকাশ তার বিদ্রোহের একটি আঙ্গিক হিসাবে স্বীকৃত। সংসারের মধ্যে নারীর যৌনতা পুরুষের অভিলষিত কতগুলি গুণের প্রতিমা মাত্র, যা তার ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যখন কোনো পুরুষের সংস্পর্শে এসে তার নিজের দেহমন সম্বন্ধে চেতনা জেগে ওঠে, সেটা হতে পারে তার আত্ম-উন্মেষের একমাত্র উপায়, সাংসারিক নিষ্পেষণের থেকে মুক্তির অনন্য রাস্তা। অমলের মধ্যেই চারুলতা মুক্তি খুঁজে পায়, পায় আত্মপ্রকাশের একমাত্র অবলম্বন। এই মুক্তি সে তার লেখার ক্ষমতার মধ্যেও খুঁজে পায় নি। চারুর এই জাগরণে বহির্জগতের রাজনীতিরও কোনো ভূমিকা নেই। এটা সংসারের চিরাচরিত সীমার মধ্যেই ঘটে। হয়তো এই কারণেই, যদিও 'স্ত্রীস্বভাবে'র তাত্ত্বিক কাঠামোর মধ্যেই গল্পটি থাকে— চারু ধরে রাখতে চায়, অমল পালাতে চায়— তবু তাতে, দাবানলবেষ্টিতা হরিণীর মতো চারুর মুক্তির ইচ্ছা ও মুক্তিহীনতার যে ট্রাজিক বাস্তবতা, তার কোনো ব্যত্যয় ঘটে না। আনন্দময়ী বা মৃণালের একাগ্র মানবতাবাদী বিদ্রোহ চারুর চরিত্রায়ণে আমরা পাই না, কিন্তু চারুকে তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে চলবে না। মৃণালের আত্ম-উন্মেষের প্রক্রিয়া ও চারুর আত্ম-উন্মেষের প্রক্রিয়া পরস্পরের পরিপূরক।

'ঘরে বাইরে'র প্রায় সমকালীন 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে দামিনীর মধ্যে নারীর যৌনতার বিকাশ ও ধর্মীয় মোহের বিরুদ্ধে তার বিদ্রোহ পরস্পর সংলগ্ন হয়ে দেখা দেয়। 'স্ত্রীস্বভাবে'র তত্ত্ব এখানে বাস্তবকে অগ্রাহ্য করে নি, দামিনী 'মোহিনী' নারীর প্রতিমা হলেও ঐ আদলটিতে আবদ্ধ থাকে না, নিজের চারিত্রিক যুক্তিতেই বিকশিত হয়, সে মূর্তিমতী বাস্তবতা। চারুর মতোই তারও মুক্তি একটি পুরুষের সঙ্গে তার সম্পর্কের উন্মেষে, অন্য মুক্তি সে জানে না। কিন্তু সে চারুর চেয়ে অনেক বেশি আত্মসচেতন। তাই সে লীলানন্দ স্বামীর প্রধান প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়ায়। এদিক থেকে সে মৃণাল বা আনন্দময়ীর বেশি কাছাকাছি, তাদের মতোই প্রচলিত সমাজব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত অযুক্তিকে— এ ক্ষেত্রে ধর্মীয় মাতলামিকে— আঘাত করার একটি হাতিয়ার তার চরিত্র। শচীশ তাকে যতই না কেন তপোভঙ্গকারিণী উপদ্রব হিসাবে দেখুক, সে কিন্তু নিজের আবেগের ওপর কোনো মোহের প্রলেপ লাগিয়ে রাখতে চায় না। বরং এই স্বাভাবিক মানবিক প্রবৃত্তিগুলোকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে গাঁজিয়ে তাকে আধ্যাত্মিক উন্মাদনায় পরিণত করার পুরুষালি প্রবণতাকে ধিক্‌কার দিয়ে সে বলে :

'তোমরা দিনরাত রস রস করিতেছ, ও ছাড়া আর কথা নেই। রস যে কী সে তো আজ দেখিলে ? তার না আছে ধর্ম, না

আছে কর্ম, না আছে ভাই, না আছে স্ত্রী, না আছে কুলমান ; তার দয়া নাই, বিশ্বাস নাই, লজ্জা নাই, শরম নাই। এই নির্লজ্জ নিষ্ঠুর সর্বনেশে রসের রসাতল হইতে মানুষকে রক্ষা করিবার কী উপায় তোমরা করিয়াছ ?.... আগুন দিয়া আগুন নেবানো যায় না'[২৪] দামিনীর এই নির্মম বাস্তবতার সামনে 'অসীমে'র সন্ধানী সন্ন্যাসী শচীশও পিছু হটতে বাধ্য হয়। সন্ন্যাসী পুরুষের নির্লিপ্তি রবীন্দ্রনাথের অনেক লেখাতেই এক মহিমান্বিত চেহারায় হাজির হয়, প্রকৃতি তথা নারীর মায়াজাল যখন সে ছিন্ন করে তখনই সে সার্থক। 'ল্যাবরেটরি'র সোহিনী এইভাবেই নেয় প্রকৃত পুরুষের পরীক্ষা, মায়াবিনী বাঁশরী শেষ পর্যন্ত এই নির্লিপ্তির কাছেই নতি স্বীকার করে। দামিনীর নির্মোহ, বিশ্ববীক্ষা কিন্তু এটা খুব স্পষ্ট করে দেয় যে স্ত্রীপুরুষের এই সরলীকৃত প্রভেদের ধারণার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বাস্তববোধকে সবসময়ে খাপ খাওয়াতে পারেন নি। 'স্ত্রীস্বভাবে'র স্বীকৃত আদলের জন্যেও তখন দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছে, চরিত্রগুলি যে সবসময়ে একই কাজে ব্যবহৃত হয়েছে তা বলা যায় না। দামিনী সোহিনী বা বাঁশরীর তুলনায় বেশি বাস্তব— এ কথার অর্থ এই নয় যে বাস্তবে দামিনীর মতো চরিত্র দেখা যায়। সোহিনী বা বাঁশরীর মতোই দামিনী একটি শিল্পায়িত আকৃতিমাত্র— লেখকের কিছু ধারণার সাকার রূপ। কিন্তু দামিনীর মধ্যে এই ধারণাগুলি কোনো দেশকালনিরপেক্ষ তুরীয় ঐক্যের অবস্থায় থাকে না। সেগুলি পারস্পরিক দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয় চিন্তার সংঘাত সৃষ্টি ক'রে এবং এইভাবে আমাদের চেতনায় বিবর্তিত হয়। আপাত নির্বিকল্প হিন্দু অধ্যাত্মবাদেরও ঐতিহাসিক অবস্থানটি মেপে দেয় দামিনীর চরিত্র।

এই কাজটি করার জন্য রবীন্দ্রনাথ যে একটি নারীচরিত্রকে ব্যবহার করেছিলেন, আজকের নারীমুক্তিবাদী চেতনার কাছে এটাই একটা কৌতূহলের বিষয়। দামিনী বা মৃণাল, বিমলা বা এলা কী ? মুক্ত নারীর আদর্শ, নাকি তারা তা নয় ? প্রশ্ন করার এই ধরনটা সঠিক নয়। প্রশ্নটা হল, কোন্ ধরনের মতাদর্শগত আদল বা শিল্প আদল থেকে তাদের উদ্ভব। এবং তাদের রূপায়ণ করতে গিয়ে এই আদলগুলি কতটা, কীভাবে বিবর্তিত হয়েছে, কিংবা কোথায় সেগুলো একই রয়ে গেছে। রবীন্দ্রচর্চার ক্ষেত্রে নারীমুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যাঁরা আসবেন, এই প্রশ্নগুলি দিয়েই তাঁদের কাজ শুরু করতে হবে।

প্রাসঙ্গিক টীকা

১ 'রবীন্দ্রনাথ ও ভিক্‌তোরিয়া ওকাম্পোর সন্ধানে', এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং, কলকাতা, ১৯৮৬।
২ 'দেশ', ২০ ডিসেম্বর, ১৯৮৬, পৃ· ১২১-২৩।
৩ শিবনাথ শাস্ত্রী, 'আত্মচরিত', সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ শতবার্ষিক সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৮২, পৃ· ২০৫।
৪ তদেব, পৃ· ৫২৬।
৫ তদেব, পৃ· ১০০-১০৯, ১৩৭-৪০।
৬ 'আত্মকথা' ১ম খণ্ড, অনন্যা প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৮২তে প্রকাশিত।
৭ 'রবীন্দ্ররচনাবলী' জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ, খণ্ড ১৩, পৃ· ৭২-১০১।
৮ তদেব, খণ্ড ১০, পৃ· ২৮১-৮২।
৯ "The Women's Question in Nineteenth Century Bengal", *A Critique of Colonial India*, Papyrus, Calcutta, 1985, p. 75.
১০ রবীন্দ্ররচনাবলী, খণ্ড ৭, পৃ· ২১৫।
১১ পূর্বোল্লিখিত "হিন্দুবিবাহ" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ চন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ নব্যহিন্দুদের বাল্যবিবাহসংক্রান্ত মতের বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। ১৮৭২ সালে যখন তথাকথিত 'তিন আইনের বিবাহ' চালু হয়, তখন ঐ আইনে প্রথম মেয়েদের চোদ্দ বছরকে বিবাহের ন্যূনতম বয়স হিসাবে বেঁধে দেওয়া হয়। কিন্তু 'তিন আইনের বিবাহ' হিন্দুবিবাহের রীতিনীতিকে স্পর্শ করতে পারে নি, এই আইনে যাঁদের বিবাহ হত তাঁদের নিজেদেরকে ধর্মরহিত বলে ঘোষণা করতে হত। বিবাহের ন্যূনতম বয়স নিয়ে এর পর একটা আলোচনার আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছিল, কিন্তু গোঁড়ামির জোরটা ছিল খুবই বেশি। ১৮৮৭ সালেও জয়গোবিন্দ সোম, যিনি নিজে খৃস্টধর্মাবলম্বী ছিলেন, হিন্দুবিবাহে মেয়েদের ন্যূনতম বয়স নিয়ে বক্তৃতা দিতে গিয়ে বলেছিলেন, আমাদের দেশে আট-নয় বছরের মেয়েরাও যখন স্বামীকে দেখে লজ্জা করতে অভ্যস্ত, তখন বুঝতে হবে ঐ বয়সেই বিবাহে সম্মতি দেবার যোগ্যতা তাদের হয়ে যায়। অবশ্য তিনিও তেরোর নীচে বিবাহ হওয়া উচিত নয় বলে মত দেন। (*Nineteenth Century Studies*, No. 10, April 1975, p. 221.)

১২ মহারাষ্ট্রে রুক্মাবাই বনাম দাদাজির মামলায় বয়ঃপ্রাপ্তা রুক্মাবাই যখন শৈশবে বিবাহিত স্বামীর ঘরে যেতে অস্বীকার করেন, তখন রমাবাই রুক্মাবাইয়ের পক্ষে জনমত সংগঠনে এগিয়ে আসেন, সংস্কৃতজ্ঞ ম্যাক্স মূলারের সঙ্গেও এ ব্যাপারে পত্রালাপ করেন। (*Nineteenth Century Studies*, No. 10, April 1975, pp. 235-44)
১৩ রবীন্দ্ররচনাবলী, খণ্ড ১৩, পৃ· ১০৩।
১৪ তদেব, খণ্ড ১০, পৃ· ৩৬৭-৭০।
১৫ তদেব, পৃ· ৩৫৭-৬০।
১৬ Sumit Sarkar, *The Swadeshi Movement in Bengal, 1903-1908*, Delhi, 1973, pp. 53-54.
১৭ তদেব, p. 288 '...the prevalent orthodox ideology of the Swadeshi age could hardly have been conducive to the acceptance of full equality of sexes.'
১৮ 'জীবনের ঝরাপাতা', কলকাতা (রূপা), ১৯৭৫, পৃ· ১৮৭।
১৯ রবীন্দ্ররচনাবলী, খণ্ড ৯, পৃ· ৪০৯।
২০ Sunil Sen, *The Working Women and Popular Movements in Bengal*, Calcutta, 1985, pp. 25-28.
২১ রবীন্দ্ররচনাবলী, খণ্ড ৯, পৃ· ৯১৪।
২২ তদেব, পৃ· ৯১৪।
২৩ ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত, 'বিপ্লবের পদচিহ্ন', কলকাতা, ১৯৫৩, পৃ· ৩৪৪-৫৭।
২৪ রবীন্দ্ররচনাবলী, খণ্ড ৯, পৃ· ৩৮৯।

গল্পগুচ্ছের প্রকরণ : কতিপয় মোটিফ

সৈয়দ আকরম হোসেন

জীবন-তো সময়-সমষ্টি। জন্ম-মৃত্যুর সময়সীমা-শাসিত আয়ুষ্কালও জীবন— সে-জীবন শিল্পী-দার্শনিক রবীন্দ্রনাথের বিষয় নয়। রবীন্দ্রনাথের স্নায়ুতন্ত্রের নিজস্ব ধর্মে গ্রন্থী-কেন্দ্রের মৌল অভিজ্ঞানে জীবন হল সমাজ ও সময়ের ধ্বনি-প্রতিধ্বনি, মূল্যজ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ধ্রুপদী অনুষঙ্গ। সে-জীবন হল সময়াভিজ্ঞতার ইনটেনশন বা ধ্যান, সময়-অন্তর্গত মৌল সংরাগ ও প্রবীণতম চেতনাস্তম্ভ। রবীন্দ্র-প্রতিভার প্রকৃতি চলমানতার উৎসপ্রবাহে অঙ্গীকারবদ্ধ, রবীন্দ্রসৃষ্টির প্রকৃতি এ কারণেই চলমান বিশ্বজগতের পরিপ্রেক্ষিতে পরীক্ষা-প্রিয়। অ্যারিস্টটলীয় ত্রি-নীতি অনুসৃত জীবনের বহুলাঙ্গিক সম্পূর্ণতা, শত প্রবাহের শব্দবিন্যাস ও শাখা-প্রশাখাসমাচ্ছন্ন বহুভুজ জীবনের রূপনির্মাণ উপন্যাসে প্রত্যাশিত হলেও, ছোটোগল্পে অবাঞ্ছনীয় ও অচল। তীক্ষ্ণদৃষ্টি, অন্তর্দৃষ্টি ও দিব্যদৃষ্টির সুষম ঐক্যে স্ফটিকায়িত হয় ছোটোগাল্পিক শিল্পবোধের তন্ময় মহান বিন্দুবৃত্ত, যার অভিব্যঞ্জনায় ভগ্ন ও চূর্ণ বিশ্ব হয়ে ওঠে প্রতীতি-সমগ্র। সময়-মূল্যাশ্রয়ী জীবন-তরঙ্গ পুষ্পিত হয় অসীমাকাঙ্ক্ষার চিত্রকল্পে।

সঞ্চরণশীল পটভূমির গভীরে বিচিত্র মাত্রায় সংলাপ হয়ে গড়ে ওঠে ছোটোগল্পের স্বরগ্রাম, রূপশৈলী, সংকেত ও প্যাটার্ন অর্থাৎ সংবেদনময় চিত্রকল্প। পটভূমির পরিবেশ-পরিস্থিতি প্রকৃতি এবং সময়ের গতিবৈচিত্র্য অনিবার্যভাবে নির্ধারণ করে ছোটোগল্পের চরিত্রচিত্তের গভীরতা, বিস্তৃতি ও সুরসমূহ। এই পারস্পরিক সংযোগ-প্রক্রিয়ায়, বিন্যাস-প্রতিন্যাসের সূক্ষ্মতায় এবং বিপ্রতীপ গতির সম্বন্ধসূত্রে শিল্পিত হয়ে ওঠে রবীন্দ্রনাথের 'গল্পগুচ্ছের' জীবনদর্শন।

২

রবীন্দ্রশিল্পদৃষ্টির অন্তরঙ্গ 'মোটিফ' অর্থাৎ উপাদান ও প্রকরণগত তন্ময়নির্জন বৈশিষ্ট্য হল, মানুষের কোনো সমস্যাদীর্ণ মুহূর্ত, যন্ত্রণাজর্জর অনুভূতি, তীক্ষ্ণমুখ বেদনাবেগ ইত্যাদিকে গল্পের পটভূমির আবেগ ও চলমানতার বিপরীতে নিশ্চলভাবে সংশ্লিষ্ট করে তাকে একটি স্তব্ধ পরিমণ্ডলে প্রগাঢ় করে তোলা। অর্থাৎ পটভূমি (Background) ও অগ্রভূমির (Foreground) পারস্পরিক গতি-তারতম্যের দ্বন্দ্বময় বিন্যাসে রবীন্দ্রনাথ শিল্পিত করেন তাঁর বিশেষ-নির্বিশেষ জীবনজিজ্ঞাসা, ব্যক্তি ও সমগ্র ধারণা। 'শাস্তি' গল্পের একটি দৃষ্টান্ত এ প্রসঙ্গে পরীক্ষা করা যেতে পারে :

> 'চন্দরা রক্তসিক্ত বস্ত্রে 'কী হল গো' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। ছিদাম তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল। দুখিরাম দা ফেলিয়া মুখে হাত দিয়া হতবুদ্ধির মতো ভূমিতে বসিয়া পড়িল।...
>
> বাহিরে তখন পরিপূর্ণ শান্তি। রাখালবালক গোরু লইয়া গ্রামে ফিরিয়া আসিতেছে। পরপারের চরে যাহারা নতুনপক ধান কাটিতে গিয়াছিল তাহারা পাঁচ- সাতজনে এক-একটি ছোটো নৌকায় এপারে ফিরিয়া পরিশ্রমের পুরস্কার দুই-চারি আটি ধান মাথায় লইয়া, প্রায় সকলেই নিজ নিজ ঘরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।' (প্রথম পরিচ্ছেদ)

ক্রুদ্ধ দুখিরাম স্ত্রীকে খুন করার পর মুহূর্তে ছিদাম-দুখিরাম পরিবার নিক্ষিপ্ত হল চরম যন্ত্রণাজীর্ণ সংকটময় পরিস্থিতিতে। দৃশ্যচিত্রের অগ্রভূমির ভূমিহীন এই কৃষক-পরিবারের শূন্যতা, অস্তিত্বহীনতা, নিমজ্জন এবং তাদের ব্যক্তি-আশ্রয়ী রক্তাক্ত

অনুভূতিপুঞ্জকে রবীন্দ্রনাথ একাধারে করেছেন নিশ্চল, স্থির ; অপরপক্ষে পটভূমির পরিপূর্ণ শান্তিময় চলমান দৃশ্যের চিত্ররেখা দুরন্ত আবেগী গতিরেখায় হয়েছে তরঙ্গিত। ফলে একটি সুতীক্ষ্ণ স্থির-অস্থির ব্যঞ্জনাবেগ কেন্দ্রীভূত হয় দৃশ্যপটের ফ্রেমে। এবং দ্বন্দ্বমুখর 'মন্টাজ প্রক্রিয়া'য় একটি বিষণ্ণ উদাসী আবেগ স্থানকাল ছিন্ন হয়ে ঘুরে ঘুরে নিজেকে সীমাহীনতায় চিহ্নিত করে যায়। একই গল্পে অনুরূপ মোটিফ অন্যত্র : দৃশ্যের অগ্রভূমিতে নিরীহ ক্ষুদ্র চঞ্চল কৌতুকপ্রিয় গ্রাম্যবধূ চন্দরা যখন পরিস্থিতির শিকারে পরিণত এবং ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট যখন তাকে সেশনে চালান দিলেন, তখন পটভূমির উদাসী সশব্দ চিত্র ও চলচ্চিত্র অনুধাবনীয় :

'ইতিমধ্যে চাষবাস হাটবাজার হাসিকান্না পৃথিবীর সমস্ত কাজ চলিতে লাগিল। এবং পূর্ব পূর্ব বৎসরের মতো নবীন ধান্যক্ষেত্রে শ্রাবণের অবিরল বৃষ্টিধারা বর্ষিত হইতে লাগিল।' (তৃতীয় পরিচ্ছেদ)

এই পূর্ববৎ চলমান জীবন বর্ষণমুখর উদাসী পটভূমির বৈপরীত্যে চন্দরার অন্তর-নৈঃসঙ্গ্য একাকীত্ব, স্তম্ভিত কান্না এবং সংগত অভিমান হয়ে উঠেছে অধিকতর চেতনাসঞ্চারী সজীব এবং বর্ণান্তর অতিক্রমী সংকেতময়।

গল্পগুচ্ছের সংগঠন প্রক্রিয়ার মধ্যে উপর্যুক্তপ্রবণতা, মনোভাব বা মোটিফ রবীন্দ্রনাথের বিশেষ প্রিয়। পূর্ব-দৃষ্টান্তে ব্যবহৃত প্রয়োগ-ফল সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বিশ্বস্ত এবং শিল্পনিপুণ। গল্পগুচ্ছের গুরুত্বপূর্ণ রূপদক্ষ গল্পসমূহে ব্যবহৃত হয়েছে উল্লিখিত মোটিফ। যেমন : [এক]। জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রাতে, দক্ষিণের হু-হু করা উদ্‌ভ্রান্ত বাতাসে, ছাদের উপর উৎপীড়ক স্বামী গোপীনাথ যখন স্ত্রী গিরিবালার অলংকারসমূহ ছিনিয়ে নিয়ে পদাঘাত ক'রে চলে যায়, তখনকার বিপরীতধর্মী চলমান পটভূমির ইমেজ নিম্নরূপ :

'বাড়ির কাহারও নিদ্রাভঙ্গ হইল না, পল্লীর কেহ কিছুই জানিতে পারিল না, জ্যোৎস্নারাত্রি তেমনি নিস্তব্ধ হইয়া রহিল, সর্বত্র যেন অখণ্ড শান্তি বিরাজ করিতেছে।' (মানভঞ্জন)

[দুই]। জট পাকানো যুগের উন্মূলিত ও বিকৃত মানসিকতার প্রতিভূ অনাথবন্ধু, বিন্ধ্যবাসিনীর স্বামী। শারদীয় পূজার সময় সে শ্বশুরের সিন্দুক ভেঙে অর্থ আত্মসাৎ করে বিলেত যাচ্ছে। এই সংবাদবাহী চিঠি পড়ার পর : দৃশ্যের অগ্রভূমির বিন্ধ্য, নিস্তব্ধ মৃত্যুরজনীর ঝিল্লিধ্বনির মতো শব্দ শুনতে পেল, আর পটভূমিতে তখন শারদীয় উৎসবানন্দের ক্রমবিস্তৃত সামগ্রিকতার গতিস্পন্দন :

'... প্রাঙ্গণ হইতে, প্রতিবেশীদের বাড়ি হইতে এবং দূর অট্টালিকা হইতে, বহুতর সানাই বহুতর সুরে তান ধরিল। সমস্ত বঙ্গদেশ তখন আনন্দে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে।' (প্রায়শ্চিত্ত)

এই পারস্পরিক বিপ্রতীপ বিন্যাসে অধিকতর গুরুত্ব পেয়েছে বেদনা এবং আনন্দের সংঘাত ও বৈপরীত্য। পটভূমি এখানে কেবল গতিময় চিত্রধর্মীই নয়, বরং ধ্বনি ও শ্রাব্যকল্পের অন্তর্বয়নে ঊর্ধ্বমুখী, বীতশোক অথচ আশ্চর্য এক বিবাদজর্জরিত। 'প্রায়শ্চিত্ত' গল্পেই অন্যত্র যেমন, রাজকুমারবাবুর ক্রোধের পরিপ্রেক্ষিতে :

'মা কাঁদিতে লাগিলেন, মেয়ে কাঁদিতে লাগিল এবং কলিকাতার চতুর্দিক হইতে বিচিত্র সুরে আনন্দের বাদ্য বাজিতে লাগিল।'

'পোস্টমাস্টার', 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন', 'মেঘ ও রৌদ্র', 'নিশীথে', 'বোষ্টমী' প্রভৃতি গল্পের শরীর গঠনে আলোচিত মোটিফ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এ-সব ক্ষেত্রে রৈখিক গতি ও গ্রাফিক দৃশ্যের গতিবেগের মধ্যে স্থিরদৃশ্যের ও স্তব্ধ আবেগের সংঘাত ঘটিয়ে মুহূর্ত-আবদ্ধ এবং অসীম বিস্ফারিত সংবেদনকে ভাবকল্পে সংকেতময় করা— সীমাহীন তৃতীয় এক রস-প্রতীতির জন্ম দেওয়া রবীন্দ্র-প্রকরণের অন্যতম শিল্পসূত্র।

৩

গল্পগুচ্ছের শিল্পপ্রকরণে রবীন্দ্রনাথের আরেকটি সূক্ষ্মতর মোটিফ হল— পরিচর্যা-পর্যায়ে কোনো ফ্রেমের অগ্রভূমিকার দৃশ্যাবলীর মাঝে প্রয়োজনীয় ও স্বাভাবিক গতিবেগ সঞ্চার ক'রে এবং পটভূমির গতিচ্ছন্দ হরণ ক'রে যতিপাত ঘটিয়ে এবং

প্রথমমন্থর ক'রে— ভিন্নতর প্যাশন ও বিশ্ববীক্ষার আবেগময় প্রতিপাদ্য ও প্রতিসাম্য সৃষ্টি করা। যেমন 'মেঘ ও রৌদ্রে' স্টিমারের ইংরেজ ম্যানেজার যখন দেখল, স্ফীতপাল বাঙালির নৌকা প্রতিযোগিতায় ব্রিটিশ-স্টিমারকে পরাভূত করে এগিয়ে যাচ্ছে, সে-মুহূর্তের পরিচর্যা :

'সাহেব হঠাৎ একটা বন্দুক তুলিয়া স্ফীত পাল লক্ষ্য করিয়া আওয়াজ করিয়া দিল। এক মুহূর্তে পাল ফাটিয়া গেল, নৌকা ডুবিয়া গেল, স্টিমার নদীর বাঁকের অন্তরালে অদৃশ্য হইয়া গেল।'

বর্ণনাংশের বাক্য অর্থজ্ঞাপকতায় হয়েছে ক্রমশ হ্রস্ব এবং 'ইল'-প্রত্যয়ান্তিক ক্রিয়াপদের বারংবার ব্যবহারের ফলে বাক্যশরীর ও শব্দচিত্র থেকে শোষিত হয়েছে গতিবেগ। ফলে দৃশ্য এবং আবেগের ক্রমবিলীয়মান অন্তশ্ছন্দে উপলব্ধি ও অনুভবের আন্তরক্রিয়ায় পাঠকচিত্তে এক নিশ্চল বিমূর্ত আইডিয়ার জন্ম দেয়। রবীন্দ্রনাথের এই প্রাকরণিক মোটিফ পূর্বালোচিত প্রক্রিয়ার বিপরীত। প্রাথমিক মোটিফে পটভূমি ছিল প্রাত্যহিক, উদাসীন, ধাবমান এবং ক্রমপ্রসারিত ও বর্ধিতআয়তনিক। বিপরীতে অগ্রভূমি ছিল নিশ্চল স্থির কখনো বা চিত্র-আয়তনে ঝাপসা, রেখান্বিত। বর্তমান পরিচর্যায় ও প্রকরণে মোটিফ গুণগতভাবে ভিন্ন। এখানে পটভূমি ক্রম-ক্ষয়িষ্ণু, ক্রম-স্থির। এবং গতিচ্ছন্দে ক্রম-ধীর, অতঃপর বিলীয়মান দূরচিত্রে ও নৈঃশব্দ্যে গীতময়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বেশ-কিছু গল্পে অনুরূপ মোটিফ-ধর্মী পরিচর্যায় শিল্পিত করেছেন সংবেদনলোকের সাবজেকটিভ এক্সপ্রেশন।

৪

দৃশ্যপটের অগ্রভূমি (Foreground) দ্রুততর কিংবা চলমান রেখে, পটভূমির (Background) নৈঃসঙ্গ্য, নৈঃশব্দ্য ও মন্থরগতিকে রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেন রসপরতান্ত্রিক ও অঙ্গুলিনির্দেশক এক পরম মুহূর্তকে ক্রমসূক্ষ্ম তীক্ষ্ণমুখ করে তুলতে। রাবীন্দ্রিক এ-মোটিফ চিত্রশিল্প-প্রতিভা ও সাংগীতিক-প্রতিভার আন্তরক্রিয়ার ফলেই হয়েছে সম্ভব। এ-জাতীয় পরিচর্যায় অন্তর-স্পন্দন অনুভবে কল্পনাশক্তি, শব্দ, সংমিশ্রণ-প্রতিক্রিয়ার ধারণা, রঙের সম্ভাব্য প্রতীকী-ব্যঞ্জনা-অবধারণ এবং সাংগীতিক গতিচেতনা অনিবার্য। প্রচ্ছন্ন, স্পষ্ট ও সংকেতিত— নানাভাবে এ-জাতীয় প্রাকরণিক মোটিফ 'একরাত্রি', 'নিশীথে', 'ক্ষুধিত পাষাণ', 'মেঘ ও রৌদ্র', 'শাস্তি', 'ছুটি', 'বোষ্টমী' প্রভৃতি গল্পের গঠন-শৈলীকে সমৃদ্ধ করেছে। যেমন 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' গল্পের মেঘাচ্ছন্ন অপরাহ্ন। রাইচরণ খেয়ালী, খোকাবাবু অর্থাৎ শিশু নবকুমারকে ঠেলাগাড়িতে করে পদ্মাতীরে বেড়াতে এল। এরপর :

'রাইচরণ ধীরে ধীরে গাড়ি ঠেলিয়া ধান্যক্ষেত্রের প্রান্তে নদীর তীরে-আসিয়া উপস্থিত হইল। নদীতে একটিও নৌকা নাই, মাঠে একটিও লোক নাই— মেঘের ছিদ্র দিয়া দেখা গেল, পরপারে জনহীন বালুকাতীরে শব্দহীন দীপ্ত সমারোহের সহিত সূর্যাস্তের আয়োজন হইতেছে। সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে শিশু সহসা একদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিল, "চন্ন ফ়ু।"

আলোচ্য আয়তনের অগ্রভূমি-চিত্র হল : ধানক্ষেতের পাশ দিয়ে রাইচরণ গাড়ি ঠেলে নদীর তীরে এল। অপরপক্ষে পটভূমির বর্ণনা (১) লোকহীন নৌকাহীন নির্জনতা ; (২) ওপারে দারুণ নিঃসঙ্গতায় ছেঁড়া-মেঘের ফাঁক দিয়ে ছিটকে-পড়া ফ্যাকাশে রঙের সংকেত ; (৩) ডুবন্ত নিভে যাওয়া সূর্য ; (৪) চারদিকে স্তব্ধতা, নৈঃশব্দ্য— সমগ্র প্রকৃতিলোক ও বহির্জগৎ থেকে শেষ শব্দবিন্দুও শোষণ ক'রে নেয়া হয়েছে। এখানে নির্জনতা স্তব্ধতা সূর্যের নিভে-যাওয়া-চলচ্ছবি, ছেঁড়া-মেঘ এবং নৈঃশব্দ্য সবচেয়ে জরুরি সংকেতবহ উপাদান। 'চন্ন ফ়ু'— খোকাবাবুর এ-উচ্চারণকে সামগ্রিক স্তব্ধতা, স্তম্ভিত প্রকৃতি ও শব্দশূন্যতা করেছে বৃহদায়তন, ক্রমপ্রসারিত ও বিদ্যুচ্চমকধর্মী ; অন্যপ্রান্তে সূর্যাস্ত, ফ্যাকাশে রঙ— এ গল্পের ট্রাজিক পরিণামকে করেছে তীব্রতম এবং প্রতীকী। নৈঃশব্দ্য যে-কোনো আবেগ সৃষ্টিতে সক্ষম— এখানে সেই নিশ্চল স্তব্ধতা গল্পের তীক্ষ্ণতম মুহূর্তের গতিশীলতাকে করেছে দৃশ্যপটে আবদ্ধ। বর্ণানাংশের সংগীতময়তা, রঙ, শব্দ, নৈঃশব্দ্য এবং একটি সংলাপ, মূলত, পরম্পরিত অন্তশ্ছন্দময় সংঘাতে সৃষ্টি করেছে স্থান-কালসীমা-মুক্ত এক পারমার্থিক

জাগর চৈতন্যের ইশারা। বেগবান অনিরুদ্ধ এই বহির্জগৎ, চলমানতার মানুষ, প্রাণিকুল, প্রকৃতি, সমাজ ও সময়। অবিরাম এই চলমানতায় আত্ম-সন্ধানী, বিশ্বস্ত ও ধীমান রবীন্দ্রনাথ রূপরেখাময় বস্তুবিশ্বের ধাবমান পটভূমিতে পরীক্ষা ও বিবেচনা করেছেন 'গল্পগুচ্ছে'র চরিত্রাবলীকে, বিন্যাস করেছেন গল্পসমূহের জীবনার্থ ও চেতনাগুচ্ছ। 'গল্পগুচ্ছে'র পটভূমির চলচ্ছবি, বস্তু-উপাদান ও চলমান জীবন যেন প্রতীকী অভীপ্সা— বর্ণনায় ও ব্যঞ্জনায় যা তীক্ষ্ণমুখ, গভীর সত্য ও তত্ত্বময়। জীবনানুষঙ্গে, বিচিত্র অর্থে, বিভিন্ন বোধ ও সংবেদনে— নানা মোটিফ-সমবায়ে, বিবিধ তাৎপর্য এবং মূল্যে 'গল্পগুচ্ছে'র অগ্রভূমি ও পটভূমি রূপ ও রূপক-বোধে হয়ে উঠেছে শিল্পস্বচ্ছন্দ, চেতনাগভীর ও ব্যঞ্জনায় গীতময়।

গ্রন্থে ব্যবহৃত চিত্র

স্মারক-গ্রন্থ প্রকাশ সমিতি